রঙ্গমঞ্চের নেপথ্য বিজ্ঞান

পট দীপ·ধ্বনি

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক
দিলীপ কুমার ঘোষ
কর্মসচিব
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন,
কলিকাতা-৭

মুদ্রক
দুর্গাপ্রসাদ মিত্র
এলম্ প্রেস
৬৩, বিডন স্ট্রিট
কলিকাতা-৬

প্রাপ্তিস্থান
রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
কলিকাতা-৭
জিজ্ঞাসা
১৩৩ এ, রাসবিহারী এভিনিউ,
কলিকাতা-২৯
৩৩, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
অমর ঘোষ

ভাবীকালের
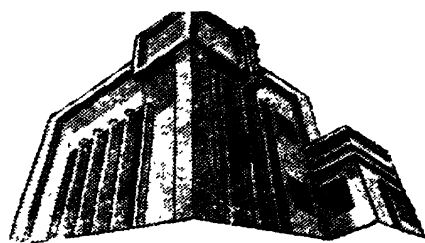
মঞ্চবিজ্ঞানীদের উদ্দেশে

মুখবন্ধ

ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোলের মতোই যে কোনও বিজ্ঞান-পুস্তকের আদ্যন্ত সব কথা কোনও গ্রন্থকারের মৌলিক কথা হতে পারেনা। পূর্বসূরীদের গবেষণালব্ধ প্রাথমিক বিষয়গুলিকে কাঠামো হিসাবে গ্রহণ করাই এসবক্ষেত্রে রীতি। 'পট-দীপ-ধ্বনি'র মূল কাঠামোতেও সেই ধরণের ঋণ অস্বীকার করার উপায় নেই।

মৌলিকত্বের প্রথম যে দাবী এই গ্রন্থে করা চলে, তা হচ্ছে সর্বতোভাবে এটিকে বাংলা বই হিসাবে রচনা করার চেষ্টা করেছি। অসংখ্য নূতন শব্দের ব্যবহার পাওয়া যাবে এই বইটিতে, যেগুলি তাদের নূতন ব্যবহারিক অর্থ নিয়ে মঞ্চজগতে অচিরে জনপ্রিয় এবং প্রচলিত হবে বলে আশা রাখি। লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, নূতন শব্দগুলি কিন্তু অপরিচিত নয়; অন্যপক্ষে এযাবতকাল ব্যবহৃত নামগুলির সঙ্গে ধ্বনি-সাদৃশ্য-যুক্ত, শ্রুতিমধুর এবং সহজে উচ্চারণ করার মতো সংক্ষেপিত। যাঁরা অনায়াসে Acting area বলে এসেছেন, তাঁদের পক্ষে 'রঙ্গপীঠ' উচ্চারণ করা নিশ্চয় আরও সহজ হবে। অনুরূপভাবেই Acting area light কে বলেছি 'রঙ্গপ্রদীপ'। Orchestra Pit আর 'বাদ্যপীঠ' Grid Iron আর 'কড়িকাঠাম', Tormentor আর 'পার্শ্বপট', অথবা Cyclorama আর 'বলয়পট'—এগুলির মধ্যে উচ্চারণ-সময়ের সমতা ও ছন্দগত মিল দুইই সহজে নজরে পড়বে। Trap এর মতো ছোট্ট একটি শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'সুঁড়ি' কথাটি নিশ্চয়ই আদর পাবে। সুঁড়িপথ কথাটি সুড়ঙ্গপথের অপভ্রংশ হিসাবে পূর্বপরিচিত।

এর ভিতর থেকে শুধু 'সুড়ি' কথাটিই মূলভাব ব্যক্ত করার পক্ষে পর্য্যাপ্ত, সেইসঙ্গে Trap এর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চট করে উচ্চারণ করার মতো হাল্কা। ঠিক একইভাবে ব্যবহার করেছি 'কাজী' শব্দটিকে। Working light কে 'কাজের আলো' বলার চেয়ে 'কাজী' বললে অনেকখানি আপন করে নেওয়া যাবে।

মৌলিকত্বের আর একটি দিক, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর পর্য্যায় পর্যন্ত পাঠক্রম হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ার উপযুক্ত করেই যে শুধু এই গ্রন্থ রচিত হয়েছে তা নয়, নাট্যলোকের নেপথ্য বিজ্ঞান সম্পর্কে প্রাথমিক ভিত্তি গড়ে তোলার মতো সর্বাঙ্গীন শিক্ষাদানের যোগ্য করেই সাজানো হয়েছে এর পরিচ্ছেদগুলিকে। সেইসঙ্গে যেসব অনুশীলনী যুক্ত হয়েছে, সেগুলি একজন শিক্ষার্থীকে আলোচ্য বিষয়াবলীর তত্ত্ব এবং প্রয়োগ উভয়বিধ অভ্যাস সাধনে সাহায্য করবে। বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রমের দিক থেকেও প্রদত্ত অনুশীলনীগুলির মাধ্যমে, একজন পরীক্ষার্থী তার প্রস্তুতিপর্বে, সম্ভাব্য প্রশ্নপত্র সম্পর্কে ধারণা এবং উত্তরপত্র তৈরী করার বিষয়ে যথাযথ ইঙ্গিত পাবে।

যেসব নাট্যকর্মী এই শ্রেণীর বিভিন্ন বিদেশী পুস্তক পাঠ করেছেন এবং চর্চ্চা করেন, তাঁরা 'পট-দীপ-ধ্বনি'র আর একটি মৌলিক দিক নিশ্চয় লক্ষ্য করবেন। এটি রচিত হয়েছে সম্পূর্ণভাবে আমাদের দেশীয় কাঠামোতে, আমাদেরই রঙ্গজগতের সীমাবদ্ধ পটভূমিকে কেন্দ্রকরে। আমাদের সাধ্যের বাইরে কোনও দৃষ্টান্ত, উপকরণ বা কলাকৌশল এতে নেই— বরং যেসব উদাহরণ, নমুনা বা কারসাজির উল্লেখ করা হয়েছে, তার প্রত্যেকটি আমাদের নাট্যজগতে পরীক্ষিত; সুতরাং শিক্ষার্থীদের পক্ষেও অনুশীলন-সাধ্য।

এই শ্রেণীর বিজ্ঞান-পুস্তক চিত্র-সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে বাধ্য। অবশ্যই স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বিদেশী পুস্তকের সঙ্গে এ ব্যাপারে পাল্লা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এই কারণে যে, আমাদের স্বল্প মুদ্রণ-সংখ্যায় পুস্তকের বিক্রয়মূল্য সে ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার্থী সমাজের ক্রয়-ক্ষমতার সীমা ছাড়িয়ে যাবে। তবু যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি পুস্তকটিকে মৌলিক রেখাচিত্র এবং আলোকচিত্রে অলংকৃত করতে। বিশেষকরে পরীক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করেই রেখাচিত্র এবং চার্টগুলিকে যথাসম্ভব সহজ ও সরল করার প্রয়াস পেয়েছি।

সংগীত-নৃত্য-নাটক আকাদেমীতে মঞ্চ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসাবে নিযুক্ত হয়েই লক্ষ্য করেছিলাম, এ বিষয়ে বাংলা তথা ভারতীয় ভাষাতেই কোনও পাঠ্যপুস্তক নেই। যেসব বিদেশী বই বাজারে বা বিভিন্ন লাইব্রেরীতে পাওয়া যায়, তা একাধারে দুর্লভ এবং দুর্মূল্য। তাছাড়া, কোনও একটি নির্দিষ্ট বই অনুশরণ করে আলোচ্য বিষয়াবলী সম্পর্কে প্রার্থিত ফললাভ করা প্রাথমিক শিক্ষার্থীর পক্ষে শুধু কষ্টসাধ্যই নয়, অসম্ভব। আকাদেমী পরে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যলয়ে রূপান্তরিত হলো, এবং নাটক উন্নীত হলো স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পাঠক্রম হিসাবে। এই পর্য্যায়ে এতখানি গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয়ের উপরে পাঠ্যপুস্তক হাতের কাছে না পাওয়ার অভাব স্বাভাবিক ভাবেই প্রকটভাবে দেখা দেয়।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই পর্য্যায়ে আমার 'পট-দীপ-ধ্বনি'র পাণ্ডুলিপি প্রকাশের জন্য অনুমোদন করেন। এই অনুমোদনের ব্যাপারে নাটক বিভাগের প্রাক্তন প্রধান স্বর্গত অধ্যাপক ডঃ সাধন কুমার ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়-মহাশয়দের নাম আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। দুর্ভাগ্যবশতঃ প্রায় বারো বছর এই প্রকাশনার কাজ নানা অসুবিধায় বিলম্বিত হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকের অভাব উত্তরোত্তর আরও প্রকটভাবে অনুভূত হয়েছে ছাত্রছাত্রীমহলে। এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্য শ্রদ্ধেয় ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় যথেষ্ট সহানুভূতি এবং দ্রুততার সঙ্গে পুস্তকটি মুদ্রণ ও প্রকাশনার ব্যবস্থা করে শুধু আমায় কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন তাই নয়, আলোচ্য পাঠক্রম-অন্তর্গত ছাত্রছাত্রীদের একটি বিরাট অভাব মোচন করেছেন। বাংলা-ভাষায় এই ধরণের একটি মূল্যবান সংযোজনের প্রথম গৌরব লাভের জন্য আমি রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চির-ঋণী রইলাম।

এই গ্রন্থে প্রায় দেড়শতাধিক চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে। ন্যুনাধিক পঞ্চাশটি চিত্র এঁকে সাহায্য করেছেন রবীন্দ্রভারতীর প্রাক্তন ছাত্র শ্রীগোবিন্দ মোদক। গ্রন্থটিকে নিজের পছন্দমতো সাজিয়ে প্রকাশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা পেয়েছি রবীন্দ্রভারতীর প্রকাশনা বিভাগের কাছ থেকে। গ্রন্থটিকে যথাসম্ভব পরিচ্ছন্ন ও ত্রুটিমুক্ত করার ব্যাপারে বারম্বার প্রুফ সংশোধনের এবং বিন্যাস অদলবদলের দরকার পড়েছিল—এ ব্যাপারে অকণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন মুদ্রাকর শ্রীদুর্গাপ্রসাদ মিত্র মহাশয়। এঁদের প্রত্যেকের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম।

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তালিকা থেকে পৃথকভাবে সশ্রদ্ধ প্রণতির সঙ্গে স্মরণ করছি নটসূর্য্য স্বর্গীয় অহীন্দ্র চৌধুরীর নাম—যিনি তাঁর বহুমূল্য গ্রন্থসংগ্রহশালা অকৃপণভাবে খুলে দিয়েছিলেন আমার জন্য। সংগীত-নৃত্য-নাটক আকাদেমীতে কাজ করার প্রথম কয়েকটি বছর একাদিক্রমে আমি প্রয়োজনমতো নুড়ি কুড়িয়েছি ঐ বিশাল সংগ্রহের বেলাভূমিতে।

'পট-দীপ-ধ্বনি' বিশেষভাবে নাটক-বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রচিত হলেও, সাধারণভাবে যে কোনও নাট্যানুরাগীর কাছেই এটি Ready Reference-এর কাজ করবে। বলা বাহুল্য, আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি এত বিশাল যে, এর যে কোনও একটি অনুচ্ছেদের বক্তব্য অবলম্বন করে এক একটি পৃথক পুস্তক রচনা করা সম্ভব। ভবিষ্যতে উত্তর-সুরীদের কেউ যদি অনুরূপ রচনার কাজে এগিয়ে আসেন, তবেই বুঝবো আমার এই উৎসমুখ খুলে দেওয়ার কাজটি সার্থক হয়েছে।

সূচীপত্র বিষয়াবলী

সূচীপত্র || চিত্রাবলী

চিত্রসংখ্যা পৃষ্ঠাঙ্ক

উপক্রমণিকা

যে কোনও অভিনয়ে প্রথমেই যাঁদের নজরে পড়ে, তাঁরা হচ্ছেন অভিনেতৃবৃন্দ। জীবনের একটি অংশকে নাট্যকার তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাখ্যা করে যে আখ্যান রচনা করেন, তার নাম নাটক। সেই নাটককে রঙে রসে সুষমামণ্ডিত করে দর্শকের সামনে তুলে ধরার জীবন্ত মাধ্যম বলা যেতে পারে এইসব অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের। নাটক পড়ার সময় পাঠকের মনশ্চক্ষে যে ছবি তার অস্পষ্ট ছায়া নিয়ে ধরা পড়ে, সেই ছবি যেন রক্ত মাংসের চেহারা নিয়ে দর্শকের চোখের সামনে ধরা দেয় মঞ্চের গণ্ডীতে। বলা বাহুল্য, নাটক দেখার মুহূর্তে অভিনেতৃবৃন্দের প্রকাশ করা শোকে আমরা উদ্বেল হই, তাদেরই হাসিতে আমরা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করি, ভারাক্রান্ত হয়ে উঠি তাদেরই ফুটিয়ে তোলা ব্যথা বেদনায় সমব্যথী হয়ে। সবার শেষে একটি ভালো নাটক উপভোগ করানোর পুরস্কারে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানাতে প্রেক্ষাগৃহ করতালি মুখরিত করে ফিরে আসি।

তবে আজকের সচেতন দর্শক সমালোচক কারও জানতে বাকী নেই যে, মঞ্চে দৃশ্যমান কয়জন অভিনেতা-অভিনেত্রীই একটি নাটক উপস্থাপনার প্রথম ও শেষ কথা নয়। একটি সফল পরিবেশনার নেপথ্যে রয়েছে আরও বহু অক্লান্ত কর্মীর কুশলতা, যাদের বাদ দিয়ে কোনও নাটক উপস্থাপনা করা আজকের যুগে শুধু কষ্টকর নয়—অসম্ভব।

নেপথ্যের কাজগুলিকে আমরা মোটামুটি চার ভাগে ভাগ করতে পারি। দৃশ্য পরিকল্পনা, আলোকসম্পাত, কৃত্রিম ধ্বনিসহ শব্দযোজনা, রূপসজ্জা—এই হলো প্রধান চারটি নেপথ্য কর্ম। কিন্তু এদের প্রত্যেকটি বিভাগে আবার উপবিভাগও আছে একাধিক। যেমন দৃশ্য পরিকল্পনাকারীর সাহায্যের জন্য একদিকে যেমন দরকার সূত্রধরদের, অন্যদিকে তেমনি

আবার চিত্রকরশ্রেণীকেও দরকার। নাটক চলার সময় একটি ছোটখাটো বাহিনীই নিযুক্ত থাকে দৃশ্য এবং আনুষঙ্গিকাদি পরিবর্ত্তনের কাজে—যাদের শিফ্‌টার বলে। আলোকসম্পাতকারীর সঙ্গে এক বা একাধিক তড়িৎ-বিশারদকে হাজির থাকতেই হবে। শব্দযোজনা বিভাগে একদিকে যেমন তড়িৎ বিশারদের কিছু সাহায্য চাই, তেমনি চাই বাদ্য ও কণ্ঠশিল্পী-সহ বিভিন্ন শব্দ উৎপাদনে সক্ষম কুশলী শিল্পী এবং স্বরক্ষেপন বিশারদের সহযোগিতা। রূপসজ্জাকরের সঙ্গে হাত মেলাতে হয় বেশকারী এবং আনুষঙ্গিক-অবধায়ককে। এছাড়া, যিনি নাটকের সংলাপ স্মরণ করিয়ে দেন, অর্থাৎ স্মারক, তিনিও একজন অতিপ্রয়োজনীয় নেপথ্য কর্মী।

এতগুলি বিভিন্ন কাজে রত নেপথ্য কর্মীদের চরম লক্ষ্য কিন্তু একটি সার্থকতার দিকে এগিয়ে চলে। এবং এই চলার জন্য—এই একমুখী লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য দরকার পড়ে একজন সংযোগ-সাধকের। নির্দেশকই এই সংযোগ-সাধকের দায়ীত্ব নেন। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই দায়ীত্ব পরবর্তীকালে, অর্থাৎ নাটকের নিয়মিত অভিনয় শুরু হয়ে যাওয়ার পর, তুলে দেওয়া হয় আর একজন দায়ীত্বশীল কর্মীর হাতে, যার পরিচয় হয় 'মঞ্চ-নিয়ামক' বা 'ষ্টেজ ম্যানেজার'। নির্দেশক যে ক্ষেত্রে নিজে অভিনেতা হিসাবে ভূমিকায় নামেন, সেক্ষেত্রে পূর্বাহ্নেই একজন সুযোগ্য সহকারীকে মঞ্চ-নিয়ামক হিসাবে গড়ে নিতে হয়।
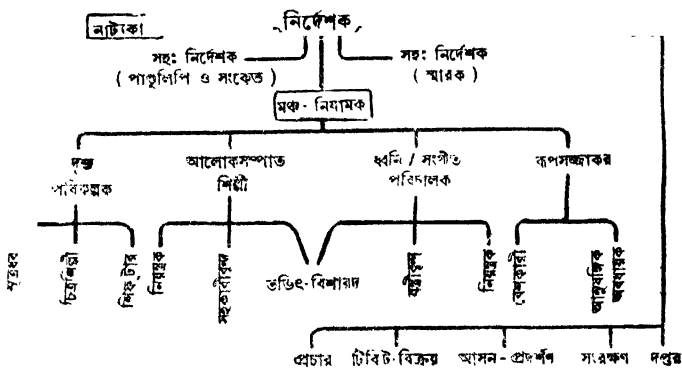
নাট্য নির্দেশককে সবার শীর্ষে রেখে, নাট্যলোকের নেপথ্য জগৎটাকে আমরা মোটামুটি উপরের ছকে সাজিয়ে নিতে পারি। এই ছক থেকে,

আরও কয়েকটি বিভাগ ও নেপথ্য কর্মীর পরিচয় এবং দায়ীত্বর নমুনা পাওয়া যাবে, যাদের সহযোগিতা নিয়মিত নাট্যপরিবেশনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য। তবে, যে বিভাগগুলি নাট্য উপস্থাপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়, সেগুলি প্রযোজকের বা তাঁর স্বলাভিষিক্ত কোনও পদাধিকারিকের তত্বাবধানে থাকা ভালো। যেমন, প্রচার বিভাগের কর্মীরা, টিকিট-বিক্রয় সংক্রান্ত করণিকবৃন্দ, আসন প্রদর্শনকারী এবং টিকিট-চেকারের দল সরাসরি নির্দেশকের অনুগামী থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। রঙ্গালয় পরিচালনার জন্য দপ্তর-বিভাগ এবং রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য দারোয়ান, মালী, ফরাস তথা জমাদার শ্রেণীর কর্মচারীরাও নির্দেশকের সরাসরি আওতার বাইরে থাকতে পারে। প্রদত্ত ছকে এই পৃথক বিভাগগুলিকে প্রযোজকের অধীন দেখানোর সময় ধরেই নেওয়া হয়েছে যে রঙ্গালয়ের মালিকই প্রযোজক। যেক্ষেত্রে রঙ্গালয়ের নিজস্ব প্রযোজনা থাকেনা, ভিন্ন সংস্থা বা গোষ্ঠি অথবা প্রযোজক রঙ্গালয়টি ভাড়া নিয়ে নাটক উপস্থাপনা করেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজনমতো এই উপবিভাগ বণ্টনের অদলবদল ঘটতে পারে।

নাট্য উপস্থাপনাকে কেন্দ্র করেই যখন আমাদের বক্তব্য, তখন আমাদের আলোচনা নির্দেশককে কেন্দ্র করেই রাখা যাক। প্রদত্ত ছকে দেখা যাবে, নির্দেশক তাঁর দুইপাশে আলোচনার দ্বার খোলা রেখেছেন নাট্যকার এবং প্রযোজকের সঙ্গে। নাট্যকার যেমন একদিকে যোগাচ্ছেন নাটক, তথা বিষয়বস্তু, প্রযোজক তেমনি অন্যদিকে ভার নিচ্ছেন বিত্ত, তথা সংস্থানের। [পেশাদার মঞ্চে প্রযোজকরাই অবশ্য নাট্যকার এবং নির্দেশক নির্বাচন করে থাকেন] যদিও ব্যাপক অর্থে প্রযোজককে নাট্য উপস্থাপনার সর্বেসর্বা ধরা হয়, তবু নির্দেশককে অতিক্রম করে নেপথ্য-কর্মীদের উপরে তাঁর অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা বড় একটা থাকেনা— অন্ততঃ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

নির্দেশকের সরাসরি নিয়ন্ত্রণে থাকেন একদিকে অভিনেতৃবৃন্দ, অন্যদিকে যাবতীয় নেপথ্য কলাকুশলীর দল। সমগ্র বিষয়টি রীতিমতো একটি বাহিনী পরিচালনার সঙ্গে সমান গুরুত্ব রাখে। এবং গুরুতর বিষয়মাত্রেই আয়ত্ব করতে হলে, চাই শিক্ষাগ্রহণ পর্ব এবং অধ্যবসায়। খুবই আনন্দের বিষয়, নাটক আজ আর শুধু অপাংক্তেয় অধ্যায় থেকে উঠে এসেছে তাই নয়, বিশিষ্ট শিক্ষার এবং চর্চার অঙ্গ হিসাবে

আদরে গৃহীত হয়েছে দেশে বিদেশে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্য্যায়ে এর শিক্ষাক্রম প্রচলিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক বিশেষ মর্য্যাদা আরোপিত হয়েছে আজ নাট্যচর্চার উপরে। তাই এর প্রতিটি অধ্যায়ের প্রতিটি কর্ম শুধু ঠেকে শেখার দিন অতিক্রান্ত হয়েছে। পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান পুঁথিবদ্ধ করে, তা নিয়ে অধ্যয়ন অধ্যাপনার দ্বার আজ মুক্ত হয়েছে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য।

লক্ষ্য করে দেখা গেছে, অভিনেতা বা অভিনেত্রী যোগ্য শিক্ষা গ্রহণের শেষে নিজেই নিজের রূপসজ্জা ঠিক করে নিতে পারেন। পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করার ভিতর দিয়ে পোষাক পরিচ্ছদ পরে নেওয়া বা বদল করার কাজটিও খুব সহজে চালিয়ে নিতে পারেন অভিনেতৃবৃন্দ—গ্রুপ থিয়েটারগুলিতে এর যথেষ্ট উদাহরণ দেখতে পাওয়া যাবে। কিন্তু দৃশ্য, আলো আর শব্দক্ষেপনের জন্য পৃথক নেপথ্যকর্মী অতি অবশ্য দরকার পড়ে। প্রযোজকের নিজস্ব তত্ত্বাবধানে যে উপবিভাগ-গুলির কথা দেখানো হলো আগের তালিকায়, সে কাজগুলিও চেষ্টা করলে অভিনয়ের ফাঁকে বা আগে পরে চালিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু পট, দীপ আর ধ্বনির জন্য চাই স্বতন্ত্র কর্মী। তাই এই তিনটি অধ্যায়কে মুখ্য নেপথ্য কর্ম হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে।

পরবর্তী অধ্যায় এবং পরিচ্ছেদগুলিতে পর্বে পর্বে এই তিনটি নেপথ্য কর্মের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করা হলো। আলোচনার তত্ত্বকে ভিত্তি করে প্রয়োগের অভ্যাস করতে হবে যোগ্য শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে। প্রত্যেক অধ্যায় সংশ্লিষ্ট অনুশীলনীগুলি, যদিও প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যায় খুবই কম, তবু একটি শিক্ষার্থীকে প্রার্থিত ফললাভের দিকে অনেকখানি এগিয়ে নিতে সাহায্য করবে।

নাট
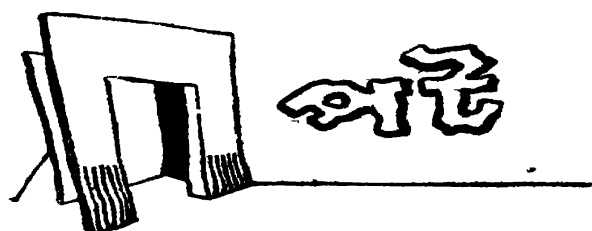
পটলিথন

ভরতের নাট্যশাস্ত্রে বর্ণিত রঙ্গশালা আজ আমাদের কাছে ইতিহাসের কথা এবং গবেষণার বিষয়মাত্র। একমাত্র সংস্কৃত নাটক নিয়ে যাঁরা চর্চা বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন, তাঁরাই নাটশাস্ত্র বর্ণিত নাট্যালয়ের সার্থকতা অনুধাবন করতে পারেন। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের হাতের কাছে সে ধরনের কোনও রঙ্গভূমি বর্তমান নেই। আমাদের রঙ্গালয় বলতে যে উদাহরণগুলি আছে, সেগুলি সবই পাশ্চাত্য ভাবধারায় তৈরী 'প্রসেনিয়াম থিয়েটার'-এর বিভিন্ন রূপ।

গ্রীকভাষায় দৃশ্য বোঝাতে 'থিয়া' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেখানে কোনও দৃশ্য অনুষ্ঠিত হয়, সে স্থানকে ওদের ভাষায় বলা হয় 'থিয়াত্রন'। এই থিয়াত্রন শব্দটিই ইংরাজীতে 'থিয়েটার' হিসাবে রূপান্তরিত হয়েছে। তেমনি আবার, অভিনেতাদের পশ্চাৎপট এবং একইসঙ্গে নেপথ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য 'স্কীন' নামে যে চালা তৈরী করা হতো রঙ্গপীঠের পিছনে, সেটিই পরবর্তী যুগে রূপান্তরিত হয়েছে 'সীন' অথবা 'সীনারী'তে।

এই স্কীনের মাঝখানে থাকতো একটি বড় প্রবেশ পথ, যার ভিতর দিয়ে অভিনেতৃবৃন্দ রঙ্গপীঠে যাতায়াত করতেন। এই খিলান-জাতীয় দ্বারপথের গ্রীসীয় নাম থেকেই 'প্রসেনিয়াম' শব্দটি এসেছে। অবশ্য আজকের 'প্রসেনিয়াম' রঙ্গপীঠের পিছনে নেই—চলে এসেছে সামনে; এবং এই সামনে আসার ভিতর দিয়েই গ্রীক্, এথেনিয়ান, রোম্যান থিয়েটারের ক্রমবিকাশের ধারা থেকে স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে আধুনিক রঙ্গমঞ্চ।

ঘটনার সূত্রপাত ঘটেছিল ১৫৮৮ সালে ইটালীতে। সাবিওনেট্টা শহরে স্কামোজ্জি নামে একজন স্থপতি একটি ছোট রঙ্গালয় গড়ে তোলার ভার পান। দৃশ্যের পিছনে একটি বাজার দেখানোর সুবিধা হবে বলে, তিনি পিছনের প্রবেশ পথটি খুব চওড়া করে গড়েছিলেন। পরে পারমা শহরে ১৬১৮ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'তিয়েত্রো ফার্নিজ' রঙ্গালয় গড়া হলো তখন পুরো

রঙ্গভূমিটি নিয়ে যাওয়া হলো প্রসেনিয়ামের পিছনে। রোম্যান রঙ্গালয়ের স্মৃতি-অবশেষ থেকে গেল মঞ্চমুখে কারুকার্য্য করা খিলানগুলিতে।

এর পর থেকেই রঙ্গপীঠে নাটক পরিবেশন করার দিকে শুরু হলো পরিবর্তনের পর পরিবর্তন। ঝোলানো কাপড়ে আঁকা দৃশ্যপটকে প্রথমে মাঝখান থেকে কেটে দুপাশে সরানোর ব্যবস্থা হলো। পরবর্তী যুগে সেগুলিকে একটি মজবুত কাঠামোতে আটকিয়ে দাঁড় করিয়ে রাখা বা টেনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা রাখা হলো রঙ্গমঞ্চে।

ক্রমশঃ এঁকে-বোঝানো পার্স্পেকটিভের যুগ বাতিল হয়ে গেল; এলো ঘনত্বযুক্ত বাস্তবধর্মী দৃশ্যপটের ব্যবহার। সেই সঙ্গে 'পটলিখন' অধ্যায় হয়ে উঠলো নেপথ্য-কর্মের একটি বিশেষ পর্ব—মঞ্চ-বিজ্ঞানের একটি অতি প্রয়োজনীয় অধ্যায়।

অঙ্কনে এবং হাতের কাজে সাধারণ পারদর্শিতাযুক্ত যে কোনও নাট্য-প্রেমী, সামান্য অধ্যবসায়ের সাহায্যেই দৃশ্য পরিকল্পনাকারী হয়ে উঠতে পারেন। নাট্য নির্দেশনার দিকে যাঁদের ঝোঁক, তাঁরাও যদি পটলিখনের মূল কথাটি অবগত থাকেন, তবে ঐ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত শিল্পীকে সহজেই নির্দেশ দিতে পারবেন। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে ধাপে ধাপে পটলিখনের তত্ব ও প্রয়োগের দিকগুলি আলোচিত হলো।

এক দৃশ্যপটের প্রয়োজনীয়তা

ইতিকথা ইউরোপে গ্রীস এবং রোমের রীতিনীতি ও শিল্পচর্চ্চার পুনরুত্থান হলো রেনেসাঁস বা শিল্প-বিপ্লবের যুগে। নাটক পরিবেশনের ক্ষেত্রে, দুর্ভাগ্যক্রমে শুধু নাটক ছাড়া, প্রয়োগবিধি-সম্পর্কিত কোনও তথ্যই পাওয়া যায়নি পূর্বসূরীদের কাছ থেকে। বাধ্য হয়েই, নতুন যুগের সূত্রপাত হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে—দেখা দিল নূতন নূতন ধারণা, তৈরী হলো নূতনতর প্রয়োগ কৌশল।

১৫৫১ সালে শিল্পী সেবাষ্টিয়ান সালিও প্রকাশ করেন শিল্পকলা সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত আলোচনা পুস্তক। এরই একটি অধ্যায়ে ছিল বিপ্লবোত্তর ইতালীয় রঙ্গমঞ্চে মঞ্চশিল্পের আলোচনা। পরে ১৬১১ সালে এটি ইংরাজীতে অনুদিত হয়। সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে, ইংল্যাণ্ডের মঞ্চশিল্পে, বিশেষ করে দৃশ্য সংযোজনার ক্ষেত্রে, শিল্পী সালিও-এর প্রকাশিত পুস্তকটির যথেষ্ট প্রভাব পড়েছিল।

অধুনা-প্রচলিত সহজবহনযোগ্য হাল্কা-গঠনের দৃশ্যপটের ব্যবহার কবে, কোথায়, কার দ্বারা প্রথম সুরু হয়েছে, এ সম্পর্কে কোনও সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে ১৬৩০ সালের মধ্যেই হয়েছে এর সূত্রপাত এবং সংরক্ষিত দলিলপত্রাদি থেকে পথপ্রদর্শক হিসাবে নাম পাওয়া যায় গ্যালি-বিবিয়েনা পরিবার, ইনিগো-জোন্‌স্ এবং পীরানীজের। এই সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত মঞ্চের উপরে **দৃশ্যপটের প্রাধান্যের যুগ** বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। শেষের দিকে বাস্তববোধ ফোটানোর আগ্রহাতিশয্যে, দৃশ্যপরিকল্পনাকে আলোকচিত্রের মতো সর্বাঙ্গীন নিখুঁত করতে গিয়ে, মঞ্চসজ্জা এত জটিল করে তোলা হতো যে, অভিনেতার

◁ [চিত্র ১] দৃশ্যপট নির্মাণের প্রায়োগিক পাঠগ্রহণ

পক্ষে অভিনয়ের জন্য পর্য্যাপ্ত স্থান সংকুলান করা কষ্টকর হয়ে উঠতো। এডল্‌ফ এপিয়া এবং গর্ডন ক্রেগ নামলেন এই আবর্জনা সরিয়ে মঞ্চে অভিনয়ের জন্য জায়গা করে দেওয়ার কাজে। সংস্কারক হিসাবে কাজে নামলেও, আজকের মঞ্চশিল্প মুখ্যতঃ এঁদেরই অবদান বলে গণ্য করা হয়।

চিত্রসৃষ্টির দিক নাটকের অভিনয় দেখতে এসে দর্শককে কয়েকটি প্রচলিত ধারা মেনে নিতে হবেই। কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে :—

অন্ধকার রাত্রির দৃশ্য—এক পা'ও চলা দুষ্কর। অভিনেতা প্রতি পদে হোঁচট খাচ্ছে। অথচ মঞ্চে যত কম আলোই থাক না কেন, এমন উজ্বলতা রাখতেই হয়েছে, যার সাহায্যে প্রেক্ষাগৃহের শেষপ্রান্তের দর্শকও অভিনেতার কাজকর্ম দেখতে পান। এই যে আলোর মাঝে নিরন্ধ্র অন্ধকারের কল্পনা, এটি একটি প্রচলিত ধারা।

ঘটনাস্থল হয়তো আফ্রিকার জঙ্গল, অভিনেতাদের রূপসজ্জায় ফুটে উঠেছে নিগ্রোদের চরিত্র। নাটকের ভাষা বাংলা! এই যে নিগ্রোদের মুখে বাংলাভাষার ব্যবহার, এটিও একটি প্রচলিত ধারা। টিপু সুলতান বা আলমগীরের অভিনয় দেখতে বসে কেউ অভিনেতাদের মুখে চরিত্রগুলির নিজস্ব প্রাদেশিক ভাষা শোনার প্রয়োজন বোধ করে না।

এই প্রচলিত ধারা যখনই অস্বীকৃতি পেয়েছে দর্শক সাধারণের কাছ থেকে, তখনই প্রয়োজন হয়েছে সংস্কার সাধনের ; এসেছে পরিবর্ত্তন। দর্শক আর পছন্দ করে না তাদের সামনে অভিনেতৃবর্গ গান গেয়ে মনের ভাব প্রকাশ করুক—আমূল সংস্কার হলো—এলো নাটকে গদ্যের ব্যবহার। গভীরতাহীন ঝোলানো দৃশ্যপট ব্যবহারের যুগও এইভাবে পিছিয়ে পড়লো অতীতের ইতিহাসে। বলা বাহুল্য, সব যুগেই প্রচলিত ধারা দাঁড়িয়ে আছে দর্শক মণ্ডলীর সমালোচনার বস্তু হয়ে।

চিত্রসৃষ্টির দিক থেকে এই প্রচলিত ধারাকে কি জাতীয় সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয় দেখা যাক। সৃষ্ট শিল্পের উদ্দেশে সমালোচকের প্রথম এবং চরম প্রশ্ন : 'বিষয়টি মানিয়েছে কি না?' এ ছাড়া, চোখের সামনে যে ছবিটি দেখা যাচ্ছে, 'পরিমিতি ও ভারসাম্যের দিক থেকে সেটি নিখুঁত কি না?' দেয়ালের গায়ে যে ছবিগুলি ঝুলছে, জানালা বা দরজায় যে পর্দা টাঙানো হয়েছে, যে ঘরে যে আসবাবপত্র ব্যবহৃত হয়েছে, তারা

'পরস্পরের সঙ্গে ঐকতান বজায় রেখেছে কি না ?' সেই সঙ্গে কানে যা শোনা যাচ্ছে এবং চোখে যা দেখা যাচ্ছে, এই দুইটি মিশে দর্শকদের মনে 'একটি অবিচ্ছিন্ন ভাবের সৃষ্টি হচ্ছে কি না ?'—এই জাতীয় প্রশ্নাবলীও উঠতে পারে সমালোচকের মনে।

রঙ্গপীঠের তিন দিকের সীমা দৃশ্যপট এবং পার্শ্বপটাদি দিয়ে ঘেরা থাকে ; মুক্ত থাকে মঞ্চমুখের দিকটি—যে পথে দর্শকবৃন্দ অভিনয় দেখেন। এই মুক্তপথটিকে ধরে নেওয়া হয় **অনুপস্থিত চতুর্থ প্রাচীর**-এর দিক হিসাবে। দর্শক যেন অভিনেতাদের অজ্ঞাতসারে এই চতুর্থ দেয়ালটি সরিয়ে, তাদের নিভৃতির মাঝে উঁকি মারেন। মঞ্চ-পরিকল্পকের হাতে তুলে দেওয়া এই অধিকারটুকুর যথাযথ সদ্ব্যবহার তিনি করতে পেরেছেন কি না, এ সম্পর্কেও একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতে পারে। প্রযোজকের সবচেয়ে বড় দায়ীত্বই হচ্ছে, এই চিত্রসৃষ্টির মাধ্যমে দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হওয়া, এবং সেই সঙ্গে নাটকের জন্য একটি সার্থক পরিবেশ সৃষ্টি করা। প্রধানতঃ এই **পরিবেশ সৃষ্টি**র প্রয়োজনেই দৃশ্যাবলী পশ্চাৎপট-রূপে ব্যবহৃত হয়।

সঠিকতার দিক ঘটনার স্থান এবং কাল সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার দায়ীত্বও দেওয়া হয়েছে দৃশ্যপটের উপরে।

অভিনেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট বহুলাংশে নির্ভর করে ক্ষেত্রের বিশিষ্টতায়। একজন পর্বতারোহীর আরোহণ-পর্ব দেখানোর জন্য উপযুক্ত পটভূমি দরকার। ভারতের গ্রাম্যজীবনের ছবিতে মাটির দাওয়া আর চালাঘর ওতোপ্রোতঃভাবে জড়িয়ে আছে। কার্পাস-চাষের ক্ষেত্র দিয়ে পাশ্চাত্যের দক্ষিণাঞ্চলের জীবনযাত্রা বোঝানো ওদেশের একটি প্রচলিত ধারা। এইভাবে চরিত্রকে স্থানের দ্বারা সঠিকভাবে স্থাপন করা, দৃশ্যসজ্জার একটি প্রধান কাজ।

অনুরূপভাবে সময়ের মূল্যও স্থানের সঙ্গে অনেকাংশে জড়িত। দিনের বিশেষ ক্ষণে, রাত্রে আলো থাকলে বা না থাকলে, একই স্থানের পরিবেশ বদলে যায়।

এই সঠিকতার দিক থেকে কতখানি বিশদ রূপায়ণ পর্য্যাপ্ত হবে, যুগের প্রচলিত ধারার উপরে সেটি নির্ভর করে। বেশ কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত নাটক পরিবেশনকে ভাবা হতো বৃহত্তর মূল শিল্প হিসাবে, যার সঙ্গে

সাময়িকভাবে কয়েকটি অসংযুক্ত গৌণ শিল্পের সমাবেশ ঘটানো হয়েছে মাত্র। এই গৌণ শিল্পের পৃথক পৃথক পরিচালকেরা ভূমিকালিপিতে জড়িয়ে থাকলেও, বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় মেতে উঠতেন। আজকের যুগে নাট্যশিল্পকে একক কলা হিসাবে গণ্য করা হয়, যার মধ্যে অভিনয়, নৃত্য, গীত, মঞ্চপরিকল্পনা, আলোকসম্পাত, নেপথ্য শব্দব্যঞ্জনা, রূপসজ্জা প্রভৃতি আরও বহুতর গৌণ শিল্পের একত্র সমাহার ঘটেছে।

দৃষ্টি বিক্ষেপ ঘটনাবৈচিত্রের নিজস্ব দাবীতেই দৃশ্যসজ্জায় বৈচিত্র আসতে বাধ্য। বিচিত্র দৃষ্টিকোণ, বিচিত্র বর্ণসমারোহ, আনুষঙ্গিক বস্তু সম্ভারে বৈচিত্র, আলোকচিত্রণে বৈচিত্রময় তারতম্য, এ সবই আসে প্রয়োজনের তাগাদায়। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, এই বৈচিত্র যত সুন্দর, যত কৌশলপূর্ণই হোক না কেন, অবাঞ্ছিত সময়ে যেন চিত্তবিভ্রম তথা দৃষ্টি বিক্ষেপের কারণ না হয়।

জাঁকজমকের আতিশয্যযুক্ত কোনও চমকপ্রদ দৃশ্যও দৃষ্টিবিক্ষেপ ঘটানোর দোষে দুষ্ট হতে পারে। একনজর দেখে যে দৃশ্যের সমস্তটা দেখা শেষ হয় না, অভিনয় চলার মধ্যে দর্শক বারম্বার সুযোগ খোঁজে তার বাকীটুকু দেখে নেওয়ার জন্য। এছাড়াও বিক্ষেপ ঘটানোর নানাবিধ কারণ দেখা যায়। দূর থেকে স্পষ্ট দেখা যায়, এমন বড় মুখযুক্ত ঘড়ী এই জাতীয় বিক্ষেপসৃষ্টিকারী বস্তু। দৃশ্যসজ্জার আনুষঙ্গিক হিসাবে দেয়াল ঘড়ী রাখার প্রয়োজন দেখা দিলে, হয় সেটিকে অনালোকিত অংশে রাখতে হবে, নয়তো এমনভাবে লাগাতে হবে যেন প্রেক্ষাগৃহ থেকে সেটি সোজাসুজি দেখা না যায়। ঘড়ীর চলমান কাঁটা আর সময় নির্দ্দেশনাই এই বিক্ষেপ সৃষ্টির কারণ। তেমনই আবার, জটিল নক্সাকরা অক্ষরে লেখা কোনও সাইনবোর্ড (যা একবার দেখেই পড়া শক্ত), অপ্রয়োজনীয় কোনও আনুষঙ্গিক, অপ্রধান অংশে উজ্জলতর আলোকসম্পাত প্রভৃতি আরও নানাবিধ কারণে দৃষ্টিবিক্ষেপ ঘটতে পারে।

আমাদের দর্শনেন্দ্রীয় শ্রবণেন্দ্রীয়ের চেয়ে বহুগুণ দ্রুত কাজ করে। জানালার পাল্লার সামান্য দোলা, বা অসতর্ক অপেক্ষমান শিল্পীর উপস্থিতির সামান্যতম আভাষও মূল ঘটনাকেন্দ্র থেকে দর্শকের দৃষ্টিকে বিপথগামী করতে পারে। পার্শ্বপটের ফাঁকে বেরিয়ে পড়া স্মারকের হাতে ধরা বইয়ের অংশ নিঃসন্দেহে আর একটি বিরক্তিকর উদাহরণ।

উনবিংশ শতাব্দীতে জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্যসজ্জা ব্যবহারের যুগে প্রথাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, পট-উন্মোচনের পর বেশ কিছু সময় অভিনেতৃবর্গকে প্রবেশ করতে না দেওয়া। এই সময়টুকু দর্শককে ছেড়ে দেওয়া হতো দৃশ্যসজ্জার খুঁটিনাটি অংশ দেখে নেওয়ার জন্য। শোনা যায়, সে যুগের সুবিখ্যাত প্রযোজক-অভিনেতা গ্যারিকের মঞ্চপরিকল্পনাকারী ডি. লুথারবার্জ নাকি পট-উত্তোলনের পর তাঁর পরিকল্পিত দৃশ্যসজ্জার পরিপূর্ণ রসাস্বাদনের জন্য রীতিমতো সময় দিতে বাধ্য করতেন। বিখ্যাত প্রযোজক ডেভিড বেলাস্কো এই প্রথারই উন্নতি করে, এই ফাঁকের অংশটুকু ভরিয়ে তুলতেন অপ্রধান কিছু কাজকর্ম দিয়ে। তাঁর "মেরী ওডাইল" (১৯১৫) এই জাতীয় পরিবেশনের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই নাটকে পট উন্মোচনের পর নায়িকা তার প্রথম কথাটি বলার পূর্বে অনেকখানি সময় কাটানো হতো অপ্রধান কাজকর্ম দিয়ে। মঠমাতারা একদিক থেকে অন্যদিকে যেতেন, আবার ঘুরে আসতেন; ঘণ্টা বাজতো, লাতিন ভাষায় অস্পষ্ট অথচ গুরুগম্ভীর ধ্বনিতে প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারিত হতো—আর এই সময়টুকু নায়িকা ব্যস্ত থাকতো মঠের আসবাব পত্র পরিষ্কার করার কাজে, এবং ঝেড়ে মুছে গুছিয়ে রাখতো চেয়ার টেবিল-জাতীয় আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি। মূল নাটক সুরু হওয়ার পূর্বে ঘটনাস্থলের পরিপূর্ণ আবহাওয়া ফুটিয়ে তোলা হতো এই সময়ের মধ্যে। এর ফলে, বিলম্বে যাঁরা আসতেন দেখতে, মূল নাটকের কোনও অংশ তাঁদের বাদ পড়তো না; আবার সুরু থেকেই যাঁরা দেখতেন, তাঁদের কাছে এই সংযোজনটির মাধুর্য্য মূল নাটকের রসাস্বাদনে অনেকখানি সাহায্যই করতো। বলা বাহুল্য, নাটকটি আগাগোড়া একটিমাত্র দৃশ্যপটে অভিনীত হয়েছিল।

অদ্ভুত শোনালেও এটি একটি চরম সত্য যে, দৃশ্যসজ্জার নিছক সৌন্দর্য্য নাটকের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক—কারণ, এর ফলে দর্শককে অযথা অন্যমনস্ক হতে হয়। নিখুঁত সর্বাঙ্গীন সুন্দর একটি দৃশ্যসজ্জা চোখের সামনে উদ্‌ঘাটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, নিজগুণে দর্শকের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিচালক যদি পরমুহূর্তেই নাটকের মূল ঘটনা সুরু করে দেন, তবে দর্শক নাট্যপ্রবাহের মাঝে মাঝে সময় চুরি করে, দৃশ্যসজ্জা দেখে নেওয়ার ইচ্ছা চরিতার্থ করবেই। দৃশ্য-পরিকল্পনাকারীর পক্ষে এটি আত্মপ্রসাদের বিষয় হলেও, পরিকল্পনাটি সমর্থনযোগ্য নয়।

প্রাধান্য আরোপ

রঙ্গপীঠের বিশেষ বিশেষ স্থান ঘটনাপ্রবাহের দাবীতে প্রাধান্য লাভ করে। দৃশ্যসজ্জার বৈশিষ্টে এই প্রাধান্যকে বলবৎ করে তোলা দরকার। দৃশ্যপটের গঠন, বস্তু ও আনুষঙ্গিকাদির সংস্থাপনের কৌশলে এই কাজ সম্পন্ন
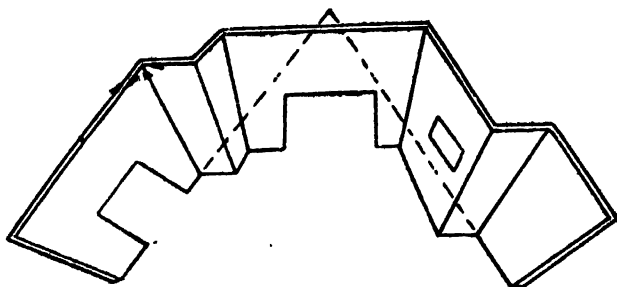
[চিত্র ২.১] মঞ্চসজ্জার কৌণিক সংস্থাপন

করা হয়। দরজা, জানালা, ড্রেসিং টেবিল, সোফা-কেদারা এমনকি ছোট একটি ফুলদানীও এই জাতীয় প্রাধান্যের কেন্দ্রবিন্দু হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে।
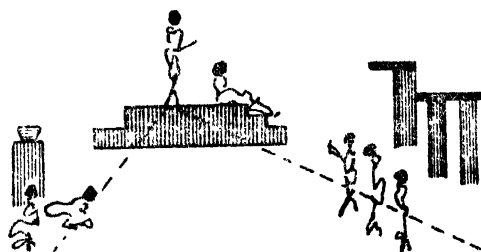
[চিত্র ২.২] অভিনেতৃবর্গের কৌণিক অবস্থান

বিষয়টি জটিলতর হয়ে ওঠে, যখন রঙ্গপীঠে একই দৃশ্যে একাধিক স্থানে প্রাধান্য আরোপের আবশ্যক হয়। অধুনা প্রচলিত মঞ্চসজ্জার কৌণিক সংস্থাপনের সাহায্যে [চিত্র ২.১] এই জাতীয় জটিল সমস্যা সমাধানের সহজতম উপায় হয়েছে। এই সংস্থাপনে উভয় দিকের

দৃশ্যপট কোনাকুনি এগিয়ে গিয়ে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। এই বিন্দুতেই রাখা হয় আরোপিত প্রাধান্য। শুধু দৃশ্যপট নয়, বস্তু সজ্জা, অলঙ্করণের রেখাদি, এমনকি অভিনেতৃবর্গের অবস্থান দ্বারা বর্ণিত রেখাও [চিত্র ২.২] যেন এই প্রধান বিন্দু বা বিন্দুগুলিতে এসে মিলিত হয়।

মনস্তাত্বিক আবেদন

সার্থক দৃশ্যসজ্জার মধ্য দিয়ে নাটকের স্থান-কাল ইত্যাদির সঙ্গে নাটকের মনস্তাত্বিক দিকটিও ফুটে ওঠা উচিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তুলনামূলক বিষয়বস্তুর সাহায্য নেওয়া হয় এই জাতীয় মনস্তত্ব বিশ্লেষণে। নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা বোঝানোর জন্য ফাঁকা মাঠে একটিমাত্র ডালপালাহীন গাছ, মনের আকস্মিক আশা-আনন্দোচ্ছ্বাসকে ফুটিয়ে তুলতে শুকনো ডালে পাতা ফুল ইত্যাদি ফুটিয়ে তোলা বা অন্ধকার ঘরে আলো জেলে দেওয়া, মনের গুমোটকে ঝড় জলের মধ্য দিয়ে আরো ভারী করে তোলা প্রভৃতি অগণিত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে দৃশ্যসজ্জার মনস্তাত্বিক দিক নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে। তুলির সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা অথবা আলোর মাধ্যমে প্রকাশ করা বর্ণ-বৈচিত্রের সাহায্য নিয়েও ঘটনার মনস্তাত্বিক আবেদন বোঝানো হয়। বর্ণের এই মনস্তাত্বিক ভাব ফুটিয়ে তোলার ক্ষমতা সম্পর্কে পৃথক পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

অনেক সময় সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী উপমার সাহায্যেও এই মনস্তাত্বিক দিক ফোটানো যায়। 'শেষের কবিতা'য় অমিত যে ভাঙা কুঁড়ে ঘরের মধ্যে যোগমায়া দেবীর মাধ্যমে লাবণ্যকে পাওয়ার স্বীকৃতি পেলো, সেখানে কবিগুরুর বর্ণনাতেই যে দৃশ্যসজ্জার আভাষ আছে, সেটি এই জাতীয় বিপরীত ধর্ম্মী উপমার চমৎকার উদাহরণ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে।*

---

* "এক সময়ে ছিল গোয়ালার কি মালীর ঘর, তারপরে একজন কেরানির হাতে পড়ে তাতে গরিবি ভদ্রতার অল্প একটু আঁচ লেগেছিল। ....জানালা দরজা প্রভৃতির কার্পণ্যে ঘরের মধ্যে তেজ মরুৎ ব্যোম এই তিন ভূতেরই অধিকার সংকীর্ণ, কেবল বৃষ্টির দিনে অপ্ অবতীর্ণ হয় আশাতীত প্রাচুর্যের সঙ্গে অখ্যাত ছিদ্রপথ দিয়ে। ....তখন অমিত ভিজে চৌকির উপরে একতাড়া খবরের কাগজ চাপিয়ে তার উপর বসেছে। ......অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে, ঝোড়ো হাওয়াটা গেছে থেমে, মেঘ এসেছে পাতলা হয়ে।"

পরিবেশ সৃষ্টি

রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যসজ্জা কথাটি ব্যবহার করা হয় মোটামুটি-ভাবে দৃশ্যপট, পর্দা এবং আনুষঙ্গিক বস্তুগুলিকে বোঝানোর উদ্দেশে। কিন্তু ব্যাপক অর্থে 'দৃশ্যসজ্জা' বলতে বোঝায়, অভিনয়কালীন অভিনেতাকে ঘিরে থাকা যাবতীয় বস্তু—এর মধ্যে দৃশ্যপট, পর্দা এবং আনুষঙ্গিক বস্তুগুলিতো আছেই; এ ছাড়া পোষাক-পরিচ্ছদ, রূপসজ্জায় ব্যবহৃত অতিরিক্ত সংযুক্তি এবং সেইসঙ্গে আলোক সম্পাতকেও দৃশ্যসজ্জার মধ্যে ধরা হয়।

দৃশ্যসজ্জা-কথাটির এই ব্যাপক অর্থ মেনে নিলে, দৃশ্যসজ্জার প্রয়োজনীয়তা বলতে বোঝাবে নাটকের ঘটনাপ্রবাহের জন্য উপযুক্ত **পরিবেশ** সৃষ্টি। নাটকের মুখ্যভাব, যা অভিনেতৃবর্গ কাজ এবং কথার দ্বারা প্রকাশ করছে, তাকে বর্ণ, রেখা এবং ঔজ্জ্বল্যের মাধ্যমে রূপায়িত করাই হচ্ছে এই পরিবেশ সৃষ্টির প্রধান লক্ষ্য। দৃশ্যপট অর্থবোধক আবেষ্টনী তৈরী করে, নাট্যকারের কল্পনাকে রূপায়িত করার কাজে অভিনেতৃবর্গকে সর্বতোভাবে সাহায্য করবে। [দৃশ্যপটের প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যায় পরিবেশ-সৃষ্টির এই তত্ব প্রচারের ব্যাপারে স্মরণীয় হয়ে থাকবে এড্‌লফ এ্যাপিয়া ও গর্ডন ক্রেগের নাম।]

পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা

দৃশ্যপটের পরিবেশ সৃষ্টির কাজটিকে এবার বিস্তারিত ভাবে পর্য্যালোচনা করা যাক। কি ভাবে দৃশ্যসজ্জার দ্বারা ঘটনার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়? আপাতঃদৃষ্টিতে এর তিনটি পন্থা আছে। সেগুলি যথাক্রমে :—

(ক) ঘটনার জন্য স্থান নির্দেশের দ্বারা ;

(খ) ঘটনার কাল ও চরিত্র নির্দেশের ভিতর দিয়ে অন্তর্নিহিত ভাবটিকে পুনর্বলবৎ করার দ্বারা ; এবং

(গ) ঘটনার জন্য একটি ছবির মতো সুন্দর পশ্চাৎপট সৃষ্টি তথা অলঙ্করণের দ্বারা।

এবার এই পন্থাগুলি সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করা যাক।

ঘটনার স্থান-নির্দেশ

পরিবেশের প্রথম কথা **স্থান-নির্দেশ**। নাটকের চরিত্রগত বৈশিষ্টের উপরে নির্ভর করে, এই স্থান নির্দেশ করার বিষয়টি নীচের যে কোনও একটি বা একাধিক ধারার সমন্বয়ে সাধন করা হয়ে থাকে।

প্রথমে উল্লেখ করা যেতে পারে **বাস্তবানুগ** পরিবেশনের কথা। এই জাতীয় পরিবেশনে আসল বা কাল্পনিক স্থানটির হুবহু প্রতিকৃতি তুলে ধরার চেষ্টা করা হয় [চিত্র ৩.১] দৃশ্য-পটাদির সাহায্যে। অবশ্যই এই জাতীয় পরিবেশনকে আলোকচিত্রের মতো সর্বাঙ্গীন পূর্ণ ও নিখুঁত করে তোলা উচিত নয়—অন্যথায় বহু ক্ষেত্রে মঞ্চে অভিনয়ের জন্য উপযুক্ত স্থান সংকুলান দুস্কর হয়ে উঠবে।

[চিত্র ৩.১] বাস্তবানুগ মঞ্চ পরিকল্পনা

আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বাস্তবানুগ দৃশ্যপটগুলি যতদূর সরল করা সম্ভব, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া হয়। এর ফলে দৃশ্যের অনেক অংশই ছেড়ে দেওয়া হয়, দর্শকদের কল্পনা করে নেওয়ার জন্য।

কোনও স্থানের পূর্ণ-প্রতিকৃতি তৈরী না করে, আংশিক প্রতিকৃতির সাহায্যে পরিবেশ সৃষ্টি করার ধারাকে বলা হয় **ইঙ্গিতধর্মী** পরিবেশন। এই শ্রেণীর পরিবেশনে [চিত্র ৩.২] কয়েকটি অংশ মাত্র পূর্ণ প্রতিকৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। একটি গ্যাসের আলোর ষ্ট্যাণ্ড দিয়ে রাস্তা বোঝানো, পার্কের রেলিংয়ের সামান্য অংশ আর প্রচলিত আকারের বেঞ্চ দিয়ে পার্কের দৃশ্য তৈরী করা, একটি দরজা ও জানালা অথবা অনুরূপ গৃহাভ্যন্তরে ব্যবহৃত কোনও সুপরিচিত বস্তু দিয়ে আভ্যন্তরীণ দৃশ্য বুঝিয়ে দেওয়া প্রভৃতিকে ইঙ্গিতধর্মী মঞ্চসজ্জার উদাহরণ বলা যেতে পারে।
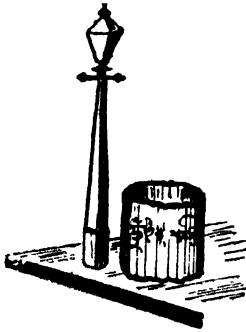
[চিত্র ৩.২] ইঙ্গিতধর্মী মঞ্চ পরিকল্পনা

বলা বাহুল্য, প্রতিনিধিত্ব করার জন্য মূল স্থানের এমন অংশ বা খণ্ড বেছে নেওয়া উচিত, যা একনজরে চেনা যায়, এবং যার মাধ্যমে মূল স্থানের পরিচয় প্রাঞ্জলভাবে ধরা পড়ে।
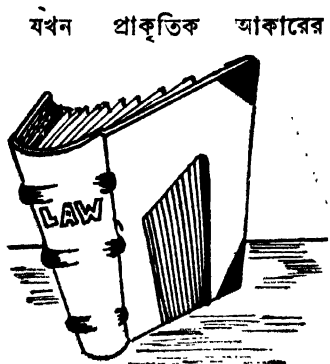
যখন প্রাকৃতিক আকারের উপরে প্রাধান্য না দিয়ে, কোনও বিশেষ ধারণাকে দৃশ্যে রূপায়িত করা হয়, তখন সেই জাতীয় পরিবেশনকে বলা হয় **ভাবধর্মী** পরিবেশন। এই শ্রেণীর দৃশ্য-পরিকল্পনায় [চিত্র ৩.৩] বর্ণ, আকৃতি এবং অনুপাতকে কোথাও আতিশয্যের দ্বারা, কোথাও বিকৃতির সাহায্যে রঞ্জিত করে, কোনও একটি বিশেষ ভাবের রূপদানের কাজে লাগানো হয়।

[চিত্র ৩.৩] ভাবধর্মী দৃশ্য পরিকল্পনা

চতুর্থ একশ্রেণীর পরিবেশনের নাম দেওয়া যেতে পারে **বিন্যাসধর্মী** পরিবেশন। এই শ্রেণীর দৃশ্যপরিকল্পনায় [চিত্র ৩.৪] ঘটনার জন্য স্থান নির্দেশ করা হয় মাত্র, কিন্তু সেই স্থানটিকে কোনও নির্দিষ্ট স্থানের প্রতিকৃতি হিসাবে গণ্য করা যায় না। খুবই সরল আকৃতির কয়েকটি ধাপ, দেয়াল, বেদী প্রভৃতির সাহায্যে রঙ্গপাঠে এক বা একাধিক স্তর বিন্যাস করে এই জাতীয় দৃশ্যপট তৈরী করা হয়। ধাপ বা বেদী প্রভৃতির চেহারায় বিশেষ কোনও দেশ বা কালের ছাপ থাকে না—বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এগুলি বিবিধ জ্যামিতিক তলের চেহারায় গঠিত হয়। বারবার দৃশ্যসজ্জার পরিবর্তন না ঘটিয়ে, একই আয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ঘটনাবলীকেও এই প্রথায় পরিবেশন করা চলে। ফলে নাটকের গতি বাড়ানো সহজ হয়।
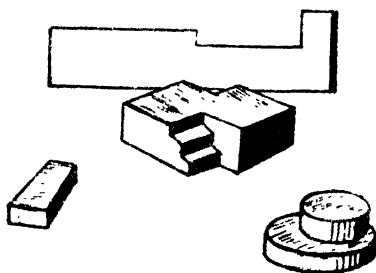
[চিত্র ৩.৪] বিন্যাসধর্মী মঞ্চ পরিকল্পনা

ঘটনার কাল ও চরিত্র নির্দেশ

পরিবেশ সৃষ্টির কাজে দৃশ্যপট ঘটনার কাল ও চরিত্র নির্দ্দেশের দ্বারা নাটকের বক্তব্যকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। উপযুক্ত আলোকসম্পাত এবং বাতী, অগ্নিস্থলী প্রভৃতি আনুষঙ্গিকের যথোপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে, সুপরিকল্পিত দৃশ্যসজ্জায় অনায়াসে ঘটনার **কাল**

প্রকাশ করা সম্ভব। দিনের কোন সময়ে বা বৎসরের কোন ঋতুতে, প্রাকৃতিক কি ধরণের আবহাওয়ায় ঘটনাটি ঘটছে, এই 'কাল'-প্রকাশের ফলে তা ধরা পড়বে।

সুপরিকল্পিত দৃশ্যসজ্জার মারফত, ঐ দৃশ্যপটে বর্ণিত স্থান যারা ব্যবহার করছে, তাদের চরিত্রও প্রকাশ পেতে পারে। ঘরের গোছানো বা আগোছালো ভাবের মধ্য দিয়ে গৃহস্বামীর প্রকৃতি, ব্যবহৃত বিছানা চাদর দরজা-জানালার পর্দা বা দেয়ালের বর্ণ থেকে তাঁর রুচির পরিচয় নির্দ্ধারণ করা দর্শকের পক্ষে খুবই সহজ। ডাক্তারের স্টেথিসকোপ, বৈজ্ঞানিকের ল্যাবরেটরি-সরঞ্জাম, সঙ্গীতশিল্পীর বাদ্যযন্ত্রাদি, চিত্রকরের চিত্রাঙ্কণ সরঞ্জাম—হাজার রকমের দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে, দৃশ্য-সজ্জায় যে সবের উপস্থিতি পাত্রপাত্রীদের চরিত্র বোঝানোর মাধ্যমে ঘটনাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবে। ঝরা পাতা, ফুলের মেলা, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে বিদ্যুতের চমক প্রভৃতি উপমাত্মক উপকরণের সাহায্যেও নাটকের বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করা যায়।

দৃশ্যপট তথা আসবাবপত্রাদির ভাবসাম্যহীনতার ভিতর দিয়ে ঘটনায় উল্লেখিত চরিত্রাবলীর মানসিক ভারসাম্যহীনতাও ফুটিয়ে তোলা যায়—তবে এই জাতীয় পরিবেশন ভাবধর্মী পরিবেশনের ক্ষেত্রেই সাধারণতঃ সীমাবদ্ধ।

বর্ণ এবং আলোকসম্পাতের ভিতর দিয়ে আবহাওয়ার স্বরূপ প্রকাশের দ্বারাও দৃশ্যসজ্জা ঘটনাকে সাহায্য করতে পারে; অব্যক্ত এক ইঙ্গিত-মূলক ভাষায় নাটকের অন্তর্নিহিত দুঃখ, দৈন্য, একাকীত্ব, ক্লান্তি, আনন্দোচ্ছ্বাস, বিভৎসতা প্রভৃতি বহুবিধ ভাবের মধ্যে দর্শকের মনকে টেনে আনতে সক্ষম হয়।

ঘটনার অলঙ্করণ

ঘটনার জন্য পরিবেশ সৃষ্টি করার তৃতীয় পন্থা হলো **অলঙ্করণ**—অর্থাৎ ঘটনার জন্য একটি ছবির মতো ক্ষেত্র প্রস্তুত করা। ব্যবহৃত দৃশ্যাবলী এবং আনুষঙ্গিক বস্তুগুলির রেখাগত এবং বর্ণগত সংস্থাপনকে শিল্পরুচির দিক থেকে সুষ্ঠু করে তোলার দ্বারা ঘটনার পরিবেশটিকে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। দৃশ্যসজ্জার প্রয়োজনীয়তার এটি একটি মূল্যবান দিক। পরিকল্পনা-হীন সংস্থাপনের দ্বারা যদি দৃশ্যসজ্জার আকর্ষণ বিনষ্ট হয়, তবে পরিবেশ সৃষ্টির কাজে সে দৃশ্যপট ব্যর্থ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে।

আপাতঃদৃষ্টিতে অসুন্দর স্থানকেও পরিবেশনের গুণে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব। প্রয়োজনের খাতিরেও একঘেঁয়ে, বৈচিত্রহীন, ক্লান্তিকর ধুসর বা বাদামী রঙের পশ্চাৎপট ব্যবহার করা উচিত নয়। ঘটনাকে সাহায্য করার বদলে, এর বিরক্তিকর আবহাওয়া দর্শকের পীড়া-উদ্রেকের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। চুণ-বালি-খসা দেয়াল, পোকায়-কাটা দরজা-জানালার পাল্লা, ভাঙা আসবাব পত্র, চাপ-চাপ কালো ছায়া ইত্যাদির বৈচিত্রের সাহায্যে এই জাতীয় ক্লান্তিকর পরিবেশকেও আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়। পরিবেশের ক্লান্তিভাব বোঝানোর জন্য চিত্র যেন ক্লান্তিকর হয়ে না ওঠে।*

---

* এই একই কারণে, পিছনে একটিমাত্র পর্দা টাঙিয়ে যেখানে কোনও অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়, সেখানে পিছনের পর্দাটি হয় সাদা, নয়তো কালো রাখা উচিত। সাদা পর্দার উপরে আলোর সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব। কালো পর্দা নিজে কোনওভাবেই প্রকটিত না হয়ে, অভিনেতাদের পরিহিত পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণবৈচিত্রকে বেশীমাত্রায় প্রাধান্য দিতে সাহায্য করে।

দুই

সার্থক পরিকল্পনার বৈশিষ্ট

প্রকাশ ধর্ম দৃশ্যপটের সাহায্যে ঘটনার স্থান, কাল ও চরিত্র নির্দ্দেশ করা এবং অলঙ্করণের কাজটি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের সময়, মঞ্চশিল্পীকে বিশেষভাবে কয়েকটি বৈশিষ্টের কথা স্মরণে রাখতে হবে।

প্রথমতঃ, দৃশ্যপট যেন নাটকে বর্ণিত স্থান কাল ইত্যাদি এবং ঘটনাবলীর অন্তর্নিহিত ভাব প্রকাশে সক্ষম হয়। ঘটনার চতুষ্পার্শ্ববর্তী দৃশ্যবস্তুর যথাযথ উল্লেখের ভিতর দিয়ে (ক) ঘটনার জন্য বাস্তবানুগ বা ইঙ্গিতধর্মী কিম্বা ভাবধর্মী অথবা বিন্যাসধর্মী পরিবেশনের যে কোনও এক বা একাধিক পন্থার সাহায্যে স্থান নির্দ্দেশ করা, এবং (খ) ঘটনার আবেষ্টনীকে কাল ও অবস্থা বোঝানোর কাজে যোগ্য করে তোলা দৃশ্য-পটের প্রধান এবং প্রথম কাজ। পূর্ব অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, দৃশ্যপট যেন এক নজরে নিজের পরিচয় তুলে ধরতে সক্ষম হয় দর্শকের চোখে।

আকর্ষণ পরিবেশের কাজে ব্যবহৃত সরঞ্জামাদির আকৃতি ও বর্ণে শিল্পরুচীসম্মত সৌন্দর্য্য বিধানের মধ্য দিয়ে, দৃশ্যপট ঘটনাবলীকে সর্বদাই একটি দৃষ্টি-সুখকর আবেষ্টনীতে যেন ঘিরে রাখে।

আকর্ষণীয় বিন্যাস সাধনের জন্য কয়েকটি নিয়ম মেনে চলা দরকার। এই নিয়মাবলীর প্রথম কথা **সমার্থবোধকতা**। দৃশ্যপট, আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি, পোষাক-পরিচ্ছদ এবং আলোকসম্পাতের মাধ্যমে প্রাপ্ত তল, রেখা ও বর্ণ যেন একই ভাব ব্যক্ত করার কাজে নিযুক্ত হয়।

একটি নক্সায় এই সমার্থবোধকতা আনার সময়, লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন—

(ক) পরিবেশ সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত বিষয়গুলি পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত হয় ;

(খ) পরিবেশের মুখ্য ভাব যে বস্তু বা বিষয়ের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে, গৌণবস্তু বা বিষয়গুলির অবস্থান যেন তাকে প্রাধান্য দেয় ; এবং

(গ) সমগ্র নক্সায় যেন একই ধারা ব্যবহৃত হয় ।

এইভাবে সমার্থবোধক অংশদ্বারা গঠিত দৃশ্যপটের সবখানি খুব সহজে নজরে পড়ে, এবং দর্শকের দৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গৌণবস্তুগুলিকে আশ্রয় করেই মুখ্যবস্তুর দিকে কেন্দ্রীভূত হতে পারে ।

বিন্যাসকে আকর্ষণীয় করে তোলার দ্বিতীয় নিয়ম **বৈচিত্র** বজায় রাখা । একঘেঁয়ে পুনরাবৃত্তিকে এড়িয়ে চলতে হবে । একই আকৃতি বা বর্ণ সর্বত্র ব্যবহার করা উচিত নয় । বৈচিত্রের জন্য লম্ব রেখার বিরুদ্ধে রাখতে হবে অনুভূমিক রেখা, গোলাকার বস্তুর বিপরীতে রাখতে হবে ত্রিকোণ বা চতুষ্কোণ বস্তু, গাঢ়বর্ণের সঙ্গে রাখতে হবে নিরপেক্ষ বর্ণের অবস্থান । এককথায় বৈচিত্র নির্ভর করে পরস্পরের প্রতি সহযোগী অথচ বিরোধাত্মক সমাবেশের উপরে । পরিবেশের মূলভাব যদি সর্বত্র বজায় থাকে, তবে বলা বাহুল্য, এই জাতীয় বিরোধাত্মক সমাবেশে সমার্থবোধকতার কোনও হানি হয় না ।

সুষ্ঠু বিন্যাসের তৃতীয় সূত্র **ভারসাম্য** রক্ষা করা । দৃশ্যসজ্জায় ব্যবহৃত প্রধান প্রধান বিষয়গুলি [যেমন দরজা, জানালা প্রভৃতি], বড় আসবাবপত্র এবং বিশেষ প্রণিধানের বস্তুগুলিকে রঙ্গপীঠের দুইদিকে সমানভাগে ভাগ করে দেওয়া উচিত । শুধু বস্তু নয়, বর্ণের ক্ষেত্রে, তথা বিরোধাত্মক সমাবেশ-সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত সবকিছুই এইভাবে রঙ্গপীঠের ডাইনে ও বামে সমান ওজনে ছড়িয়ে থাকা দরকার ; তবেই বৈচিত্রের মাঝে চিত্রসৃষ্টির কাজটি সার্থক হয়ে ওঠে ।

আকর্ষণীয় করে তোলা সম্পর্কে শেষ কথা, সবকিছুর মাঝে একটি **ছন্দোবদ্ধ ভাব** ফুটিয়ে তোলা দরকার । বাস্তবে, বিভিন্ন বিষয় ও বস্তুর

সহযোগী-মনোভাবাপন্ন অবস্থানের ভিতর দিয়েই আকর্ষণীয় একটি একক চিত্র ফুটে ওঠে।

প্রক্ষেপণ দৃশ্যপটকে এমনভাবে তৈরী করতে হবে, যেন তার প্রতিটি অংশ প্রেক্ষাগৃহের দূরতম প্রান্তে অবস্থিত দর্শকের পক্ষেও অনুধাবন করা কষ্টকর না হয়।

দর্শকদের মুখ্য অংশকে থাকতে হয় মঞ্চসজ্জা থেকে কুড়ি ফুট ও পঞ্চাশ ফুটের মধ্যে—অনেকক্ষেত্রে এর চেয়ে আরও বেশী দূরে। দূর থেকে অনুধাবন করার বিষয়টিকে সহজসাধ্য করার জন্য দৃশ্যপটের নক্সাকে **সরল** এবং **অতিরঞ্জিত** করে তোলা দরকার। প্রত্যেকটি রেখা এবং বর্ণ বলিষ্ঠভাবে ব্যবহার করতে হবে। যা দূর থেকে স্পষ্ট বোঝা যাবে না, অথচ দৃশ্যপটের অনেক প্রধান অংশের সাথে একাকার হয়ে মূল রূপটিব অনুধাবনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে, এমন ছোট আকারের কারুকার্য্য যত মনোরমই হোক, বর্জন করা উচিত। পাদপ্রদীপমালার সীমা পার করে দৃশ্যপটের স্বরূপকে দূরে প্রক্ষেপ করতে হলে, সব কিছু 'বড় করে' দেখানোর দিকে লক্ষ্য দিতে হবে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি জঙ্গলের দৃশ্যে গাছের প্রত্যেকটি পাতা পৃথকভাবে আঁকার কোনও সার্থকতা নেই। সবুজ-শ্রেণীর গাঢ়, হাল্কা বিভিন্ন বর্ণের ছোপ দিয়েই পত্রাকীর্ণ অঞ্চল বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভব। দেয়ালের অলঙ্করণে সাধারণ কক্ষে যেটুকু জায়গায় দু'ডজন ফুল আঁকা হয় দশ-বারো রকমের হাল্কা রঙের সমন্বয়ে, মঞ্চে সেই স্থানটুকু আধ ডজন ফুলেই ভরিয়ে তুলতে হবে—বর্ণ হওয়া উচিত দুই বা তিনটি উজ্জ্বল শ্রেণীর।

সরলতা দৃশ্যপট গঠনের সময় শিল্পীর প্রধান লক্ষ্য হবে, দৃশ্যপটের জন্য সেইসব বিষয়ই শুধু নির্বাচন করা, যেগুলি মূলভাব প্রকাশে সাহায্য করবে। সম্বন্ধহীন অপ্রধান বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলা উচিত।

অবশ্যই স্মরণ রাখা দরকার, এই সরলতা-বিধানের অর্থ মঞ্চকে বস্তুশূণ্য (ফাঁকা) করা নয়। দৃশ্যপটে মাত্র দুটি রেখা এবং একটি রঙের ব্যবহার হয়েছে, না কুড়িটি রেখা ও দশটি রঙের ব্যবহার হয়েছে, এসব বড় কথা নয়। দৃশ্যপটকে সরল বলা হবে, যদি তার গঠন-বিন্যাস

তথা নক্সায় কোনও জটিলতা না থাকে। দর্শক যদি একনজরে অনায়াসে দৃশ্যপটের অন্তর্নিহিত ভাব বুঝে নিতে পারে, তবেই তাকে **সরল** বলা হবে।

শুধু যে পরিমিতিবোধের দ্বারা দৃশ্যপটকে সরল করা দরকার তাই নয়, যান্ত্রিক দিক থেকেও সরল করে তোলা প্রয়োজন। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন, দৃশ্যপটের নির্মাণ, চিত্রায়ণ ও সংস্থাপনের ব্যাপারে সময় ও বস্তুর অপব্যয় না ঘটে।

ব্যবহারোপযোগিতা

দৃশ্যপট যেন অভিনেতৃবর্গের দ্বারা সর্বতোভাবে ব্যবহৃত হওয়ার উপযোগী করে তৈরী করা হয়, সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার। প্রয়োজনমতো প্রবেশ-নির্গমনের পথ, ধাপ, সিঁড়ি চেয়ার টেবিল তথা অভিনেতাদের ঘোরাফেরা, ওঠা, দাঁড়ানো, শোয়া, বসা প্রভৃতির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখার বিষয়ে শিল্পীকে দৃষ্টি দিতে হবে। এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষ্য রাখতে হবে, দৃশ্যপট শুধু ঘটনার পরিবেশ সৃষ্টির কাজে বাহ্যতঃ তাল বজায় রাখলে চলবে না—প্রয়োজনের উপযোগী নিরাপদ ও মজবুতভাবে গঠন করা দরকার। যেমন, যে ধাপের উপরে বহু ব্যক্তির সমাবেশ ঘটবে, সে ধাপের ভারবহনক্ষমতা তদুপযুক্ত হওয়া দরকার—অথবা, যে দেয়ালটিতে ঘটনা-প্রসঙ্গে কারও ধাক্কা খাওয়ার কথা, সেটিকে উপযুক্তভাবে দাঁড় করানোর বিশেষ ব্যবস্থা করা উচিত.....ইত্যাদি।

সম্ভাব্যতা

দৃশ্যপট যেন একাধারে সাধারণ কারিগরী বৈশিষ্টগুলি বজায় রাখার সঙ্গে, মঞ্চ বিশেষের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ প্রয়োজনগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে পরিকল্পিত হয়।

সাধারণ কারিগরী বৈশিষ্টগুলি বজায় রাখতে হলে মঞ্চ-শিল্পীকে নীচের বিষয়গুলির দিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে :—

দৃশ্যপটগুলি যেন (ক) সহজে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে গঠিত ও চিত্রিত হতে পারে ; (খ) খরচের দিক থেকে মিতব্যয়িতার সঙ্গে নির্মিত হতে পারে ; (গ) দ্রুত এবং নিঃশব্দে মঞ্চ থেকে অপসারিত হতে পারে ; (ঘ) ব্যবহার এবং ভারবহনজনিত আঘাত ও ক্ষয় সইতে পারে ; (ঙ) পরস্পরের সঙ্গে সহজে এবং ভালোভাবে জোড়া লাগতে পারে ; এবং (চ) তুলে রাখার সময় অল্প জায়গায় নিরাপদে যেন রাখা সম্ভব হয়।

মঞ্চ বিশেষের গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ প্রয়োজনের উপযোগী করে তুলতে হলে, শিল্পীকে দুটি বিষয় প্রথম সচেতন হতে হবে—প্রথমটি মঞ্চবিশেষের আয়তন ; দ্বিতীয়, দৃশ্যপট অপসারণের ব্যবস্থা ।

মঞ্চের আয়তনের দিকে লক্ষ্য রেখে, এমনভাবে দৃশ্যপট নির্মাণ করা উচিত, যেন সেই দৃশ্যপটগুলি

(ক) দৃষ্টিরেখা বরাবর সংস্থাপিত হতে পারে ;

(খ) পার্শ্বপট, ঝালর ইত্যাদিকে (যা দৃষ্টিগোচর হওয়া উচিত নয়) ঢেকে রাখতে পারে ;

(গ) ব্যবহারের পর নির্দ্দিষ্ট স্থানে সংরক্ষিত হতে পারে ; এবং

(ঘ) আলোক সম্পাতের সরঞ্জাম ব্যবহার করার এবং আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি সংস্থাপন ও নেওয়া আনার সুযোগ দেয় ।

সুতরাং মঞ্চশিল্পীকে দৃশ্যপটের নক্সা তৈরী করার পূর্বে মঞ্চবিশেষের বিশেষ কয়েকটি বিষয় জানতে হবে। (ক) মঞ্চের প্রস্থ, (খ) যবনিকা-রেখা থেকে পশ্চাৎপট পর্য্যন্ত গভীরতা, (গ) কার্য্যকরী মঞ্চমুখের প্রসার ও উচ্চতা, (ঘ) কপিকল ব্যবস্থা থাকলে, রঙ্গপীঠ থেকে সেস্থানের উচ্চতা এবং (ঙ) মঞ্চের উপরে ঝুল বারান্দা থাকলে, তার অবস্থান ও পরিমাপ জানা, এই বিষয়গুলির মধ্যে প্রধান ।

দৃশ্যপট অপসারণের ব্যবস্থা সম্পর্কে যে বিষয়গুলি প্রণিধানযোগ্য, তা হচ্ছে—

(ক) কপিকলের সংখ্যা,

(খ) টেনে তোলার জন্য ব্যবহৃত দড়ির ভারোত্তলন ক্ষমতা,

(গ) কপিকল ও কপিকল লাগানো কড়িকাঠামের ক্ষমতা,

(ঘ) 'প্রতিচাপ' ব্যবস্থা যদি থাকে, তার প্রকৃতি,

(ঙ) মঞ্চভূমির ভারবহন ক্ষমতা,

(চ) বিশেষ ধরণের অপসারণ ব্যবস্থা যদি থাকে, তার প্রকৃতি এবং

(ছ) সংরক্ষণের ব্যবস্থাদি ।

দৃশ্যপটের সম্ভাব্যতা-পর্য্যায়ে আলোচিত বিষয় কটি পূর্বাহ্নে জেনে, তবেই মঞ্চশিল্পীর নক্সা প্রস্তুতির কাজে হাত দেওয়া উচিত।

ঐকতান দীপচিত্রণ, ধ্বনিসংযোজন, রূপসজ্জাদি অপরাপর মঞ্চকলার সঙ্গে দৃশ্যপটও যেন সমগ্র নাটক পরিবেশনার সার্থকতায় একটি উপ-অংশ গ্রহণ করে। নাটকের অন্তর্নিহিত অর্থ

সম্যকরূপে দর্শকের সামনে তুলে ধরতে হলে, মঞ্চশিল্পীর উচিত সর্বতোভাবে নাট্যপরিচালকের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রেখে কাজ করা। যত প্রয়োজনীয়ই হোক না কেন, পরিবেশ যে ঘটনার উপরে প্রাধান্য পেতে পারে না, এই কথাটি অতি-উৎসাহী নবীন মঞ্চশিল্পীরা ভুলে যান। নিজেদের কৃতিত্ব দেখানোর মোহে তাঁরা প্রায়ই নাটকের প্রধান উপকরণ অভিনেতৃবর্গকে উপেক্ষা করে বসেন। অস্বাভাবিক উজ্জ্বল পশ্চাৎপট, বিরাট আকাশের পটভূমি, ভারসাম্য ও বর্ণের অভিনব প্রয়োগ, আলোকসম্পাতের অসাধারণ পরিবেশন প্রভৃতি হয়তো এককভাবে দৃশ্যপটকে চমকপ্রদ করে তুলতে পারে; কিন্তু অভিনেতা-অভিনেত্রীর উপস্থিতিতে এগুলির প্রয়োগ অযথা দৃষ্টিবিক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এ ধরণের দৃশ্যপটে যাকে বা যাদের ঘিরে পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়েছে, তাদের চেয়ে, পরিবেশ-সৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত বস্তুগুলির দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষিত হবে বেশী মাত্রায়।*

উপসংহারে বলা যেতে পারে, ভালো দৃশ্যপট তৈরী করতে হলে তা যে অসাধারণ করা উচিত হবে না, তা নয়—বরং, অসাধারণ পরিবেশ সৃষ্টি সৃজনীশক্তির পরিচায়ক বলে গণ্য হতে পারে—লক্ষ্য রাখতে হবে, দৃশ্যপট যেন ঘটনাপ্রবাহের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার না করে, অনুগামী হয়ে চলে।

* স্থির বস্তুর চেয়ে চলমান বস্তু বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এজন্য, মঞ্চসজ্জায় সচল বস্তু [ব্রীজের উপরে ট্রাম-বাসের চলাচল, নাগরদোলা, এমনকি বড় দেয়াল ঘড়ীর দোলায়মান পেণ্ডুলামও] বেশীমাত্রায় দৃষ্টি-বিক্ষেপের কারণ হয়।

তিন

দৃশ্যপটের শ্রেণীবিভাগ

সাধারণ রঙ্গমঞ্চের পরিচয়

দৃশ্যপট সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় আসার পূর্বে, সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বিষয়ে একটি মোটামুটি ধারণা গড়ে তোলা দরকার। আলোচ্য অনুচ্ছেদে, মঞ্চের বিভিন্ন অংশের [মুখপাতের ছবি] সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, অধিকাংশ বাংলা প্রতিশব্দ গ্রন্থকার কর্তৃক উপস্থাপিত; তাই এগুলির সুপরিচিত ইংরাজী নামগুলিও পাশে পাশে দেওয়া হয়েছে।

প্রেক্ষাগৃহ ও মঞ্চের মাঝে আড়াআড়িভাবে যে প্রাচীর ব্যবধান সৃষ্টি করে দাঁড়িয়ে থাকে, যার বিরাট খিলানটি দিয়ে আমরা অভিনয় দেখি, তাকে **মঞ্চমুখ** বা 'প্রসেনিয়াম' বলা হয়। এই মঞ্চমুখের ঠিক পিছনে থাকে **অধিমুখ** বা 'ফলস্ প্রসেনিয়াম', যাকে বাড়িয়ে বা কমিয়ে মঞ্চমুখের পরিসর কম বেশী করা যায়। মঞ্চের উভয়পার্শ্বে দৃষ্টিসীমার বাইরে যে জায়গা থাকে, তাকে বলা হয় **পার্শ্বরঙ্গ** বা 'উইংস'। এই উইংস দিয়েই সজ্জাকক্ষে বা ভাণ্ডারে যাওয়া যায়। উইংসের পাশের বড় দরজা দিয়ে দৃশ্যপটাদি মঞ্চে ঢোকানো হয়। আলোক ও শব্দ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এবং মঞ্চ-নিয়ামকের আসন থাকে এই উইংসে। ব্যবহারের জন্য অপেক্ষমান দৃশ্যপট ও আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র এখানেই রাখা হয়। মঞ্চের নিরাপত্তার ব্যবস্থাদি, ঘড়ী এবং কোনও কোনও মঞ্চে, শেষবারের মতো রূপসজ্জার খুঁটিনাটি নিজে দেখে নেওয়ার সুবিধার জন্য, বড় আয়না লাগানো থাকে উইংসেরই সুবিধাজনক জায়গায়।

মঞ্চের **পাটাতন** তৈরী করা হয়, কমপক্ষে ১½ ইঞ্চি বেধের, নরম হলদে পাইন কাঠের তক্তা দিয়ে। এই তক্তাগুলি মঞ্চমুখ ও পশ্চাৎপটের সঙ্গে সমান্তরালভাবে লাগানো হয়। বেশীর ভাগ মঞ্চেই এই পাটাতনের

মধ্যে এক বা একাধিক **সুঁড়ি** বা 'ট্র্যাপ' থাকে। সুঁড়ি পাটাতনের একটি অপসারণযোগ্য ক্ষুদ্র অংশ—যা সরিয়ে পাটাতনের নীচে নামা যায়। অনেকক্ষেত্রে নীচে নামার জন্য সিঁড়ি থাকে।

দর্শকের দিকে মঞ্চের সীমানা বরাবর **পাদপ্রদীপমালার** স্থান। **মূল পর্দা** বা **যবনিকা**র গতিপথ ও পাদপ্রদীমালার স্থানের মাঝে যে জায়গাটুকু থাকে, তাকে বলা হয় **অধিরঙ্গ** বা 'এপ্রণ'।

যে সংকীর্ণ একরঙা দৃশ্যপটগুলি মঞ্চের উভয় দিকে সমান্তরালভাবে রেখে, দর্শকের চোখ থেকে পার্শ্বরঙ্গকে আড়াল করে রাখা হয়, তাদের বলে **পার্শ্বপট** বা 'টরমেণ্টার'। অনুরূপভাবে, দৃশ্যপটাদির উর্দ্ধে অনাবশ্যক শূন্যস্থানে দৃষ্টি যাতে প্রসারিত না হয়, সে জন্য সমান্তরালভাবে **ঝালর** বা 'বড়ার' ঝোলানো হয়। প্রথম নক্সাকাটা ঝালরটিকে বিশেষভাবে বলা হয় **মুখপট** বা 'টীজার'।

পার্শ্বপট, ঝালর, দৃশ্যপট ইত্যাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হওয়ার পরে, মঞ্চমুখের ভিতর দিয়ে দর্শক মঞ্চের উপরে যে স্থানটুকু দেখতে পান, তাকে **রঙ্গপীঠ** বলে। এই রঙ্গপীঠেই অভিনেতাকে তার চলাফেরা সীমাবদ্ধ রাখতে হয়। দর্শকের আসনশ্রেণীর দুই-প্রান্তবর্তী দর্শকের **দৃষ্টিরেখা**র মধ্যে রঙ্গপীঠের উপকরণাদি সাজানোই বিধিসম্মত।

ঝালরের উপরে **ফ্লাই** নামের ফাঁকা জায়গায়, বিশেষ কপিকল ব্যবস্থাযুক্ত **কড়িকাঠাম** বা 'গ্রিড'-এর সাহায্যে দৃশ্যপট বা আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি তুলে রাখা হয়। দুই বা তিন সারি দড়ি ব্যবহৃত হয় এই টেনে তোলার কাজে, যাদের **সেট-লাইন** বলে। সেট লাইনের দড়ির প্রান্ত, ফ্লাইয়ের কোনো এক পাশের **ঝুল বারান্দা** বা 'গ্যালারী'তে রাখা **কীলক** বা 'পিন-রেল'ব্যবস্থার সাহায্যে আটকে রাখা হয়। এই গ্যালারীর সাহায্যে, পাটাতন থেকে যথেষ্ট উঁচুতে, মঞ্চের ভিতরকার চার দেয়ালেই ঘুরে আসার ব্যবস্থা থাকে।

ভারী দৃশ্যপটাদি সহজে কপিকলের সাহায্যে ওঠানোর জন্য **প্রতিচাপ** বা 'কাউণ্টার ওয়েট' ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় ঠিক রঙ্গপীঠের উপর দিয়েই এক গ্যালারী থেকে অন্য গ্যালারীতে যাওয়ার জন্য সরু **ব্রীজ** থাকে, যার গায় আলোকসম্পাতের সরঞ্জাম লাগানো যেতে পারে।

একাধিক পর্দা টাঙানোর ব্যবস্থা থাকে মঞ্চমুখের ঠিক পরেই। প্রথমেই থাকে একটি **অগ্নিনিরোধক** এস্‌বেষ্টজের চাদর। দুর্ঘটনার সময় এটি নামিয়ে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহকে অগ্নিনিরোধক প্রাচীরে বিচ্ছিন্ন করে

দেওয়া হয়। তারপরেই থাকে রঙ্গমঞ্চের প্রধান পর্দা বা **যবনিকা**। যবনিকার পরে অঙ্কান্তর বা দৃশ্যান্তর বোঝানোর উপযোগী সাধারণ পর্দা থাকে। ছোট রঙ্গমঞ্চে অবশ্য একটি পর্দাই উভয়বিধ কাজ সম্পন্ন করে।

ব্যবহার বিধির তারতম্য অনুসারে পর্দার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। বড় রঙ্গমঞ্চে (যেখানে ফ্লাই অনেক উঁচু) সাধারণতঃ উপরে সোজা টেনে তোলার যোগ্য যবনিকা ব্যবহৃত হয়। উপরে টেনে তোলার স্থানাভাব থাকলে, সমবর্ত্তুল কাঠের রোলারে জড়িয়ে তোলার ব্যবস্থা রাখা হয়। এই উভয়শ্রেণীর যবনিকা বা পর্দাকেই **ড্রপ** বলে। আংটার সাহায্যে বা চাকা লাগানো ঝরি দিয়ে দুটুকরো পর্দাকে দুপাশে সরিয়ে খোলার উপযোগী পর্দাকে বলে **ড্রু** শ্রেণীর পর্দা। পর্দার টুকরো দুটিকে মঞ্চমুখের উপরের দুই কোণে কুঁচিয়ে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থাকে **ট্যাবলো** অথবা শুধু **ট্যাব** বলে।

রঙ্গপীঠকে আড়াআড়ি দুভাগ করলে, দর্শকের দিকে থাকা অংশকে বলা হবে **নিম্নরঙ্গ** বা 'ডাউন ষ্টেজ' এবং পশ্চাৎপটের দিকে অর্দ্ধাংশকে বলা হবে **উর্দ্ধরঙ্গ** বা 'আপষ্টেজ'। দর্শকের দিকে মুখ করে দাঁড়ানো অবস্থায় অভিনেতার ডানদিক ও বামদিক যথাক্রমে রঙ্গপীঠের ডান ও বামদিক বলে গণ্য হবে। রঙ্গপীঠের কেন্দ্রস্থলকে বলা হবে **মধ্যরঙ্গ** বা 'সেণ্টার ষ্টেজ'।

বিভিন্ন শ্রেণীর দৃশ্যপট

সচরাচর ব্যবহৃত দৃশ্যপটের উপকরণগুলিকে সাধারণ পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। মঞ্চশিল্পীকে এই পাঁচটি শ্রেণীরই এক বা একাধিক উপকরণ মিলিয়ে দৃশ্যপট গড়তে হবে। নীচে উদাহরণসহ ঐ পাঁচটি শ্রেণী সম্পর্কে আলোচনা করা হচ্ছে:

(১) প্রথমেই ধরা যাক **ভারবহনক্ষম** উপকরণের কথা। বেদী, বারান্দা, সিঁড়ী, উঁচু রাস্তাযুক্ত প্রাচীর, অভিনেতার দ্বারা ব্যবহৃত হবে এমন পাহাড় বা পাড় প্রভৃতি এই শ্রেণীতে পড়ে। গঠনপ্রণালী, আটকে রাখার ব্যবস্থা, ক্ষুদ্রতর অংশ সংযোজনের মজবুতি এবং ব্যবহৃত বস্তুর শক্তির উপরে এই শ্রেণীর দৃশ্যপট বা উপকরণের ভারবহণক্ষমতা নির্ভর করে।

(২) দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়বে **ঝুলন্ত** শ্রেণীর উপকরণ। সাধারণতঃ 'ফ্লাই' থেকে ঝুলিয়ে নভোপট, কুয়াশা বা চাঁদনীরাতের দৃশ্য দেখানোর

জন্য, অথবা যবনিকারও সামনে নক্সাদার পর্দা হিসাবে এগুলি ব্যবহৃত হয়। অনেকসময় পূর্ণ একটি আভ্যন্তরীণ দৃশ্যও এই শ্রেণীর উপকরণে গড়ে তোলা সম্ভব।

(৩) 'ফ্ল্যাট' বা **ক্যাম্বিস-ঢাকা কাঠামো**-র শ্রেণীতে পড়বে দৃশ্যপটে ব্যবহৃত প্রায় সব ধরণের সমতল উপকরণ। সাধারণ দেয়াল, দরজা-জানালার ফাঁকযুক্ত দেয়াল, ছাদের নিম্নাংশ, বাড়ীর বাইরের দেয়াল, প্রাচীর ইত্যাদি অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যেতে পাবে এই শ্রেণীর উপকরণ হিসাবে। প্রান্তরেখা অসমতল হতে পারে—উপরিভাগ সমতল হলেই, তা এই শ্রেণীর উপকরণ গঠনের কৌশলে গড়া যাবে।

(৪) দেয়ালের কার্ণিস, নক্সা, উঁচু কড়ি, বারান্দা বা সিঁড়ির রেলিং, দরজার চৌকাঠ ও দরজা, জানালার কাঠামো ও পাল্লা প্রভৃতিকে **ত্রিমাত্রিক সংযোজন** শ্রেণীতে ফেলা হয়। এগুলি সাধারণতঃ ক্যাম্বিস-ঢাক কাঠামো, অথবা ভারবহনক্ষম উপকরণের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় ব্যবহারে লাগে।

(৫) সবার শেষে ধরা যাক উঁচু-নীচু পাথরের দেয়াল, কাঠের দেয়াল, গাছের গুঁড়ি, ঝোপ-জঙ্গল, ঘাস, পাথর প্রভৃতি **বিশেষ তল** বোঝানোর উপকরণগুলির কথা। এগুলি সাধারণতঃ 'আনুষঙ্গিক' হিসাবে গণ্য হয়। কাঠ বা তারেব জাল দিয়ে তৈরী খাঁচার উপরে প্ল্যাষ্টার বা কাগজের প্রলেপ দিয়ে তৈরী করা হয় এই শ্রেণীর উপকরণগুলি।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে, এই পাঁচটির মধ্যে একাধিক শ্রেণীর মিশ্রণেই দৃশ্যপট রচনা করতে হয়। ধরা যাক 'অরণ্যপ্রান্তে একটি ভগ্ন দেউল'-এর দৃশ্য। এই দেউলের সিঁড়ি এবং বারান্দা 'ভারবহনক্ষম' হবে। আকাশ বা দূরের আঁকা গাছপালাগুলি থাকবে 'তন্তুজা' শ্রেণীর। দেউলের প্রাচীর গড়া হবে 'ক্যাম্বিস-ঢাকা কাঠামো'র সাহায্যে। দেউলের ভাঙা দরজার পাল্লা, প্রাচীরগাত্রে পোড়ামাটির কাজ প্রভৃতি 'ত্রিমাত্রিক সংযোজন' প্রথায় তৈরী করে জুড়তে হবে। গাছের গুঁড়ি, ঝোপ জঙ্গল, সম্ভব হলে মাটির স্তুপ বা ঘাসের স্তর দিয়ে জায়গাটিকে ভরাট করতে হবে 'বিশেষ তল' প্রস্তুত করার প্রণালীতে। এটি অবশ্য চরম উদাহরণ, যেখানে পাঁচটি পৃথক শ্রেণীই ব্যবহৃত হয়েছে। সাধারণতঃ 'ক্যাম্বিস-ঢাকা কাঠামো'র সাহায্যে দৃশ্যপট গড়ে তোলাই সমধিক প্রচলিত।

দৃশ্যপটগুলির ব্যবহারিক দিক থেকে, এদের পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। (ক) মঞ্চের পাটাতনের উপরে খাড়াইভাবে যে দৃশ্যপটগুলি দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের বলা হয় **লম্ব** বা 'ষ্ট্যাণ্ডিং ইউনিট'। (খ) উপর থেকে ঝুলিয়ে যে দৃশ্যপট ব্যবহৃত হয়, তাদের **আলম্ব** বা 'হ্যাঙ্গিং ইউনিট' বলে। (গ) ভারবহন বা সহনক্ষম দৃশ্যপটকে **ভারবাহী** বা 'বিল্ট্ ইউনিট' বলা হয়। (ঘ) পাটাতনের উপরে যে সব ছোট ছোট দৃশ্যপটের আনুষঙ্গিক অংশ সাজানো যেতে পারে, তারা পড়ে **ভূমিলগ্ন** বা 'সেট ইউনিট' শ্রেণীতে। (ঙ) পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ে **বনাত** বা 'ড্রেপারী'র অন্তর্ভুক্ত পর্দ্দাজাতীয় উপকরণগুলি। নীচে সাধারণ প্রচলিত বিভিন্ন দৃশ্যপটের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো :—

প্রথমে ধরা যাক **লম্ব** শ্রেণীভুক্ত [চিত্র ৪.১] দৃশ্যপটগুলির কথা। সাধারণতঃ ১২, ১৪ বা ১৬ ফুট উঁচু এবং ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি চওড়া ক্যাম্বিস-ঢাকা কাঠের কাঠামোকে বলা হয় **প্লেন ফ্ল্যাট**। এগুলি সাধারণতঃ সমতল দেয়ালের অংশ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়। দরজা বা জানালা ব্যবহার করার জন্য প্রয়োজনীয় ফাঁকযুক্ত ফ্ল্যাটও তৈরী করা হয়। তাদের ব্যবহার অনুযায়ী **ডোর ফ্ল্যাট** বা **উইণ্ডো ফ্ল্যাট** বলে। দেয়ালের ছোট অংশ বা খাঁজ বোঝানোর জন্য ১, ১½ বা ২ ফুটের সরু ফ্ল্যাটকে বলে **জগ**। অনেক সময় অনেকখানি বিস্তারযুক্ত সমতল দেয়াল দেখানোর জন্য একাধিক ফ্ল্যাট কব্জা দিয়ে জুড়ে নেওয়া হয়। ফ্ল্যাটের সংখ্যানুযায়ী এদের **টু-ফোল্ড, থ্রি-ফোল্ড** বা **ফোর-ফোল্ড** বলে। সচরাচর চারটির বেশী ফ্ল্যাট কব্জাবদ্ধ হয় না। দুটি ফ্ল্যাট যদি বিপরীত দিকে ভাঁজ হয়, অর্থাৎ পিঠোপিঠিভাবে, তখন তাদের বলা হয় **রিটার্ন**। উইণ্ডো বা ডোর ফ্ল্যাটের ফাঁকে সংযুক্ত করার উপযোগী পৃথক পাল্লা বা দরজা সম্বলিত চৌকাঠ তৈরী করা হয়। এদের **উইণ্ডো ফ্রেম ইউনিট** বা **ডোর ফ্রেম ইউনিট** বলে। অনুরূপভাবে অগ্নিস্থলীর জন্য **ফায়ার প্লেস ইউনিট**-ও তৈরী করা হয়। খিলানের আকারবিশিষ্ট খাঁজ এবং অপসারণযোগ্য প্রাচীর-ঘনত্ব বোঝানোর ব্যবস্থাযুক্ত ফ্ল্যাটকে **আর্চওয়ে** বলে। এদের প্রত্যেকটিকে লোহা বা কাঠের **ধারক** বা 'ব্রেসের' সাহায্যে পাটাতনের উপর লম্বভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়। মজবুত করার জন্য এবং জোড় মাথাগুলি নিখুঁতভাবে মেলানোর জন্য কাঠামোর পিছনে **ল্যাস-লাইন** বা দড়ি দিয়ে বাঁধার ব্যবস্থা থাকে।

আলম্ব শ্রেণীভুক্ত দৃশ্যপটের মধ্যে [চিত্র ৪.২] কাঠামোযুক্ত 'মূল, যবনিকা' বা **ড্রপ** অতি সুপরিচিত। পশ্চাৎপট হিসাবে আকাশী নীল রঙে রঞ্জিত করে এই জাতীয় ড্রপ **নভোপট** হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। ড্রপের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ **ঝালর** বা বর্ডার ব্যবহৃত হয় দৃষ্টিরেখাকে অনাবশ্যক উপরের দিকে প্রসারিত হওয়ার ব্যাপারে বাধা দিতে। শুধু ঘনরঙের পর্দা, নভোপটের সঙ্গে মিলিয়ে নীলরঙের কাপড়, অথবা ঝোলানো ডালপালা আঁকা নানাজাতীয় ঝালর ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন দৃশ্যপটের প্রয়োজনে। প্রাসাদ-কক্ষাদিতে খিলান-আঁকা বা ছাদ আঁকা ঝালরও ব্যবহৃত হয়। আধুনিক বাস্তবানুগ মঞ্চসজ্জায়, ঘরের ভিতরের দৃশ্য দেখানোর সময় ছাদের নিম্নাংশও দেখানো হয়ে থাকে আলম্ব শ্রেণীভুক্ত **সিলিং** দিয়ে। এগুলি 'প্লেন ফ্ল্যাট' বা 'টুফোল্ড' প্রথায় তৈরী করে, পাটাতনের সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থায় দৃশ্যপটের উপরে নামিয়ে আনা হয়। সিলিং-যুক্ত দৃশ্যপটে ঝালরের প্রয়োজন থাকে না।
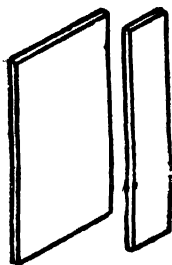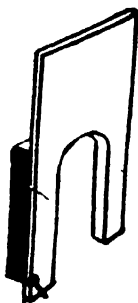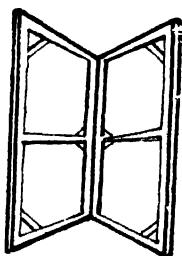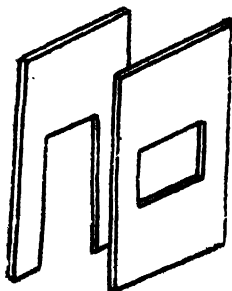
[চিত্র ৪.১] লম্বশ্রেণীভুক্ত দৃশ্যপট

বৃহদায়তন মঞ্চের ক্ষেত্রেই পিছনে স্থায়ী বা অপসারণযোগ্য

বলয়পট (সাইক্লোরামা) ব্যবহার করা যেতে পারে। একটি নিভাঁজ অবতল সাদা অথবা হাল্কা নীল রঙের পর্দা এই বলয়পটের উপকরণ। কাঠ বা ধাতুতে গড়া খাঁচার সাহায্যে এটি গঠিত হয় এবং পিছনে ঝুলিয়ে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণতঃ বহির্দৃশ্যে, আকাশের পশ্চাৎপট হিসাবে এর ব্যবহারের তুল্য বাস্তবানুগ পরিবেশন, অন্য কিছুতেই সম্ভব নয়।

[চিত্র ৪২] আলম্ব-শ্রেণীভুক্ত দৃশ্যপট
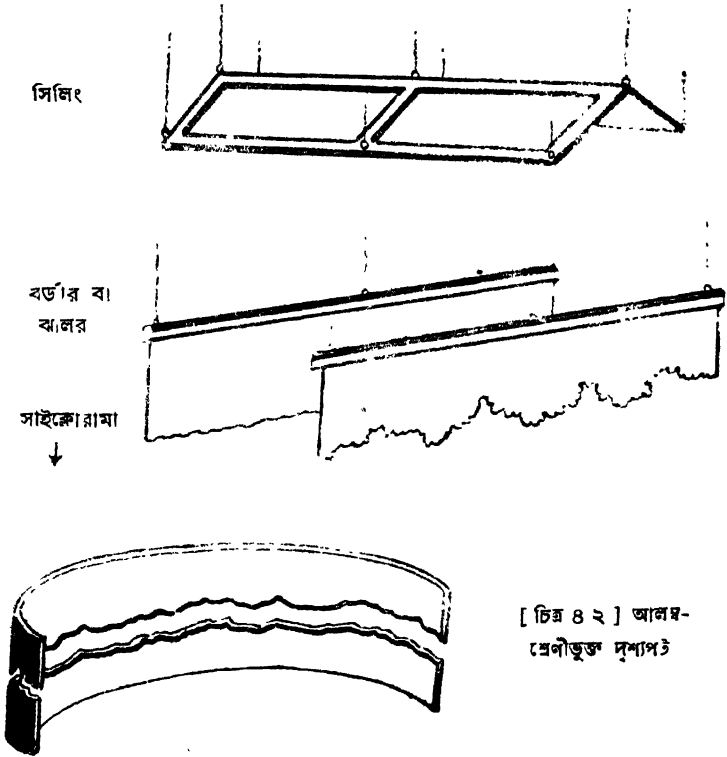
আলম্ব শ্রেণীভুক্ত সবকয়টি জিনিষই কড়িকাঠাম থেকে সেট-লাইনের সাহায্যে টেনে তোলা বা নামানো হয়ে থাকে। দৃশ্যপটের দৈর্ঘ্য ও ওজনের উপরে নির্ভর করে দুই, তিন বা তার চেয়েও বেশী সেট লাইন ব্যবহৃত হয়।

ভারবাহী শ্রেণীর দৃশ্যপটগুলি [চিত্র ৪.৩] ব্যবহারের উপযোগী মজবুত করে গড়ে তোলা হয়। মজবুত করার ফলে অন্যান্য শ্রেণীর দৃশ্যপটের তুলনায় এগুলি ভারী হতে বাধ্য। সহজে বহন করার জন্য তাই এগুলিকে খণ্ড খণ্ড-ভাবে তৈরী করা হয়। অল্প জায়গায় সহজে রাখার সুবিধার জন্য এগুলিকে ভাঁজ করে রাখার ব্যবস্থা করা দরকার।
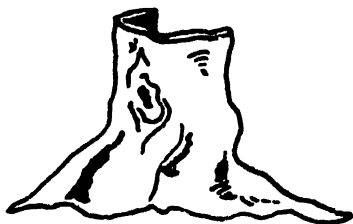
গাছের গুঁড়ি

বেদী বা 'প্ল্যাটফর্ম' এই
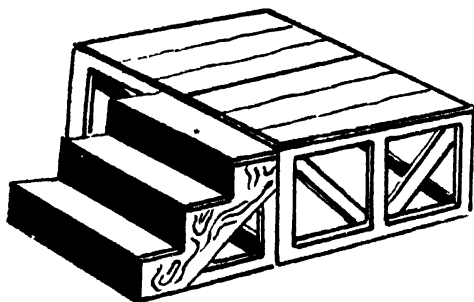
সিঁড়ির ধাপ বেদী
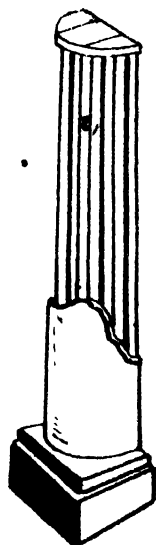
[চিত্র ৪.৩] ভারবাহী শ্রেণীভুক্ত দৃশ্যপট

পাথরের চাঙড় থাম

শ্রেণীর একটি সুপ্রচলিত উপকরণ। তিন বা চারধাপ যুক্ত **সিঁড়ী** মঞ্চে বিভিন্ন দৃশ্যপটে ব্যবহার করা হয়। গোল বা চারকোণা **থাম**, সত্যকার

গাছের গুঁড়ির অবিকল অনুকৃতি, বসার উপযোগী পাথরের বা মাটির **চাঙড়** বা **মাটির পাড়** প্রভৃতি নানাবিধ ভারবাহী শ্রেণার দৃশ্যপট বিভিন্ন প্রয়োজনে তৈরী ও ব্যবহার করার দরকার পড়ে।

ভূমিলগ্ন-শ্রেণীর দৃশ্যপটগুলিকে [চিত্র ৪.৪] অন্য দৃশ্যপটাদির সঙ্গে সংযুক্ত না করেও, এককভাবে পাটাতনের উপরে দাড় করানো যায়।
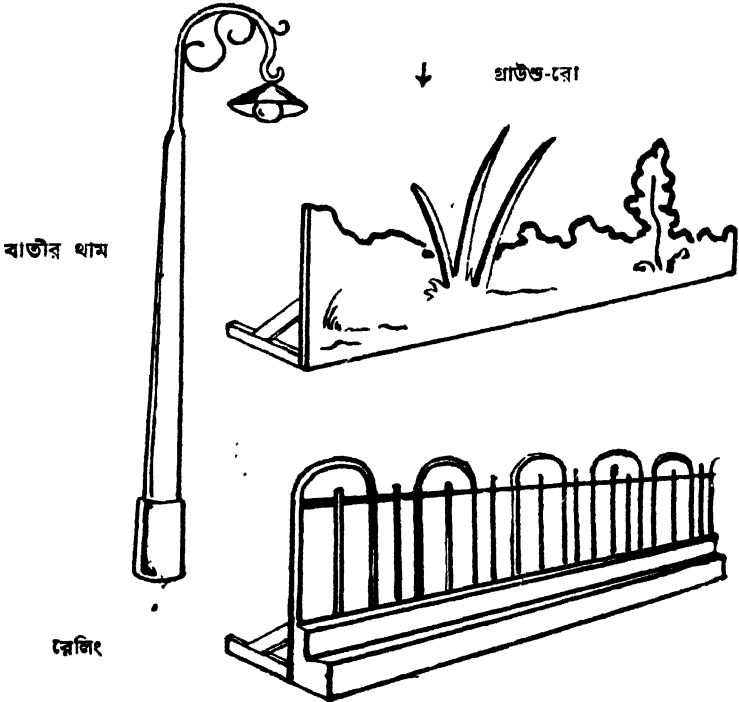
[চিত্র ৪.৪] ভূমিলগ্নশ্রেণীর দৃশ্যপট

ভূমি-পট (গ্রাউণ্ড-রো), বেড়া, **একক প্রাচীর** বা **প্রাচীরের অংশ** অথবা **কুটীর, পাতকুয়া,** রাস্তায় **বাতীর থাম** ইত্যাদি অগণিত ভূমিলগ্ন দৃশ্যপটের উদাহরণ দেওয়া যায়। এগুলি ভারবাহী শ্রেণীভুক্ত দৃশ্যপটের মতো ত্রিমাত্রিক নয়। বলা বাহুল্য, একটি দ্বিমাত্রিক থাম একক ব্যবহৃত হলে, ভূমিলগ্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হবে।

কাঠামো বিহিন শুধু কাপড়ে তৈরী **বনাত** শ্রেণীর উপকরণ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। বেশীরভাগ পর্দ্দাগুলিই এই শ্রেণীতে পড়ে।

সাধারণ ব্যবহৃত দৃশ্যপট, বিশেষতঃ ফ্ল্যাটগুলির সর্বাধিক প্রস্থ ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি রাখা হয়। দূরবর্ত্তী স্থানে বহন করার উপযোগী ট্রাকগুলি সাধারণতঃ ৬ ফুট চওড়ার থাকে। সুতরাং নির্দ্দেশানুযায়ী প্রস্থের জিনিষ-গুলি সহজে ঢোকানো যায় গাড়ীতে। তাছাড়া আচ্ছাদনের জন্য ব্যবহৃত সাধারণ কাপড় সচরাচর সর্বাধিক ২ গজ বহরের পাওয়া যায়। এক্ষেত্রেও উদ্বৃত্ত ৩ ইঞ্চি কাপড়, পিছনে মুড়ে পেরেকে আটকানোর সুবিধা হয়।

আভ্যন্তরীণ দৃশ্যাবলী

বিভিন্ন শ্রেণীর দৃশ্যপট ও উপকরণাদির সাহায্যে যত রকমের দৃশ্যসজ্জাই করা হোক, তাদের আমরা দুটি পৃথক শ্রেণীতে ফেলতে পারি। এক শ্রেণীর দৃশ্যসজ্জা যে কোনও ধরনের ঘরের ভিতরকার রূপ ফুটিয়ে তোলে। অপর শ্রেণী ফুটিয়ে তোলে বাইরের দৃশ্য। প্রথমে ঘরের ভিতরকার রূপ ফোটাবার ব্যবস্থা বা **আভ্যন্তরীণ দৃশ্যাবলী** সম্পর্কে আলোচনা করা যাক।

দুই বা ততোধিক দেয়াল ঘেরা, জানালা দরজা-যুক্ত, প্রয়োজনে থাম, খিলান ও সিঁড়ীর ধাপে অলঙ্কৃত ঘরের ভিতরকার হুবহু প্রতিকৃতি গড়ে তোলা যায় আভ্যন্তরীণ দৃশ্যের [চিত্র ৩.১] জন্য। কক্ষের উপরে সিলিং, প্রাচীরগাত্রে চিত্রাদি, আসবাবপত্র, সাজসরঞ্জাম ইত্যাদির ব্যবহারে আভ্যন্তরীণ দৃশ্য অলঙ্কৃত করে তোলা হয়। নিখুঁত একটি আভ্যন্তরীণ দৃশ্য, ধনীর প্রাসাদই হোক বা দরিদ্রের কুটীর হোক, মন্দির, মসজিদ, গীর্জ্জা বা দপ্তর, কারখানা, কয়লার খাদ যাই হোক না কেন, দর্শকের আসন থেকে বসে দেখতে দেখতে, এর গঠনকৌশল বোঝার উপায় থাকেনা। বাস্তবের সঙ্গে এর কদাচিত অমিল ঘটে।

অঙ্ক বা দৃশ্যান্তরে একটি দৃশ্যসজ্জার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন ঘটে প্রায় ইন্দ্রজালের মতো। ইন্দ্রজালের কৌশলটি অবশ্য আজ সবারই জানা। মঞ্চের ভিতর থেকে দৃশ্যপটের পিছনের দিকটি দেখলেই বোঝা যাবে, বিভিন্ন ফ্ল্যাটের সুসংযুক্তিতেই সবটা গড়ে উঠেছে। জোড় মাথাগুলি নিখুঁতভাবে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য কব্জা আটকানো 'টু-ফোল্ড' বা 'রিটার্ণ' ব্যবহার করা হয়েছে বহু কোণে। উভয় ফ্ল্যাটের ফাঁক ঢেকে দেওয়া হয়েছে **ডাচম্যান** নামের সরু ফিতে দিয়ে।

বহির্দৃশ্যাবলী

ঘরের বাইরে প্রকৃতির রাজ্য। সার্থক **বহির্দৃশ্যাবলী**তে প্রাকৃতিক দৃশ্যের অনুকৃতি ফুটিয়ে তোলা আভ্যন্তরীণ দৃশ্যাবলী রচনার মতো সহজসাধ্য নয়। আধুনিক মঞ্চসজ্জার উপকরণ

ও কৌশল অবলম্বনে, একমাত্র স্বল্পালোকিত অনুজ্জ্বল পটভূমিতেই সার্থক বহির্দৃশ্য রচনা সম্ভবপর। মধ্যাহ্নের প্রখর দিবালোকে উৎকৃষ্টতম প্রাকৃতিক দৃশ্যপটও অত্যন্ত খেলো ও নকল বলে ধরা পড়বেই।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের সবচেয়ে বড় অসুবিধার দিক, বিভিন্ন বস্তুর অসম বিন্যাস। সাধারণ একটি গাছেরই শাখা, প্রশাখা, পাতা-ফুলে মিলে সহস্রাধিক অংশ। ধানের খেত বা বাঁশ ঝাড়ের হুবহু নকল তৈরী করলেও বাস্তবের সঙ্গে তার বহুলাংশে পার্থক্য থেকে যাবেই।
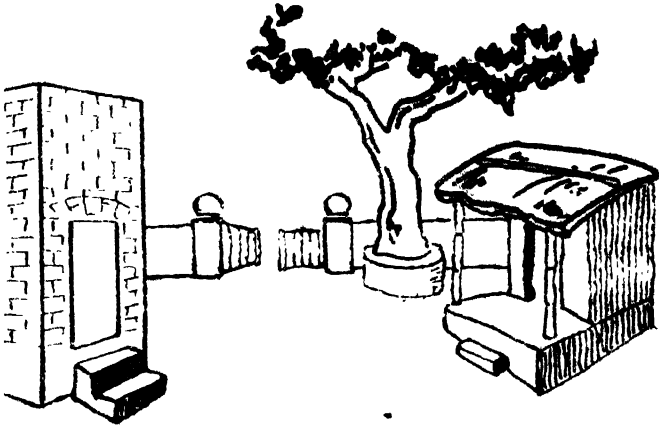
[চিত্র ৫.১] বহির্দৃশ্য

অভিজ্ঞ মঞ্চশিল্পী, এইসব কারণেই, প্রাকৃতিক বস্তুর সরলতম অংশ-টুকুই ব্যবহার করেন বহির্দৃশ্যাবলী [চিত্র ৫.১] রচনায়। গাছের নিম্নাংশটুকু [উপরের অংশ যেন ঝালরের পিছনে আড়াল পড়ে গেছে], ফুল বাগানের উপরিঅংশ [নীচের অংশ প্রাচীর, বেড়া বা ঝোপের আড়ালে ঢাকা], বহুদূরস্থিত জঙ্গল বা পর্বতমালা [বহুদূরে থাকার ফলে, উপরিভাগ প্রায় সমতল দেখায়] প্রভৃতি এইজাতীয় সরলতম অংশের উদাহরণ। এরসঙ্গে, সম্ভব হলেই, মানুষের তৈরী ঘরবাড়ী, গোলাঘর, প্রাচীর, বেড়া ইত্যাদি পূর্ণতঃ বা অংশবিশেষে এমনভাবে ব্যবহার করা হয়, যেন দর্শকের দৃষ্টি বিশেষভাবে ঐগুলির প্রতি আকৃষ্ট থেকে যায়; প্রাকৃতিক বস্তুগুলি নিখুঁতভাবে পরীক্ষা করার অবকাশ

পায় না। সবার উপরে, চাঁদনী রাত, গোধুলি, প্রত্যুষ বা অন্ধকার রাত্রি প্রভৃতি এমনই সময় বেছে নেওয়া হয়, যখন আলোর প্রাখর্য্য থাকে খুবই কম।

বলয়পট কাব্যধর্মী, নৃত্যগীতমূলক অথবা ক্ল্যাশিক-পর্য্যায়ভুক্ত নাটকাবলী আভ্যন্তরীণ দৃশ্য বা বহির্দৃশ্য-নির্বিশেষে 'সাইক্লোরোমা' বা **বলয়পট**-এর সম্মুখে অভিনীত হতে পারে। বলয়পট ব্যবস্থায় [চিত্র ৫.২] দুই পাশ ও উপরের দিকে দৃষ্টিরেখাকে বাধাদানের জন্য একটি চৌকা খিলান-শ্রেণীর **আড়াল** বা **'মাস্ক'** ব্যবহৃত হয়। অনেক সময় বলয়পটের সামনে 'ভারবাহী' বা 'ভূমিলগ্ন' শ্রেণীর দৃশ্যপট ও উপকরণাদি ব্যবহার করে, এর ফাঁকা-ভাবটি কাটানো হয়ে থাকে। বলয়পটের উপর উপযুক্ত দীপচিত্রণের সাহায্যে সুন্দর **নভোপট** সৃষ্টি করা যায়। যে কোনও দৃশ্য এই বলয়পটে প্রক্ষেপিত হলে, অবতলপৃষ্ঠের জন্য অনেক বেশী স্বাভাবিক মনে হয়—সচরাচর দেখা দিগ্বলয়ের ভাব ফুটে ওঠে।
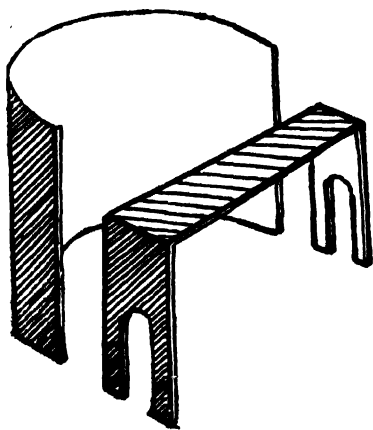
[চিত্র ৫.২] বলয়পটের পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থা

জার্মানীতে প্রথম ব্যবহৃত কংক্রীট প্ল্যাষ্টারে ঢালাই করা **গম্বুজ** বা 'ডোম', বলয়পটেরই একটি উন্নততর সংস্করণ। গম্বুজের উপরিভাগও সাপের ফণার মতো [চিত্র ৫.৩] উপরের দিক ঢেকে রাখে। হাল্কা নীল রঙে রঞ্জিত এই গম্বুজের সাহায্যে দেখানো নভোপট নিঃসন্দেহে সর্বোৎকৃষ্ট। কিন্তু প্রয়োজনে গম্বুজ, তুলে রাখা যায়না। এটিকে মঞ্চের একটি অনপসারণযোগ্য অংশ হিসাবে তৈরী করতে হয়।
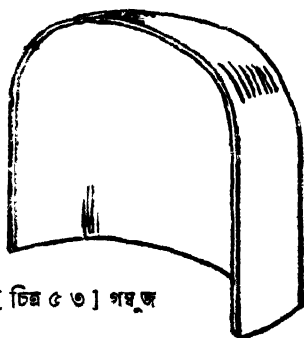
[চিত্র ৫.৩] গম্বুজ

সেদিক থেকে বলয়পট অথবা সাধারণ বনাতের পশ্চাৎপট অনেক বেশী সুবিধাজনক।

একক দৃশ্যসজ্জা

দৃশ্যসজ্জার একটি বিশেষ আয়োজনকেই, অংশত: অথবা পূর্ণত: অদলবদল করে যদি বিভিন্ন দৃশ্যে ব্যবহার করা হয়, তবে সেই আয়োজনকে **একক দৃশ্যসজ্জা** বা 'ইউনিট সেট' বলে।

সাধারণত: দুই উপায়ে একক দৃশ্যসজ্জার পরিবর্ত্তন ঘটানো হয়।

এক শ্রেণীর একক দৃশ্যসজ্জায় একটি স্থায়ী কাঠামো নাটকের সুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দাঁড় করানো থাকে। এই স্থায়ী কাঠামো দিয়ে কোনো দেয়ালের অংশ, মাটির পাড় বা পাথরের চাঙড় ইত্যাদি বোঝানো হয়। বিভিন্ন দৃশ্যে, এই কাঠামোর সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের খিলান, জানালা বা দরজার কাঠামো, বিশেষ ধরনের খাঁজ ইত্যাদি জুড়ে, স্থানের পরিবর্ত্তন বোঝানোর ব্যবস্থা থাকে।

আর একজাতীয় একক দৃশ্যসজ্জায়, একটি দৃশ্যে ব্যবহৃত একক দৃশ্যসজ্জার উপকরণগুলিকেই ভিন্ন ধারায় সাজিয়ে, দৃশ্যান্তর বোঝানোর ব্যবস্থা করা হয়। সেক্সপীরীয় নাটকাবলীর পরিবেশনে এই ধরনের একক দৃশ্যসজ্জার ব্যবহার সুপ্রচলিত। দৃশ্যসজ্জার পরিকল্পনা বদল করেই, একটি কক্ষকে অন্য কক্ষে, বা আভ্যন্তরীণ দৃশ্যকে বহির্দৃশ্যে অনায়াসে পরিবর্তিত করা যায়।

দৃষ্টিরেখা

প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের চোখ ও মঞ্চে অবস্থিত দৃশ্যপট সংযোগকারী কল্পিত রেখাকে **দৃষ্টিরেখা** বলে। দৃশ্যসজ্জায় ব্যবহৃত উপকরণগুলিকে দৃষ্টিরেখার সীমানার মধ্যে রাখা, দৃশ্য-পরিকল্পনার প্রধান লক্ষণীয় বিষয়।

কোনও দৃশ্যসজ্জার প্রতিটি অংশ যদি মঞ্চমুখের ভিতর দিয়ে প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেক দর্শকের চোখে পড়ে, তবে সেই দৃশ্যসজ্জা সুপরিকল্পিত দৃষ্টিরেখার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে বলা যেতে পারে। দৃশ্যসজ্জার পুরো আদলটি, যেন প্রেক্ষাগৃহের নীচের তলা ও দোতলার প্রথম ও শেষ সারির প্রান্তবর্ত্তী আসনগুলি থেকেও [চিত্র ৬] ভালোভাবে চেনা যায়। বলা বাহুল্য, প্রান্তবর্ত্তী আসন থেকে ভালোভাবে দেখা গেলে, কেন্দ্রবর্ত্তী আসনগুলি থেকে আরও ভালোভাবে দেখা যাবেই।

দৃষ্টিরেখার ভূমিচিত্রে [চিত্র ৬.১] ক ও খ সামনের সারির দুই প্রান্তবর্তী দর্শক। ম এবং র্ম মঞ্চমুখের ভিতরের দুই সীমা। দৃশ্যসজ্জার ভূমিচিত্রটি যদি কম এবং খর্ম রেখার বর্দ্ধিতাংশের মধ্যে পরিকল্পিত হয়, তবে সে দৃশ্যসজ্জার প্রতিটি অংশ সমগ্র দর্শকের দৃষ্টিরেখার মধ্যেই রইবে। এক্ষেত্রে উল্লেখ রাখা যেতে পারে যে, প্রেক্ষাগৃহের আসনগুলিও কম ও খর্ম রেখার ক ও খ প্রান্তে যথাক্রমে র্ক ও র্খ পর্য্যন্ত বর্দ্ধিতাংশের দ্বারা যেন সীমাবদ্ধ হয়। প্রেক্ষাগৃহের দোতলায় (ব্যালবনিতে) যদি দর্শকের আসন থাকে, তবে সেই আসনগুলিও পূর্ব নির্ধারিত দৃষ্টিরেখার দ্বারা সীমাবদ্ধ রেখে সংস্থাপিত হওয়া উচিত।
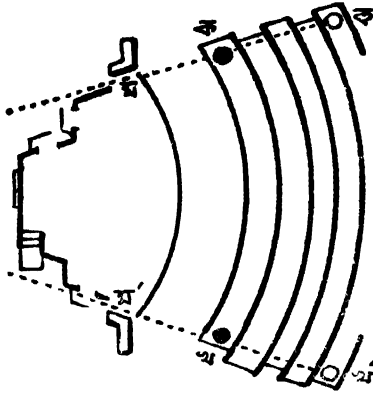
[চিত্র ৬.১] দৃষ্টিরেখার ভূমিচিত্র

দৃষ্টিরেখার প্রস্থচ্ছেদ চিত্রে [চিত্র ৬.২] 'অ' সামনের সারির কেন্দ্রবর্তী দর্শক। যদি ব্যালকনি ব্যবস্থা না থাকে, তবে পশ্চাৎপটের
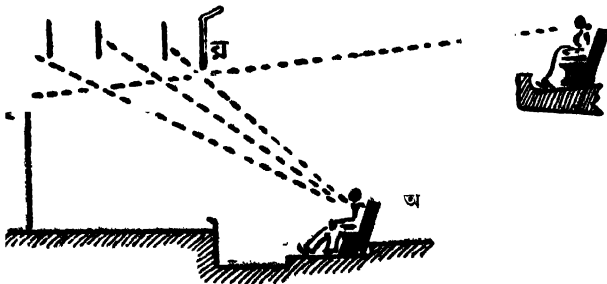
[চিত্র ৬.২] দৃষ্টিরেখার প্রস্থচ্ছেদ চিত্র

সর্ব্বোচ্চ উচ্চতা পাটাতন থেকে র্দৃ পর্য্যন্ত হতে পারবে। কিন্তু ব্যালকনি থাকলে ঐ উচ্চতা দৃ-এর উপরে তোলা উচিত হবে না। অনুরূপভাবে পিছনের সারির আসনগুলি থেকেও দৃষ্টিরেখা বিচার করা দরকার।

সার্থক দৃষ্টিরেখার পরিকল্পনায়, মঞ্চের সমস্ত খুঁটিনাটি প্রেক্ষাগৃহের সমগ্র দর্শককে দেখানোই শুধু সমস্যা নয়—মঞ্চের অপ্রয়োজনীয় অংশ দর্শকের দৃষ্টিরেখা থেকে আড়ালে রাখাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। পার্শ্বপট, ঝালর, মুক্ত দরজা জানালা বা খিলানের পিছনে **আড়াল** বা 'ব্যাকিং'য়ের ব্যবহার প্রভৃতির সাহায্যে রঙ্গপীঠের উভয় পার্শ্বের, উপরের এবং পিছনের অপ্রয়োজনীয় অংশ ঢেকে রাখা দরকার।

নিম্নরঙ্গের উপরি-অংশে ঝালর বা সিলিং ব্যবহার করার সময় ঝরি তথা অন্যান্য আলোক-সরঞ্জামের কথা মনে রাখা উচিত। **মুখপট** বা 'টীজার' অপেক্ষাকৃত বেশী নীচে নামিয়ে আলোকসম্পাতের সরঞ্জাম ঢাকার দরকার পড়ে। মুখপটের নিম্নপ্রান্ত পাটাতন থেকে যত উঁচুতে রাখা হবে, দৃশ্যপটের উচ্চতা তার চেয়ে কমপক্ষে দেড় থেকে তিনফুট বেশী হওয়া উচিত। নচেৎ, অপেক্ষাকৃত উঁচুতে ঝোলানো ঝালর দিয়ে দৃশ্যপটের অসম্পূর্ণ উপরিভাগ ঢাকা যাবে না।

বহির্দৃশ্য রচনার সময় মঞ্চশিল্পী ঘরের দেয়াল বা সিলিং জাতীয় স্বাভাবিক আড়াল ব্যবহার করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। বহির্দৃশ্যটি যদি রাজপথ, বাড়ীর কাছাকাছি বাগান বা উঠান প্রভৃতি হয়, তবে ঘরের বাইরেকার দেয়াল ব্যবহারের কিছুটা সুযোগ থাকে; এবং ফ্লাই আড়াল দেওয়ার সমস্যা অনেকখানি কমে আসে। কিন্তু প্রান্তর, অরণ্য বা পর্বতশঙ্কুল প্রদেশ ইত্যাদির মতো বহির্দৃশ্য হলে, প্রাচীর জাতীয় আড়াল ব্যবহারের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। সুযোগ ও সুবিধা যদি থাকে, বলয়পটের ব্যবহার এক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী। গম্বুজ ব্যবহৃত হলে ফ্লাই আড়াল দেওয়ার সমস্যাও থাকে না। কিন্তু স্থানাভাব এবং সামর্থাভাবের দৃষ্টান্তই বেশী। সুতরাং মঞ্চশিল্পীকে সেক্ষেত্রে খানিকটা কল্পনাশক্তির উপরে নির্ভর করে, মানানসই আড়ালের পরিকল্পনা করে নিতে হবে। পরস্পর সংলগ্ন কয়েকটি গাছের গুঁড়ি, পাহাড়ের খাড়া অংশ, ঝোপ জঙ্গল বা মাটির বাঁধ জাতীয় দৃশ্যপট ব্যবহার করা যেতে পারে, পার্শ্বরঙ্গের অপ্রয়োজনীয় অংশ ঢেকে রাখার জন্য। ফ্লাইয়ের অপ্রয়োজনীয় অংশ ঢাকার জন্য, পাতার গুচ্ছাকৃতি ঝালর (ফলিয়েজ) ব্যবহার করা যেতে পারে।

অভিজ্ঞতার ফলে দেখা যাবে, দীপচিত্রণের সুপ্রয়োগে এই আড়াল দেওয়ার কাজটি সবচেয়ে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হতে পারে। প্রয়োজনীয় দৃশ্যাংশটুকু ছাড়া বাকী অংশ অনালোকিত রাখাই প্রকৃষ্ট পন্থা।

চার পরিকল্পনার প্রয়োগবিধি

নক্সা

শিল্পীর মনশ্চক্ষে প্রথম পরিকল্পনা রূপ নেয় **নক্সা** বা 'স্কেচ' আকারে। প্রেক্ষাগৃহের কেন্দ্রস্থল থেকে মঞ্চমুখের ভিতর দিয়ে, পরিকল্পিত দৃশ্যসজ্জা যেমন দেখাবে, তারই প্রতিকৃতি পেনসিল বা কালিতে এঁকে নিলেই, সেটি হবে ঐ দৃশ্যসজ্জার 'নক্সা'। প্রয়োজনে এটির গায় পরিকল্পনানুযায়ী রঙ লাগানো যেতে পারে।

নক্সা তৈরী করাব বিষয়ে কয়েকটি প্রাথমিক ইঙ্গিত দেওয়া হচ্ছে। নক্সায় কি দেওয়া যাবে না যাবে, তার একটি সাধারণ ধারণা জন্মাবে এই ইঙ্গিতগুলি থেকে।

মঞ্চমুখের সীমারেখা নক্সার চতুঃসীমা হিসাবে ধরে নিতে হয়। এই চতুঃসীমার মধ্যে, পরিকল্পিত দৃশ্যপটটি কি রকম দেখাবে, তারই ছবি আঁকতে হবে। প্রথমেই বলা হয়েছে, কল্পনা করার সময়, শিল্পী নিজেকে প্রেক্ষাগৃহের (নীচের তলার) মধ্যবর্তী আসনে উপবিষ্ট বলে যেন ভেবে নেন।

[চিত্র ৭.১] দৃশ্যপটের নক্সা

একটি বাস্তবধর্মী আভ্যন্তরীণ দৃশ্যের উদাহরণ, একটি ড্রইংরুম-দৃশ্যপটের কথা ধরা যাক [চিত্র ৭.১]। প্রেক্ষাগৃহের মধ্যবর্তী আসন থেকে, আসন-শ্রেণীর সঙ্গে সমান্তরভাবে অবস্থিত দেয়ালগুলি পূর্ণভাবে দেখা যাবে—দুপাশের দেয়াল পরিপ্রেক্ষিতে স্বল্পস্থান জুড়ে রইবে। পাটাতন তার নিজস্ব গভীরতার

তুলনায় স্বল্পগভীর মনে হবে। সিলিং দেখাই যাবে না। [সিলিং যদি উর্দ্ধরঙ্গের দিকে ক্রমশঃ নিম্নমুখীভাবে তৈরী করা হয়, তবেই তা পিছনের আসনসারি থেকে দেখা যেতে পারে। নচেৎ সামনের দু'তিন সারির দর্শক ছাড়া, সিলিং কারও নজরে পড়ে না।]

দৃশ্যপটে আসবাবপত্রের পরিকল্পনাও নক্সায় দেখাতে পারলে কাজের সুবিধা হয়। এমন কি বিশেষ নাটকীয় মুহূর্ত্তে অভিনেতাদের বিশেষ অবস্থানগুলি পরিকল্পিত দৃশ্যসজ্জার পটভূমিতে কেমন দেখাবে, তারও আভাস নক্সায় দেওয়া চলে। বলা বাহুল্য, পরিপ্রেক্ষিত চিত্রের ধর্ম অনুযায়ী নক্সা-অঙ্কনে কোনো বাঁধা **স্কেল** ব্যবহৃত হয় না। অনুপাত বজায় রেখে চিত্রটি অঙ্কিত হওয়া দরকার।

ভূমিচিত্র

মনশ্চক্ষে দেখা পরিকল্পিত দৃশ্যপটের চিত্রটি 'নক্সায়' রূপান্তরিত হওয়ার পরে, মঞ্চশিল্পীকে পরবর্ত্তী যে প্রধান কাজটি করতে হবে, সেটি হচ্ছে নক্সার অনুসরণে **ভূমিচিত্র** বা 'ফ্লোর প্ল্যান' [চিত্র ৭.২] তৈরী করা। দেয়াল, দরজা জানালা, বেদী,
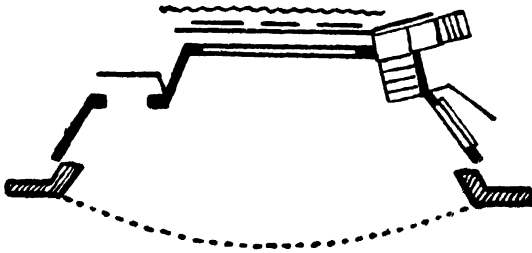
[চিত্র ৭.২] দৃশ্যপটের ভূমিচিত্র

সিঁড়ি প্রভৃতি, দৃশ্যপটের প্রয়োজনে ব্যবহৃত বস্তুগুলির সঠিক অবস্থান পাওয়া যাবে এই ভূমিচিত্র থেকে। কয়েকটি রেখার দ্বারা এই চিত্র আঁকা যায়। ফ্লাই-এর কেন্দ্রবিন্দু থেকে যদি পরিকল্পিত দৃশ্যপটগুলিকে দেখা যায়, তবে তাদের কতকটা এই ভূমিচিত্রের অনুরূপ দেখা যাবে।

ভূমিচিত্র অবশ্যই একটি নির্দ্দিষ্ট 'স্কেলে' আঁকা উচিত। শুধু দেয়াল দরজা-জানালা প্রভৃতি দিলেই চলবে না ; সেই সঙ্গে প্রধান আনুষঙ্গাদি এবং দর্শকের আসন থেকে দেখা যায় না, এমন সব বিশেষ বিষয়গুলিও ভূমিচিত্রে দিতে হবে। [সিঁড়ি দিয়ে উঠে কিভাবে পিছনে বেরোতে হবে,

অথবা দরজা খোলা থাকলে, পিছনের অপ্রয়োজনীয় অংশ কিভাবে আড়াল দেওয়া হবে, ইত্যাদি অনেক বিষয়ই দর্শকের আসন থেকে দেখতে পাওয়ার কথা নয়—সুতরাং নক্সায় এদের স্থান নেই] মঞ্চমুখের ব্যাপ্তি, এবং পার্শ্বপটগুলি ব্যবহৃত হলে তাদের অবস্থানও ভূমিচিত্রে দেখানো দরকার।

অনেকসময় মঞ্চশিল্পী প্রথমে একটি খসড়া ভূমিচিত্র তৈরী করে, তারপর নক্সায় হাত দেন। এর দ্বারা নক্সার সম্ভাব্যতা সন্দেহাতীত হয়ে ওঠে।

প্রতিরূপ

নক্সার পরিকল্পনা ও ভূমিচিত্রের পরিমাপ অনুসরণে, ভাবী দৃশ্যপটের একটি ক্ষুদ্রায়তন **প্রতিরূপ** বা 'মডেল' গড়ে নিলে গঠনের কাজে সুবিধা হয়; মারাত্মক কোনো ত্রুটি থাকলে, তা এই পর্য্যায়ে ধরা পড়ে। তাছাড়া, ব্যয়সাপেক্ষ সমগ্র পরিকল্পনাটি শেষ করার আগে, পরিচালকের পক্ষে ভাবী দৃশ্যপটের চেহারা পরীক্ষা করার এই সুযোগটি কম মূল্যবান নয়। গঠন পর্বে সূত্রধরকে পরিকল্পনাটি বোঝানোর

[চিত্র ৭.৩) দৃশ্যপটের প্রতিরূপ
[দেখানোর সুবিধার জন্য খণ্ড খণ্ড করে আঁকা হয়েছে]

জন্য, অথবা মহলার প্রাথমিক পর্বে অভিনয় সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সদস্যদের কাছে পরিকল্পনার চিত্রটি ফোটানোর জন্য প্রতিরূপের মূল্য অপরিসীম।

হাল্কা কাগজের বোর্ড বা টুপীস প্লাইউড দিয়ে প্রতিরূপ তৈরী করা হয় [চিত্র ৭.৩]। ভূমিচিত্রের মতো প্রতিরূপ গঠনে একটি নির্দিষ্ট স্কেল ব্যবহার করা দরকার। সাধারণতঃ ¼"=১ ফুট বা ½"=১ ফুট এই দুটি

স্কেল বেশী ব্যবহৃত হয়। আঠা দিয়ে জোড়ার সময়, আঁঠা লাগানো কাগজের ফিতে বা বড় মাথাওলা পিতলের বোর্ড পিন ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যাবে।

সাধারণতঃ, প্রতিরূপ গঠনের সময়, যাবতীয় চিত্রণ ও অলঙ্করণের পর দেয়ালগুলি জোড়া হয়। [ক্ষুদ্রায়তন প্রতিরূপে হাত ঢুকিয়ে পরে কিছু নিখুঁতভাবে আঁকা বা জোড়া কষ্টকর]। সাধারণ জলরঙেই চিত্রায়ণের ভালো কাজ করা যায়। ভাঁজ করা কাগজে তৈরী আসবাব দিয়ে প্রতিরূপটিকে পরে সাজিয়ে নেওয়া চলে।

প্রতিরূপ গঠনের যাবতীয় কাজের পর একই স্কেলে মঞ্চমুখের একটি আদল কেটে সামনে দাঁড় করিয়ে দিলে, নক্সার সঙ্গে মিলিয়ে এর ত্রুটি-

[চিত্র ৭.৪] দৃশ্যপটের গঠন-নির্দ্দেশিকা

বিচ্যুতি দেখার পক্ষে সুবিধা হবে। বহির্দৃশ্যের ক্ষেত্রে পিছনে একটি বলয়পটের প্রতিরূপও যোগ করা যেতে পারে।

গঠন নির্দ্দেশিকা

দৃশ্যপটের বিভিন্ন অংশ এবং আনুষঙ্গিকগুলি কিভাবে তৈরী করা হবে, তার নিখুঁত এবং নির্ভুল নির্দ্দেশ এঁকে **গঠন নির্দ্দেশিকা** বা 'ওয়ার্কিং ড্রইং' তৈরী করা, এই পর্য্যায়ের শেষ এবং চরম পর্ব। কোনো বস্তু গঠনের উপায় সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দেওয়ার এটিই সরলতম পন্থা [চিত্র ৭.৪]।

পরিপ্রেক্ষিতে আঁকা নক্সায় দৃশ্যপটের ত্রিমাত্রিক-চিত্র পাওয়া যায়। গঠন নির্দ্দেশিকায় দিতে হবে বস্তুটির সম্মুখ বা পার্শ্বচিত্র—যে দিক থেকে বিষয়টির গঠনবিন্যাস সম্যক বোঝা যাবে। প্রয়োজন হলে, সম্মুখ চিত্র, পার্শ্বচিত্র, ঊর্দ্ধচিত্র তথা ভূমিচিত্র, পশ্চাৎচিত্র এবং ভিতরে বিশেষ কোনো

কৌশল থাকলে প্রস্থচ্ছেদ বা দৈর্ঘ্যচ্ছেদ [ক্রশ সেকশান] চিত্রও দিতে হবে গঠন-নির্দ্দেশিকায় [চিত্র ৭.৪ / ক. খ. গ. ঘ দ্রষ্টব্য] । তবে সব সময় এতগুলি বিষয়ের দরকার হয় না ; বিশেষ জ্ঞাতব্য নির্দ্দেশটুকু দিলেই চলে । এই বিশেষ জ্ঞাতব্যের তালিকায় নীচের বিষয়গুলি থাকা উচিত :—

(ক) সমগ্র বস্তুর আকৃতি ও পরিমাপ ;

(খ) বিভিন্ন অংশের আকৃতি ও পরিমাপ ;

(গ) বিভিন্ন অংশের সংযোগসাধন প্রণালী ; এবং

(ঘ) গঠনের উপাদান ।

গঠন নির্দ্দেশিকা প্রস্তুত করার সময় কয়েকটি প্রচলিত ধারা মেনে চলতে হয় । সেগুলি নীচে তালিকাক্রমে বর্ণিত হলো :—

(১) একই বস্তুর একাধিক চিত্র দিতে হলে, সেগুলির পরিচিতি যেন দেওয়া হয় ।

(২) স্কেলের পরিমাণ যত বড় হবে, ক্ষুদ্র অংশগুলি তত পরিষ্কার বোঝানো যাবে । সাধারণতঃ ১/২"=১ ফুট স্কেল গঠন নির্দ্দেশিকা অঙ্কনে বেশী ব্যবহৃত হয় । তবে ছোট ছোট অংশে বিশেষ কাজ থাকলে, সেগুলিকে পৃথকভাবে ১"=১' বা ১১/২"=১' স্কেলে আঁকা উচিত ।

(৩) ঘনত্ববোধক রেখা যেন গঠন-নির্দ্দেশক রেখার চেয়ে হাল্কা হয় । কোনো স্থানেই যেন ঘনত্ববোধক রেখা গঠন নির্দ্দেশক রেখাকে স্পর্শ না করে ।

(৪) প্রত্যেক দূরত্বার পরিমাণ পাশে পাশে লিখে রাখা উচিত ।

(৫) স্কেলের পরিমাণ যেন নির্দ্দেশিকায় উল্লিখিত হয় । একাধিক মাপের স্কেল ব্যবহৃত হলে, কোন চিত্রের জন্য কোন স্কেল ব্যবহার করা হয়েছে, পরিষ্কারভাবে যেন তার উল্লেখ থাকে ।

(৬) সংযোজনের ক্রম অনুসারে চিত্রগুলি কাগজের উপরে সাজানো উচিত ।

(৭) বড় হাতের অক্ষরে পরিচিতিগুলি লিখিত হলে পড়ার সুবিধা হয় । লম্বভাবে কিছু লেখার প্রয়োজ[illegible]লে, নীচে থেকে উপরের দিকে

লেখাই রীতি।* প্রত্যেকটি অংশের একটি নাম দিয়ে রাখলে, কাজের সুবিধা হবে [৭.৪ নং চিত্রে ইংরাজী হরফের ব্যবহার দ্রষ্টব্য]।

(৮) গঠন নির্দ্দেশিকা রেখাগুলি যেন গভীর এবং স্পষ্ট হয়।

(৯) ছেদচিত্রের পার্শ্বদেশগুলি তীর্য্যক হাল্কা রেখা দিয়ে ভরে দেওয়া উচিত [চিত্র ৭.৪-গ]।

(১০) গঠন নির্দ্দেশিকার পত্রটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। সামান্য আঁচড় বা দাগের ফলে পরিমাপের বিরাট পার্থক্য ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

গঠন নির্দ্দেশিকার চিত্রগুলি আঁকার পর, কাঠ, কাপড়, লোহার সরঞ্জামাদি প্রয়োজনীয় জিনিষ সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য ও নির্দেশ লিখিতভাবে দাখিল করতে হবে। গঠন কৌশল সম্পর্কে বিশেষ বক্তব্য থাকলে, সেটিও ঐ সঙ্গে মন্তব্য হিসাবে যুক্ত হতে পারে।

* 'উপর থেকে নীচের দিকে লেখা' দ্রুত পড়ার পক্ষে অসুবিধাজনক। ৭.৪ নং চিত্রে বামের তিনটি ড্রইংয়ে উপর থেকে নীচে, এবং ডাইনের দুটি ড্রইংয়ে নীচে থেকে উপরের দিকে লেখার নমুনা দেওয়া হয়েছে। তুলনা করলেই সুবিধা-অসুবিধার দিকটি ধরা পড়বে।

পাঁচ গঠন পর্ব

প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম

দৃশ্যপট গঠনের শতকরা ৭৫ ভাগ কাজ সূত্রধরের, অবশিষ্টাংশ চিত্রকরের। চিত্রকরের করণীয় অংশ চিত্রায়ণ-শীর্ষক পৃথক পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হয়েছে। গঠনপর্বে তাই সূত্রধরের সরঞ্জামের কথাই বলা হচ্ছে। রঙ্গমঞ্চ সংলগ্ন একটি কারখানায় এইসব যন্ত্রপাতি প্রস্তুত রাখা দরকার।

বিবিধ প্রয়োজনে বিভিন্ন আকারের ভিন্ন ভিন্ন কাজের উপযোগী যন্ত্রপাতি লাগে। নীচের তালিকায় অত্যাবশ্যকীয় কয়েকটি সরঞ্জামের পরিচয় দেওয়া হলো, দৃশ্যপট গঠনে যেগুলির ব্যবহার অপরিহার্য :—

১। কমপক্ষে ১২ আউন্স ওজনের একটি **হাতুড়ি**।

২। বিভিন্ন কাজের উপযোগী **করাত** [কাঠের আঁশ ভেদ করে কাটার জন্য 'ক্রশ কাট' করাত, আঁশ বরাবর কাটার জন্য 'রিপ' করাত এবং বক্ররেখায় কাটার জন্য 'কম্পাস' করাত ব্যবহৃত হয়]।

৩। একটি **রেঁদা** [কমপক্ষে ২" ফলাবিশিষ্ট হওয়া দরকার]।

৪। বড় ও ছোট **স্ক্রু-ড্রাইভার**।

৫। বিভিন্ন আকারের **বাটালী** কয়েকটি [প্রয়োজনীয় আকার হলো ১/৪", ১/২", ৩/৪" এবং ১"—তাছাড়া 'গোবে' বা বাঁকা বাঁটালী একটি থাকা দরকার।]

৬। বিভিন্ন আকারের ফলাসহ একটি **তুরপূণ** [১/৮" এবং ৩/১৬ ইঞ্চি ফলা বিশেষ দরকারী।]

৭। কয়েকটি ভিন্ন ব্যাসের ছিদ্র করার উপযোগী **আগড়** [৩/৮", ১/২" এবং ১" ব্যাসের আগড়গুলি বেশী ব্যবহৃত হয়।]

৮। দাগ দেওয়ার উপযোগী ছুরী অথবা **কুরুসুৎ**।

৯। সরু ও মোটা উভয় প্রকারের **উখা**।

১০। সাঁড়াশী বা **প্লায়ার্স**।

১১। এক সেট সমকোণী বা **স্কোয়ার**।

১২। একটি কাঠ বা ধাতুর **মাটাম** বা **মিটার বক্স**।

১৩। ভাঁজ করা যায় এমন একটি কাঠের **রুলকাঠি** [কমপক্ষে ৩ ফুট দীর্ঘ হওয়া উচিত]।

১৪। কাঁটার মাথা ভাঙার বা ঠুকে বসিয়ে দেওয়ার জন্য লোহার **ব্রাডুল** গোটা দুয়েক।

১৫। একটি ছোট **ভাইস**-লাগানো বেঞ্চ।

নিখুঁত কাজ দ্রুতগতিতে সম্পন্ন করার জন্য বিশেষ করে ফ্ল্যাটের কাঠামো তৈরীর কাজে, একটি **টেমপ্লেট**-এর সাহায্য পাওয়া অনেকখানি লাভজনক। 'টেমপ্লেট' একটি কোমর বরাবর উঁচু মজবুত বেঞ্চের কাঠামো [চিত্র ৮] যার প্রস্থ ৫'-৯" এবং দৈর্ঘ্য ১২ ফুট থেকে ১৬ ফুটের মধ্যে। বেঞ্চের চতুঃসীমায় শুধু সমতলভাবে ৪" অথবা ৬" চওড়ার সরু তক্তা লাগানো থাকে। বেঞ্চটির তিনদিকে মজবুত তক্তার সাহায্যে ১/৪" উঁচু খাঁজ তুলে নিতে হয়। টেমপ্লেটের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড় ফ্ল্যাটও যাতে সমানভাবে খাটানো যায়, সেইজন্যই একদিকে উঁচু খাঁজ থাকে না।
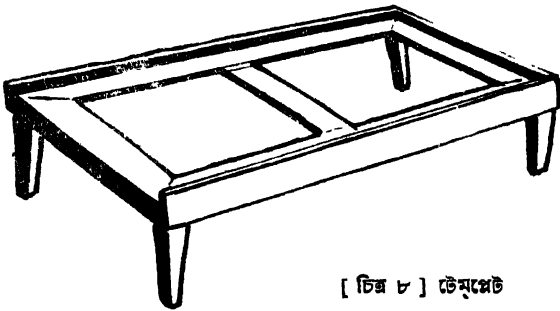
[চিত্র ৮] টেমপ্লেট

টেমপ্লেটের গঠনে যদি খুঁত না থাকে, তবে ফ্ল্যাটের কাঠামোর জন্য কাঠ মাপা বা সোজা করা, অথবা কাঠামো লাগানোর ব্যাপারে বারবার মাপজোপ করা বা মাটাম ব্যবহারের দরকার হয় না। সাজানো কাঠামোটি টেমপ্লেটের খাঁজে খাঁজে সমানভাবে আটকে গেলেই বুঝতে হবে, সেটি

নিখুঁত মাপের হয়েছে, এবং তল বা কোণ নির্দ্ধারণে কোনও ত্রুটি নেই।

মঞ্চশিল্পীর কারখানায় সূত্রধরের সরঞ্জামগুলির সঙ্গে, আচ্ছাদন ও চিত্রায়ণের সরঞ্জামও থাকা বাঞ্ছনীয়। শেষোক্ত সরঞ্জামের মধ্যে একটি ছোট গ্যাস, বিদ্যুত অথবা কেরোসিনের চুল্লী, কয়েকটি কলাই করা বাটি এবং সস্তাদরের কয়েকটি ৩" এবং ৪" চওড়া তুলি অতি আবশ্যকীয়।

দৃশ্যপটাদি গঠনের উপকরণ

দৃশ্যপট ও আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি গঠনের জন্য যে সব উপকরণ দরকার, তাদের পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় :—

(ক) চেরা কাঠ বা তক্তা অথবা তক্তাজাতীয় বস্তু,
(খ) কাঁটা-পেরেক জাতীয় লৌহ দ্রব্য,
(গ) মঞ্চসংক্রান্ত বিশেষ ধাতব-উপকরণ,
(ঘ) তন্তুজাত বস্তু এবং
(ঙ) বিবিধ।

এই অনুচ্ছেদে ঐ সব উপকরণগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে জিনিষপত্র ক্রয় করার সময়, এ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞান থাকা সুবিধা ও লাভজনক।

(ক) চেরা কাঠ বা তক্তা :

দৃশ্যপট ও আনুষঙ্গিক গঠনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত কাঠগুলির কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকা উচিত। এগুলি হাল্কা হবে, আঁশের দিক থেকে সহজে কাজ করার পক্ষে সুবিধাজনক হবে, দুমড়িয়ে বা পাকিয়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকবে না, রসের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম হওয়া চাই এবং দামেও সস্তা হবে। আইডাহো'র সাদা পাইন কাঠ এইসব কয়টি গুণের অধিকারী হিসাবে আদর্শ স্থানীয়। তবে আমাদের দেশের পক্ষে, দামের দিক থেকে দেবদারু কাঠ আরও সস্তা—এবং পাইনজাতীয় হওয়ার ফলে, অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণের অধিকারী। কাঠ কেনার সময়, বেশী গাঁটযুক্ত, দোমড়ানো, রসালো অথবা জটিল আঁশ যুক্ত কাঠ বাদ দিয়ে বাছাই করা উচিত।

আমাদের দেশে চেরাই কাঠের আড়তে কাঠ বিক্রী করা হয় ঘনফুট দরে। একফুট লম্বা, একফুট চওড়া ও একফুট উচ্চতার মধ্যে যতখানি কাঠ ধরে, তাকে ১ ঘনফুট বলা হয়। যে কোনও চেরাই কাঠের ঘনত্ব কষে বের করার সূত্রটিকে এইভাবে লেখা যেতে পারে :

ধরা যাক, ইঞ্চিতে কাঠের প্রস্থ = প্রস্থ
ইঞ্চিতে কাঠের বেধ = বেধ
ফুট মাপে কাঠের দৈর্ঘ্য = দৈর্ঘ্য

$$\text{অতএব কাঠের পরিমাণ} = \frac{\text{প্রস্থ} \times \text{বেধ} \times \text{দৈর্ঘ্য}}{১২ \times ১২} \text{ ঘনফুট।}$$

কাঠের দাম সাধারণতঃ ১০০০ ঘনফুট দরে উল্লেখ করা হয়। সেক্ষেত্রে প্রতি ঘনফুটের দাম জানার জন্য দশমিক চিহ্ন তিন ঘর বামে সরিয়ে আনলেই চলবে।

উদাহরণ : কাঠের দাম হাজার ঘনফুট প্রতি ১১৭০.০০ টাকা হলে, একটি ১৬ ফুট লম্বা ৪″ × ২″ তক্তার দাম কত ?

প্রস্থ = ৪
বেধ = ২
দৈর্ঘ্য = ১৬

$$\therefore \text{ কাঠের পরিমাণ } \frac{৪ \times ২ \times ১৬}{১২ \times ১২} = \frac{৮}{৯} \text{ ঘনফুট}$$

১০০০ ঘনফুটের দাম ১১৭০.০০ টাকা

∴ ১ ঘনফুটের দাম টা ১.১৭ পয়সা

∴ $\frac{৮}{৯}$ ঘনফুটের দাম টা ১.১৭ × $\frac{৮}{৯}$ = টা ১.০৪ পয়সা

[উত্তর]

দৃশ্যপটাদি গঠনের বিভিন্ন অংশে যে মাপের তক্তা ব্যবহার করা সুবিধাজনক এবং প্রচলিত, তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো :

বেশীর দিকে যে কোনও দৈর্ঘ্যের ২″ × ১″ তক্তা	ফ্ল্যাটের কোণায় লাগানোর ব্রেস তৈরীর জন্য।
১২′ অথবা ১৪′ দৈর্ঘ্যের ৩″ × ১″ তক্তা	ফ্ল্যাটের দৈর্ঘ্যের দিকের কাঠামো বা 'রেল' তৈরী করার জন্য।
৬′, ৫′, ৪′ দৈর্ঘ্যের ৩″ × ১″ তক্তা	ফ্ল্যাট বা জগের প্রস্থের দিকের কাঠামো ('স্টাইল' এবং 'টগল্') তৈরীর জন্য।

বেদীর দিকে যে কোনও দৈর্ঘ্যের ২"×১½" তক্তা	আনুষঙ্গিক অথবা ফ্ল্যাট দাঁড় করানোর ধারক (ব্রেস) ইত্যাদি নির্মাণের কাজে।
৬' এবং ৩' দৈর্ঘ্যের ৩"×১½" তক্তা	বেদীর খাঁচা তৈরীর জন্য।
বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের ৬"×১" তক্তা	আনুষঙ্গিক অথবা জানালা দরজার কাঠামো তৈরীর জন্য।
২' ৬" বা ৩' দৈর্ঘ্যের ৬"×১½" এবং ৩"×১½"	সিঁড়ির ধাপ তৈরীর জন্য।
৬"×১" তক্তা যত লম্বা পাওয়া যায়	বেদীর পাটাতন করার জন্য

কাঠের তক্তা ছাড়া কাঠের উপাদানে গঠিত আরও কয়েকটি জিনিষ দৃশ্যপটাদি নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়। এগুলির মধ্যে দরজা জানালার পাল্লা, ভূমি পট, দেয়াল বা দরজার বেধ, খিলান ও বহুরকমের আনুষঙ্গিক নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত **প্রোফাইল বোর্ড** বা 'প্লাইউড'কে **প্রধান স্থান** দেওয়া যায়। বাস্তবানুগ মঞ্চসজ্জায় প্লাইউডের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফ্ল্যাট তৈরীর কাজে রেল ও ষ্টাইল বা টগল্ জোড়ার সময়, **কর্ণার ব্লক** এবং **কী-ষ্টোন** [চিত্র ৯] ব্যবহার করা সুবিধাজনক।
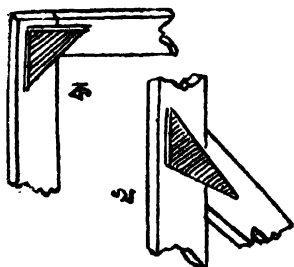
[চিত্র ৯] (ক) কর্ণার ব্লক ও (খ) কী-ষ্টোন

আসবাবপত্র বা রেলিং ইত্যাদির গোলাকার অংশ তৈরী অথবা নানা টুকিটাকী নক্সার কাজে, এরোপ্লেনের মডেল গড়ার জন্য ব্যবহৃত 'বালসা' কাঠ খুব উপযোগী। প্রায় কর্কের মতো নরম এই কাঠকে ইচ্ছামতো আকারে পরিণত করা খুব সহজ। তবে, রাস্তার বাতীথাম জাতীয় দীর্ঘাকৃতি জিনিষ এই কাঠে গড়ে তুললে, পিছন দিক থেকে পাইন কাঠের আশ্রয়ে এটিকে ভেঙে না পড়ার মতো মজবুত করে তোলা উচিত।

(খ) কাঁটা পেরেকজাতীয় লৌহদ্রব্য :

পেরেক ও স্ক্রু যেমন বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়, তেমনি আবার গঠনবৈচিত্র্যেও এদের অনেকগুলি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। প্রয়োজন অনুযায়ী এদের শ্রেণী ও আকৃতি নির্দ্ধারিত হয়। নীচের তালিকা থেকে সাধারণ প্রয়োজনে লাগা **কাঁটা পেরেক** জাতীয় লৌহদ্রব্যের শ্রেণী ও আকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা জন্মাতে পারে :

পেরেক	আকার	গড়সংখ্যা পাউণ্ড প্রতি	প্রয়োজন
চৌকো গা, বড় মাথাওলা	১″ ১¼″ ১½″	৭০৯ ৪১৬ ৩৪৭	কর্ণার ব্লক ও কীষ্টোন লাগানোর কাজে লাগে। অস্থায়ীভাবে ফ্ল্যাটের কাঠামো খাটানোর সময়ও ব্যবহৃত হয়। [উল্টোদিকে পেরেকের মাথা দুমড়িয়ে আটকানোর দরকার হলে, মোট বেধের চেয়ে ১/৪″ বেশী দৈর্ঘ্যের পেরেক বাছাই করা উচিত]
সাধারণ	২″ ২½″ ৩″	১০২ ১০৫ ৬৮	প্ল্যাটফরম প্রভৃতি ভারবহনক্ষম উপকরণ প্রস্তুতির কাজে লাগে।
সরু, ছোট মাথাওলা	১¼″ ১½″ ২″	৬৩৫ ৫৮৩ ৩০৮	আনুষঙ্গিক নির্মাণ, প্রোফাইল বোর্ড আটকানো বা ফ্ল্যাটের গায় নক্সা আটকানো, সিঁড়ীর ধাপ তৈরী প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়।
বড় মাথাওলা, মোটা গা	৩/৪″ ১″	২৫৯ ১৭৯	মেঝেয় ত্রিপল বা কার্পেট আটকানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
বোমা কাঁটা	১/২″ ¾″		ফ্ল্যাটের গায় কাপড় আটকানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

যে সব উপকরণ আবার খুলে অন্যভাবে জোড়া লাগানোর পরিকল্পনা থাকে, সেসব ক্ষেত্রে পেরেকের বদলে স্ক্রু ব্যবহার করাই বিধেয়।

স্ক্রু বা প্যাঁচ*	আকার	প্রয়োজন
চ্যাপটা মাথাওলা সরু	$\frac{৫}{৮}''$ বা $\frac{৩}{৪}''$	ফ্ল্যাটের তক্তা জোড়া বা ফ্ল্যাটের গায় কব্জা বা অন্যান্য ধাতব উপকরণ লাগানোর কাজে লাগে।
	২''	প্ল্যাটফরম তৈরী অথবা অনুরূপ মজবুত কাজে ব্যবহৃত হয়।

* স্ক্রু ডজন দরে বিক্রী করা হয়। প্রতি বাক্সে এক গ্রোস অর্থাৎ ১৪৪টি স্ক্রু থাকে।

স্ক্রু-এর মতো আর একটি জোড়ার উপকরণ **নাট ও বোল্ট** বোল্টের চওড়া মাথা এবং নাট দুদিক থেকে চাপ দিয়ে জোড়া লাগানো উপকরণগুলিকে সুনিশ্চিত মজবুতির সঙ্গে ধরে রাখে।

নাট ও বোল্ট	বেধ	আকার	প্রয়োজন
চ্যাপটা মাথাওলা সারা গায়ে প্যাঁচ	$\frac{৩}{১৬}''$	২''	যেখানে স্ক্রুয়ের সাহায্যে জোড়ার চেয়েও বেশী মজবুত সংযোগের দরকার হয়, সেখানে বোল্ট ব্যবহার করা উচিত। [উদ্বৃত্ত অংশ লোহা কাটা করাতে কেটে বাদ দিতে হয়।
চার কোণা গা শেষের $\frac{১}{২}''$ প্যাঁচযুক্ত	$\frac{৩}{৮}''$	২''	
মেসিন বোল্ট, উত্তল মাথাওলা	$\frac{৩}{৮}''$	১''-২$\frac{১}{২}''$	ধাতব অংশের সঙ্গে ধাতব অংশ যোগ করার কাজে, ওয়াসার দিয়ে ব্যবহার করা উচিত।

স্ক্রু লাগানোর আগে জোড়া লাগানোর যায়গায় স্ক্রুয়ের দৈর্ঘ্যের ন্যূনাধিক $\frac{১}{৪}$ পরিমাণ ছিদ্র করে নেওয়া উচিত। নাট লাগানোর যায়গায় এপার-ওপার ছিদ্র করে নিতে হয়।

কাঁটা পেরেক স্ক্রু ও বোল্টের মতো কব্জারও শ্রেণীভেদ আছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে বিভিন্ন আকারের এবং ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কব্জা ব্যবহার করা হয়। নীচের তালিকায় বিভিন্ন শ্রেণী ও আকারের কব্জা ব্যবহার করার সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা দেওয়া হলো :

কব্জা*	আকার	প্রয়োজন
সাধারণ	১½"	ছোট ছোট জগ অথবা ফ্ল্যাটের উপরে লাগিয়ে সংযোগ সাধনের কাজে ব্যবহার করা হয়।
	২"	উপরে লাগিয়ে বড় ফ্ল্যাট জোড়ার সময় ব্যবহৃত হয়। [উদাহরণ : টুফোল্ড বা রিটার্ণ]
খোলা কব্জা (রিফ্লোক্স বা লূজ পিন)	১½" ২"	দৃশ্যপটের উপকরণাদি পরস্পরের সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধ রাখার জন্য, পিছনের দিকে এই জাতীয় কব্জা দিয়ে আটকানোর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। সাধারণ কব্জার পিন বাদ দিয়ে, মোটা তারের সাহায্যে এই কাজ চালানো যায়।
পাতি কব্জা	৫"	রঙ্গপীঠের বিপরীতে খুলবে, এমন দরজা বা জানালার পাল্লা জোড়ার কাজে লাগে। ট্র্যাপ খোলার জন্যও এই কব্জা বিশেষ উপযোগী।
	৬"	দরজা বা জানালার কাঠামো ফ্ল্যাটের গায় লাগানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

* বাজারে কব্জাগুলি জোড়া হিসাবে বিক্রয় করা হয়।

উপরে বর্ণিত লৌহজাতীয় বস্তুসামগ্রী ছাড়া, আরও কয়েকটি সাধারণ জিনিষ মঞ্চের কাজে লাগে, যেগুলি লৌহজাতীয় বস্তুর তালিকাতেই

গণ্য হবে। সাধারণ দরজার গায় যে সব উপকরণ ব্যবহৃত হয়, অর্থাৎ হাতল, ল্যাচ্, চাবির ব্যবস্থা প্রভৃতি—মঞ্চেও একই উপকরণ ঐসব প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। **গ্রোমেট** জাতীয় পিতলের আংঠাকেও এই তালিকায় ফেলা যেতে পারে। ক্যাম্বিস বা অনুরূপ তন্তুজ বস্তুর ধারে দড়ি ঢোকাবার ছিদ্র বাঁধানোর কাজে এগুলি ব্যবহৃত হয়। ৩/৮" ব্যাসের গ্রোমেটই মঞ্চে বেশী কাজে লাগে। **সিল** অথবা **ফ্লোর আইরণ** দরজার ফাঁকযুক্ত ফ্ল্যাটের নীচের অংশ দুটিকে বেঁধে রাখে। এগুলি ৩/১৬" ইঞ্চি মোটা এবং ৩/৪" ইঞ্চি চওড়া হওয়া উচিত। লোহা-কাটা করাত দিয়ে প্রয়োজন মতো দৈর্ঘ্যে এগুলি কেটে নিয়ে তুরপুনের সাহায্যে স্ক্রু ঢোকানোর ছিদ্র করে নিতে হয়। মিহি **তারের জাল** ব্যবহার করা হয়, অসমতল কোনো আকৃতি গড়ে তোলার জন্য। এর উপরে ক্যাম্বিস, সাধারণ কাপড় বা কাগজের আস্তরণ দিয়ে ঢেকে রং করা হয়। এদের আকৃতি ৩৬" থেকে ৭২" প্রস্থযুক্ত হয়ে থাকে এবং জালের ফাঁকগুলি প্রয়োজন অনুযায়ী ৩/৪" থেকে ২" এর মধ্যে বেছে নেওয়া দরকার।

(গ) মঞ্চ সংক্রান্ত বিশেষ ধাতব উপকরণ :

মঞ্চের বিবিধ প্রয়োজনে কয়েকটি বিশেষ ধাতব উপকরণ ব্যবহার করা হয়। এগুলি সাধারণ বাজারে পাওয়া যায় না। সম্ভব হলে কামারশাল থেকে মাপ ও বর্ণনা দিয়ে এগুলি তৈরী করে নিতে হবে, নচেৎ বিকল্প উপায়ের সাহায্যে উক্ত প্রয়োজন মেটানোর পথ বেছে নেওয়া যেতে পারে।

নীচে কয়েকটি সচরাচর ব্যবহৃত ধাতব উপকরণের তালিকা এবং তাদের ব্যবহার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হলো :

ব্রেস ক্লীট	২"×৪"	ফ্ল্যাটের মাথায় এগুলি লাগানো হয়। এর ছিদ্রে দড়ি অথবা ফ্ল্যাট দাঁড় করানোর হুক আটকানো হয়।
সিলিং প্লেট	২½"×৭"	সিলিংগুলি পরস্পর যুক্ত অবস্থায় রাখার জন্য আংঠা যুক্ত এই ধাতব পাতগুলি ব্যবহৃত হয়।
কার্পেট পিন	২"—৩"	মঞ্চের পাটাতনে কার্পেট বা ত্রিপল আটকানোর জন্য মজবত গঠনের এই

		পিন ব্যবহার করা হয়। কার্পেট বা ত্রিপলের গ্রোমেটের মধ্যে এগুলি লাগানো উচিত।
হ্যাঙ্গার	১", ১½" বা ২"	সহজে পর্দাদি টাঙানোর জন্য ব্যবহার করা হয়।
ফুট আইরণ	৮"×৩¼"	লোহার সমকোণী পাত। ছোট ফ্ল্যাট ইত্যাদি পাটাতনে দাঁড় করানোর জন্য লাগে। কব্জা লাগানো ফুট আইরণ উপর থেকে ঝোলানো দৃশ্য-পট আটকানোর কাজে ব্যবহৃত হয়।
ল্যাস্ ক্লীট এবং ল্যাসআই (বিভিন্ন আকারের)		ফ্ল্যাটের গায় দড়ি আটকানো ও দড়ি দিয়ে বাঁধার কাজে ব্যবহৃত হয়।
মেণ্ডিং প্লেট	সরল, সমকোণী অথবা টী-আকৃতি বিশিষ্ট	ভাঙা ব্যাটেন জোড়া দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) **তন্তুজাত বস্তু :**

সাধারণতঃ **ক্যাম্বিস**, অথবা সস্তার দিক থেকে **মার্কিন কাপড়**-ই ফ্ল্যাটে লাগানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া তন্তুজাত বস্তুর মধ্যে **গজ**, মশারীর জাল বা **নেট** এবং **ফ্ল্যানেল**ও মঞ্চের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়। অর্দ্ধ-স্বচ্ছ পর্দার জন্য গজ এবং স্বচ্ছ পর্দার প্রয়োজনে নেট-এর ব্যবহার সমধিক প্রচলিত। রাত্রির দৃশ্য, কুয়াশা বা স্বপ্ন-দৃশ্যাদির জন্য অর্দ্ধ স্বচ্ছ পর্দা ব্যবহার করা হয়। গজের মধ্যে ছ'কোণা ফাঁকযুক্ত গজ, চারকোণা বুনুনীর চেয়ে অনেক বেশী স্বচ্ছ; তবে চারকোণা বুনুনী বেশী টেকসই। কাটা দৃশ্যাপটাদির ফাঁক ভরানোর জন্য, অথবা বস্তু বা ব্যক্তিকে অদৃশ্য করার প্রয়োজনে নেটের ব্যবহার উপযোগী। ফ্ল্যানেল অথবা ভেলভেট প্রভৃতি ঝালর, মূল পর্দা বা পার্শ্বপটে ব্যবহার করা হয়।

(ঙ) **বিবিধ :**

মঞ্চে ব্যবহৃত প্রত্যেকটি দাহ্যবস্তু **অগ্নি-নিরোধক দ্রব**র সাহায্যে সুরক্ষিত করে নেওয়া উচিত। বাজারে এই দ্রব কিনতে পাওয়া যায়; অথবা তিন বালতি জলে ১ পাউণ্ড **বোর‍্যাক্স** (সোহাগা) এবং ১ পাউণ্ড

স্যাল্‌অ্যামোনিয়াক্‌ মিশিয়ে নিজেদের মতো এই দ্রব তৈরী করে নেওয়া চলে।

রঙের সঙ্গে মেশানোর জন্য **গঁদ** বা **শিরীষ**-এর যে কোনো একটি আঠা ব্যবহার করা যেতে পারে। এদের মধ্যে শিরীষ গরম জল ছাড়া গোলা যায় না। গঁদের ক্ষেত্রেও জল গরম করে নিলে দ্রবণ দ্রুত হয়। কাগজের কাজ অথবা সরাসরি কাঠের সঙ্গে কাপড় বা গজ ইত্যাদি আটকানোর প্রয়োজনে ময়দা বা এরারুটের **লেই** ব্যবহার করা অনেক বেশী সুবিধাজনক।

ছাঁচ তৈরীর কাজে প্যারিস-**প্ল্যাষ্টার** ব্যবহার করা হয়। এই ছাঁচের সাহায্যে কাগজের স্তর দিয়ে যে সব নক্সা বা মূর্তি তৈরী করা হয়, তাদের বলে **'পেপিয়ার-ম্যাসে'**র কাজ। [বিস্তারিত বিবরণ এই পরিচ্ছেদের শেষাংশে দ্রষ্টব্য]।

ভারবহন ক্ষমতা নির্দ্ধারণ

দৃশ্য পরিকল্পনাকারীর পূর্বাহ্নেই ভেবে রাখা উচিত যে তাঁর পরিকল্পিত দৃশ্যপটের ভারবহনকারী অংশগুলিকে কতটা ভারবহন করতে হবে। পরিকল্পনা রূপায়ণের সময় এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার।

একটি ভারবহনকারী বস্তুর ভারবহনক্ষমতা তিনটি বিষয়ের উপরে প্রধানতঃ নির্ভরশীল :

(১) প্রথম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে বস্তুটির আকৃতি এবং সেইসঙ্গে ভূমির উপরে তার অবস্থানের প্রকৃতি। উচ্চতার তুলনায় যে বস্তুর পরিসর বেশী, অর্থাৎ ভূমির উপরে যার সংযোগ উচ্চতার তুলনায় পর্য্যাপ্ত বিস্তারিত, তার ক্ষমতা তত বেশী।

(২) দ্বিতীয় বিষয়, বস্তুটির বিভিন্ন অংশ জোড়া লাগাবার কায়দা এবং উপকরণ। জোড়া লাগানোর ভিন্ন ভিন্ন কায়দা এবং তাদের ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু পরেই আলোচনা করা হয়েছে।

(৩) তৃতীয় বিষয়, যে উপকরণগুলির সাহায্যে বস্তুটি নির্মিত হয়েছে, তাদের নিজস্ব ক্ষমতা। বলা বাহুল্য, উপকরণের নিজস্ব ক্ষমতা যথেষ্ট হলেও, উপরের দুইটি সর্ত পালিত না হলে, সে ক্ষমতা কাজে লাগে না।

সবচেয়ে সুবিধাজনক উপায় হচ্ছে, পিছনে ত্রিভুজাকৃতি **ধারক** বা ব্রেস-এর সাহায্যে প্রত্যেক ভারবহনকারী বস্তুর ভূমির সঙ্গে দৃঢ়বদ্ধতা

বাড়িয়ে তোলা। বস্তুর ভারকেন্দ্র যদি সেই বস্তুর ভূমির বাইরে থাকে বা সরে যায়, তবে সেই বস্তু পড়ে যাবে। ত্রিভুজাকৃতি ধারক লাগানোর দ্বারা [চিত্র ১০] ভূমির আয়তন বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ফলে ভারকেন্দ্র সহজে ভূমির বাইরে যেতে পারে না। জোড়া লাগানোর ব্যাপারেও দুটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বহুক্ষেত্রে বস্তুর গঠনবৈশিষ্টের গুণে জোড়ের উপরে এমন চাপ পড়ে যে, যুক্ত অংশ দুটি পরস্পরের সঙ্গে আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়ে যায়—তবে এক্ষেত্রে মোচড় লাগার সম্ভাবনা থাকতে পারে। অপরপক্ষে, জোড়ের উপরে এমন টান পড়াও সম্ভব, যার ফলে যুক্ত অংশ দুটি পৃথক হতে চায়। এই উভয় অবস্থার কথা বিবেচনা করে, বিভিন্ন অংশ জোড়ার কায়দা নির্দ্ধারণ করতে হবে।
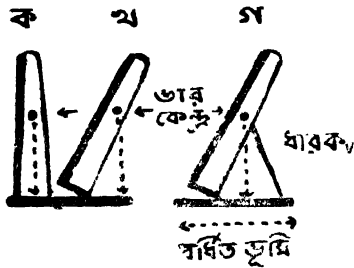
[চিত্র ১০] ভারকেন্দ্র

[ধারকহীন অবস্থায় খ-অবস্থানে বস্তুটি পড়ে যাবে ; কিন্তু গ-অবস্থানে ভারকেন্দ্র মূল বস্তুর ভূমির বাইরে পড়লেও, ধারকের ফলে ভূমি-বৃদ্ধি ঘটায়, বস্তুটি পড়বে না]

উপকরণের ভারবহনক্ষমতা বিচার করার সময় কাঠের কথাই চিন্তা করা হয়। কেননা অন্যান্য ধাতব উপকরণ তুলনামূলকভাবে কাঠের চেয়ে মজবুত। কাঠের ভারবহনক্ষমতা নির্দ্ধারণ সম্পর্কে নীচের চারটি নিয়ম মনে রাখা উচিত :

১। নির্জীব ভার অপেক্ষা সজীব ভারের ধ্বংসকারী ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা চলে, যে কাঠের কড়ির উপরে ১০ মণ জিনিষ নিরাপদে চাপানো যাবে, সেই কড়ি ৫ মণ মানুষের ওজন সহ্য করার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

২। কেন্দ্রীভূত ওজন, সমানভাবে ছড়িয়ে থাকা ওজনের তুলনায় দ্বিগুণ ক্ষতিকারক। সুতরাং যে কড়ি ছড়ানো অবস্থায় রাখা ১০ মণ জিনিষ বা ইতস্ততঃভাবে দাঁড়ানো ৫ মণ মানুষের ভার সইতে পারবে, তার মাঝখানে ২½ মণ ওজনের ভীড় একত্র হলে ভেঙে যেতে পারে।

৩। কড়ির প্রস্থ বৃদ্ধির ফলে যে পরিমাণ ক্ষমতা বাড়ে, বেধ বৃদ্ধির ফলে ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিমাণ অনেকগুণ বেশী বেড়ে যায়। উদাহরণ

স্বরূপ বলা যায়, একটি ৩" চওড়া ও ৩" মোটা কড়ির চেয়ে ৬" চওড়া ৩" মোটা কড়ির ক্ষমতা দ্বিগুণ কিন্তু ৩" চওড়া ও ৬" মোটা হলে, তার ক্ষমতা প্রথমের ৪ গুণ হয়ে যাবে।

৪। কড়ির বেধের উপরেই কড়ির নমনীয়তা নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, ভারবহনকারী কড়ির পক্ষে নমনীয়তা দোষণীয়। এই কারণেই ভারবহনক্ষম উপকরণাদি নির্মাণের সময়, কড়ির মোটা অংশটিকে বেধ হিসাবে ব্যবহার করাই বিধেয়।

বিভিন্ন ধরণের জোড়া লাগানোর ধারা
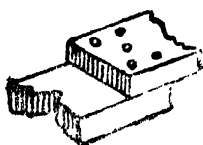
দুটি কাঠের টুকরা জোড়া লাগানোর সহজতম উপায়, সে দুটিকে উপর্যুপরি রেখে [চিত্র ১১.১] পেরেক মেরে আটকে দেওয়া। এই জাতীয় জোড়া লাগানোর পদ্ধতিকে বলা হয় **সরল বাট জয়েণ্ট**। এর ধারণ ক্ষমতা খুবই কম—পেরেক অথবা স্ক্রু্র জোরের উপরেই এর সবটুকু ক্ষমতা নির্ভর করে। পাশাপাশি জোড়া লাগানোর সময় কর্ণার ব্লক বা কীষ্টোন দিয়ে মজবুত করে নেওয়া চলে। বাট জয়েন্ট-এর সংযোগ স্থলে একটি সমকোণী কাঠের টুকরা দিয়ে জোড় মাথাটিকে মজবুত করে নেওয়াকে **ব্লক্‌ড বাট জয়েণ্ট** [চিত্র ১১.২] বলা হয়। দরজা জানালার কাঠামো মজবুত করার সময় এবং বিবিধ আনুষঙ্গিক নির্মাণের কাজে এই জাতীয় জোড় ব্যবহৃত হয়।

[চিত্র ১১.১] সরল বাট জয়েণ্ট

জোড়া লাগানোর অংশ দুটি যখন কোনাকুনি-ভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তখন তাকে **মিটার জয়েণ্ট** [চিত্র ১১.৩] বলে। বিভিন্ন ছাঁচ বা ছবির ফ্রেম জোড়া লাগানোর সময় এই জাতীয় জোড় লাগানোর পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। জোড়া লাগানোর অংশে উভয় কাঠের অর্দ্ধেকখানি বাদ দিয়ে জোড়া দেওয়ার নাম **হাভ্‌ড্‌ জয়েণ্ট** [চিত্র ১১.৪] অথবা 'খাবল জোড়'। ফ্ল্যাট তৈরীর সময় এইজাতীয় জোড়া দেওয়ার পদ্ধতি প্রায়ই ব্যবহার করা হয়। 'বাট জয়েণ্টে'র চেয়ে এই জাতীয় জোড়ের ক্ষমতা বেশী।
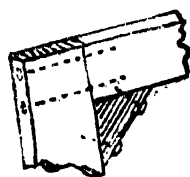
[চিত্র ১১.২] ব্লক্‌ড্‌ বাট্‌ জয়েণ্ট

দুটি জোড়া লাগানোর অংশের একটিতে একটি ফাঁক এবং অন্যটিতে
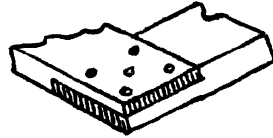
[চিত্র ১১.৩] মিটার জয়েণ্ট

[চিত্র ১১.৪] হাভড় জয়েণ্ট

উক্ত ফাঁকের সমান আকারের একটি জিভ তৈরী করে জোড়া লাগানোকে [চিত্র ১১.৫] **মর্টিজ ও টেনন জয়েণ্ট** বলে। দরজার কাঠামো, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি আনুষঙ্গিক গঠনে এই জোড় বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। বিবিধ জোড়া লাগানোর পদ্ধতির মধ্যে এটিই সবচেয়ে মজবুত। পাটাতন জোড়ার জন্য **টাং ও গ্রুভ জয়েণ্ট** পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। মেসিনে তক্তা চেরাই করার সময় একদিকে ঝরি এবং অন্যদিকে জিভ [চিত্র ১১.৬] তৈরী করে
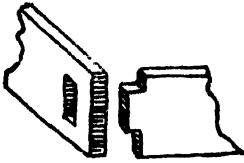
[চিত্র ১১.৫] মর্টিজ ও টেনন জয়েণ্ট

[চিত্র ১১.৬] টাং ও গ্রুভ জয়েণ্ট

নেওয়াই সুবিধাজনক। এই ধরণের জোড়যুক্ত পাটাতনের তক্তাগুলি কালক্রমে ফাঁক হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।

চিহ্নিতকরণ ও আচ্ছাদন

ফ্ল্যাটের কাঠামোগুলি তৈরী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের পিছনে তাদের পরিচিতি লিখে রাখা উচিত। সাধারণ খড়ি বা পেনসিলেও এই কাজ করা যায়—তবে খড়ি বা পেনসিলের দাগ জলের আওতায় এলে, বিশেষ করে অগ্নি-নিরোধক ব্যবহারের সময় মুছে যেতে পারে। কালো রঙে, অগ্নি-নিরোধক দ্রব ব্যবহারের পরে পরেই লিখে রাখা সুবিধাজনক। নাটকের নাম,

অঙ্ক, দৃশ্য এবং সংস্থাপন নির্দেশক অক্ষর বা সংখ্যা লিখে রাখা হয়। শুকনো তুলি ব্যবহার করলে, অক্ষর ঝাপসা হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।

ফ্ল্যাটের কাঠামোর গায় তন্তুজাত বস্ত্র আচ্ছাদনের সময়, কাঠামোর নীচের দিকটি বাদ দিতে হয়। বাকী তিনদিকের ধারে টেনে এনে বোমা কাঁটা মারাই বিধেয়। নীচের অংশ মঞ্চের পাটাতনে ক্রমাগত ঘষিত হয়—তাই সে অংশে কাপড় মোড়া হয় না। সাধারণতঃ দুদিক থেকে দুজন কর্মী একই সঙ্গে টান বজায় রেখে পেরেক মেরে চলা উচিত। ক্যাম্বিস বা কাপড়ের উপরে ন্যূনাধিক ১০ পাউণ্ড টান পড়া শ্রেয়ঃ, এবং পেরেকগুলির অন্তবর্তী ব্যবধান ৯" এর বেশী হওয়া উচিত নয়। টগল বা ব্রেসের গায় পেরেক মারা হয় না। লক্ষ্য রাখতে হবে, আচ্ছাদনের সময় ফ্ল্যাটের সামনের দিকটি যেন পরিচ্ছন্ন থাকে।

আচ্ছাদনের পর প্রয়োজনবোধে কব্জাদি লাগানো হয়। কব্জা এবং দুটি ফ্ল্যাটের জোড় মাথার ফাঁক ঢাকতে হলে **ড্যাচম্যান** বা সরু ফিতে পেরেকের সাহায্যে চাপিয়ে দেওয়া দরকার।

ফ্ল্যাটগুলি তৈরী হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে, রং করার আগেই, একবার মঞ্চের উপরে পরিকল্পনানুযায়ী খাটিয়ে দেখা দরকার। অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি এর ফলে সহজে সংশোধন করা যায়। একে **পরীক্ষামূলক সন্নিবেশ** করা বলে।

আনুষঙ্গিক

মঞ্চের উপর থেকে দৃশ্যপট, দৃশ্যপট অপসারণের যন্ত্রপাতি, আলোক সম্পাতের সরঞ্জাম এবং রূপসজ্জার উপকরণাদি বাদ দিলে আর যা কিছু থাকে, তাকেই **আনুষঙ্গিক** বা 'প্রপার্টি' (সংক্ষেপে 'প্রপ্') বলা হয়। এই আনুষঙ্গিকগুলিকে পাঁচটি সাধারণ ভাগে ভাগ করা যেতে পারে :—

(ক) **মঞ্চানুষঙ্গিক :** দৃশ্যপটের পরিপূরক হিসাবে এগুলি ব্যবহৃত হয়। যেমন, দেয়ালে টাঙানো ছবি, ফুলদানীতে রাখা ফুল, থালায় রাখা খাবার, পিঁপে বা বাক্স প্রভৃতি। ইংরাজীতে এদের **সীনপ্রপ্** বলে।

(খ) **সঙ্গানুষঙ্গিক :** যে সব বস্তু অভিনেতৃবর্গের দ্বারা আনীত, বাহিত বা যে কোনওরূপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে সঙ্গানুষঙ্গিক বা **হ্যাণ্ডপ্রপ্** বলে। যেমন, চিঠি, সিগারেট, দেশ্লাই, টেনিস র‍্যাকেট ছড়ি, ভ্যানিটি ব্যাগ প্রভৃতি।

(গ) **সজ্জানুষঙ্গিক :** জানালা দরজার পর্দা, বিছানার চাদর, চেয়ারের গদি, বইয়ের আলমারী ও বই প্রভৃতি **ফার্ণিসিং** বা 'সজ্জানুষঙ্গিক' হিসাবে গণ্য হয়।

(ঘ) **শব্দানুষঙ্গিক :** আসল বা নকল যে কোনও ধ্বনিই আনুষঙ্গিক শ্রেণীভুক্ত। টেলিফোনের ঘণ্টাধ্বনি, বজ্রপাত, বন্দুকের আওয়াজ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক-নিয়ন্ত্রণকারীর তত্ত্বাবধানে থাকার বিষয়।

(ঙ) **দৃশ্যানুষঙ্গিক :** আলোকের কৌশল ব্যতিরেকে অন্য যে কোনও উপায়ে প্রস্তুত যে কোনও কৌশলই আনুষঙ্গিকের পর্য্যায়ে পড়বে। জানালা দিয়ে দেখা বৃষ্টির ধারা, অভিনেতার কোটে লাগা তুষার বা জলকণা, ধোঁয়া বা কুয়াশা এই জাতীয় দৃশ্যানুষঙ্গিকের নমুনা।

আনুষঙ্গিকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, মঞ্চের আলমারীতে রাখা বইগুলি সজ্জানুষঙ্গিক হলেও, অভিনেতা যদি কোনো বই তুলে নিয়ে পড়েন বা এনে রাখেন, তবে সেটি সঙ্গানুষঙ্গিক হিসাবে গণ্য হবে। অনুরূপভাবে এক দৃশ্যে মালীর সাজিয়ে রাখা সঙ্গানুষঙ্গিক হিসাবে গণ্য ফুলগুলি, পরবর্তী দৃশ্যে দৃশ্যানুষঙ্গিক হিসাবে তালিকাভুক্ত হতে পারে।

তেমনি আবার, যে চশমাটি মেঝেয় পড়ে আছে, কোনও শিল্পী এসে হয়তো কুড়িয়ে নেবে—সেটি তালিকাভুক্ত হবে আনুষঙ্গিক হিসাবে। কিন্তু সাধারণভাবে চশমা (যা ব্যবহার করা হয় পরার জন্য) পরিচ্ছদের অঙ্গ হিসাবে অলংকারের সঙ্গে তালিকাভুক্ত হয়। খুব ভারী আনুষঙ্গিককে যদি দাঁড় করানোর জন্য বেঁধে বা অন্য কোনও রকমে আটকিয়ে রাখতে হয় দৃশ্যপটের সঙ্গে, তবে তাকে দৃশ্যপটের অংশহিসাবেও গণ্য করা যেতে পারে।

আনুষঙ্গিক নির্বাচন বা নির্মাণ করাও শিল্প-নির্দেশক তথা মঞ্চ-স্থপতিরই দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে অবশ্যই তাঁকে নাটকে উল্লিখিত ঘটনার যুগ ও কাল মেনে চলতে হবে; দৃশ্যপটের পরিবেশন রীতির সঙ্গে একমত হয়ে কাজ করতে হবে, এবং পারিপার্শ্বিক বর্ণ-সমাহারের দিকে দৃষ্টি রেখে নির্বাচন করতে হবে আনুষঙ্গিকের রঙ। শিল্পনির্দেশকের দাখিল করা নক্সায় এইসব আনুষঙ্গিক সম্পর্কে প্রাথমিক একটি ধারণা জন্মায় বটে, তবে সেটিকেই চরম তালিকা হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে, নাও পারে। এ সম্পর্কে পৃথকভাবে বিস্তারিত চিত্র এবং বিবরণী দাখিল করতে হবে এবং নির্দেশকের সঙ্গে আলোচনায় স্থির করতে হবে

এদের মধ্যে কোন কোন বস্তু সংগ্রহ করা যেতে পারে, অথবা কি কি জিনিষ তৈরী করে নিতে হবে রঙ্গমঞ্চের কারখানায়।

বলাবাহুল্য, শিল্পীকে বিভিন্ন যুগে ব্যবহৃত আসবাবপত্র, গৃহসজ্জা, এবং আনুষঙ্গিকাদি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হতে হবে। এজন্য শুধু ইতিহাস বা ছবির বইয়ের উপরে নির্ভরশীল না থেকে শিল্পীকে নিজের চেষ্টায় স্কেচ সংগ্রহ করতে হবে, যেতে হবে মিউজিয়াম বা আর্ট গ্যালারীতে—গড়ে তুলতে হবে নিজস্ব এ্যালবাম, যার মধ্যে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে খুঁজে পাওয়াব মতো দৃষ্টান্ত থাকবে মজুত করা।

নিজেদের প্রয়োজনমতো আনুষঙ্গিক তৈরী করার সময় কয়েকটি কথা বিশেষভাবে স্মরণে রাখা দরকার।

(ক) আনুষঙ্গিকগুলির দৃশ্য-অংশ যেন বাস্তবের যতটা সম্ভব অনুগামী হয়।

(খ) আনুষঙ্গিকের যে অংশ কখনোই দর্শকের দৃষ্টিপথে আসবেনা, সে অংশটুকু তৈরী করার দরকার নেই।

(গ) যতখানি হাল্কাভাবে তৈরী করা সম্ভব, আনুষঙ্গিক যেন সেইভাবেই তৈরী করা হয়, অথচ বারবার ব্যবহারে দ্রুত নষ্ট যেন না হয়, সেইভাবে এবং তার উপযুক্ত উপকরণ দিয়ে তৈরী করা দরকার।

(ঘ) ব্যয়সংক্ষেপের দিকটিও লক্ষণীয়।

হাল্কা অথচ টেকসইভাবে গড়ার জন্য নানা ধরণের উপকরণ আজকাল কাজে লাগানো হচ্ছে আনুষঙ্গিক নির্মাণে। হাল্কা ধরণের কাঠ, প্লাইবোর্ড, পেষ্টবোর্ড ইত্যাদির সঙ্গে সহযোগী হয়েছে ফোম, থার্মো-প্ল্যাষ্টিক, ফাইবার গ্লাস, **প্যারিস প্ল্যাস্টার, পেপিয়ার ম্যাসে, সেলাস্টিক** প্রভৃতি আধুনিক মাধ্যমসমূহ। শেষের তিনটি উপাদানের ব্যবহার পদ্ধতি এখানে আলোচিত হলো।

প্ল্যাষ্টারের ছাঁচ তৈরী করা

মূর্ত্তি অথবা অন্যান্য মাধ্যমকে কাজে লাগানোর উপযোগী ছাঁচ তৈরীর জন্য **প্যারিস্ প্ল্যাস্টারই** শ্রেষ্ঠ উপাদান। এখানে সেই প্ল্যাষ্টারের ছাঁচ তৈরী করার সরলতম উপায় বর্ণনা করা হচ্ছে। ছাঁচগুলি সোজা [পজেটিভ] অথবা উল্টো [নেগেটিভ] যে কোনওভাবে তৈরী করা চলে।

প্রথমে কাঠের সমতল পিঁড়ির উপরে মূর্তি গড়ার এঁটেল মাটি দিয়ে নক্সাটির প্রতিরূপ গড়ে তুলতে হবে। বোতল বা জগ জাতীয় উভয় পার্শ্ব বিশিষ্ট পদার্থের জন্য দুটি অর্দ্ধ প্রতিরূপ [চিত্র ১২] গড়া দরকার। পরিকল্পিত বস্তুটি যদি অনেক বড় আকারের হয়, তবে কাঠের কাঠামো তৈরী করে, তার উপরে মাটি দিয়ে প্রতিরূপ গড়া যেতে পারে। প্রতি-রূপের উপরিভাগ ভালোভাবে তৈলাক্ত করে নেওয়া উচিত।
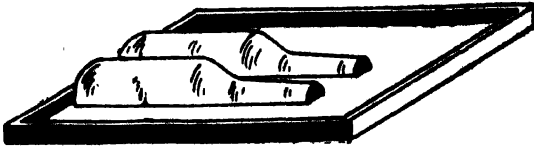
[চিত্র ১২] এঁটেল মাটিতে গড়া বোতলের দুটি অর্দ্ধ প্রতিরূপ

এবার কলায়ের পাত্রে দেড় দুই ইঞ্চি গভীর জল নিয়ে তার মধ্যে প্ল্যাষ্টার ছেঁকে ছেঁকে ফেলতে হবে। হাতে ভালো করে তেল মেখে কাজ করাই বিধেয়। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যতক্ষণ না প্ল্যাষ্টার গরম হয়ে কাইয়ের মতো হচ্ছে, ততক্ষণ এইভাবে প্ল্যাষ্টার মিশিয়ে যাওয়া দরকার। কাই হঠাৎ ময়দার লেচীর মতো নরম তালে পরিণত হবে। সেই তাল তখনি নিয়ে মাটির প্রতিরূপের উপরে অন্যূন আধ ইঞ্চি পুরুত্বে জমিয়ে দিতে হবে। নীচের পিঁড়ির চারদিকে দু'এক ইঞ্চি উঁচু আলের বাঁধুনী থাকলে, প্ল্যাষ্টার গড়িয়ে বেরিয়ে যাওয়ার ভয় থাকে না।

সম্পূর্ণরূপে শুকিয়ে যাওয়ার পর, শক্তভাবে জমে যাওয়া প্লাষ্টারের খোল থেকে মাটি চেঁছে বের করে নিলেই, প্ল্যাষ্টারের ছাঁচ তৈরীর কাজ সম্পূর্ণ হবে।

পেপিয়ার-ম্যাসে

কাগজের স্তর জমিয়ে কোনো বস্তুর প্রতিরূপ তৈরী করাকে 'পেপিয়ার-ম্যাসে'র কাজ বলে। জলে দ্রবণীয় নয়, এমন যে কোনও কঠিন বস্তুকেই ছাঁচ হিসাবে ব্যবহার করে, ঐ বস্তুর কাগজের প্রতিরূপ গড়া যায়। নিজস্ব ছাঁচ গড়ে নিতে হলে প্ল্যাষ্টারের ছাঁচ গঠন করাই যুক্তিযুক্ত।

এখানে পেপিয়ার-ম্যাসের একটি সুপ্রচলিত ধারা বর্ণিত হলো :

খবর কাগজ জাতীয় পাতলা নরম কাগজ প্রথমে ছিঁড়ে বা কেটে ন্যূনাধিক এক বা দেড় ইঞ্চি বর্গ পরিমাণ টুকরো জড়ো করতে হবে। এগুলি জলে ভালোভাবে ভিজিয়ে, পরে ভালোভাবে ফুটিয়ে কাইয়ে পরিণত করতে হবে। এবার উদ্বৃত্ত জল নিঙড়ে বাদ দিয়ে, ঐ কাইয়ের সঙ্গে ২ ভাগ ময়দার কাই ও ১ ভাগ গঁদ মিশিয়ে ভালো করে ঘেঁটে নিতে হয়।

প্ল্যাষ্টারের ছাঁচটির ভিতরের দিক এবার ভালো করে তৈলাক্ত করে, তার উপরে কাগজ ময়দা ও গঁদের মণ্ড লেপে দিতে হবে—লক্ষ্য রাখতে হবে, ছাঁচের প্রত্যেক খাঁজে খাঁজে যেন মণ্ড ঢুকে যায়। এই মণ্ডের প্রলেপ অন্যূন ⅛ ইঞ্চি পুরু হওয়া উচিত। সবার শেষে মিহি কাপড় ঐ ভিজে মণ্ডের উপরে বসিয়ে দিতে হবে। শুকিয়ে যাওয়ার পর, ঐ মণ্ডের আকৃতি হুবহু ছাঁচের ভিতরকার আকৃতির অনুরূপ হবে—সেইসঙ্গে জিনিষটি হবে অত্যন্ত হাল্কা, অথচ যথেষ্ট মজবুত। বোতল, জগ ইত্যাদি গঠনের সময় দুটি অর্দ্ধপ্রতিরূপ কাগজের ফিতে ও আঠার সাহায্যে জুড়ে, রং করে নিতে হয়।

মণ্ডের সঙ্গে কাগজ সিদ্ধ না করে, ভিজে কাগজের টুকরোগুলি ময়দা ও গঁদের লেইতে ডুবিয়ে, তৈলাক্ত ছাঁচের ভিতরে একের পর এক লাগিয়ে গেলেও কাজ হবে। তিন বা চার স্তর এইভাবে লাগিয়ে নিলেই প্রয়োজনীয় বেধ এসে যায়। সরাসরি জালের খাঁচার উপরে এইভাবে কাগজের টুকরো লাগিয়ে, গাছের গুঁড়ি বা পাথর ইত্যাদির প্রতিরূপ গড়া হয়ে থাকে।

সেলাস্টিক একধরণের চর্বি-লাগানো কাপড়কে সেলুলোস নাইট্রেট এবং অগ্নি-নিরোধক রাসায়নিক দ্রবণে পরিপৃক্ত করে **সেলাস্টিক** তৈরী করা হয়। সাধারণভাবে কাপড়টি বেশ শক্ত থাকে। একে বিশেষ দ্রবণে ডুবিয়ে নিলেই নমনীয় হয়ে যায়। তখন সেই নমনীয় কাপড়টি খুব সহজেই সোজা বা উল্টো যে কোনও ছাঁচের উপর চেপে চেপে বসিয়ে দেওয়া যাবে। পরবর্তী দ্রবণটি খুব শিগগির বাষ্পাকারে উড়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেলাস্টিক কাপড় তার নূতন পাওয়া চেহারাতেই শক্ত হয়ে যায়। ছাঁচের উপরে এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দিয়ে ঢেকে নিলে, সেলাস্টিকের প্রতিরূপটি খুব সহজে ছাঁচ থেকে বেরিয়ে

আসবে। এগুলি প্রায় সংকুচিত হয় না বললেই চলে, এবং এর দ্বারা তৈরী করা বিষয়গুলি প্রচণ্ডভাবে মজবুত হয়। **তন্তু-স্থাপত্য** নামে পরিচিত এই ধরণের সেলাস্টিকের কাজের মধ্যে মঞ্চসজ্জার অনেক সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে।*

প্ল্যাষ্টার, পেপিয়ার ম্যাসে বা সেলাস্টিক অথবা অন্য যে কোনও মাধ্যমে গড়া আনুষঙ্গিক সবশেষে প্রয়োজনমতো রঙ করে নিতে হবে। বলাবাহুল্য, যে বস্তুর প্রতিনিধিত্ব করবে এইসব প্রতিরূপ, নিঃসন্দেহে এরা সেইসব বস্তুর তুলনায় হবে যথেষ্ট পরিমাণে হাল্কা। সুতরাং এগুলিকে অতিরিক্ত ভারের সাহায্যে মজবুতভাবে দাঁড় করাতে বা লাগাতে হবে মঞ্চের উপরে। আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে একটি পাঁচমণ ওজনের পাথরে তৈরী ভাস্কর্য্য, অথচ পাটাতনের উপরে অভিনেতার চলাফেরার তালে, অথবা মূর্তি দাঁড় করানো পেডেষ্টালের গায় হেলান দিতেই সেটি দুলে দুলে উঠছে—এমন হাস্যকর পরিস্থিতির যেন উদ্ভব না হয়, সেদিকে পূর্বাহ্ণেই লক্ষ্য রাখা উচিত।

---

* অসমতল উপরিভাগ তৈরী করার জন্য সস্তা দামের উপকরণ হিসাবে খাবারের ঝুড়ি ব্যবহার করা যেতে পারে। মন্দিরে যে ধরণের হাল্কা ঝুড়িতে পূজার ডালা সাজিয়ে দেয়, সেই ধরণের বিভিন্ন আকারের ছোট বড় ঝুড়ি দৃশ্য-পটের খাঁচায় আটকিয়ে অসমতল স্থানের কাঠামো তৈরী করে নিতে হবে। এর উপরে খবরের কাগজ এবং ছেঁড়া কাপড় ময়দার লেই দিয়ে চাপা দিলেই, জমি তৈরী হয়ে যাবে। প্রয়োজন মতো রঙ ক'রে নিতে হবে শুকিয়ে যাওয়ার পর।
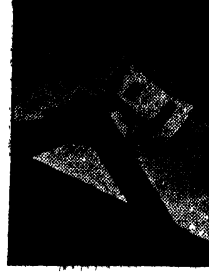
ছয় চিত্রায়ণ

দুটি কথা সার্থক মঞ্চশিল্পী হয়ে ওঠার জন্য বহু বৎসরের সাধনা ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন। তবে, আধুনিক নাটকের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী সরল, আকর্ষণীয়, সাধারণ দৃশ্যপট আঁকতে পারা বিশেষ শ্রমসাধ্য বিষয় নয়। এর জন্য চিত্রাঙ্কন, বিন্যাস ও বর্ণ সম্পর্কে জ্ঞান থাকার সঙ্গে সঙ্গে দুটি বিশেষ কথা স্মরণে রাখা কর্তব্য।

প্রথম কথা, মাত্রাবোধযুক্ত অতিরঞ্জন সম্পর্কে ধারণা থাকা উচিত। মঞ্চের জন্য যা কিছু আঁকা দরকার, আঁকতে হবে বড় আকারে, ঘন রেখায়। দূর থেকে যেন সেগুলির চরিত্র সম্যক ধরা পড়ে। একটি আধ ইঞ্চি বুরুশে টানা রেখা দর্শকমণ্ডলীর চতুর্থ বা পঞ্চম সারি থেকে দেখা যাবে কিনা যথেষ্ট সন্দেহের বিষয়।

দ্বিতীয় কথা, দীপচিত্রণের কথা মনে রেখে, তার উপযোগী করে চিত্রাঙ্কণ করতে হবে। আলোকসূত্রের মুখে প্রায়শঃই বর্ণমাধ্যম ব্যবহৃত হয়। রঙিন আলো যে শুধু দৃশ্যপটের নিজস্ব বর্ণের রূপান্তর ঘটায়, তাই নয়—বহুক্ষেত্রে বর্ণের প্রখরতাও বদল করে। এমন কি কোনো কোনো বর্ণ বিশেষ পরিস্থিতিতে লুপ্ত হয়ে যায়।

উপকরণ চিত্রায়ণ বিষয়ক উপকরণাদি সম্পর্কে আলোচনার প্রথমেই রঙের প্রসঙ্গে আসা যাক। রঙের উপকরণ হিসাবে দরকার (ক) জলে দ্রবণীয় গুঁড়ো রঙ, (খ) হোয়াইটিং এবং (গ) গঁদ বা শিরিষ। দৃশ্যপট আঁকার কাজে তেলরঙের বদলে জল রঙই ব্যবহৃত হয়, কারণ জল রঙ সহজে এবং দ্রুতগতিতে লাগানো যায়, খুব তাড়াতাড়ি শুকোয়, চক্‌চক্ করে না, হাতে লেগে থাকার ভয় কম, তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট সস্তা এবং দাহ্য নয়।

হোয়াইটিং এগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। সমস্ত রঙের পরিমাণ একত্র করলে যা হয়, হোয়াইটিং তার চেয়েও কিছু বেশীই লাগে দৃশ্যাঙ্কণের কাজে।

গঁদ বা শিরিষ ফুটিয়ে নিয়ে গরম গরম ব্যবহার করা উচিত। ঠাণ্ডা জলে গোলা গঁদ বা শিরিষের আঠা রঙের জেল্লা কমিয়ে কালচে করে দেয়।

এরপর বলা যায় **তুলির** কথা। ৬'' বা ৮'' বুরুশ দিয়ে প্রাথমিক লেপনের কাজ সহজ হয়। সাধারণ বড় আকারের জুতার বুরুশ দিয়েও এ কাজ ভালোভাবে করা যায়। 8'' চওড়া কয়েকটি বুরুশ দরকার বিভিন্ন রঙের জন্য। এছাড়া কয়েকটি ২'' ও ১'' চওড়া বুরুশ ছোট খাটো নক্সা বা দাগ টানার জন্য হাতের কাছে তৈরী রাখা উচিত। বুরুশগুলি কাজের শেষে ভালো করে ধুয়ে, শুকিয়ে রাখা দরকার; নচেৎ রঙের আঠায় জমে এগুলি অকেজো হয়ে যাবে। গরম জলে তুলি ডুবিয়ে রাখা উচিত।

অন্যান্য আবশ্যকীয় উপকরণের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো :

১। একটি মাপের গজকাঠি,

২। কাঠ কয়লার কাঠি বা পেনসিল,

৩। রঙের গুঁড়ো দিয়ে দাগ টানার জন্য মজবুত পৈতের সুতো—(কমপক্ষে ১০ গজ লম্বা হওয়া চাই),

৪। ছয়ফুট দীর্ঘ, ঢালু ধারবিশিষ্ট রুলকাঠি [ছোট দাগ আঁকার জন্য],

৫। বারো ফুটের একটি নিখুঁত সরল ধারবিশিষ্ট ৩''×১'' ব্যাটেন [বড় দাগ আঁকার জন্য],

৬। দুই তিন গ্যালন জল ধরার উপযোগী কয়েকটি বালতি,

৭। সাত আটটি কলাইয়ের চওড়া মুখওলা বাটি,

৮। একটি গ্যাস, বিদ্যুৎ অথবা কেরোসিন চুল্লী, এবং

৯। রঙ ছাঁকার উপযোগী মিহি শক্ত কাপড় বা গামছা।

বড় বড় চিত্রশালায় দৃশ্যপট ঝোলানো অবস্থায় আঁকার জন্য **পেণ্ট ফ্রেম**-এর ব্যবস্থা রাখা হয়। এই ব্যবস্থায় দৃশ্যপটের সমান দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি পুল, অঙ্কনরত শিল্পীদের নিয়ে, দৃশ্যপটের সামনে প্রতিচাপ ব্যবস্থার সাহায্যে প্রয়োজন মতো ওঠা নামা করে। সাধারণ নাট্যালয়ের

পক্ষে এ ব্যবস্থা অপরিহার্য্য নয়। ফ্ল্যাটগুলিকে মেঝেয় শুইয়ে অনায়াসে আঁকা যায়। তবে আঁকার কাজ শেষ হওয়ার পর, মেঝেয় পড়ে থাকা অবস্থায় দৃশ্যপটগুলিকে শুকোতে দিলে, মেঝের সঙ্গে কাপড় সেঁটে যাওয়ার ভয় থাকে। তাছাড়া, একই ফ্ল্যাটের দুপিঠে যদি দুটি ভিন্ন দৃশ্য আঁকার প্রয়োজন পড়ে, তখন দৃশ্যপটটিকে মেঝেয় না ফেলাই বাঞ্ছনীয়। নচেৎ চিত্রগুলি নোংরা হয়ে যাবে।

রঙ তৈরী করা গঁদ বা শিরীষের আঠা মিশিয়ে রঙ ব্যবহার করা উচিত—নচেৎ শুকিয়ে যাওয়ার পর, রঙ ঝরতে সুরু করবে। রঙের সঙ্গে মেশানোর জন্য প্রস্তুত রাখা এই আঠাকে **সাইজ ওয়াটার** বলে।

'সাইজ ওয়াটার' তৈরী করার জন্য তিন গ্যালন পরিমাণ জলে ৪ পাউণ্ড গঁদ বা শিরীষ সারা রাত [কমপক্ষে ১ ঘণ্টা] ভিজিয়ে রাখতে হয়। তারপর এটিকে সিদ্ধ করার পালা। সাধারণতঃ একটি বড় পাত্রে সামান্য জল ও একটি ইঁট বা কাঠ রেখে, তার মধ্যে সাইজ ওয়াটার তৈরী করার পাত্রটি ঢুকিয়ে, সবশুদ্ধ উনুনে বসানো উচিত। এর ফলে শিরীষ বা গঁদ জ্বলে ওঠার ভয় থাকে না [চিত্র ১৩]। সম্পূর্ণ গলে যাওয়ার পর আঠায় আরো জল মিশিয়ে পাতলা করে নেওয়া হয়। ৪ পাউণ্ড গঁদ বা শিরীষে ৪ থেকে ৬ বালতি সাইজ ওয়াটার তৈরী হবে। আঠার ঘন অংশ মাঝে মাঝে পাতলা করে মিশিয়ে নেওয়ার জন্য পৃথকভাবে রাখা যেতে পারে। যদি দীর্ঘ সময়ের জন্য আঠা ফেলে রাখার দরকার হয়, তবে দু এক চামচ কারবলিক এসিড মিশিয়ে রাখা উচিত। এর ফলে আঠা কেটে যাওয়ার ভয় থাকবে না।
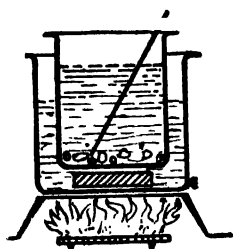
[চিত্র ১৩] সাইজ ওয়াটার জ্বাল দেওয়ার পদ্ধতি

সাইজ ওয়াটারে রং মেশানোর সময় সর্বদা ঘেঁটে চলা উচিত। নচেৎ রঙ ডেলা পাকিয়ে যাবে। আঠার ভাগ বেশী হয়ে গেলে, দৃশ্যপট শুকিয়ে যাওয়ার পর ছবি ফাটতে সুরু করে; তেমনি আবার আঠার ভাগ কম হলে হাতে শুকনো রঙ উঠে আসে। রঙের ভাগ প্রয়োজনের বেশী হলে তুলি টানতে কষ্ট হয়, এবং প্রলেপগুলিকে পৃথকভাবে চেনা যায়। তেমনি

আবার রঙের পরিমান কম হলে, প্রলেপগুলি স্বচ্ছ মনে হয়। রঙ কিছুটা গরম থাকতে থাকতেই ব্যবহার করা উচিত। রঙের পাত্রে যাতে রঙ জমে না যায়, সেজন্য মাঝে মাঝে গুলিয়ে নেওয়া দরকার। পুরাতন রঙ পারতপক্ষে ব্যবহার না করা বিধেয়।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঘন রঙ ব্যবহার করার সময়, রঙের সমপরিমাণ হোয়াইটিং মিশিয়ে নেওয়া উচিত। রঙের হাল্কা ভাব ফোটাতে হলে হোয়াইটিংয়ের মাত্রা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতে হয়। মনে রাখতে হবে, জল রঙ ভিজে থাকা অবস্থায় ঘন মনে হয়। বিশেষ করে যে রঙের সঙ্গে সাদা মেশানো আছে, তার ঘনত্ব নির্দ্ধারণ বেশ কষ্টসাধ্য। এই কারণেই রঙের জোড়াতালি দেওয়া একরকম অসম্ভব বললেই চলে। একরঙা বড় জমি রঙ করার সময় বরং বেশী পরিমাণে রঙ গুলে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, যেন কাজের মাঝে রঙের অভাব না ঘটে। ২ থেকে ৩ গ্যালনের ২ বালতি রঙে, একটি ২৫′×৩০′ আকারের বলয়পট, অথবা ১২ ফুট উঁচু সাধারণ আকারের ৭টি ফ্ল্যাট সুন্দরভাবে রঙ করা যাবে।

প্রাথমিক এবং পরবর্তী বর্ণপ্রলেপ

ক্যাম্বিস বা ফ্ল্যাটে লাগানো কাপড়ের সছিদ্র তলটিকে ভরাট করে, পরবর্ত্তী প্রলেপের কাজকে সহজ করে তোলাই প্রাথমিক বর্ণপ্রলেপের কাজ। এই প্রলেপ শুকিয়ে যাওয়ার পর, সহজে আঁকার উপযোগী একটি মসৃণ জমি তৈরী হয়। হোয়াইটিং যেহেতু সবচেয়ে সস্তা, তাই এটিই ব্যবহার করা হয় প্রাথমিক প্রলেপের উপকরণ হিসাবে। তবে যে কোনো হাল্কা রঙের সাহায্যে এই কাজটি করা চলে।

প্রাথমিক প্রলেপের জন্য যথেষ্ট বড় বুরুশ ব্যবহার করা উচিত। রঙ যেন সমুদয় জমিতে সমান ঘনত্বে, মসৃণ এবং পাতলাভাবে লাগানো হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

পরবর্ত্তী প্রলেপ দেওয়ার সময়, একটি রঙ সম্পূর্ণ শুকিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় রঙ লাগানো উচিত। রঙের পরিমাণ যদি ঠিক হয়ে থাকে, তবে প্রত্যেক প্রলেপ পূর্ববর্তী প্রলেপকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিবে—নচেৎ বুঝতে হবে, রঙের মাত্রা কম হয়েছে। যদি পরবর্তী প্রলেপ দেওয়ার সময় পূর্ববর্তী রঙের স্তর উঠে আসে, তবে বুঝতে হবে (ক) হয় পরবর্তী প্রলেপের জন্য ব্যবহৃত রঙ বেশী গরম আছে, (খ) নয়তো, পূর্ববর্তী

প্রলেপের রঙ এখনও শুকোয়নি, (গ) অথবা, পূর্ব্ববর্তী প্রলেপের রঙে আঠার ভাগ কম ছিল।

বহু পুরাতন দৃশ্যপটের উপরে নূতন প্রলেপ দেওয়ার সময় প্রায়ই দেখা যায়, পুরাতন ছবির রঙ তুলির টানে উঠে আসছে। এক্ষেত্রে কাজ করা অসম্ভব হলে, ফিটকিরী গোলা জল ছিটিয়ে, পুরাতন ছবির রঙ জমিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

রঙ লাগানোর কয়েকটি কায়দা

দৃশ্যপট অঙ্কনের কাজে সাধারণতঃ নীচের পাঁচ রকম কায়দায় রঙ লাগানো হয়। বিভিন্ন ধরণের জমি তৈরীর জন্য ব্যবহৃত এই কায়দাগুলি দখলে আনতে বেশ কিছুটা অভ্যাসের প্রয়োজন পড়ে।

(ক) ভিজে ব্রাশে আঁকা

(খ) স্পঞ্জে আঁকা
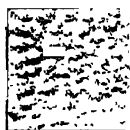
(গ) শুকনো ব্রাশে আঁকা

(ঘ) নিকানো
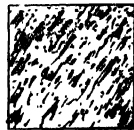
(ঙ) ছিটানো

[চিত্র ১৪] রঙ লাগানোর বিভিন্ন কায়দা

(ক) ভিজে বুরুশে আঁকা :

দৃশ্যাঙ্কনের এটিই সবচেয়ে সহজ এবং সরল পন্থা। তুলিতে প্রয়োজন-মত রঙ নিয়ে, পটের গায় সমানভাবে প্রলেপ লাগিয়ে যেতে হয়। এই প্রথায় প্রাথমিক প্রলেপ ও পরবর্ত্তী একরঙা প্রলেপ দেওয়া সুবিধাজনক। পারতপক্ষে হাত চালানোর গতি একমুখী রাখা উচিত। ইংরাজীতে একে বলে **'ফ্ল্যাট পেন্টিং'** [চিত্র ১৪.ক]।

(খ) স্পঞ্জের সাহায্যে আঁকা :

স্পঞ্জ প্রয়োজন মতো আকারে কেটে ছেঁটে নিয়ে, রঙে ডুবিয়ে নিতে হয়। তারপর সেটিকে প্রয়োজনমতো নিংড়ে, পটের প্রয়োজনীয় অংশে আলতোভাবে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে ছবি আঁকার এই প্রথাটি **স্পঞ্জিং** নামে পরিচিত। রঙ যেন কোথাও জুবড়ে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। নক্সার ধারাটিকে বৃত্তাকার, অর্দ্ধবৃত্তাকার বা ঘূর্ণীর মতো করে

তুললে, দেখতে সুন্দর হয়। এই প্রথাটি [চিত্র ১৪ খ] অসমতল জমি আঁকার জন্য ব্যবহারে লাগে।

(গ) শুকনো বুরুশে আঁকা :

বুরুশ রঙে ডোবানোর পর বেশ করে নিংড়ে শুকনো করে নিয়ে, আস্তো ছোঁয়ায় পটচিত্রণের এই প্রথাকে [চিত্র ১৪ গ] ইংরাজীতে বলে **স্কামলিং**। এই প্রথায় হাত এলোমেলোভাবে চালানো হয়ে থাকে। প্রাথমিক প্রলেপ বা পরবর্তী বর্ণপ্রলেপ (যার উপরে এই প্রথায় আঁকা হয়) এর ফলে আংশিকভাবে চাপা পড়ে। অমসৃণ তল বোঝাতে এই শ্রেণীর চিত্রাঙ্কন বিশেষ কার্য্যকরী।

(ঘ) নিকানো :

মোটা কাপড়, বা ফ্ল্যানেলের টুকরো রঙে ভিজিয়ে এলোমেলো নিকিয়ে রঙ করার পদ্ধতিকে [চিত্র ১৪ ঘ] ইংরাজীতে **রোলিং** বলে। পুরাতন দেয়াল বা পাথুরে যায়গা আঁকার পক্ষে এটি চমৎকার কায়দা।

(ঙ) ছিটানো :

রঙে ভেজা তুলি থেকে রঙ ছিটিয়ে, বা হাতের উপরে ভিজে তুলি ঠুকে ঠুকে পটের গায় রঙের বিন্দু ছড়িয়ে নূতন এক ধরণের জমি তৈরী করা যায় [চিত্র ১৪ ঙ]। তুলি থেকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত রঙ ছিটকে না পড়ে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে। ইংরাজীতে এই ধরণের চিত্রাঙ্কন প্রথাকে **স্প্যাটারিং** বলা হয়। একটি রঙের ভিতরে পাশের আর একটি রঙের আভা ফুটিয়ে তোলার কাজে এই কায়দা খুব কার্য্যকরী। দুটি ভিন্ন রঙের ছিটে পৃথকভাবে ছড়িয়ে থাকলেও দূর থেকে দর্শকের চোখে সেদুটি মিশ্রিত বলে মনে হবে। অসমতল জমি আঁকার জন্যও এই কায়দা কাজে লাগে।

রঙের ব্যবহার দৃশ্যপটের গায় কোথায় কি রঙ ব্যবহার করা উচিত, কিভাবে কোন দৃশ্য আঁকতে হবে, ইত্যাদি বিষয় অঙ্কনবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত। আলোচ্য পরিচ্ছেদে তার বিশদ আলোচনা সম্ভবপর নয়। তবে 'বস্তুর রঙ' তথা অস্বচ্ছ বর্ণ সম্পর্কে প্রাথমিক যেটুকু জ্ঞান থাকা দরকার, তারই উপরে ভিত্তি করে এই অনুচ্ছেদে রঙের ব্যবহার সম্পর্কে দুচার কথা বলা হলো।

রঙের মধ্যে **মৌলিক বর্ণ** বলে গণ্য করা হয় লাল, হলুদ ও নীল রঙ তিনটিকে। যে কোনও দুই মৌলিক রঙের মিশ্রণে যৌগিক বর্ণ তৈরী হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যাবে, লাল ও হলুদের মিশ্রণে কমলা, হলুদ ও নীলের মিশ্রণে সবুজ এবং নীল ও লালের মিশ্রণে বেগুণী রং পাওয়া যায়। অতএব এই কমলা, সবুজ ও বেগুণী তিনটি **যৌগিক বর্ণ** [আলোকের রঙ তথা স্বচ্ছ বর্ণের ক্ষেত্রে এই পরিচিতি খাটে না]। বর্ণচক্রে [চিত্র ১৫] এই রঙগুলিকে সাজিয়ে নিলে এদের চরিত্র বোঝা সহজ হবে।
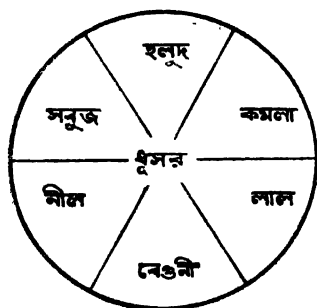
[চিত্র ১৫] বর্ণচক্র

চক্রের পরিধি বরাবর কাছাকাছি থাকা দুটি রঙকে **সদৃশ বর্ণ** বলা হয়। যেমন নীল, নীলচে সবুজ আর সবুজ সদৃশ বর্ণ। চক্রের বিপরীতে অবস্থিত রঙ দুইটি পরস্পরের **প্রতিপূরক বর্ণ**। যেমন, সবুজ লালের প্রতিপূরক, নীল কমলার প্রতিপূরক, ইত্যাদি। কেন্দ্রে রাখা হয়েছে ধূসর বর্ণ—এটি সর্বতোভাবে **প্রভাবহীন বর্ণ**।

এই বর্ণগুলির মধ্যে, লাল, কমলা এবং হলুদ তিনটি 'উষ্ণবর্ণ'। সবুজ, নীল ও বেগুনী তিনটি 'শীতল বর্ণ'। সদৃশবর্ণগুলি 'সুসমঞ্জস', তথা পাশা-পাশি ব্যবহার করার পক্ষে নিরাপদ। প্রতিপূরক রঙগুলি সবচেয়ে বেশী 'বৈষম্যের সৃষ্টি' করে। রঙের হাল্কা ভাব ঘনভাবের তুলনায় 'উদ্দীপনা-মূলক'। তেমনি আবার ঘনভাবগুলি হাল্কাভাবের তুলনায় বেশী 'দৃষ্টি আকর্ষণকারী' এবং 'গাম্ভীর্য্যপূর্ণ'। সামান্য উজ্জ্বল বর্ণের অবস্থান, অনেক-খানি ধূসর বর্ণের প্রভাবকে সহজেই 'অতিক্রম' করতে পারে। বর্ণে বর্ণে মিশ্রণ ঘটলেই 'বর্ণপ্রাখর্য্যের হ্রাস' ঘটে।

একই রঙের ঘন ও হাল্কা প্রলেপগুলি পাশাপাশি যে কোনও পরিমাণে ব্যবহার করা চলে। সদৃশ বর্ণগুলিকেও পাশাপাশি যে কোনও পরিমাণে ব্যবহার করা যেতে পারে, যদি তার পাশে অন্য কোনও রঙ না থাকে। প্রতিপূরক রঙ পাশাপাশি ব্যবহার করতে হলে অসম পরিমাণ জমি ভাগ করে নেওয়া উচিত। উজ্জ্বল রঙে আঁকা বিচ্ছিন্ন জমিগুলিকে বাঁধার জন্য,

অসহযোগী বর্ণের জমি তৈরী করে নেওয়া লাভজনক। দৃশ্যপটের বেশীর ভাগ অংশ অসহযোগী বর্ণে রঞ্জিত করে, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তনে উজ্বলবর্ণের সমাহার ঘটানো বুদ্ধিমানের কাজ।

দৃশ্যপটের গায় তুলির টানে 'ছায়া' না আঁকাই বাঞ্ছনীয়। আলোক-সম্পাতের সাহায্যে সৃষ্ট ছায়াই কাম্য। কিন্তু প্রয়োজনে যদি ছায়া আঁকতেই হয়, তবে তা কালো রঙে আঁকা উচিত নয়। বাদামী, সবুজ, বেগুনী প্রভৃতিতে ছায়ার রূপটি ভালোভাবে ফোটে। আলোকের বর্ণমাধ্যমের কথা স্মরণে রেখে, প্রয়োজন-বিশেষে লাল বা নীল ছায়াও আঁকা যেতে পারে।

আমাদের দেশীয় উপাদানে দৃশ্যপট আঁকার সময় মোটামুটিভাবে আমরা নীচের তালিকা অনুযায়ী রঙ ব্যবহার করি :—

সাদা—জিংক অক্সাইড	নীল—রবীন ব্লু
হলুদ—পিউড়ি	এলা—এলা মাটি
লাল—রেড্ অক্সাইড	সবুজ—গ্রীণ অক্সাইড

কালো—ভূষো কালি* ইত্যাদি।

কালো ছাড়া প্রত্যেকটি রঙের সঙ্গে হোয়াইটিং মিশিয়ে নিতে হয়। এই রঙগুলির মধ্যে কালো এবং নীল ছাড়া বাকী রঙগুলি খনিজ চূর্ণ। রঙ গোলার সময় এগুলি দ্রুত নখ ক্ষয়িয়ে দেয়। হাত দিয়ে রঙ গোলার কাজটিকে এড়িয়ে চলা খুবই কষ্টসাধ্য। তার চেয়ে রঙের কাজে হাত দেওয়ার আগে থেকে, বিশেষ করে ডান হাতের নখ না কাটাই বুদ্ধিমানের কাজ।

---

* ভূষোতে জল মেশানোর আগে, অ ঠার সাহায্যে কাইয়ের মতো করে নিতে হবে। নচেৎ তৈলাক্তভাবের জন্য শুকনো ভূষো কিছুতেই মেশানো যাবে না।

সাত সন্নিবেশ ও অপসারণ

বাঁধন ও ধারকের ব্যবহার

দুটি ফ্ল্যাট পাশাপাশি রাখার পর তাদের দুটিকে **ল্যাসিং** প্রথায় বেঁধে দেওয়া হয়। এই ল্যাসিংয়ের জন্য সাধারণতঃ ফ্ল্যাটের উচ্চতাব সমান দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ১/৪'' ব্যাসের স্যাস্ বা ল্যাকলাইন দড়ি ব্যবহারে লাগে। ফ্ল্যাটের পিছনে উপরের অংশে দক্ষিণ সীমান্তে এই দড়ির একপ্রান্ত বাঁধা থাকে। দুটি ফ্ল্যাট জুড়ে ধরার পর, ঐ দড়ি বামদিকের ফ্ল্যাটের মাথা থেকে ছুঁড়ে ফেলা হয় ডানদিকের ফ্ল্যাটের উপরে লাগানো 'ক্লীট' বা **আঁকসী**তে। তারপর দড়ির টান বজায় রেখে ক্রমান্বয়ে সেটিকে বামে-ডাইনে, বামে-ডাইনে বারবার ঘুরিয়ে নেওয়া হয় ক্লীট থেকে ক্লীটে [চিত্র ১৬.১] এবং শেষ ক্লীটে পেঁৗছে দড়িটিকে ফাঁস দিয়ে আটকে রাখা হয়। ক্লীটের বদলে মজবুত পেরেক মেরে বেঁকিয়ে দিলেও চলে। তবে লক্ষ্য রাখা উচিত, পেরেকের মাথা উঁচু হয়ে আছে কিনা। ফ্ল্যাটের উপরে ফ্ল্যাট ফেলে রাখার সময়, ঐ জাতীয় উঁচু হয়ে থাকা পেরেক ফ্ল্যাটের কাপড় ছিঁড়ে ফেলতে পারে।
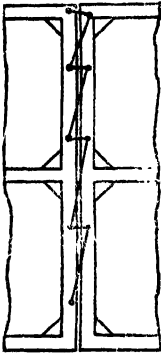
[চিত্র ১৬'১] ল্যাসিং

দৃশ্যপটের প্রান্তবর্তী ফ্ল্যাটগুলি, অথবা বেশী চওড়া দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশ, কিম্বা দরজা-জানালা বা খিলানযুক্ত ফ্ল্যাটগুলিকে **ধারক** বা 'ব্রেসে'র সাহায্যে আরও দৃঢ়বদ্ধ করে রাখা উচিত। ব্রেস লোহা বা কাঠে তৈরী ৬ ফুট থেকে ৮ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ একটি হুক বিশেষ [চিত্র ১৬'২]।

যার একপ্রান্তে কর্ক স্ক্রু জাতীয় হুক থাকে, এবং অন্যপ্রান্তে থাকে ছিদ্রযুক্ত ধাতব ভূমি। অনেক ব্রেসের দৈর্ঘ্য কমানো বাড়ানো যায়। ভূমিপট বা বিশেষ দৃশ্যপটাদির প্রয়োজনে ২' থেকে ৪ ফুট দৈর্ঘ্যের খর্বাকৃতি ধারকও ব্যবহৃত হয়। যে ফ্ল্যাটটিকে দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে, তার মাঝ বরাবর লাগানো একটি আংটায় ধারকের হুক ঢুকিয়ে মোচড় দিলে, ধারকটি আটকে যায়। তখন উপযুক্ত ব্যবধানে ধারকের নিম্নাংশ, পাটাতনের সঙ্গে কীলকের সাহায্যে এঁটে দেওয়া হয়।
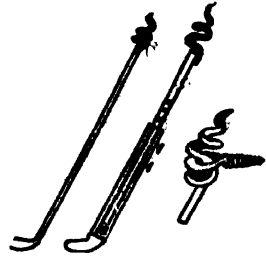
[চিত্র ১৬.২]
ধারক বা 'ব্রেস'

বেদী, ধাপ অথবা অনুরূপ ভারী উপকরণ, কিম্বা যেসব দৃশ্যপট ল্যাসিং বা ধারকের সাহায্যে প্রয়োজনমতো মজবুতভাবে দাঁড় করানো সম্ভবপর নয়, সেগুলি অন্যান্য অংশের সঙ্গে নাটবল্টু অথবা খোলা কব্জার সাহায্যে জোড়া দরকার।

দৃশ্য পরিবর্তনের বিবিধ কৌশল

একটি মাত্র দৃশ্যপটের সম্মুখে যখন সম্পূর্ণ নাটক অভিনীত হয়, তখন নেপথ্যে আনুষঙ্গিক যোগান দেওয়া ছাড়া মঞ্চ কর্ম্মীদের অন্য কোনও কাজ থাকে না। কিন্তু যে নাটকে একাধিক দৃশ্যপট ব্যবহার করা হয়, সে নাটকে নেপথ্য কর্ম্মীদের সর্বদা ব্যস্ত এবং সতর্ক থাকতে হয়।

আধুনিক রঙ্গমঞ্চে এই জাতীয় দৃশ্য পরিবর্তন নিঃশব্দে এবং অবিলম্বে ঘটানোর জন্য, কর্মদক্ষতা ছাড়াও, যান্ত্রিক সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে। মঞ্চ-শিল্পীও বিশেষ মঞ্চের অপসারণ কৌশল-বিশেষের বিষয়ে সম্যক অবগত হয়েই দৃশ্যপট রচনায় হস্তক্ষেপ করেন।

দৃশ্যপট দ্রুত পরিবর্তন করার সবচেয়ে পুরাতন প্রচলিত প্রথা **কভার-ডিসকভার** নামে সুপরিচিত। এই প্রথায়, জড়িয়ে তোলার উপযোগী পর্দায় আঁকা দৃশ্যপট, অথবা অর্দ্ধ-অর্দ্ধ অংশ উভয় দিকে সরিয়ে নেওয়ার উপযোগী ফ্ল্যাটে আঁকা দৃশ্যপট, দুয়ের যে কোনওটিই ব্যবহার করা যেতে

পারে। এই শ্রেণীর দৃশ্য পরিবর্তন কার্য্যকরী করার জন্য পর পর কয়েকটি দৃশ্য সাজিয়ে রাখা হয়। সাধারণতঃ জমকালোভাবে সাজানো দৃশ্যটিকে উর্দ্ধরঙ্গের শেষদিকে রেখে, সাদাসিধে দৃশ্যগুলি রাখা হয় সামনের দিকে। তারপর দৃশ্যান্তরের অন্ধকার বিরতিতে অনাবশ্যক দৃশ্য সরিয়ে বা প্রয়োজনীয় দৃশ্য ঢুকিয়ে দৃশ্যপটের পরিবর্তন সাধন করা হয়। ফ্ল্যাটগুলি সরলরেখায় এসে যেন সহজেই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তারজন্য উপরে কাঠের খাঁজ কাটা গলিপথ বা **ঝরি** লাগানো থাকে। ঘর্ষণের ফলে দৃশ্যপটের নিম্নাংশ যেন নষ্ট না হয়, অথবা পাটাতনে বাধার স্থষ্টি না করে, তার জন্য কাঠের **স্যাডেল** লাগানো থাকে ফ্ল্যাটের নীচে।

আমাদের দেশে সর্বাধুনিক যুগে দৃশ্যপট পরিবর্তন করার জন্য **ঘূর্ণায়মান মঞ্চের** ব্যবহার সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। এই ব্যবস্থায় রঙ্গপীঠের সর্বাধিক স্থান জুড়ে পাটাতনের একটি গোলাকার অংশ চাকা ও বিয়ারিংয়ের উপরে ঘোরানোর আয়োজন থাকে। এই চাকার এক তৃতীয়াংশে দৃশ্যপট সাজিয়ে এককালীন ব্যবহার করা হয় [চিত্র ১৭.১]। বাকী দুই-তৃতীয়াংশে পরের দুইটি দৃশ্যপট প্রস্তুত রাখা হয়। ঘূর্ণায়মান অংশটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রয়োজনীয় দৃশ্যটিকে নিয়ে আসা হয় মঞ্চমুখের দিকে। ঘোরানোর কাজ লোক লাগিয়ে অথবা বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে করার ব্যবস্থা থাকে।
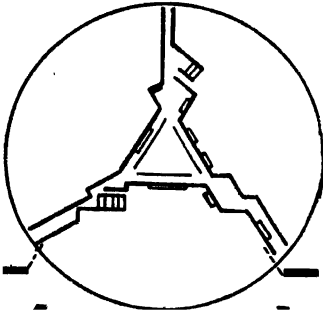
[চিত্র ১৭.১] ঘূর্ণায়মান মঞ্চব্যবস্থা

এই ব্যবস্থার প্রধান অসুবিধা, ঘূর্ণায়মান পাটাতনের এক তৃতীয়াংশ মাত্র ব্যবহার করা যায় দৃশ্যপট রচনার জন্য। মঞ্চের গভীরতম দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত কোনও দৃশ্য রচনা এই জাতীয় মঞ্চ ব্যবস্থায় সম্ভব নয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, দৃশ্যপট সংলগ্ন 'আসবাব বাতীগুলিতে' তড়িৎ সংযোগ বজায় রাখার জন্য এই ব্যবস্থায় ঘূর্ণায়মান অংশের কেন্দ্র বরাবর একটি 'প্লাগবাক্স' ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

একাধিক ঐককেন্দ্রিক ঘূর্ণায়মান পাটাতনের ব্যবস্থা থাকে কোনও কোনও মঞ্চে। বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে এই ব্যবস্থার চাকাগুলি সমগতিতে, অসমগতিতে বা বিপরীতমুখী গতিতে ঘোরানো যায়। নাটকের প্রয়োজনভেদে নিরূপিত হয় এর ব্যবহারের তারতম্য।

যেখানে মঞ্চের উপরে যথেষ্ট ফাঁকা জায়গা পাওয়া যায়, সেখানে **কড়িকাঠাম** থেকে সেট-লাইনের সাহায্যে দৃশ্যপটাদি টেনে উপরে তুলে নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই ব্যবস্থায় মঞ্চের পূর্ণ গভীরতা কাজে লাগানো যেতে পারে। ভারী দৃশ্যপটাদি সহজে টেনে তোলার জন্য **প্রতিচাপ** ব্যবস্থা থাকা সুবিধাজনক। নিরাপত্তার জন্য এই ব্যবস্থায় ব্যবহৃত দড়ি, চাকা এবং প্রতিচাপ ব্যবস্থা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য আয়োজন মাঝে মাঝে পরীক্ষা করে দেখা উচিত।

রঙ্গপীঠের উভয় পার্শ্বে যেখানে পর্যাপ্ত জায়গা পাওয়া যায়, সেখানে **শকট** বা 'ওয়াগন' ব্যবস্থার [চিত্র ১৭.২] সাহায্যে দৃশ্য পরিবর্তন করার আয়োজন করা সুবিধাজনক। এই ব্যবস্থায়, রঙ্গপীঠের দ্বিগুণ আয়তন বিশিষ্ট একটি পাটাতন, লাইনের উপরে চাকার সাহায্যে ডাইনে বাঁয়ে সরানো হয়ে থাকে। পাটাতনের যে কোনও একটি অর্দ্ধাংশ থাকে মঞ্চ-
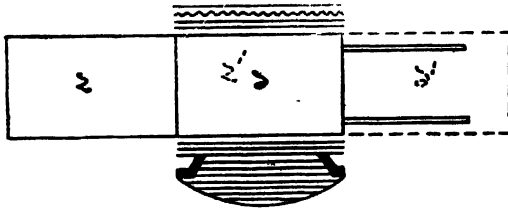
[চিত্র ১৭.২] শকট বা ওয়াগন মঞ্চ

মুখের পিছনে, বাকী অর্দ্ধাংশ ডাইনে অথবা বাঁয়ে পরবর্তী দৃশ্যসজ্জার জন্য খালি পাওয়া যায়। ম্যাজিক লণ্ঠনের স্লাইড বদল করার কায়দায়, এই জাতীয় মঞ্চে দৃশ্যপট বদলের কাজটি চলে।

জটিলতর আরও নানাবিধ ব্যবস্থা পাশ্চাত্য দেশসমূহে কাজে লাগানো হয় দৃশ্য পরিবর্তনের জন্য। প্রত্যেক ব্যবস্থারই কিছু না কিছু বিশেষ সুবিধার দিক আছে—কিন্তু আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ এবং সর্বাঙ্গীন ত্রুটিমুক্ত নয়। তবে এদেরই মধ্যে **এলিভেটার** এবং **সিজার্স** ব্যবস্থা দুটি বহুল প্রচারের ফলে সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।

এলিভেটর ব্যবস্থার কার্যপ্রণালী ওয়াগন ব্যবস্থারই অনুরূপ ; পার্থক্যের মধ্যে আলোচ্য ব্যবস্থায় দৃশ্যপট দুটি পাশাপাশি না থেকে, উপর নীচুভাবে থাকে [চিত্র ১৭.৩]। কপিকল ও প্রতিচাপ ব্যবস্থাদির সহায়তায়
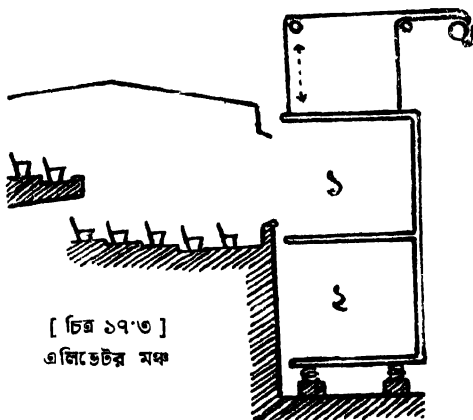
[চিত্র ১৭·৩]
এলিভেটর মঞ্চ

বৈদ্যুতিক শক্তিতে মঞ্চটি উপরে নীচে লিফ্‌টের মতো ওঠা-নামা করে। এলিভেটর ব্যবস্থায় ফ্লাই-এর মতো মঞ্চভূমির নীচেও পর্য্যাপ্ত স্থান থাকা দরকার

যে মঞ্চের উভয় পার্শ্বে জায়গা 'ওয়াগন' তৈরী করার উপযোগী নয়, সেই স্বল্প পরিসরে **সিজার্স** ব্যবস্থায় [চিত্র ১৭.৪] ওয়াগন-মঞ্চের সমস্ত সুবিধাই পাওয়া যায়। কাঁচির মতো দুটি পাটাতন এই ব্যবস্থায় কাজ করে। দৃশ্য চলাকালীন ব্যবহৃত পাটাতনটি মঞ্চমুখের পিছনে সমান্তরালভাবে থাকে—অন্য পাটাতনটি ব্যবস্থানুযায়ী একপাশে লম্বভাবে সরে যায়। পাটাতন দুটির এক একটি কোণ বিয়ারিং যুক্ত কীলকের সাহায্যে মঞ্চভূমিতে আটকানো থাকে ; বাকী অংশ চাকার সাহায্যে অর্দ্ধবৃত্তাকার রেলের উপরে ঘোরে।
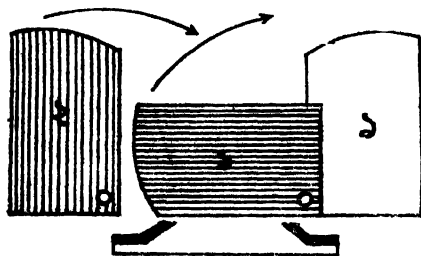
[চিত্র ১৭৪] সিজার্স মঞ্চ

এ' যাবৎ বর্ণিত আয়োজনগুলির একাধিক ব্যবস্থাও বহুমঞ্চে একই সঙ্গে কাজে লাগানো হয়। দুপাশে রাখা দুটি ঘূর্ণায়মান মঞ্চের পিছনে একটি ওয়াগন, সিজার্সের পিছনে ওয়াগন, অথবা ওয়াগনের মধ্যে ঘূর্ণায়মান পাটাতন প্রভৃতি তার দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাহ্যিক আয়োজনের অপেক্ষা না রেখে, দৃশ্যপটের মধ্যেই দৃশ্য পরিবর্তনের বহুবিধ উপায় মঞ্চশিল্পীর উদ্ভাবনীশক্তির পরিচয় বহন করে। কয়েকটি প্রচলিত উপায় সম্পর্কে নীচে আলোচনা করা হলো।

একটি ফ্ল্যাটের দুপাশে দুটি দৃশ্যপট আঁকা যেতে পারে। দৃশ্যান্তরের সময় ফ্ল্যাটগুলি ঘুরিয়ে নিলেই, সহজে পরিবর্তিত দৃশ্য [চিত্র ১৮.১] দেখানো যেতে পারে। এই ব্যবস্থায় ফ্ল্যাটগুলির উপরের রেলের কেন্দ্র ফ্লাই থেকে ঝোলানো দড়িতে বেঁধে রাখা দরকার। একটি ফ্ল্যাটের সঙ্গে অপর ফ্ল্যাটের বাঁধন ল্যাসের সাহায্য না নিয়ে, গেট হুক দিয়ে করতে হয়। সাধারণতঃ দুটি দৃশ্যের নাটকের পক্ষে এই ব্যবস্থা উপযোগী। দৃশ্যপট সাজানোর ধারাটি উভয়তঃই এক-রকমের থাকে। চিত্রায়ণের সময়,

[চিত্র ১৮.১] ফ্ল্যাটের দুইপিঠে আঁকা দৃশ্যপট

পরিকল্পনানুযায়ী হিসাবমতো পিছনের দৃশ্য আঁকতে হয়। ফ্ল্যাটের উল্টো পিঠে আঁকার জন্য দুপিঠেই ক্যাম্বিস লাগানো যেতে পারে। তবে ভাঙা বাড়ী, জঙ্গল প্রভৃতি দৃশ্য ফ্ল্যাটের পিছনে বাটাম ও কাপড়ে এঁকে সহজেই মিলিয়ে দেওয়া যায়।

ফ্ল্যাটের দুপিঠে ছবি আঁকারই আর একটি সংস্করণ **ড্রপিং ফ্ল্যাপ** প্রথা [চিত্র ১৮.২]। এই ব্যবস্থায় একটি মূল ফ্ল্যাট ধারকের সাহায্যে স্থায়ীভাবে দাঁড় করানো থাকে। উক্ত ফ্ল্যাটের সামনে একটি আধখানা ফ্ল্যাট কবজা দিয়ে জুড়ে এমনভাবে রাখা হয়, যা প্রয়োজনমতো মূল ফ্ল্যাটের উপর বা নীচের অর্দ্ধাংশ ঢেকে ফেলতে পারে। চিত্র আঁকা হয় মূল

ফ্ল্যাটের অর্দ্ধাংশ ও টুকরো ফ্ল্যাটের একপিঠ জুড়ে। প্রদত্ত চিত্রে এদের পরিবর্তন ক্রিয়াটি সঠিক বোঝা যাবে। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থাতেও দুটি দৃশ্যের নাটক ভালোভাবে পরিবেশন করা চলে।

[চিত্র ১৮.২] ড্রপিং ফ্ল্যাপ
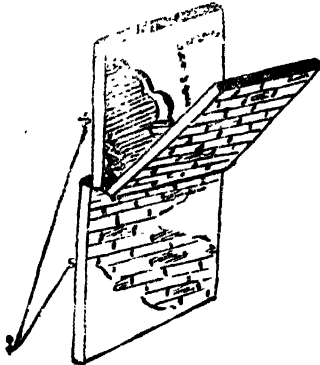
ড্রপিং ফ্ল্যাপের উন্নততর পর্য্যায় **বই খোলার কায়দায়** [চিত্র ১৮.৩] দৃশ্য পরিবর্তনের ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থায় অনেক-গুলি দৃশ্য দেখানো যেতে পারে। দুদিক থেকে দুটি ফ্ল্যাট ঘুরিয়ে এনে মাঝখানে মিলিয়ে দিলে, অথবা মাঝখান থেকে দুটি ফ্ল্যাট দুদিকে বইয়ের পাতা খোলার মতো খুলে নিলেই নূতন নূতন দৃশ্য বেরিয়ে আসবে। শুধু মাত্র কব্জার উপরে নির্ভর না করে, মজবুতভাবে দাঁড় করানো দুটি লোহার খুঁটির গায় সমগ্র ব্যবস্থাটির সংযোগ রাখা উচিত। পরিবর্তনের কাজটি নিঃশব্দ ও মসৃণ করার জন্য, ফ্ল্যাটগুলির মুক্ত অংশের নীচে চাকা বা বলকাষ্টার লাগানো হয়। এই ব্যবস্থায় একমাত্র শেষের ফ্ল্যাটে ছাড়া, ব্যবহারোপযোগী দরজা জানালা রাখা সম্ভব নয়।
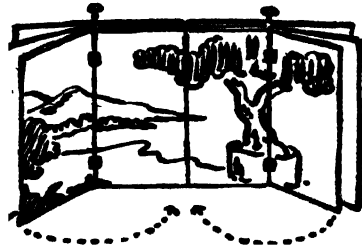
[চিত্র ১৮.৩] বই খোলার কায়দায় দৃশ্যপরিবর্তন ব্যবস্থা

দৃশ্যপটের কোনো একটি অংশ অপসারণ করে, অথবা নূতন অংশ জুড়ে নূতন পরিবেশ সৃষ্টি করার কায়দাটিও পরিকল্পনাকারীর দক্ষতার পরিচয় বহন করে। বিশেষ একটি দেয়াল সরিয়ে, দরজাকে জানালায় পরিণত করে, অথবা সিঁড়ী, ধাপ বা খিলান যোগ দিয়ে দৃশ্যপটের আদল বদলানো যায়। একই দৃশ্যপট ভিন্নভাবে সাজিয়েও পৃথক স্থান

বোঝানো যেতে পারে। চাকার উপরে সংস্থাপিত বিন্যাসধর্মী দৃশ্যপটের দিক-পরিবর্তন ঘটিয়েও স্থানের পরিবর্তন বোঝানো যায়। ক্ল্যাশিক নাটকাবলীর পক্ষে শেষোক্ত দৃশপরিবর্তনের কায়দাটি বিশেষভাবে উপযোগী।

অধিরঙ্গ ও এরিণা

পূর্বে বলা হয়েছে, রঙ্গপীঠের সামনে যে বর্ধিত অংশটুকু থাকে, তাকে **অধিরঙ্গ** বা 'এপ্রণ' বলে। এই অধিরঙ্গকে আরও বাড়িয়ে একটি অতিরিক্ত রঙ্গপীঠ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। দৃশ্যপটাদির ব্যবহার অবশ্য মূল রঙ্গপীঠের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

এই বর্ধিত রঙ্গপীঠ-যুক্ত মঞ্চব্যবস্থাকে **অধিরঙ্গমঞ্চ** বা 'থ্রাষ্ট্ ষ্টেজ' [চিত্র ১৯.১] নামে অভিহিত। মূল রঙ্গপীঠে দৃশ্যপটাদির পটভূমিতে
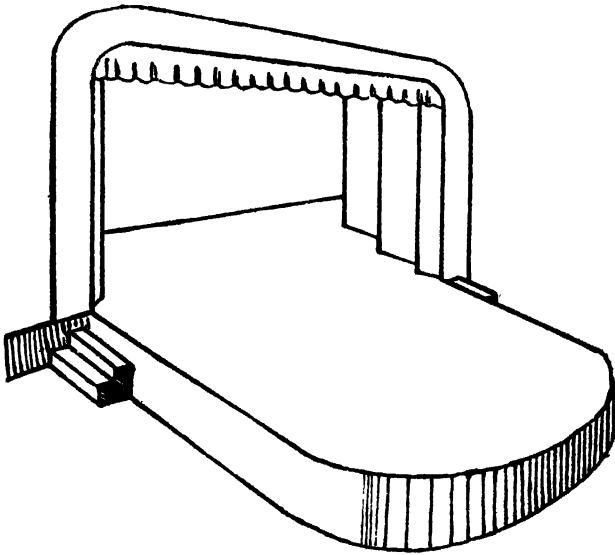
[চিত্র ১৯.১] অধিরঙ্গ মঞ্চ

কোনও দৃশ্যের সূত্রপাত করে, দৃশ্যের শেষাংশে চরিত্রগুলি এগিয়ে আসে এই অধিরঙ্গে। পিছনে যবনিকা বন্ধ করে, সেই অবকাশে দৃশ্যপট বদলে নেওয়া যেতে পারে।

প্রায় ক্ষেত্রে অধিরঙ্গের তিনদিক ঘিরে দর্শকের আসন থাকে। তাই অধিরঙ্গে এগিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাকে দর্শকের খুব কাছে নিয়ে আসা হয়।

ঘটনাকে দর্শকের কাছে বা মাঝে নিয়ে আসার প্রেরণা থেকেই আর এক রকমের মঞ্চ ব্যবস্থা অতি সম্প্রতি জনপ্রিয়তা অর্জন করতে চলেছে।
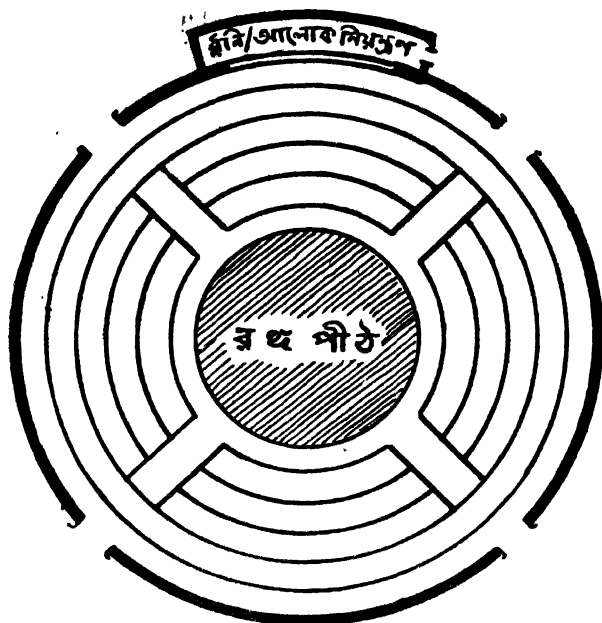
[চিত্র ১৯.২] এরিণা মঞ্চ

এরিণা বা 'কেন্দ্রায়ত অভিনয়' ব্যবস্থার [চিত্র ১৯.২] একটি প্রাচীনরূপ অবশ্য দেখা যায় আমাদের লোকনাট্য-শিল্প যাত্রাগানের আসরে। তবে যাত্রার আসর অস্থায়ী ব্যবস্থা। এরিণার স্থায়ী মঞ্চে দৃষ্টিরেখার উৎকর্ষ, আলোকসম্পাতের আধুনিক ব্যবস্থা, প্রবেশ নির্গমনের একাধিক পথ ইত্যাদি গবেষণালব্ধ বহুবিধ উন্নত প্রণালী সংযুক্ত হয়েছে। কলিকাতায় ১৯৭৬ সালে গঠিত **সারকারিণা** রঙ্গমঞ্চ এই জাতীয় এরিণা রঙ্গালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আধুনিক উদাহরণ, যেখানে রঙ্গপীঠটি শুধু ঘূর্ণায়মানই নয়, সেইসঙ্গে বাতাসের চাপে ওঠা নামায় সক্ষম। ফলে দৃশ্যান্তরের ক্ষেত্রে

।খানে আসবাবপত্র ও আনুষঙ্গিকাদি বদল করা খুবই সহজসাধ্য— এবং হ দৃশ্যেই সুস্থির মঞ্চচিত্রকে সবার দিকে ঘুরিয়ে দেখানো সম্ভব হচ্ছে।

বলাবাহুল্য, অধিরঙ্গে বা এরিণায় এমন কোনও আসবাব বা দৃশ্যানুষঙ্গ ব্যবহার করা চলবেনা, যা দৃষ্টিরেখা ছিন্ন করতে পারে। এই কারণে, দেয়াল বা উঁচু আসবাবের ব্যবহার এখানে সম্ভব নয়। নাট্য ঘটনার সঙ্গে দর্শকের একাত্মবোধটুকুই এই জাতীয় মঞ্চব্যবস্থায় উপরি লাভ। সুপরিকল্পিতভাবে ইংগিতধর্মী দৃশ্য-আনুষঙ্গিকের ব্যবহার অধিরঙ্গ বা এরিণায় এক নূতন স্বাদ এনে দেয়।

সংরক্ষণ

প্রত্যেক স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে অব্যবহৃত দৃশ্যপটগুলি মঞ্চ থেকে সরিয়ে সংরক্ষণ করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাযুক্ত ভাণ্ডার থাকে। সাধারণভাবে বলা যায়, জড়িয়ে তোলার দৃশ্যপটগুলি ভাঁজ না করে, কাঠের রোলারে জড়িয়ে উঁচু মাচায় তুলে রাখা উচিত। ফ্ল্যাটগুলি বিশেষভাবে তৈরী করা র‍্যাকে পাশাপাশি এমনভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা দরকার, যেন প্রয়োজনের সময় যে কোনও ফ্ল্যাট অবিলম্বে টেনে বের করে আনা যেতে পারে। ফ্ল্যাটগুলির বাইরের দিকে চওড়া অংশে ফ্ল্যাটের পরিচয়জ্ঞাপক সংখ্যা, অক্ষর বা নাম লিখে রাখলে, চেনার পক্ষে সুবিধা হয়। একটির উপরে আর একটি ফ্ল্যাট চাপিয়ে রাখলে, শুধু যে বের করার অসুবিধা হয় তাই নয়; নীচের ফ্ল্যাটগুলি উপরের ফ্ল্যাটের চাপে বেঁকে বা ভেঙে যেতে পারে।

ভাণ্ডারে সংরক্ষণ করার আগে ফ্ল্যাটের গায় যুক্ত দরজা, জানালা, ছবি, কার্ণিস প্রভৃতি খুলে পৃথক ভাবে রাখতে হবে। নানা প্রয়োজনে ফ্ল্যাটের গায় পেরেক মারা হয়, বা ছবি টাঙানোর হুক লাগানো হয়। সংরক্ষণের আগে সেগুলি খুলে ফেলা উচিত।

সংরক্ষণের যায়গাটি যেন সর্বতোভাবে শুষ্ক রাখার দিকে যত্ন নেওয়া হয়। অগ্নিনিরোধক দ্রব ব্যবহৃত হলেও, ভাণ্ডার কক্ষটি সম্পূর্ণরূপে আগুনের আওতার বাইরে রাখা উচিত। এছাড়াও, অগ্নি নির্বাপণের যাবতীয় সরঞ্জাম কাছাকাছি মজুদ রাখা নিরাপদ।

প্রমাণ আকারের একটি ফ্ল্যাট স্থানান্তরিত করার কাজে সর্বদাই দুজন লোকের হাত লাগানো দরকার। ফ্ল্যাটটি যেদিকে নিয়ে যাওয়া হবে, সেইদিকের নিম্নভাগ জমি থেকে ফুটখানেক তুলে, পিছনের কোণাটি

জমিতে ঘষে, খাড়াভাবে [চিত্র ২০] ফ্ল্যাট নিয়ে যাওয়া উচিত। কোনওক্রমেই ষ্ট্রেচারের মতো দুদিক থেকে তুলে ফ্ল্যাট নিয়ে যাওয়া উচিত নয়।

সেট লাইনে ঝুলিয়ে রাখা ভারী দৃশ্যপটগুলি, কাজের পর নামিয়ে রাখতে হবে। অযথা ভার চাপানো থাকলে সেট লাইনের দড়ি দুর্বল হয়ে যাবে। দৃশ্যপট খুলে নেওয়ার পর, সেট লাইনে একটি হাল্কা ব্যাটেন অথবা সাধারণ বাঁশ বেঁধে রাখতে হয়। নচেত দড়িগুলি ভারমুক্ত হওয়ার ফলে কপিকল থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তাছাড়া, কিছুমাত্র ভার না থাকলে, প্রয়োজনের সময় সেট লাইনের দড়ি নামিয়ে আনা যাবে না। অপেক্ষাকৃত হাল্কা পর্দাগুলি অবশ্য সেট লাইনে ঝুলিয়ে রাখাই নিরাপদ।
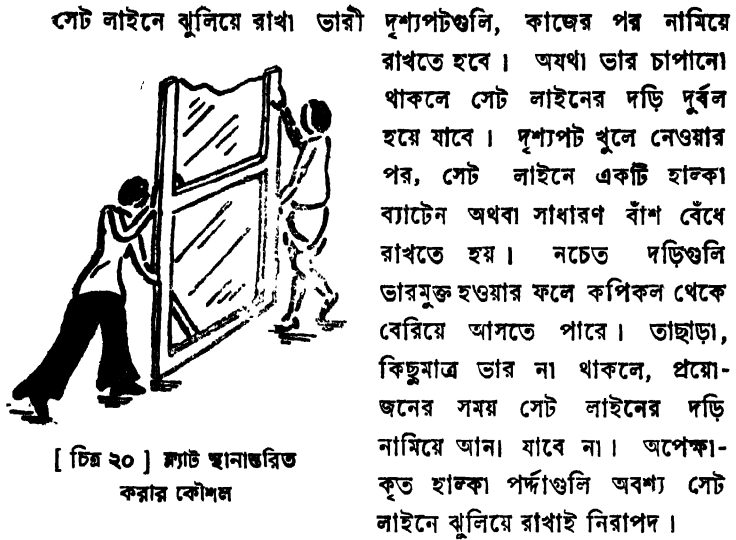
[চিত্র ২০] ফ্ল্যাট স্থানান্তরিত করার কৌশল

জল এবং আগুনের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখার মতো, উইপোকা এবং ইঁদুরজাতীয় ক্ষতিকর প্রাণীর উপদ্রব থেকেও দৃশ্যপট সংরক্ষণের ব্যবস্থাটিকে নিরাপদ করা দরকার। এর জন্য প্রয়োজনমতো ঔষধ ছড়ানো এবং নিয়মিত দৃষ্টি রাখা বিশেষ আবশ্যক।

ছোটখাটো আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি নষ্ট না করে, ভাঁড়ারে তুলে রাখলে, পরবর্তী অনুষ্ঠানে প্রায়ই কাজে লাগে। পৃথকভাবে চিহ্নিত বা নামাঙ্কিত পায়রার খোপের মতো ব্যবস্থায় এগুলি সংরক্ষিত হলে, প্রয়োজনের সময় খুঁজে বের করতে কষ্ট হয় না।

ভ্রাম্যমান দলের উপকরণ বৈশিষ্ট

নাটক নিয়ে আমাদের দেশে, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে, আজ পরীক্ষা-নিরীক্ষা আন্দোলনের অবধি নেই। ষাঠ এবং সত্তর এই দুই দশকে নূতন একটি জিনিষ আমরা পেয়েছি—তা হচ্ছে নাটক-অভিনয়ের প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতাগুলিতে যোগদানের জন্য তো বটেই, তাছাড়া সৌজন্য সফরে, অথবা নেহাতই পেশাদার দল হিসাবে নাট্য সম্প্রদায়গুলি আজকাল প্রায়শঃই

ঘুরে বেড়াচ্ছেন শহরে শহরতলীতে। যাত্রাদলগুলিকেও এই সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, কারণ আজকাল প্রায় দলই কিছু না কিছু মঞ্চ স্থাপত্যের সাহায্য নিচ্ছেন তাঁদের নাটক পরিবেশনের কাজে।

বলা বাহুল্য, এইসব ভ্রাম্যমান দলের জন্য মঞ্চ পরিকল্পনা করার সময়, মঞ্চশিল্পী যেন এর বিশেষ সুবিধা অসুবিধার দিকগুলি স্মরণে রেখে কাজে হাত দেন।

ভ্রাম্যমান নাট্যগোষ্ঠী-র কথা আগে ধরা যাক।

পূর্ণদীর্ঘ নাটকের জন্য বহু দৃশ্যপটের পরিকল্পনা এখানে সুকৌশলে বর্জন করতে হবে। **একক দৃশ্য সজ্জা**ই এসবক্ষেত্রে সবচেয়ে কার্য্যকরী। **বিন্যাসধর্মী** পরিকল্পনা গ্রহণ করা সম্ভব হলে, একাধিক নাটক একই উপকরণ দিয়ে চালিয়ে নেওয়া যাবে। একাংক নাটকের জন্য **ইঙ্গিতধর্মী**, **ভাবধর্মী** বা **প্রতীকধর্মী** দৃশ্যসজ্জা আজকাল খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। বহন করার বিষয়টি স্মরণে রেখে, এর যে কোনও ধারায় ভ্রাম্যমান দলের জন্য দৃশ্য রচনায় হাত দেওয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রধান স্মরণীয় বিষয়— ১) দৃশ্যপট নির্মাণের উপকরণগুলি পারতপক্ষে দ্বিমাত্রিক হওয়া উচিত, (২) ত্রিমাত্রিক বিষয়ের জন্য দ্বিমাত্রিক একাধিক পটকে কব্জার সাহায্যে ভাঁজ করা অবস্থায় লাগানোর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে, (৩) নির্মাণের উপকরণগুলি হাল্কা অথচ মজবুত হওয়া দরকার, (৪) নক্সা বা কারুকার্য্য সরাসরি দৃশ্যপটের গায় না এঁকে, পৃথক সংযুক্তি হিসাবে রাখলে, দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যাবে, (৫) কোনও ফ্ল্যাটের আকার এমন হওয়া উচিত নয়, যা লরির ডালার মধ্যে [ন্যূনাধিক ৬ ফুট] ধরবে না এবং (৬) ভারবাহী অংশগুলি খুলে ভাঁজ করে নেওয়ার উপযোগী হিসাবে গঠিত হওয়া দরকার। মঞ্চানুষঙ্গিকগুলি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্থানীয় উদ্যোক্তারা সংগ্রহ করে দিতে পারেন—সুতরাং বহন করা জিনিষের তালিকা থেকে ওইগুলি বাদ রাখা যেতে পারে।

যাত্রাদলে মঞ্চ স্থাপত্যের নমুনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক।*

এক্ষেত্রে কেন্দ্রায়ত রঙ্গমঞ্চের বিধিনিষেধ প্রণিধানযোগ্য। বলা বাহুল্য,

একটি সুপরিকল্পিত কেন্দ্রায়ত রঙ্গালয়ে দর্শকদের ঢালুভাবে সাজানো আসনশ্রেণী দৃষ্টিরেখার যে উৎকর্ষ সৃষ্টি করে, যাত্রাপালার জন্য সাময়িক-ভাবে তৈরী আসরে সে উৎকর্ষ আশা করা যায় না। তাই পালাগানের এইসব আসরে মঞ্চ স্থাপত্যের গণ্ডীও ভীষণভাবে সীমাবদ্ধ। দেখা গেছে, ন্যূনাধিক আঠারো থেকে বিশ ইঞ্চির বেশী উঁচু হলেই, যে কোনও মঞ্চসজ্জা যাত্রার আসরে দৃষ্টিরেখায় বাধা দেয়। মঞ্চসজ্জাটি অবশ্য যদি আসরের পিছন দিক চেপে রাখা হয়, তবে তা দুই-আড়াই ফুট পর্য্যন্ত উঁচু করা চলে।

যাত্রা পালার জন্য **বিন্যাসধর্মী** দৃশ্যসজ্জাই সবচেয়ে সাহায্যকারী। যেহেতু বেশীরভাগ যাত্রাদলের নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা আছে, সেই হেতু উপ-করণ গড়ার সময় অনায়াসে তার আকার ও পরিমাপ নির্ভুলভাবে স্থির করা সহজতর। দেখা গেছে, ভাঁজ করা বা খুলে জোড়ার মতো উপকরণের চেয়ে, মজবুত ছোট উপকরণ দীর্ঘ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশী টেকসই হয়। পরি-কল্পনা করে তৈরী করলে, বহু ভারবাহী উপকরণকে আনুষঙ্গিক বা সাজসজ্জা-সরঞ্জাম ইত্যাদি রাখার বাক্স হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রয়োগ-অভ্যাস

প্রত্যেক বিষয়ে শিক্ষালাভের শেষ-কথা প্রয়োগ এবং অভ্যাস। একটি নাটকের একটি দৃশ্য পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার পরিবেশ বোঝানোর চেষ্টায় একটি নক্সা এঁকে ফেলতে হবে। এর ভিতর দিয়ে আসবে মনের ভিতরে ফুটে ওঠা ছবিটিকে কাগজে-কলমে ফুটিয়ে তোলার অভ্যাস। নাটক মঞ্চস্থ করার সুযোগ এলেই, গতানুগতিক ভাড়া করে আনা দৃশ্যপটাদির বদলে, নিজের ধারণা অনুযায়ী নতুন কিছু করা যায় কিনা, সেটা ভেবে দেখতে হবে—আর তার ভিতর দিয়েই আসবে মঞ্চশিল্পী হিসাবে আত্ম-প্রকাশের সুযোগ। ক্রমশঃ হাতে কলমে কাজ করতে করতে দেখা যাবে কি অফুরন্ত গবেষণার অবকাশ লুকিয়ে আছে এই **পটলিখনে**র মাঝে।

অনুশীলনী

পটলিখন-বিষয়ক বিবিধ প্রশ্নাবলী

১। চিত্রসৃষ্টি ও সঠিকতার দিক থেকে দৃশ্যপরিকল্পনাকে কি ধরণের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়? কোন শ্রেণীর ত্রুটির ফলে দৃশ্যপট দৃষ্টিবিক্ষেপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়, উদাহরণসহ বুঝিয়ে দাও।

২। দৃশ্যপট ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কি? ইঙ্গীতধর্মী ও ভাবধর্মী মঞ্চপরিকল্পনার মধ্যে পার্থক্য কি? কোন শ্রেণীর নাটকের প্রয়োজনে বিন্যাসধর্মী মঞ্চপরিকল্পনা সার্থকরূপে ব্যবহার করা যেতে পারে?

৩। দৃশ্যপটকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য কি কি বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া উচিত, দৃষ্টান্তসহ বুঝিয়ে দাও। দৃশ্যপটে ব্যবহৃত কারুকার্য্যগুলিকে অতিরঞ্জিত করার প্রয়োজন কি, এবং কিভাবে তা করা হয়?

৪। বিশেষ কোনও মঞ্চের জন্য দৃশ্যরচনার সময়, পরিকল্পনাকারীর পক্ষে কি কি বিষয়ে সচেতন হয়ে কাজে হাত দেওয়া উচিত? 'দৃষ্টিরেখা' কা'কে বলে? দৃষ্টিরেখার উপরে দৃশ্যপটের আকৃতি ও বিন্যাস কিভাবে নির্ভর করে বুঝিয়ে দাও।

৫। সচরাচর ব্যবহৃত দৃশ্যপটের উপকরণগুলি কয়ভাগে শ্রেণী-বিভক্ত করা যায়? এমন একটি বহির্দৃশ্য ও একটি আভ্যন্তরীণ দৃশ্যপরিকল্পনার উদাহরণ দাও, যেখানে সবকয়টি শ্রেণীর উপকরণ কাজে লাগানোর প্রয়োজন হবে।

৬। দৃশ্যপটগুলিকে ব্যবহারিক দিক থেকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? প্রত্যেক বিভাগের অন্যূন তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়ে তাদের গঠন ও ব্যবহার বর্ণনা কর।

৭। একক দৃশ্যসজ্জা কাকে বলে? দৃষ্টান্তসহ একক দৃশ্যসজ্জায় দৃশ্যপরিবর্তনের যে কোনও একটি রীতি বুঝিয়ে দাও।

৮। দৃশ্যপটের 'গঠন নির্দ্দেশিকা' বলতে কি বোঝায়? দৈর্ঘ্যচ্ছেদ ও প্রস্থচ্ছেদ চিত্রের পার্থক্য কি? পরিকল্পনার সুরু থেকে গঠন-নির্দ্দেশিকা তৈরী করা পর্য্যন্ত, মঞ্চশিল্পীর কাজের ক্রমগুলি বর্ণনা কর।

৯। কাঠের দাম হাজার ঘনফুট প্রতি ১১২০.০০ টাকা। একটি ১২'×৬' টুফোল্ড, দুইটি ১২'×২' জগ এবং একটি ১২'×৬' ডোর ফ্ল্যাট তৈরী করতে কাঠের জন্য কত খরচ পড়বে?

১০। বস্তুর ভারবহন ক্ষমতা কিসের উপরে নির্ভর করে? একটি কাঠের কড়ির ভারবহন-ক্ষমতা নির্দ্ধারণের নিয়ম কি?

১১। 'মর্টিজ ও টেনন জয়েণ্ট' এবং 'টাং ও গ্রুভ জয়েণ্টে' চরিত্রগত পার্থক্য কি? ফ্ল্যাট তৈরীর সময় কোন শ্রেণীর জোড়া-লাগানোর ধারা সুবিধাজনক ও মজবুত হবে? একটি সিঁড়ীর ধাপ তৈরী করার কাজে কোন কোন শ্রেণীর জোড়া লাগানোর ধারা ব্যবহৃত হয়?

১২। সজ্জানুষঙ্গিক ও সঙ্গানুষঙ্গিকের মধ্যে প্রভেদ কতখানি? একই বস্তু একাধিক শ্রেণীর আনুষঙ্গিক হিসাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার তিনটি উদাহরণ দাও।

১৩। প্যারিস প্লাষ্টারের ছাঁচ তৈরী করা থেকে সুরু করে, পেপিয়ার-ম্যাসে প্রণালীতে একটি ত্রিস্তর কার্ণিসের প্রতিরূপ গড়ার পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা কর।

১৪। 'সাইজ ওয়াটার' কাকে বলে এবং কি কাজে ব্যবহৃত হয়? দ্বিতীয় বর্ণ প্রলেপের সময় কি কি কারণে পূর্ববর্তী প্রলেপের রং তুলিতে উঠে আসার সম্ভাবনা থাকে?

১৫। রঙ ছিটিয়ে ছবি আঁকার সার্থকতা কি? বিভিন্ন ধারার রঙ লাগানোর পদ্ধতি ও ফলাফলের সঙ্গে, ছিটিয়ে আঁকার পদ্ধতি ও ফলাফলের তুলনা কর।

১৬। 'সদৃশ বর্ণ' বলতে কি বোঝায়? চিত্রিত ছায়া আঁকার জন্য কোন কোন রঙ ব্যবহার করা উচিত? দৃশ্যপটে সদৃশ বর্ণ এবং প্রতিপূরক বর্ণের ব্যবহার পদ্ধতি বুঝিয়ে দাও।

১৭। ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ব্যবহার, সুবিধা ও অসুবিধার উপরে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা কর। ওয়াগন ও সিজার্স মঞ্চ ব্যবস্থা দুটির সুবিধা-অসুবিধার দিক থেকে তুলনা কর।

১৮। বাহ্যিক আয়োজনের অপেক্ষা না রেখে, দৃশ্যপটকে দ্রুত পরিবর্তনের বিষয়ে কিভাবে স্বয়ং-নির্ভর করে তোলা যায়? দৃষ্টান্তসহ তিনটি উপায় বর্ণনা কর।

১৯। দৃশ্যপটাদি সংরক্ষণের জন্য কি কি বিষয় প্রণিধানযোগ্য?

২০। নীচের বিষয়গুলির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(ক) চতুর্থ প্রাচীর,
(খ) প্রতিচাপ ব্যবস্থা,
(গ) টুফোল্ড ও রিটার্ণ,
(ঘ) বলয়পট ও গম্বুজ,
(ঙ) ভূমিপট,
(চ) টেমপ্লেট,
(ছ) সেলাষ্টিক,
(জ) বর্ণচক্র,
(ঝ) ল্যাসিং ও ব্রেসিং,
(ঞ) কভার-ডিস্কভার প্রথা।

*২১। নীচের বর্ণনা অনুযায়ী দৃশ্য পরিকল্পনা কর। প্রত্যেকটি পরিকল্পনায় নক্সা, ভূমিচিত্র এবং গঠন নির্দেশিকা দাখিল করতে হবে :—

(ক) পাঞ্চাল-নন্দিনীর বিবাহ-আসর। উর্দ্ধ দক্ষিণে কয়েক ধাপ উঁচু বেদীর উপরে পাঞ্চাল পক্ষের স্থান। বাম রঙ্গ জুড়ে অতিথি রাজন্যবর্গের বসার জায়গা। নিম্নমধ্যরঙ্গে জলকুণ্ডের পাশে ধনুর্বাণ রাখার আসন। নিম্ন দক্ষিণ রঙ্গে সাধারণ প্রজাদের জন্য সামান্য উঁচু ধাপ। খিলান ও থামগুলিতে পৌরাণিক পটভূমির ছাপ ফুটিয়ে তুলতে হবে।

(খ) মোগল শিবিরের অভ্যন্তর। দুইপাশে বর্শা ও ঢাল। দুটি প্রবেশ পথের মাঝে উঁচু বেদীতে বাদশার আসন। দুইপাশে উজীর ওমরাহ ও সৈন্যাধ্যক্ষদের স্থান। দৃশ্যারম্ভে নৃত্যগীতাদির পর মধ্যরঙ্গে আসন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে মানচিত্রাদি নিয়ে আলোচনা হবে।

* এই প্রশ্নগুলি অনুসরণে পূর্ণাঙ্গ দৃশ্যপট অথবা ক্ষুদ্রায়তন প্রতিরূপ নির্মাণের অভ্যাসও করা যেতে পারে।

(গ) নীলকর সাহেবের কুঠি। বারান্দার কিয়দংশ এবং বাগান দেখা যাবে একপাশে। জনৈক উৎপীড়িত চাষী জানালা টপকে ভিতরে ঢুকে সাহেবের শিশুপুত্রকে তুলে নিয়ে পালানোর সময়, ছুটে আসবেন শিশুর জননী ভিতরের ঘর থেকে। তাঁর আর্ত্ত চিৎকারে মালী, দারোয়ান, দাস-দাসীরা বিভিন্ন পথে ঢুকে ঘিরে ফেলবে তাকে। এমন সময় সিঁড়ীর মাথায় চাবুক হাতে দেখা যাবে সাহেবকে।

(ঘ) কানাগলিতে পাশাপাশি দুটি বাড়ী—আটের 'এ' এবং আটের 'বি'। বাড়ী দু'টি কোনও এক সময় একই মালিকানায় ছিল। অতি সম্প্রতি তার এক অংশ একজন ধনী ক্রেতা কিনে নিয়ে বসবাস করছেন।

রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টের নীচে ডাষ্টবিন। তার পাশে আস্তানা নিয়েছে একটি রিফিউজি পরিবার। তাদের অস্থায়ী বাসস্থান এবং রান্নার ব্যবস্থা ফুটপাথের অনেকখানি জুড়ে আছে। বাড়ী দুটির রোয়াকে পাড়ার ছেলেদের আড্ডা বসে।

(ঙ) দ্বিতলে আধুনিককেতায় সাজানো ড্রইংরুম—পিছনে ঝোলা বারান্দায় মধুমালতীর লতা এবং টবে অন্যান্য ফুলের গাছ। পিছনে আকাশের পটভূমিতে গাছপালার মাথা দেখা যাচ্ছে। এই ড্রইংরুম থেকে দুটি পৃথক শয়নকক্ষে এবং রান্না ঘরে ঢোকা যায়। আনুষঙ্গিক ও আসবাব পত্রের মধ্যে সোফাসেট, বইয়ের সেল্‌ফ্‌, তেপায়ার উপর রাখা টেলিফোন, একটি স্ট্যাণ্ড ল্যাম্প এবং অগ্নিস্থলীর উপরে রাখা স্ট্যাচিউ লক্ষণীয়। ঘরের রুচী ও অবস্থার সঙ্গে মানায়, এমন কিছু ছবি ও পর্দ্দা ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে।

২২। উপরের প্রশ্নে দেওয়া দৃশ্যগুলির জন্য আনুষঙ্গিকের তালিকা প্রস্তুত করে তাদের শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী পৃথক পৃথক স্তম্ভে নথিভুক্ত কর।

দীপ
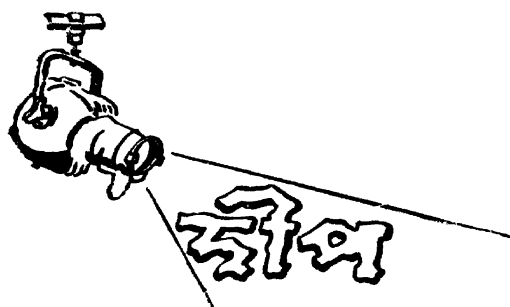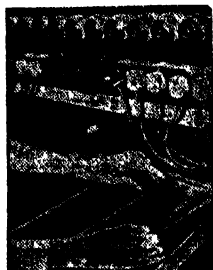
দীপচিত্রণ

সর্বাধুনিক নাট্যউপস্থাপনায় দীপচিত্রণ তথা আলোক-সম্পাতের ভূমিকা নেপথ্য কর্মগুলির মধ্যে প্রায় প্রধানতম হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেকক্ষেত্রে দৃশ্য রচনার দায়ীত্বও তুলে নিচ্ছেন আলোক-সম্পাত শিল্পী—এবং সেসব ক্ষেত্রে শূন্যমঞ্চের পিছনে টাঙানো একটি সাদা পর্দাই মঞ্চ-আনুষঙ্গিকের একমাত্র উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্থায়ী বলয়পট বা গম্বুজ থাকলে, দীপচিত্রণের কাজ আরও উন্নত মানের হতে পারে।

অবশ্যই আজকের দীপচিত্রণ-শিল্পীর হাতিয়ার হচ্ছে আলোক-সম্পাতের জন্য ব্যবহৃত আধুনিক বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসমূহ। শুধু বিভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন রকমারী রশ্মিকোণযুক্ত স্পটবাতী, ফ্লাডবাতী বা প্রদীপ ভাণ্ডারই নয়, তাদের বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখার সুব্যবস্থাও এই সরঞ্জামের অঙ্গ। এমন সব দূর ক্ষেপনসক্ষম স্পটবাতী তৈরী হয়েছে, যার রশ্মিকোণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই সংহত বা প্রসারিত করা যায়। শুধু তাই নয়, এদের মুখে স্বয়ংক্রিয় বর্ণ-পরিবর্তক লাগিয়ে এগুলি প্রেক্ষার বিভিন্ন স্থান থেকে সর্বতোভাবে ব্যবহার করা চলে, যেখানে কোনও সহকারীকে পাঠানোর প্রয়োজনই হয় না।

নানা ধরণের কারসাজিকল এদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে মঞ্চচিত্রকে বাস্তবধর্মী করে তোলার কাজে। শুধু বাস্তবধর্মী নয়, চলচ্চিত্রের 'অপটিক্যাল ইল্যুসানে'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মঞ্চেও আজ সম্ভব-অসম্ভব নানা মঞ্চমায়া সৃষ্টি করা হচ্ছে আলোর সাহায্যে।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বে যন্ত্রই শেষ কথা নয়। পরিকল্পনাকারীর স্থান সবার উপরে। আলোক-সম্পাতের পরিকল্পনাকারী হতে হলে, আগে নাটক বুঝতে হবে। সেই সঙ্গে নিজের লক্ষ্য করার এবং লক্ষ্য করে দেখা অবস্থাকে মনে রাখার ক্ষমতা বাড়িয়ে তুলতে হবে অভ্যাসের সাহায্যে।

নাটকে অনেকক্ষেত্রেই নাট্যকার তাঁর নিজের ধারণামতো ঘটনাস্থল এবং সময়ের বর্ণনা দিয়ে থাকেন। অনেকক্ষেত্রে তা দেওয়া থাকেনা।

দেওয়া থাক বা না থাক, আলোকসম্পাত শিল্পীরই দায়ীত্ব, তার মনশ্চক্ষে নাটক বর্ণিত ঘটনাস্থলের আবহাওয়া কল্পনা করা। এই কল্পনার ছবি তখনই পরিস্কার হয়ে ফুটে উঠবে, যদি পরিকল্পনাকারীর স্মৃতিভাণ্ডারে সম্ভাব্য বিভিন্ন অবস্থার ছবি স্পষ্টভাবে এবং সঠিকভাবে মজুদ থাকে।

এই মজুদ স্মৃতিভাণ্ডারকে যন্ত্রপাতির সাহায্য নিয়ে কিভাবে মঞ্চে রূপায়িত করা হবে, তারই বৈজ্ঞানিক আলোচনা এই 'দীপচিত্রণ' অধ্যায়। সব তত্ত্বের মতোই এই তত্ত্বমূলক অধ্যায়কে ব্যাকরণ মাত্র বলা যেতে পারে। ভাষা শিক্ষার জন্য, ভাষার উপরে দখল আনার জন্য ব্যাকরণ শিখতেই হবে। তারপর সাহিত্য-সৃষ্টি করবে প্রতিভা। ব্যাকরণ তখন চাপা পড়ে যাবে মাটি চাপা দেওয়া বনেদের মতো চোখের আড়ালে।

নাটক পড়ে, প্রতিটি দৃশ্যের মেজাজ ধরতে পারার অভ্যাস করা একান্ত প্রয়োজন। সেই সঙ্গে তড়িৎ বিজ্ঞান সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকলেই চলবে। [আলোকসম্পাত পরিকল্পনাকারীকে তড়িৎ-বিশারদ না হলেও চলে, কারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দায়ীত্ব ভিন্ন লোকের হাতে রেখেও পরিকল্পনাকে রূপায়িত করা সম্ভব।]

নির্দেশকদের পক্ষেও দীপচিত্রণের মূল কথাটুকু জেনে রাখা আজকের নাট্য প্রয়োগরীতিতে খুবই দরকারী। পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দীপচিত্রণের তত্ত্ব ও প্রয়োগগত দিকগুলি বিশদভাবে আলোচিত হলো।

এক আলোকসম্পাতের প্রয়োজনীয়তা

ইতিকথা মঞ্চাভিনয়ের যে ধারা আজ সারা পৃথিবীতে সুপরিচিত, এর সূত্রপাত খ্রীঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দীর কোনও এক সময়ে হয়েছে বলেই আজকের ধারণা। এস্কাইলাসের নাট্যাভিনয়কে কেন্দ্র করে, পূর্ব প্রচলিত ডায়নিসীয় পূজাধর্মী অভিনয়-ধারা তার প্রাথমিক পদ্ধতি বিসর্জন দিয়ে পরবর্তী রূপ নেয়। কিন্তু মঞ্চে আলোকসম্পাতের কথা অজানা থেকে যায় প্রায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত, যতদিন না শীতকালীন সান্ধ্য-অভিনয়-আসরকে ঢাকা ছাদের নীচে সরিয়ে আনতে হয়েছিল—যার ফলে, কৃত্রিম আলোকের প্রয়োজনীয়তা বাধ্য হয়েই দেখা দেয়।

ব্যবহারিক জীবনে তখনও আলো জ্বালানোর একই প্রাচীন পদ্ধতি চলে আসছে—যেমন তেলের বাতী, লোহার পাত্রে কাঠের গুঁড়ো জ্বালানো, সাধারণ মশাল আর অপেক্ষাকৃত আধুনিক মোমবাতী। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষাবধি নাটক অভিনীত হতো খোলা জায়গায়, দিনের আলোয়—তাই স্বাভাবিকভাবেই কৃত্রিম আলোকসম্পাতের কোনও প্রশ্ন ওঠেনি।

ফরাসী অভ্যুত্থান তথা শিল্পবিপ্লবের শেষ দিকে তৎকালীন সম্পূর্ণতঃ স্থায়ীভাবে নির্মিত মঞ্চের জন্য বহু প্রহসন, মিলনান্তক, বিয়োগান্ত এবং মুখ্যতঃ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে নাটক রচিত হতে থাকে। এবং এই নাট্য রচনার যুগান্তকারী অবদান চরমতা লাভ করে ষোড়ষ শতাব্দীর শেষে বিশ্ববন্দিত শেক্সপীয়রের রচনায়। ইতিমধ্যে লণ্ডনে **ব্ল্যাকফ্রায়ারের থিয়েটার** নামে একটি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে—পাশ্চাত্য নাটকের ইতিহাসে যার নাম অমর হয়ে থাকবে আদি নাট্যশালা হিসাবে। আরও কয়েকটি নাট্যশালা এই রঙ্গমঞ্চের সমসাময়িক বলে নিজেদের দাবী জানাতে পারে। মোট কথা, এইসব রঙ্গালয়েই কৃত্রিম

◁ **[চিত্র ২১] আলোকসম্পাতের প্রায়োগিক পাঠগ্রহণ।**

আলোকের সাহায্য নেওয়া হয়েছিল মুখ্যত: **মোমবাতী**-র সাহায্যে, আর উদ্দেশ্য ছিল একাধারে মঞ্চ এবং প্রেক্ষাগৃহকে আলোকিত করা।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখতে পাই, মঞ্চ আলোকিত করার ব্যবস্থায় কিছু উন্নতি দেখা দিয়েছে। মোমবাতীই যদিও সেই পুরাতন উপকরণ, তবু তা ব্যবহৃত হচ্ছে মঞ্চের দুইপাশে সুদৃশ্য ব্র্যাকেটের গায়, উপর থেকে ঝোলানো ঝাড় লণ্ঠনে এবং মঞ্চের পাদপ্রদীপরূপে দর্শকের দিকে ঢাকা অবস্থায়। অনেকক্ষেত্রে আবার গোলাকার ঝাড়ের ধারে ধারে মোমবাতী জ্বালিয়ে, সেগুলিকে কপিকলের সাহায্যে অভিনেতা-অভিনেত্রীর মাথার কাছে নামিয়ে আনার ব্যবস্থাও করা হতো। এই সব জ্বলন্ত বাতীর মুক্ত শিখা থেকে যে কোনও সময়েই সাংঘাতিক অগ্নিকাণ্ডের সম্ভাবনা ছিল। এর একমাত্র প্রতিকার হিসাবে প্রচুর পরিমাণে জল এবং দীর্ঘ যষ্টির মাথায় বাঁধা স্পঞ্জ সর্বদা মজুদ রাখা হতো রঙ্গমঞ্চে।

পরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে এলো তেল জ্বালানোর নূতন পদ্ধতি **আর্গাণ্ড বার্ণার** আর তার সমবর্তুল শিখা অকম্পিত রাখার জন্য **কাচের চিমনী**র ব্যবহার। নূতন ধরণের তেলের আলো সুরু হলো তৈরী হতে। এদের সাহায্যে পাওয়া গেল, অনেক বেশী সাদা পরিস্কার ও উজ্বল আলো। মোমবাতী জ্বালানোর যুগ ক্রমে পুরাতন হয়ে গেল।

এর আগের শতকের শেষ দিকেই **উইলিয়াম মার্ডক** নামে একজন স্কচ্ ইঞ্জিনীয়ার ও আবিস্কারক, কয়লা-পোড়ানো গ্যাসকে আলো-জ্বালানোর কাজে লাগানোর বিষয়ে গবেষণা করে চলেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এর সফলতা দেখা দেয়, এবং ১৮০৩ সালে **ফ্রেডরিক এ. উইনসর** নামে একজন জার্মান ভদ্রলোক লণ্ডনে **লীসিয়াম** মঞ্চে প্রথম **গ্যাসের বাতী** জ্বালানোর প্রথা প্রবর্তন করেন। এর ফলেই, নাট্যাভিনয়ের ইতিহাসে প্রথম সম্ভব হলো, অভিনয় চলার সময় প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভিয়ে দেওয়া। মঞ্চের উপরে বাস্তববোধ ফুটিয়ে তোলার যত প্রচেষ্টা হয়েছে, এখানেই তার সূত্রপাত হলো বলা যেতে পারে।

গ্যাসে জ্বালানো বাতীর সবচেয়ে বড় অসুবিধার দিক ছিল, এর মুক্ত শিখায় অত্যধিক উত্তাপ, এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর অঙ্গারকাম্ল বাষ্প। আগুন লাগার ভয়ও খুব কম ছিলনা। অবশ্য ১৮৯০ সালে **গ্যাসের ম্যাণ্টেল** আবিষ্কৃত হওয়ার পর, গ্যাস ব্যবহারের অনেকখানি উৎকর্ষ সাধিত হয়। এই ম্যাণ্টেল আবিষ্কৃত হওয়ার কিছু আগেই যদিও বিদ্যুতের ব্যবহার নিয়ে

গবেষণা সুরু হয়েছিল, তবু রঙ্গমঞ্চে ম্যাণ্টেলের ব্যবহার দ্রুত এবং সমধিক প্রসারতা লাভ করে।

তারপর বিংশ শতাব্দী সুরু হলো মঞ্চে **বৈদ্যুতিক আলোক**-এর ব্যবহার নিয়ে।* বৈদ্যুতিক আলোকের এই ব্যাপক জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে (ক) আলোক-উৎপাদনের ব্যয়-স্বল্পতা, (খ) পরিচ্ছন্নতা এবং তুলনামূলকভাবে অল্প উত্তাপ, (গ) ব্যবহারে স্বল্প মনোযোগের প্রয়োজন, (ঘ) অপেক্ষাকৃত অনেক কম অগ্নিকাণ্ডের ভীতি, (ঙ) অধিক ঔজ্জ্বল্য, প্রখরতা সৃষ্টি ও বর্ণ ব্যবহারের সুবিধা এবং (চ) ইচ্ছামতো নিয়ন্ত্রিত করার পর্য্যাপ্ত সুযোগ ও সম্ভাবনা। বলাবাহুল্য, আলোকিত করণের পূর্ববর্তী মাধ্যমগুলি দশক-দুয়ের মধ্যেই সম্পূর্ণভাবে অবলুপ্ত হয়েছে রঙ্গজগত থেকে। [অবশ্য, বিদ্যুতের আমদানী যে অঞ্চলে হয়নি, সেখানকার কোনও অস্থায়ী মঞ্চে হ্যাজাক, পেট্রোম্যাক্স ইত্যাদির ব্যবহারকে বিরুদ্ধ দৃষ্টান্ত না বলে, অনগ্রসরতার নমুনা বলে গণ্য করা উচিত]

আলোকিত করা

অভিনয়কে ঢাকা ছাদের নীচে আনার সঙ্গে সঙ্গেই সম্যকরূপে দেখানোর সমস্যা দেখা দিয়েছিল, এবং সেই সমস্যাপূরণের প্রয়োজনেই আলোকের ব্যবহার সুরু। তবে অনায়াসেই অনুমান করা যেতে পারে যে, প্রথমের দিকে মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহ আলোকিত করার ব্যবস্থায় কোনও ভিন্নতা আনার চেষ্টা করা হয়নি। উভয় যায়গাই তখনকার প্রচলিত সরঞ্জাম দিয়ে সমানভাবে আলোকিত করা হতো।

কিন্তু ক্রমে দেখা গেল, অভিনেতৃবর্গকে আরও ভালোভাবে দেখা যাবে, যদি প্রেক্ষাগৃহটি অন্ধকার করে, আলো মঞ্চের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়।

আলোকিত করার উদ্দেশে ব্যবহৃত আলোকে এইভাবে নিয়ন্ত্রিত করার ভিতর দিয়েই দীপ-চিত্রণের সুরু হলো বলা যেতে পারে। অভিনেতা

* মঞ্চে ফিলামেণ্ট-যুক্ত বৈদ্যুতিক বাতীর প্রথম ব্যবহার হয় ১৮৮২ সালে লণ্ডনের 'দি স্যাভয়' রঙ্গালয়ে। পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৮৩ সালে, স্টীল ম্যাকে, নামক একজন মঞ্চ—নিয়ামক আমেরিকার রঙ্গমঞ্চে ঐ বাতী আমদানী করেন। তবে লেন্স ও রিফ্লেক্টার-যুক্ত অবস্থায় বৈদ্যুতিক বাতীর ব্যবহার সুরু হয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে—যার ফলে বাতীগুলিকে বিভিন্ন অবস্থান থেকে ব্যবহার করা সম্ভবপর হলো।

ও তার কার্য্যাবলীকে দর্শকের চোখে উজ্জলতর করে তুলে ধরাটাই হলো এর প্রধান কাজ।

বাস্তববোধ আলোকিত করার সমস্যার সমাধান হলো। এবার দেখা দিল, মঞ্চে আলোক বিস্তার আর বির্ণবিন্যাসের তারতম্য ঘটিয়ে **বাস্তবতা** ফুটিয়ে তোলার ইচ্ছা। বৈদ্যুতিক আলো আবিষ্কৃত হয়ে, সুইচ, ডিমার প্রভৃতির সাহায্যে শুধু যে ইচ্ছামতো আলোকের প্রখরতা বাড়ানো-কমানোর সুযোগ এসেছে, তাই নয়—বিভিন্ন রঙীন আলোক প্রক্ষেপণের সুবিধা হওয়ায়, আলোকসম্পাত শিল্পীর সামনে খুলে গেছে বাস্তবজীবনকে অ ুসরণ করার বিরাট সুযোগ। এখন অনায়াসেই মঞ্চে রৌদ্রতপ্ত দ্বিপ্রহরের পীত-প্রখরতা, বা অস্তগামী সুর্য্যের রক্তাভা, অথবা জ্যোৎস্নার নীলচে-সবুজ আলো সৃষ্টি করা সম্ভব।

চিত্রসৃষ্টি বিভিন্ন রঙের ব্যবহারে, ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চাংশে ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ঘটিয়ে, কোথাও এদের সযত্নে মিশিয়ে দিয়ে, কোথাও বা আবার পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নভাবে রকমারী আকৃতি সৃষ্টির ভিতর দিয়ে, আলোককে মঞ্চের উপরে একটি সার্থক **চিত্রসৃষ্টি**র কাজে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণভাবে যে সব আসবাবপত্র, প্রচ্ছদপট শ্রীহীন ও নকল দেখায় সেইগুলিই আবার আলোকসম্পাতের গুণে মঞ্চের উপরে বাস্তব বলে মনে হয়। আলোক কতকটা রংয়ের মতো ব্যবহৃত হয় মঞ্চচিত্র সৃষ্টি করার কাজে।

প্রচ্ছদপটের গায় 'ছায়া' আঁকার প্রথা ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে আলোক-সম্পাতের ব্যাপক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে। আলোকের সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার সহজেই বস্তুর ঘনত্ব এবং গঠনবৈচিত্র বুঝিয়ে দিতে পারে। দৃশ্যপট, আসবাবপত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ এমনকি অভিনেতার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেকটি বস্তু ও ব্যক্তির স্বাতন্ত্র পরিস্কাররূপে ফুটে ওঠে, তাদের উপরে আলো-ছায়ার বিন্যাস-বৈচিত্রে।

সহজ পরিবর্তন কাল থেকে কালান্তর, অবস্থা থেকে অবস্থান্তর, স্থান থেকে স্থানান্তরের ভিতর দিয়ে দৃশ্যান্তর প্রভৃতি **পরিবর্তনের** কাজগুলি আলোর মাধ্যমে কত সহজেই না করা যায়। সামান্য ঔজ্জ্বল্য বা বর্ণের হ্রাসবৃদ্ধির ভিতর দিয়ে বিরাট পরিবর্তন বোঝানো

সম্ভব—অথচ এই পরিবর্তনের জন্য শ্রম বা সময়ের অপচয় ঘটে না। পক্ষান্তরে, অন্য যে কোনও পরিবর্তন ঘটানোর জন্য [দৃশ্যপট, রূপসজ্জা, পোষাক বা আনুষঙ্গিক ইত্যাদির পরিবর্তন] সময়, শ্রম এবং আয়োজন সব কিছুরই দরকার ন্যূনাধিক থাকেই। এই সহজ পরিবর্তন-সাপেক্ষতার জন্য মঞ্চে আলোকের ব্যবহার একটি বিশেষ উপযোগী এবং কার্য্যকরী হাতিয়ার হিসাবে গণ্য হয়েছে।

মনস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল

দীপচিত্রণের সর্বাধুনিক আবিস্কৃত প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে, নাটকের অন্তর্নিহিত রসের ইঙ্গিত দেওয়া—এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি করা, যার মাধ্যমে অভিনয়ের মনস্তাত্ত্বিক দিক আরও ভালোভাবে বিশ্লেষিত হতে পারে। আলোকসম্পাতের বিশেষ এই ব্যবহারিক দিকটির মধ্যেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যৎ-উন্নততর দীপচিত্রণ-বিধির অঙ্কুর।

প্রথম যুগে এই জাতীয় ব্যবহারের মোটামুটি নিয়ম হিসাবে ধরে নেওয়া হয়েছিল, মিলনান্তক এবং প্রহসনাদির জন্যে উজ্জ্বল আলো, আর বিয়োগান্ত নাটকের জন্য অনুজ্জ্বল আলোর ব্যবহার। কিন্তু ক্রমশঃ গবেষণা পরীক্ষা-নিরীক্ষাদির ভিতর দিয়ে দেখা গেছে, মনস্তাত্ত্বিক অর্থ বিশ্লেষণের পক্ষে আলোকের তীব্রতার হ্রাসবৃদ্ধিই শেষ কথা নয়—বিবিধ পন্থার অন্যতম মাত্র। আলোকসম্পাতের দিক, পরিমাণ, প্রক্ষেপিত আলোকের চেহারা, বর্ণ-বিন্যাস, সঞ্চালনভঙ্গী সবকিছুর মাঝে ছড়িয়ে আছে ঘটনার **মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা** প্রকাশের উপকরণ।

অতএব, **আলোকসম্পাতের প্রয়োজনীয়তা**র বিভিন্ন দিক আলোচনা করার ফলে দেখা যাচ্ছে, আলো মঞ্চের উপরে ব্যবহৃত হয় (ক) মঞ্চের উপরস্থ বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখানোর জন্য, (খ) প্রাকৃতিক অবস্থার অনুকরণের ভিতর দিয়ে সময়, ঋতু ও আবহাওয়া বোঝানোর কাজে, (গ) ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ও বর্ণবিন্যাসের মাধ্যমে মঞ্চের উপরে চিত্রসৃষ্টির উপাদান হিসাবে, এবং বস্তু ও ব্যক্তির ঘনত্ব বোঝানোর কাজে, (ঘ) সহজে কালান্তর, স্থানান্তর ও অবস্থান্তর প্রভৃতি বোঝানোর জন্য, এবং (ঙ) ঘটনার অন্তর্নিহিত মনস্তাত্ত্বিক রসের সন্ধান দিতে।
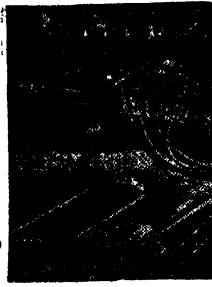
দুই তড়িৎ শক্তি

আলোকসম্পাতকারীদের প্রত্যেককেই বিদ্যুৎ তথা বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি নিয়ে কাজ করতে হয়। যদিও দীপচিত্রণের পরিকল্পনাকারীকে তড়িৎ-বিশেষজ্ঞ না হলেও চলে, তবু এ সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানটুকু থাকা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই পরিচ্ছেদে সংক্ষেপে তড়িৎশক্তি সম্পর্কে কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানানো হলো।

পারমাণবিক তত্ত্ব

তড়িৎশক্তি কাজে লাগানোর অনেক পরে এর তত্ত্বগত দিকটি আবিস্কৃত হয়েছে। যেহেতু এই তত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে বস্তুর অণু এবং পরমাণুকে কেন্দ্র করেই রচিত, তাই এই তত্ত্বকে তড়িৎশক্তির **পারমাণবিক তত্ত্ব**-রূপে পরিচিত করা হলো। এই পরিচ্ছেদে বাংলা প্রতিশব্দের সাহায্য না নিয়ে আন্তর্জাতিক সুপরিচিত ইংরাজী শব্দগুলিই ব্যবহার করা হচ্ছে।

প্রত্যেক পার্থিব বস্তুর ক্ষুদ্রতম খণ্ডকে বলা হয় **মলিক্যুল**, যেগুলি বহু সংখ্যক **এ্যাটম**-এর সাহায্যে গঠিত। প্রত্যেকটি এ্যাটমের একটি পজিটিভ্-চার্জযুক্ত কেন্দ্র আছে, যাকে বলা হয় **নিউক্লিয়াস**। একাধিক নেগেটিভ-চার্জযুক্ত **ইলেকট্রন** ছড়িয়ে আছে এই নিউক্লিয়াসের চতুর্দিকে। প্রত্যেকটি এ্যাটমের নিউক্লিয়াস গঠিত হয়েছে **প্রোটন** এবং **নিউট্রন**-এর সাহায্যে। নিউট্রনের গায় কোনও চার্জ নেই, কিন্তু প্রোটনের গায় রয়েছে 'পজিটিভ্-চার্জ'—এই চার্জ ক্ষমতার দিক থেকে ঐ বস্তুর ইলেকট্রনে যে 'নেগেটিভ-চার্জ' আছে তার সমান সমান।

সাধারণ একটি এ্যাটমের নিউক্লিয়াস ঘিরে যতগুলি ইলেকট্রন থাকে, তার নিউক্লিয়াসের ভিতরে প্রোটনের সংখ্যাও ঠিক ততগুলি। ফলে বস্তুতে পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জের মধ্যে সমতা বজায় থাকে।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, হাইড্রোজেন-এ্যাটমের নিউক্লিয়াসের ভিতরে একটিমাত্র প্রোটন এবং বাইরে একটিমাত্র ইলেকট্রন আছে; হিলিয়ামের এ্যাটমে আছে দুটি প্রোটন, দুটি ইলেকট্রন; কার্বনে আছে ছয়-ছয়টি এবং তামার এ্যাটমে আছে উনত্রিশটি হিসাবে। এইভাবে বাড়তে বাড়তে সবচেয়ে বেশী সংখ্যার হিসাব পাওয়া গেছে ইউরেনিয়ামে, যার মধ্যে আছে ৯২টি প্রোটন আর ৯২টি ইলেকট্রন। কতকটা গ্রহদের সূর্য্য পরিক্রমা করার মতো কায়দায়, ইলেকট্রনগুলি তাদের নিজস্ব কক্ষপথে নিউক্লিয়াসকে ক্রমাগত প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইলেকট্রন আর প্রোটনের সংখ্যা সমান হওয়ায়, এরা তড়িৎ-ক্রিয়ার দিক থেকে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। কিন্তু অনেকের আবার একাধিক কক্ষপথে এই ইলেকট্রনগুলি পরিক্রমা করে। যেমন তামার উনত্রিশটি ইলেকট্রনের মধ্যে প্রথম কক্ষে ঘোরে ২টি, দ্বিতীয় পথে ঘোরে ৮টি, তৃতীয় কক্ষপথে সবচেয়ে বেশী—১৮টি, এবং চতুর্থ পথে মাত্র ১টি ইলেকট্রন প্রদক্ষিণ করে। [বলা বাহুল্য, এই ভিন্ন ভিন্ন কক্ষপথ কিন্তু একই তলে অবস্থিত নয়। এক্ষেত্রেও এরা গ্রহদের উদাহরণ অনুসরণে পরস্পরের সঙ্গে কৌণিক অবস্থানে কাটাকাটি করা তলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।] তামা বা অন্য যে কোনও ধাতুর দূরবর্তী কক্ষপথে অবস্থিত ঐ ধরনের সাথীহারা ইলেক্‌ট্রনকে খুব সহজে ছিনিয়ে আনা যায়—এবং সেক্ষেত্রে সেটি মুক্ত হয়ে আশ্রয়ের খোঁজে ছুটে চলবে। কার্য্যতঃ এই মুক্ত ইলেকট্রনের ছুটে চলাটাই **তড়িৎ-প্রবাহ**-র মূলতত্ব।

পরিবাহী ও অন্তরণ

তড়িৎ প্রবাহকে ইচ্ছানুরূপ তড়িৎ চক্রে চালিয়ে নিতে হলে, মুক্ত ইলেকট্রনকে অবাধে এগিয়ে যাওয়ার মতো একটি পথ করে দিতে হবে। সাধারণতঃ যে সব ধাতু থেকে ইলেকট্রন মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে, তারাই এই প্রবাহের কাজে বেশী সহযোগী। এই শ্রেণীর ধাতুকে **পরিবাহী** অথবা 'কণ্ডাক্‌টার' বলা হয়। কিছুমাত্র বাধা দেয় না, এমন ধাতু বিরল—তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে বস্তুদের মধ্যে ধাতুরাই ভালো পরিবাহী এবং ধাতুদের মধ্যে রূপাকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ পরিবাহী। বলা বাহুল্য, রূপার তার সর্বত্র ব্যবহার করা সম্ভব নয়; তাই পরবর্তী সু-পরিবাহী হিসাবে বেছে নেওয়া হয়েছে তামাকে—মূল্যের দিক থেকে তামা সাশ্রয় ঘটায়। ইদানীং অবশ্য এ্যালুমিনিয়াম দ্রুতগতিতে তামার বিকল্প হতে চলেছে।

মুক্ত ইলেকট্রনগুলিকে প্রবাহিত হওয়ার জন্য যেমন ভালো পথ করে দেওয়া দরকার, তেমনি এগুলি যাতে অবাঞ্ছিত দিকে বেরিয়ে না যায়, সেজন্য কিছু বাধারও ব্যবস্থা রাখা উচিত। বিশেষ করে, যে পথে সেগুলি এগিয়ে চলেছে, যদি তার তুলনায় বিকল্প কোনও পথ কম বাধার সৃষ্টি করে, তবে সেই কম-বাধাযুক্ত পথই বেছে নেবে মুক্ত ইলেকট্রনের দল। এর ফলে, শুধু প্রার্থিত পথে শক্তির পরিমাণ কমে যাবে, তাই নয় ; অবাঞ্ছিত পথটি কারও স্পর্শে এলে, সে প্রচণ্ড ধাক্কা (শক্) খাবে, কারণ ঐ অবাঞ্ছিত পথটি প্রত্যাশিত না থাকায়, অরক্ষিত থাকারই সম্ভাবনা বেশী।

কিছু কিছু বস্তু আছে, [শতকরা ১00 ভাগ না হলেও] যারা তড়িৎ পরিবহনে সাহায্য করেনা। রবার, কাগজ, চীনামাটি, বেকে-লাইট প্রভৃতি এই জাতীয় অপরিবাহী বস্তুর উদাহরণ, যাদের এই বাধাদানের কাজে লাগানো হয়। এদের তখন বলা হয় **অন্তরণ** অথবা 'ইনসুলেটার'।*

তড়িৎ উৎস

তড়িৎ প্রবাহের নিরবচ্ছিন্ন গতি বজায় রাখতে হলে, ইলেক্ট্রন মুক্ত হয়ে বেরিয়ে আসার একটি দীর্ঘস্থায়ী উৎস সৃষ্টি করা দরকার। এই ধরণের উৎস থেকে যে বিরামহীন প্রবাহ সৃষ্টি হয়, তাকে বলে **বিদ্যুৎশক্তি** বা 'ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স' [সংক্ষেপে ঈ-এম্-এফ্]।

তড়িৎ-উৎসের সরলতম উদাহরণ একটি **ব্যাটারী,** যেখানে একটি কাচের পাত্রে রাখা জলমেশানো সালফিউরিক্ এসিডে একটি দস্তা এবং একটি তামার পাত পৃথকভাবে ডুবিয়ে রাখা হয়। যদি একটি তড়িৎ-প্রবাহ পরিমাপের যন্ত্র, অর্থাৎ মীটার, ঐ দুইটি পাত্রের সঙ্গে বাইরে যোগ করা হয় [চিত্র নং ২২.১] তবে দেখা যাবে, একটি পাত থেকে অন্য পাতের দিকে তড়িৎপ্রবাহ ঘটছে। কার্যতঃ ঐ এসিড দস্তার পাতটিকে আক্রমণ করার ফলে, পাতটি গলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে দস্তার প্রত্যেক এ্যাটম থেকে দুটি হিসাবে ইলেক্ট্রণ বেরিয়ে আসছে। এই ইলেক্ট্রণগুলি দস্তার উপরিভাগে পৃথক হয়ে পড়ার পর, এসিডের

* শ্রেষ্ঠতম অন্তরণ বলা যেতে পারে শুষ্ক বাতাসকে। বাতাস যদি না থাকে, অথবা আর্দ্র থাকে তবে যে কোনও রকম মুক্ত পরিবাহী থেকে কিছু কিছু ইলেক্ট্রণ ক্রমাগত বেরিয়ে যাবেই।

জন্য আবার দস্তার এ্যাটমে ফিরে যেতে পারেনা—অন্যদিকে পরিবাহীর সাহায্য পেলেই তারা তামার পাতের দিকে চলে যায়।

[চিত্র ২২.১] সরল ব্যাটারী

বিদ্যুৎশক্তি আবিষ্কারের প্রথম যুগে ভাবা হতো, তড়িৎপ্রবাহ তামার পাত থেকে দস্তার পাতের দিকে চলে। সেই অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, 'তড়িৎপ্রবাহ ঘটে পজিটিভ প্রান্ত (+) থেকে নেগেটিভ প্রান্তের (—) দিকে। আধুনিক বিজ্ঞান এই সিদ্ধান্ত বাতিল করেছে। তড়িৎপ্রবাহ ঘটে দস্তার পাত অর্থাৎ **নেগেটিভ প্রান্ত** (ঋণভাগ) থেকে তামার পাত তথা **পজিটিভ প্রান্ত** (ধন-ভাগ)-এর দিকে [বলাবাহুল্য, আজও বহু বিজ্ঞান পুস্তিকায় আগের ভ্রান্ত ধারণারই উল্লেখ পাওয়া যাবে। পূর্ববর্তী ধারণাকে 'ফ্র্যাঙ্কলিনীয় তড়িৎ-মতবাদ' আখ্যা দিয়ে পৃথকভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।]
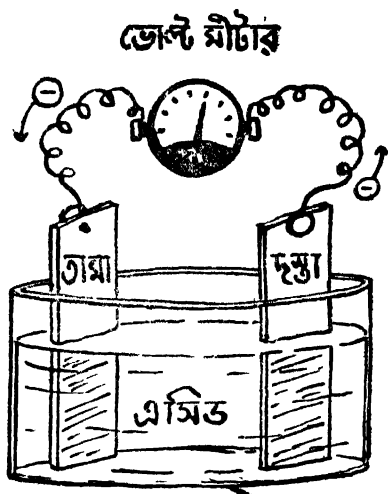
তবে, প্রবাহ-প্রস্তুতির রকমফেরে, তড়িৎপ্রবাহের গতি পরিবর্তিত হয়। **ডি-সি** অর্থাৎ 'ডাইরেক্ট কারেণ্ট'-এর ক্ষেত্রে তড়িৎপ্রবাহ ঘটে একমুখী। **এ-সি** অর্থাৎ 'অলটারনেটিং কারেণ্ট'-এর ক্ষেত্রে এই প্রবাহের দিক প্রতি সেকেণ্ডে ১০০ থেকে ১২০ বার পরিবর্তিত হয়।* একশ্রেণীর বিদ্যুৎকে অন্য শ্রেণীতে বদলে নেওয়া হয় **কনভার্টার** নামক যন্ত্রের সাহায্যে। উৎসের দুই প্রান্ত **টারমিন্যাল** নামে অবিহিত। একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহপথকে **তড়িৎচক্র** বা 'সারকিট' বলা হয়।

* সেকেণ্ডে ১০০ বার দিক পরিবর্তন-কারী তড়িৎপ্রবাহকে ৫০ সাইকলস্ এবং ১২০ বার দিক পরিবর্তনকারী প্রবাহকে ৬০ সাইকলসের বিদ্যুৎশক্তি বলা হয়।

ভিন্নতর তড়িৎ-উৎস

সরল ব্যাটারী ছাড়াও আরও নানা উপায়ে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদন করা যায়। দুটি ভিন্ন জাতের বস্তু ঘর্ষণের দ্বারা যে শক্তি উৎপন্ন হয়, তাকে **ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স** বলে। আলোক-সচেতন কিছু পদার্থের উপরে সূর্য্যকিরণের প্রক্রিয়ায় **ফটো-ইলেকট্রিসিটি** উৎপন্ন হয়। ওয়েলডিং করা দুই অসম ধাতুর জোড় মাথায় উত্তাপ প্রয়োগ করে **থার্মোইলেক্ট্রিসিটি** সৃষ্টি করা যায়। বিশেষ ধরণের কেলাস (ক্রিষ্ট্যাল)-এর উপরে যান্ত্রিক চাপ দিয়ে যে শক্তি সৃষ্টি করা যায়, তাকে **পিয়াজো-ইলেকট্রিসিটি** বলে। তবে রঙ্গমঞ্চ তথা সাধারণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমরা যে বিদুৎশক্তি ব্যবহার করি, তা হচ্ছে **চৌম্বিক-তড়িৎ,** যা উৎপাদিত হয় জল, বাষ্প বা অন্য যে কোনও জ্বালানীর সাহায্যে চালিত **জেনারেটার**-এর মাধ্যমে। এই যন্ত্রে চুম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে একটি পরিবাহীর আপেক্ষিক ঘূর্ণণের দ্বারা বিদ্যুৎশক্তি সৃষ্টি হয়। [আপেক্ষিক ঘূর্ণণ বলতে বোঝানো হচ্ছে যে, চুম্বক ক্ষেত্রকে স্থির রেখে তার মধ্যে পরিবাহীকে ঘোরানো যেতে পারে, অথবা পরিবাহীকে স্থির রেখে তার চতুর্দিকে চুম্বক-ক্ষেত্রকে ঘোরালেও চলবে।] আমাদের ব্যবহারের জন্য ইলেক্ট্রিক সাপ্লাই মারফত যে বিদ্যুৎ আমরা পাই, তার উৎস এই ধরণের বড় বড় জেনারেটার।

সিরীজ ও প্যারালেল কানেকসান

একাধিক আলোকসূত্র বা বিদ্যুৎচালিত সরঞ্জামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য দুটি উপায় [চিত্র ২২.২] অনুশরণ করা হয়। প্রথম উপায় **সিরীজ কানেকসান**—এই উপায়ে বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী সরঞ্জামগুলিকে মালার মতো যোগ করে একটিমাত্র তড়িৎচক্র রচনা করা হয়। তড়িৎ-প্রবাহের চাপ এই প্রথায় সরঞ্জামগুলির মধ্যে ভাগ হয়ে যায় এবং কোনও একটি মাত্র সরঞ্জাম বিকল হলে বা খুলে নিলে, তড়িৎচক্রে প্রবাহ বন্ধ হয়ে যাবে। দ্বিতীয় উপায় **প্যারালেল কানেকসান**—এক্ষেত্রে প্রত্যেক সরঞ্জামের জন্য পৃথক পৃথক তড়িৎ-চক্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়।
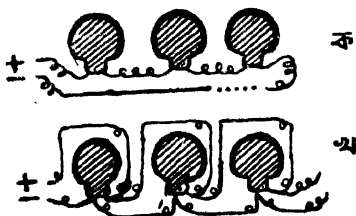
[চিত্র ২২.২] (ক) সিরীজ এবং (খ) প্যারালেল কনেকসান

এই প্রথায় যে কোনও সরঞ্জামকে পৃথক অথবা দলবদ্ধভাবে পূর্ণ চাপে কার্য্যকরী করা সম্ভব।

বৈদ্যুতিক যে কোনও নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে এই দুই ধরণের সংযোগ ব্যবস্থাই কাজে লাগে। যে কোনও একটি আলোকযন্ত্রকে নিয়ন্ত্রিত করার জন্য যে সরঞ্জামগুলি লাগে [সুইচ, ফিউজ, ডিমার, সকেট ইত্যাদি], সেগুলিকে 'সিরীজ' কানেকসানে যুক্ত করা হয়। তেমনি আবার, ভিন্ন ভিন্ন আলোকযন্ত্র বা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয় প্যারালেল কানেকসান পদ্ধতিতে।

তড়িৎ পরিমাপ

বিদ্যুৎ শক্তির প্রবাহ, চাপ, ক্ষমতা ইত্যাদি পরিমাপের জন্য চার রকম একক ব্যবহার করা হয়। তাদের সংজ্ঞা এবং পারস্পরিক সম্বন্ধ নীচে আলোচিত হলো।

ভোল্ট : যে কোনও মুহূর্তে একটি তড়িৎ চক্রে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহের চাপ-এর পরিমাণকে **ভোল্ট** বলে। বাতী বা ডিমার প্রভৃতি নির্বাচনের সময় তার 'ভোল্ট' জানা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। আমাদের দেশে ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য ২২০ ভোল্ট চাপে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কোনও কোনও টেপরেকর্ডার, ১৬ মিঃ মিঃ চলচ্চিত্র পক্ষেপণ যন্ত্র প্রভৃতির অনেক মডেল ১১০ ভোল্ট চাপে চালানোর প্রয়োজন পড়ে। তেমনি আবার কারখানা, রঙ্গমঞ্চ, সিনেমা প্রভৃতিতে ৪৪০ অথবা ততোধিক ভোল্টেরও সাপ্লাই লাইন দেওয়া থাকে।*

আরও সরলভাবে বলা যায়, একটি তড়িৎ চক্রের যে কোনও দুটি বিন্দুর মধ্যে বৈদ্যুতিক চাপের পার্থক্যই হচ্ছে 'ভোল্ট'। যদি দুইটি বিন্দুতে পরিবাহী সংযোগ সাধিত হয়, তবে মুহূর্তের মধ্যে যে কয়টি মুক্ত ইলেকট্রন ছুটে আসবে সেই পথে, সেই পরিমাণকেই ভোল্ট বলা হচ্ছে। একেই বলা হয় **ইলেক্ট্রোমোটিভ ফোর্স**—তাই ভোল্টকে গাণিতিক প্রয়োজনে সংক্ষেপে **ই** বলে উল্লেখ করা হয়।

এম্পিয়ার : তড়িৎ প্রবাহের গতিকে বলা হয় **এম্পিয়ার**। প্রতি সেকেণ্ডে কয়টি ইলেকট্রন পরিবাহী মারফৎ ছুটে যাচ্ছে, তাকেই এম্পিয়ার বলা হচ্ছে। ভোল্ট যত কম হবে, এম্পিয়ার তত বেশী হতে থাকবে। এই এম্পিয়ারের সাহায্যে বিদ্যুৎবাহী তারের শ্রেণী নির্বাচন করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি ২০০ ভোল্টের ১০০ ওয়াট বাতীর

* বেশী চাপের কম গতি-বিশিষ্ট তড়িৎপ্রবাহকে, কম চাপের বেশী গতিবিশিষ্ট করে তোলার কাজে যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তাকে 'ট্রান্সফরমার' বলে।

জন্য যে তার লাগবে তড়িৎপ্রবাহের কাজে, একটি ৬ ভোল্টের ১00 ওয়াট বাতীর জন্য লাগবে তার চেয়ে অনেকগুণ ভারী তার। হিসাব করে দেখা যাবে, প্রথমটির ক্ষেত্রে প্রবাহ সৃষ্টি হচ্ছে $\frac{1}{2}$ এম্পিয়ার, এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে ন্যূনাধিক ১৭ এম্পিয়ার। সংক্ষেপে বলা যায়, চাপ কম হলেই প্রবাহ বেড়ে যাবে। সুতরাং ভোল্ট বাড়ানোর দরকার পড়ে, তারের ভার কমানোর জন্য। বিশেষ করে যখন কোনও দূরবর্তী তড়িৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে বেশী পরিমাণে বৈদ্যুতিক প্রবাহ নিয়ে যাওয়ার দরকার হয়, তখন ভোল্ট বেশী রাখাই বিধেয়।

তড়িৎ প্রবাহের ঘনত্ব বা **ইণ্টেনসিটি** বোঝায় বলে, গাণিতিক প্রয়োজনে এম্পিয়ারের সংক্ষিপ্ত নাম রাখা হয়েছে **আই**।

ও'ম ঃ প্রত্যেক বস্তুই তড়িৎ প্রবাহে কিছু না কিছু বাধার সৃষ্টি করে। এদের মধ্যে কিছু বস্তু, যেমন তামা, খুব কম বাধা দেয়; অপরপক্ষে রাবারের বাধা দেওয়ার ক্ষমতা অনেকগুণ বেশী। এই বাধাদানের, অথবা **রেজিস্ট্যান্স** দেওয়ার ক্ষমতা মাপা হয় **ও'ম**-এর সাহায্যে, এবং সেইজন্য এর গাণিতিক সংক্ষেপ ধরা হয়েছে **আর**।

কোনও বিশেষ এম্পিয়ারে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহের জন্য যদি প্রয়োজনীয় ব্যাসের চেয়ে কম ব্যাস-বিশিষ্ট তার ব্যবহৃত হয়, তবে তা তরঙ্গপ্রবাহে বাধা দেবে—অবশ্য তারটি সু-পরিবাহী হওয়া চাই। এই বাধাদানের ভিতর দিয়ে কিছু তড়িৎশক্তি উত্তাপে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে খরচ হয়ে যাবে। এই ধরনের অপরিসর তারের দৈর্ঘ্য যত বেশী হবে, উত্তাপে রূপান্তরিত তড়িৎশক্তি ব্যয়ের পরিমাণও বেড়ে যাবে তত বেশী। যখন কোনও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ব্যাপার ঘটানোর প্রয়োজন হয়, তখন লোহা বা নিকেল-করা-তামা-জাতীয় খারাপ পরিবাহী ব্যবহার করা হয় তারের দৈর্ঘ্য কমানোর জন্য। মঞ্চে আলোকের ঔজ্জ্বল্য কমানো-বাড়ানোর জন্য ব্যবহৃত যাবতীয় **ডিমার** তৈরী হয় এই ধরনের **রেজিস্ট্যান্সকে** কাজে লাগিয়ে।

ওয়াট ঃ বিজলী বাতী, ডিমার, আলোকক্ষেপণকারী যন্ত্রপাতি প্রভৃতি যাবতীয় সরঞ্জাম সম্পর্কে পরিচয় দেওয়ার সময় বলা হয় 'এত ওয়াট'-এর সরঞ্জাম। সংক্ষেপে **ওয়াট*** বলতে বোঝায়, একটি তড়িৎচক্রে যে কোনও

* ওয়াট শব্দটি 'ক্যাণ্ডেল-ওয়াট'-এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। আলোকের ঔজ্জ্বল্য

মুহূর্তে কতটুকু বিদ্যুৎশক্তি ব্যয়িত হচ্ছে। এই ব্যয়ের পরিমাণ মাপা হয় **ইউনিট** হিসাবে। একটি ১000 ওয়াট বাতী বা উত্তাপ সৃষ্টিকারী তার এক ঘণ্টায় যে পরিমাণ শক্তি খরচ করে, তার পরিমাণ ধরা হয়েছে 'এক ইউনিট'। শক্তি বা **পাওয়ার**-এর পরিমাণ বলে, **পি** ধরা হয়েছে এর গাণিতিক সংক্ষেপ।

ও'ম-এর নিয়ম

যে শক্তিতে ইলেকট্রনেরা ধাক্কা খেয়ে এগিয়ে চলেছে, পথে যে পরিমাণ বাধার সম্মুখীন হচ্ছে তারা, এবং ফলে যে পরিমাণ তরঙ্গ প্রবাহের সৃষ্টি হচ্ছে, এদের সম্পর্ককে যে নিয়মের দ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাকে বলে **ও'ম্‌স্‌ ল** বা 'ও'মের নিয়ম'। এতে বলা হচ্ছে যে, ধাক্কা দেওয়ার শক্তিকে বাধাদানের শক্তি দিয়ে ভাগ করে যা পাওয়া যাবে, সেটিই হচ্ছে তরঙ্গ প্রবাহের ঘনত্ব। অর্থাৎ,

$$\textbf{এম্পিয়ার} = \frac{\textbf{ভোল্ট}}{\textbf{ও'ম}}, \text{ অথবা গাণিতিক সংক্ষেপে : } \textbf{আই} = \frac{\textbf{ঈ}}{\textbf{আর}}$$

অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে, তরঙ্গ প্রবাহের চাপকে প্রবাহের গতি দিয়ে গুণ দিলে বিদ্যুৎশক্তি ব্যয়ের হিসাব পাওয়া যাবে। এখানে সূত্র হচ্ছে : **ওয়াট = এম্পিয়ার × ভোল্ট**, অথবা গাণিতিক সংক্ষেপে বলা যাবে **পি = আই × ঈ**। এই সূত্রকে **পাই সূত্র** বলা হয়। এই সূত্রগত সমীকরণগুলিকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করে ভিন্ন ভিন্ন সমাধানে আসার কাজে লাগানো যেতে পারে। নীচে এই চার রকম পরিমাপের যত রকম সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়, তার একটি তালিকা দেওয়া হলো :—

$$\textbf{এম্পিয়ার} = \frac{\text{ভোল্ট}}{\text{ও'ম}} = \frac{\text{ওয়াট}}{\text{ভোল্ট}} = \sqrt{\frac{\text{ওয়াট}}{\text{ও'ম}}}$$

নির্ধারণের প্রাথমিক যুগে মোমবাতী অর্থাৎ ক্যাণ্ডেলই ছিল আলোকসৃষ্টির মুখ্য উপকরণ। একটি সাধারণ মোমবাতী থেকে একফুট দূরবর্তী একটি সাদা রঙের জমিতে যে পরিমাণ ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি হয়, তাকেই ধরা হয়েছিল 'এক ক্যাণ্ডেল-ওয়াট'। তত্ত্বগতভাবে দশটি মোমবাতী থেকে একফুট দূরে ১০ ক্যাঃ ওয়াট বা ১০০ টি মোমবাতী থেকে একফুট দূরে ১০০ ক্যাঃ ওয়াট আলো সৃষ্টি হওয়ার কথা। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা হয় না, যেহেতু একাধিক বাতীর শিখাগুলি একটি মাত্র বিন্দুতে একত্র হয়ে আলোক উৎপাদনে সক্ষম নয়।

$$\text{ভোল্ট} = \text{এম্পিয়ার} \times \text{ও'ম} = \frac{\text{ওয়াট}}{\text{এ্যাম্পিয়ার}} = \sqrt{\text{ওয়াট} \times \text{ও'ম}}$$

$$\text{ও'ম} = \frac{\text{ভোল্ট}}{\text{এ্যাম্পিয়ার}} = \frac{\text{ভোল্ট}^{২}}{\text{ওয়াট}} = \frac{\text{ওয়াট}}{\text{এ্যাম্পিয়ার}^{২}}$$

$$\text{ওয়াট} = \text{এ্যাম্পিয়ার} \times \text{ভোল্ট} = \text{এ্যাম্পিয়ার}^{২} \times \text{ও'ম} = \frac{\text{ভোল্ট}^{২}}{\text{ও'ম}}$$

সূত্রগুলিকে কাজে লাগিয়ে কোনও প্রশ্নের উত্তর বের করার দুটি নমুনা দেওয়া হলো এখানে :—

১ম উদাহরণ :—

একটি আসরে বাতী এবং পাখা ইত্যাদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের মিলিত শক্তি ৪৫০০ ওয়াট। ২২০ ভোল্টের সাপ্লাইয়ের ক্ষেত্রে ঐ আসরের জন্য মেন সুইচে কত এ্যাম্পিয়ারের ফিউজ লাগবে ?

উত্তর : ৪৫০০ ওয়াট ÷ ২২০ ভোল্ট = ২১·৮ এ্যাম্পিয়ার

[ফিউজের তার নির্বাচনের সময় ৫-এর নামতায় পূর্ণ সংখ্যা ধরে নিলে উত্তর হবে ২৫ এ্যাম্পিয়ার]

২য় উদাহরণ :—

১১০ ভোল্টের সাপ্লাইযুক্ত একটি বাড়ীতে ৩০ এ্যাম্পিয়ারের মেন সুইচ লাগানো আছে। সর্বাধিক কত ওয়াটের বাতী ব্যবহার করা নিরাপদ ?

উত্তর : ১১০ ভোল্ট × ৩০ এ্যাম্পিয়ার = ৩৩০০ ওয়াট।

তিন সরঞ্জাম

বৈদ্যুতিক বাতী

দীপচিত্রণের প্রয়োগবিধি সম্পর্কে আলোচনার পূর্বে, আলোকসম্পাতের জন্য প্রয়োজনীয় বিবিধ সরঞ্জামের সঙ্গে সম্যক পরিচয় হওয়া দরকার।

সরঞ্জাম-প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা যেতে পারে **বৈদ্যুতিক বাতী**র কথা। এর প্রধান কাজ বিদ্যুৎশক্তিকে আলোকে রূপান্তরিত করা। সাধারণতঃ এই জাতীয় বাতীর মধ্যে আলোকসূত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয় সূক্ষ্ম **টাঙ্‌ষ্টেন** তারের তন্তু বা **ফিলামেণ্ট**, যা উত্তাপে সাদা হওয়ার ফলে আলোক বিকীরণ করে। কিন্তু সচরাচর ব্যবহৃত এই জাতীয় ব্যবস্থায়, বৈদ্যুতিক বাতীর মাধ্যমে চালিত সমুদয় বিদ্যুৎশক্তি আলোকে পরিণত হয় না। বিদ্যুৎচালিত মোটরের মাধ্যমে, প্রবাহিত বিদ্যুতের প্রায় সবটুকু শক্তিই 'গতি'তে পরিণত হয়; অথবা বিদ্যুৎ-চুল্লীতে এই শক্তির সবটাই রূপ নেয় 'উত্তাপে'। কিন্তু বাতীর ক্ষেত্রে শতকরা দুইভাগেরও কম শক্তি 'আলোকে' রূপান্তরিত হয়—বাকী অংশের অপচয় ঘটে উত্তাপ হিসাবে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সচরাচর ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক বাতীতে বিদ্যুতকে রূপান্তরিত করার ক্ষমতা খুবই কম!

এই উত্তাপের জন্যই বাতীর গোলক অথবা আলোকসত্রের আকার বিরাট করার প্রয়োজন পড়ে। অবশ্য আজকের যুগে ১০০ ওয়াট বাতীর আকার বিশিষ্ট এমন ছোট আলোকসূত্রের নির্মাণ সম্ভব হয়েছে, যা থেকে ১০০০ ওয়াটের আলোক উৎপন্ন হয়। কিন্তু এর ব্যবহারবিধির কড়াকড়ি এত বেশী যে, এর দ্বারা লব্ধ সুবিধা এর অসুবিধাগুলির তুলনায় তুচ্ছ মনে হবে।

দহনে সাহায্যকারী অম্লজান বাষ্পকে ফিলামেণ্টের সংস্পর্শ থেকে দূরে রাখার জন্য ফিলামেণ্টটিকে একটি বায়ুশূন্য কাচের গোলকে ঢেকে রাখা হয়। এই জাতীয় আলোকসূত্রকে **শূন্যগর্ভ বাতী** আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর একটি বিশেষ ত্রুটির দিক আছে। প্রচণ্ড উত্তাপে ফিলামেণ্ট তিলে তিলে বাষ্পীভূত হতে থাকে, এবং গোলকের চাপশূন্য অভ্যন্তরে সহজেই স্থানচ্যুত হয়ে কাচের গায় জমা হয়। কিছুদিন জ্বলার পরেই বাতীর গায়ে এগুলি কালো দাগের সৃষ্টি করে। ফিলামেণ্টও ক্রমশঃ ক্ষীণ হওয়ার ফলে পূর্বের ন্যায় বিদ্যুৎশক্তির প্রবাহ চালাতে পারেনা। আলোর পরিমাণও যায় কমে। তাছাড়া, ভিতরের চাপশূন্যতা কাচের গোলকটিকে ভীষণ ভঙ্গুর করে তোলে।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, ফিলামেণ্টকে যতবেশী উত্তাপসহনক্ষম করে তোলা হবে, ততই তার আলোক উৎপাদনের ক্ষমতা বেড়ে যাবে ; এবং আলোকের বর্ণও হবে তত বেশী সাদা। এর জন্য ফিলামেণ্টের বাষ্পীভবনের পরিমাণ কমানো দরকার।

কাচের গোলকের মধ্যে যবক্ষারজান এবং আরগণ-জাতীয় অদাহ্য বাষ্প ভর্তি করে, ফিলামেণ্টের এই বাষ্পীভবনজনিত ক্ষয় কিছু পরিমাণে রোধ করা সম্ভব হয়েছে। এর ফলে, উত্তপ্ত অবস্থায় ফিলামেণ্টের অণুগুলি চাপশূন্য অবস্থার মতো আর বেরিয়ে যেতে পারেনা। এদের **গ্যাস-ভরা বাতী** বলা হয়। নিখুঁত সাদা আলো পাওয়া যায় এই শ্রেণীর বাতী থেকে। গ্যাস-ভরা বাতীর মাধ্যমে শতকরা প্রায় ৮ ভাগ বিদ্যুৎশক্তি আলোকে পরিণত হয়।

শূন্যগর্ভ বা গ্যাস-ভরা উভয় জাতের বাতীই ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে আলোক উৎপাদনের ক্ষমতা হারিয়ে চলে। বাতীর আলোয় হল্‌দে ভাব আসা এই হ্রাস পাওয়ার লক্ষণ। অবশ্য এই লক্ষণ একটা নির্দিষ্ট সময় না পেরোনো পর্য্যন্ত দেখা যায়না। এই নির্দিষ্ট সময়টিকে বলা হয় ঐ **বাতীর জীবনসীমা**। ঘরোয়া ব্যবহারের বাতীর ক্ষেত্রে এই জীবনসীমা ন্যূনাধিক এক হাজার ঘণ্টা। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে এই সীমা অতিক্রমণের পরেও কোনো কোনো বাতী বহুদিন, বহুবৎসরাবধি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু যে পরিমাণ আলো পাওয়া উচিত, তা আর পাওয়া যায় না।

বাতীর ফিলামেণ্টকে বেশী উত্তপ্ত করতে পারলে, আরও বেশী আলো পাওয়া যায়। বিশেষ ব্যবহারের জন্য এই জাতীয় অধিক উত্তাপ

সহনক্ষম যে সব বাতী তৈরী করা হচ্ছে, তাদের জীবনসীমা কিন্তু কমে এসেছে অনেকখানি—বহুক্ষেত্রে এই জীবন-সীমা ৫০ ঘণ্টারও নীচে নেমে আসে।

উত্তাপ সহনক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার অন্যতম উপায়, ফিলামেণ্টটিকে 'গুচ্ছ' করে নেওয়া। এর ফলে ঐ ফিলামেণ্ট একটি ভরাট আলোক উৎপাদকে পরিণত হয়। অনেকক্ষেত্রে বাতীর গোলকটির আকারে বিশেষ তারতম্য ঘটানোর ফলে, ব্যবহৃত আতসকাচ বা প্রতিফলক ফিলামেণ্টের খুব কাছে আনা সম্ভব হয়।

বাতীর গোলকের সঙ্গে যেখানে ধাতব টুপী আটকানো আছে, অধিক উত্তাপের ফলে ঐ যায়গাটি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। উত্তাপ সর্বদা উর্দ্ধমুখী; সেজন্য বাতীর টুপী উপরের দিকে থাকা অবস্থায় বাতী জ্বললে, ক্ষতির আশংকা বেশী। এই সংযোগের যায়গাটিকে তাপকেন্দ্র থেকে যত দূরে সম্ভব রাখার জন্য, গোলকের গলা লম্বা করা হয়; অনেকক্ষেত্রে অভ্রের ব্যবধান লাগানো থাকে। একজাতীয় উচ্চশক্তিসম্পন্ন বাতী একেবারে গোলাকার, অর্থাৎ ফিলামেণ্ট থেকে এর গাত্রের দূরত্ব সব যায়গায় সমান। কোনও ক্রমেই এই বাতীকে ঝুলিয়ে, অর্থাৎ টুপী উপরের দিকে রেখে ব্যবহার করা চলবেনা। আবার আর এক জাতীয় বাতী সমবর্ত্তুল, যাদের ফিলামেণ্টের খুব কাছেই তার সরু নলের মতো কাচের দেয়াল থাকে। এদের টুপীও যতটা সম্ভব নীচের দিকে রেখে ব্যবহার করা দরকার, নচেৎ ফিলামেণ্টের উপরবর্তী নিকটতম কাচের দেয়ালে কালো কালো দাগ জমতে সুরু করবে।

বাতীর টুপী

বাতীর টুপী প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর কাজ করে। প্রথম কাজ, বাতীর ফিলামেণ্টে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা; দ্বিতীয় কাজ, ধারকের সাহায্যে বাতীকে যথাস্থানে শক্তভাবে ধরে রাখা। সাধারণ ব্যবহৃত বাতীর টুপীগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর টুপীর সাহায্যে বাতীটিকে ধারকের মুখে ঢুকিয়ে আটকানো যায় সঙ্গীনের মতো [চিত্র ২৩.১]—এদের বলে 'বেয়নেট ক্যাপ' বা **সঙ্গীন টুপী**। আর এক শ্রেণীর টুপীর সাহায্যে বাতীকে প্যাঁচ দিয়ে ঘুরিয়ে ধারকে আটকাতে হয় [চিত্র ২৩.২]—এগুলিকে 'স্ক্রু ক্যাপ' বা **প্যাঁচটুপী** বলে। সঙ্গীনটুপীযুক্ত বাতীই সচরাচর ঘরোয়া কাজে ব্যবহার করা হয়। এই জাতীয় ধারকের মধ্যে দুটি স্প্রিংয়ের চাপে

বাতীকে একাধারে আটকে রাখা হয় এবং বাতীর ফিলামেণ্টে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। কিন্তু নাড়ানো বা ঘোরানোর সময় এই শ্রেণীর বাতীতে ধারক ও টুপীর সংযোগ বিচ্যুত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সেদিক থেকে প্যাঁচ-টুপীযুক্ত বাতী অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। আবিস্কর্তা এডিসন সাহেবের নামানুযায়ী বাতীর প্যাঁচ টুপীকে **এডিসন স্ক্রু**ও বলা হয়। আকৃতিগতভাবে এগুলি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত। সবচেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি প্যাঁচ টুপীকে বলা হয় **এম্-ঈ-এস** [মিনিয়েচার এডিসন স্ক্রু]; সাধারণতঃ পাইলটে এইজাতীয় প্যাঁচ টুপীর বাতী ব্যবহার করা হয়। মাঝারী আকারেরটিকে বলা হয় **এস. ঈ. এস.** [স্মল এডিসন স্ক্রু] বা শুধু **ঈ. এস.** [এডিসন স্ক্রু]; ১০০ থেকে ২৫০ ওয়াট শক্তিবিশিষ্ট বাতীর জন্য এই জাতীয় প্যাঁচ-টুপী ব্যবহৃত হয়। ৫০০ বা ততোধিক ওয়াট শক্তি বিশিষ্ট বাতীর জন্য সবচেয়ে বড় আকারের প্যাঁচ-টুপীকে বলা হয় **জি. ঈ. এস.** [গোলিয়াথ্ এডিসন স্ক্রু]।

[চিত্র ২৩.১] বাতীর সঙ্গীন টুপী ও অনুরূপ ধারক

[চিত্র ২৩.২] বাতীর প্যাঁচ টুপী ও অনুরূপ ধারক

অনেকক্ষেত্রে আলোকসূত্রের আতসকাচ ও প্রতি-ফলকের মাঝে ফিলামেণ্টের নিখুঁত একটি অবস্থানের প্রয়োজন পড়ে। তখন উপরে বর্ণিত কোনও শ্রেণীর টুপীযুক্ত বাতীতেই কাজ হয় না। এসব ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় পৃথক এক জাতীয় টুপী ও ধারক, যাকে **প্রিফোকাস** ব্যবস্থা [চিত্র ২৩.৩] বলা হয়। চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণ যন্ত্রে এইজাতীয় টুপীযুক্ত বাতী ব্যবহার করা হয়ে থাকে। মঞ্চে আলোকসম্পাতে জন্য ব্যবহৃত এইজাতীয় টুপীকে আকৃতিগত দিক দিয়ে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। (ক) এডিসন স্ক্রুর সমান আকারের টুপীকে 'মাঝারী' প্রিফোকাস এবং (খ) গোলিয়াথ স্ক্রুর সমান আকারের টুপীকে 'বড়' প্রিফোকাস বলে। (গ) তৃতীয় শ্রেণীটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। এদের আকৃতি কতকটা দুই পায়াযুক্ত প্লাগের মতো। সাধারণ টুপীর মারফত চালানো যায় না, এমনই অধিক পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি প্রবাহের জন্য ব্যবহৃত এই শ্রেণীর প্রিফোকাস টুপী ও ধারক ব্যবস্থার পৃথক নাম **দ্বিপদ** বা **বাইপোষ্ট**।

প্রদীপ যন্ত্রের অংশ হিসাবে যে সব ধারক ব্যবহৃত হয়, সেগুলির ধাতব অংশ যেন সরাসরি প্রদীপ যন্ত্রের মূল কাঠামোর ধাতব অংশের সঙ্গে যুক্ত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। সাধারণতঃ পোরসিলেনের খাপে ভরা বিশেষভাবে অন্তরণ-ব্যবস্থাযুক্ত ধারক এই কাজে ব্যবহৃত হয়। **কামড়ী** বা 'ক্ল্যাম্প' ব্যবহার করার সময় এ্যাজবেস্টজের পাতলা অন্তরণ লাগিয়ে নিলে, সমগ্র বিষয়টি অনেকটা নিরাপদ হয়।
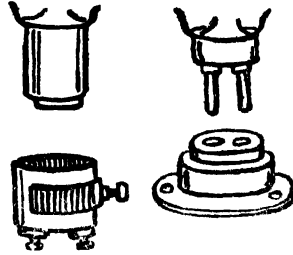
[চিত্র ২৩.৩] প্রিফোকাস ব্যবস্থার টুপী ও ধারক

বাতীর প্রকারভেদ

মঞ্চে আলোকসম্পাতের কাজে বিভিন্ন প্রয়োজনে ভিন্ন ভিন্ন আকৃতি ও গুণাগুণ বিশিষ্ট বাতী ব্যবহৃত হয়। সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় যে বাতী ব্যবহার করা হয়, তা হচ্ছে সুপরিচিত **ঘরোয়া বাতী** [চিত্র ২৪.১]। সাধারণ বাড়ীতে ব্যবহৃত বাতীকেও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মঞ্চে এই শ্রেণীর ৪০/৬০ ওয়াট থেকে ১০০০ ওয়াট পর্যন্ত শক্তিবিশিষ্ট বাতীরই প্রচলন বেশী। এর ফিলামেণ্টের আকার জড়ানো মালার মতো, এবং বাতীগুলিকে যে কোনও অবস্থানে রেখে জ্বালানো সম্ভব। মঞ্চের কাজের ভীড়ে এই জাতীয় বাতীর ফিলামেণ্টের আঘাত সহনক্ষমতা খুব কাজে লাগে। গড়ে এদের জীবনসীমা ১০০০ ঘণ্টা। এই জাতীয় বাতীর ৫০০ ওয়াটের অধিক শক্তিবিশিষ্ট বাতীগুলিতে প্যাঁচ টুপীরই ব্যবস্থা থাকে।
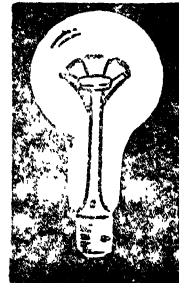
[চিত্র ২৪.১] ঘরোয়া বাতী

প্যাঁচ টুপী-যুক্ত বিশেষ এক শ্রেণীর ৬০,১০০ ও ১৫০ ওয়াটের বাতীকে, আবিষ্কর্তার নামানুযায়ী **সাময়লক** বাতী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এগুলি সাধারণ ১০০ ওয়াটের ঘরোয়া

বাতীর আকারবিশিষ্ট—পার্থক্যের মধ্যে, এদের টুপী থেকে ফিলামেণ্টের দূরত্ব সব ওয়াটের বাতীতেই সমান থাকে ; তাই সহজেই একটি বাতীর পরিবর্তে অন্য বাতী লাগিয়ে ব্যবহার করা যায়। দামে ঘরোয়া বাতীর চেয়ে কিছু বেশী হলেও, এদের এই পরিবর্তনের সুবিধাটি যথেষ্ট লাভজনক। এদের ফিলামেণ্টও মালাকৃতি বিশিষ্ট এবং জীবনসীমা ১০০০ ঘণ্টা।
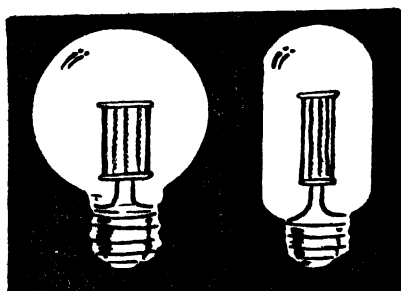
[চিত্র ২৪.২] প্রক্ষেপ বাতী
ক—"টি" শ্রেণীর বাতী
খ—এ. ওয়ান শ্রেণীর বাতী

মঞ্চে বিভিন্ন শ্রেণীর বাতীগুলির মধ্যে **প্রক্ষেপ বাতী**-র [চিত্র ২৪.২] ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এদেরও আবার আকৃতি ও গুণানুসারে শ্রেণীভেদ আছে। সচরাচর ব্যবহৃত গোলাকৃতি ও নলাকৃতি প্রক্ষেপবাতীর বর্ণনা এখানে দেওয়া হলো :—

গোলাকৃতি 'বি-ওয়ান্' বা **'টী'** শ্রেণীর প্রক্ষেপবাতী [চিত্র ২৪.২ ক] মাঝারী প্যাঁচ-টুপীযুক্ত অবস্থায় ১০০ ও ২৫০ ওয়াট এবং বড় প্যাঁচ-টুপীযুক্ত অবস্থায় ৫০০ এবং ১০০০ ওয়াটের তৈরী হয়। বড় প্যাঁচটুপীর বদলে বড়-প্রিফোকাস ব্যবস্থাযুক্ত বাতীও পাওয়া যায়। তবে ১০০ ওয়াটের বাতীগুলি মঞ্চে বড় একটা ব্যবহৃত হয় না। এদের মধ্যে 'বি-ওয়ান' শ্রেণীতে ফিলামেণ্ট **গুচ্ছ** আকারে, এবং 'টী' শ্রেণীতে **গরাদ** আকারে থাকে। ৫০০ এবং ১০০০-ওয়াট বাতীর ফিলামেণ্টগুলি একই উচ্চতায় থাকায়, একটির বদলে অন্যটি সহজেই লাগানো যায়। বাতীর গোলকগুলি গলদেশহীন, একেবারেই গোল হওয়ার ফলে, আকারে ছোট—অল্প জায়গায় ব্যবহার করার উপযোগী। এগুলির জীবনসীমা ন্যূনাধিক ৮০০ ঘণ্টা।

এই জাতীয় বাতীর শীর্ষবিন্দু থেকে ৪৫° কোণের মধ্যে এদের টুপী রাখা অবস্থায় এগুলি জ্বালানো উচিত নয়।

১০০ ওয়াট থেকে সুরু করে ১৫০০ ওয়াট পর্য্যন্ত শক্তিসম্পন্ন বিভিন্ন আকারে **নলাকৃতি 'এ-ওয়ান'** শ্রেণীর প্রক্ষেপবাতী [চিত্র ২৪.২ খ] তৈরী হয়। তবে মঞ্চে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয় এই শ্রেণীর ২৫০, ৫০০ ও ১০০০ ওয়াটের বাতীগুলি। সরু বর্তুলাকার কাচের আধারে সমান্তরালভাবে দাঁড় করানো গরাদ শ্রেণীর ফিলামেণ্ট দিয়ে এই বাতী তৈরী। এই জাতীয় ফিলামেণ্টের উভয় দিক থেকেই লক্ষণীয়ভাবে উজ্জল আলো পাওয়া যায়। অন্যশ্রেণীর ফিলামেণ্টের চেয়ে অনেক বেশী উত্তাপে এই ফিলামেণ্ট জ্বালানো চলে—যার ফলে আলোকবিকীরণ ক্ষমতাও গুচ্ছ শ্রেণীর ফিলামেণ্টের চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেড়ে যায়। অধিক উত্তাপে জ্বলতে পারার এই ক্ষমতা কিন্তু বাতীগুলির জীবনসীমা অনেকখানি কমিয়ে দিয়েছে [ন্যূনাধিক ৫০ ঘণ্টা মাত্র]। টুপীটি সরাসরি উপরে রাখা অবস্থায় ছাড়া, অন্য যে কোন অবস্থাতেই নলাকৃতি বাতীগুলি জ্বালানো চলে। তবে খুব বেশী বাঁকা অবস্থায় ব্যবহৃত হলে, কাচের দেয়ালে কালো দাগ দেখা যাবে। গোলাকৃতি প্রক্ষেপবাতীর চেয়েও সংকীর্ণ পরিসরে এই শ্রেণীর বাতী সহজে ব্যবহার করা চলে।
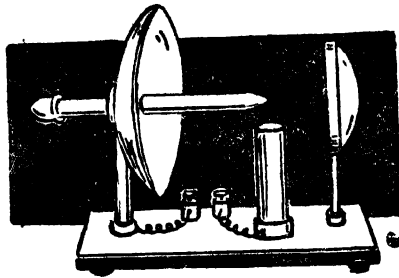
[চিত্র ২৪.৩] কার্বণ আর্ক

এ যাবৎ বর্ণিত সব শ্রেণীর বাতীই আলোক উৎপাদন করে ফিলামেণ্টের সাহায্যে। এগুলি ব্যতীত আরও দুই শ্রেণীর বাতী আছে, যাদের আখ্যা দেওয়া যায় **ফিলামেণ্টহীন বাতী**। অধুনা মঞ্চজগতে এদের প্রথমটির ব্যবহার কমে আসছে, দ্বিতীয়টির ব্যবহার সম্যকভাবে আরম্ভ হয়নি।

প্রথম ও প্রাচীন ফিলামেণ্টহীন বাতী হিসাবে ধরা যেতে পারে **কার্বণ আর্ক**-কে। কিছুকাল আগে পর্য্যন্ত রঙ্গমঞ্চে এই শ্রেণীর বাতীরই [চিত্র ২৪.৩] একাধিপত্য ছিল। এর আলোকসূত্র হিসাবে ব্যবহৃত হয় দুটি কারবণের শলাকা—একটি যুক্ত থাকে বিদ্যুৎ প্রবাহের ধনপ্রান্তে, অপরটি ঋণপ্রান্তে। যখন আলোকরশ্মির প্রয়োজন হয়, তখন এই শলাকাদুটি মুহূর্তের জন্য পরস্পরের সঙ্গে লাগিয়েই ঈষৎ দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে দুই শলাকার মুখে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি হয় এবং তীব্র নীলাভ-শ্বেতবর্ণের আলোক বিকীরণ হতে থাকে। বাতাসের সংস্পর্শে থাকার ফলে, শলাকাদুটি জ্বলে ক্রমশঃ শেষ হয়ে যায়। দেখা গেছে, ধনপ্রান্তে দহন চলে দ্রুতগতিতে। তাই ধনপ্রান্তে বৃহত্তর ব্যাসের শলাকা ব্যবহৃত হয়।

ডি. সি ব্যবস্থাযুক্ত অঞ্চলেই কার্বন আর্ক ব্যবহার করা সহজ। এ. সি ব্যবস্থায় ব্যবহার করতে হলে সমান ব্যাসের দুটি শলাকা ব্যবহার করা দরকার। তবে ডি. সি'র তুলনায় এ. সি-তে ব্যবহৃত কার্বন আর্কের বাতী অনেক কম শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকে ; এবং প্রথমটির মতো দ্বিতীয়টিতে বেশী যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা যায় না।

কার্বণ আর্ক অবশ্যই রেজিষ্ট্যান্স এবং চোক-এর সঙ্গে 'সিরীজ' অবস্থায় ব্যবহার করতে হবে। পাশ্চাত্য দেশসমূহে নাচের আসরে তীক্ষ্ণ বৃত্তাকার আলো দিয়ে অনুসরণ করা হয় ; তাই কার্বণ আর্কের সমাদর সেখানে আজও আছে। আমাদের দেশে পেশাদারী মঞ্চে কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত অভিনেতার বিশেষ মুখভঙ্গীমার উপরে বা ঘটনার বিশেষ মুহূর্ত্তটিতে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য এই জাতীয় আর্ক ব্যবহার করা হতো। ক্রমক্ষয়মান শলাকাদুটির দূরত্ব সমান রেখে, আর্কটিকে সমান উজ্জ্বল রেখে জ্বালিয়ে যাওয়া রীতিমতো অভ্যাসসাপেক্ষ। অনেকক্ষেত্রে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে এই কাজটি সম্পন্ন হয়।

ভবিষ্যৎ আলোকসম্পাতের বিশিষ্ট উপকরণ হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর ফিলোমেণ্টহীন **ডিসচার্জ** এবং **প্রতিপ্রভ** বা 'ফ্লুরোসেণ্ট বাতী'র [চিত্র ২৪.৪] কিছুটা পরিচয় জেনে রাখা ভালো। অবশ্য, আজও এগুলির কয়েকটি ত্রুটি শোধরানো সম্ভব হয়নি বলে, মঞ্চে এই জাতীয় বাতী জনপ্রিয় হতে পারেনি।

বিজ্ঞাপনমালায় ব্যবহৃত নিওনের আলোই এই শ্রেণীর বাতীর সাধারণ

রূপ। এই বাতীর অভ্যন্তরে ধনপ্রান্ত থেকে ঋণপ্রান্তে অতি উচ্চ চাপের [৬000 বা ততোধিক] বিদ্যুৎতরঙ্গ পাঠানো হয়। প্রান্ত থেকে প্রান্তে লাফিয়ে যাওয়ার পথে ঐ বিদ্যুৎতরঙ্গ বাতীর নলের ভিতরে রাখা বাষ্পকে উজ্বল করে তোলে। ঠাণ্ডা আলোর এই বাতীর আলোক বিকীরণ ক্ষমতা ও জীবনসীমা সাধারণ ফিলামেণ্টযুক্ত বাতীর তুলনায় অনেকগুণ বেশী।
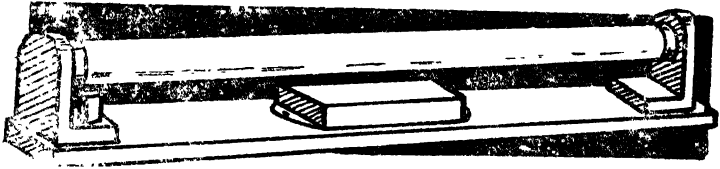
[চিত্র ২৪.৪] প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরোসেন্ট বাতী

ব্যবহৃত বাষ্পেব উপরে এই জাতীয় বাতীর বর্ণ নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, 'নিওন' বাষ্পের সাহায্যে পাওয়া যায় লাল রঙ; পারদ-বাষ্পের সাহায্যে পাওয়া যায় নীল। তেমনি আবার পারদের বদলে 'সোডিয়াম' ব্যবহার করলে হলুদ রঙের আলো পাওয়া যায়। বিভিন্ন পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, তরঙ্গের চাপ, বাষ্পের চাপ, বাষ্পেব উপাদান, নলিকার আকৃতি প্রভৃতির তারতম্য ঘটিয়ে এত রকমারী বর্ণবিন্যাস করা সম্ভব, যা বাহ্যিক বর্ণমাধ্যম ব্যবহার করার তুলনায় উৎকৃষ্টতর।

ফ্লুরোসেণ্ট বাতীর প্রচলিত আকার দুইফুট ও চারফুট। প্রথমটি ২0 এবং দ্বিতীয়টি ৪0 ওয়াট শক্তিসম্পন্ন। এই জাতীয় বাতীর একটি বিশেষ গুণ, এদের আলোক উৎপাদন কেন্দ্রটি অনেকখানি প্রসারিত, এবং উৎপাদন-স্থলে আলোকের প্রখরতা যথেষ্ট কম। মঞ্চে ব্যবহারের পক্ষে এটি একটি মহৎ গুণ। কিন্তু ডিমারের সাহায্যে এদের কমানো-বাড়ানো যায় না। কমানোর প্রয়োজনে **সার্সি** বা 'শাটার' ব্যবহার করতে হয়, যা মঞ্চে আলোকসম্পাতের পক্ষে অসুবিধাজনক।

এ. সি ব্যবস্থায় তড়িৎ গতির ঘন ঘন দিক পরিবর্তনের ফলে ফ্লুরোসেণ্ট বাতী বার বার জ্বলে ও নেভে। এই দিক পরিবর্তনের গতি যদি ৫0 সাইক্লসেব কম হয়, তবে বাতীর কম্পন সাধারণ চোখেই ধরা পড়বে। গতিযুক্ত বস্তর উপরে [পাখার ব্লেড ইত্যাদি] এই কম্পনের

প্রভাব পড়ে বেশী। এ ধরণের প্রতিক্রিয়াকে **ষ্ট্রোবোস্কোপিক প্রতিক্রিয়া** বলা হয়। চলচ্চিত্রের পর্দায় ঘূর্ণায়মান চাকাগুলি মাঝে মাঝে পিছনের দিকে ঘুরছে বা থেমে আছে বলে মনে হয়, এই প্রতিক্রিয়ার ফলে।

প্রতিফলন ও প্রতিফলক

আলোকরশ্মির নিজস্ব প্রখরতা বাড়িয়ে তোলার জন্য যত রকমের বাহ্যিক উপকরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে, **প্রতিফলকের** সংযোজন তাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান প্রচেষ্টা। প্রতিফলকের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সবিশেষ জানতে হলে, প্রতিফলনের নিয়ম সম্বন্ধে ধারণা থাকা দরকার।

আলোক তরঙ্গ যখনই কোনও রঙের [কালো ছাড়া] উজ্জ্বল বস্তুর উপর প্রতিহত হয়, তখনই তা প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। এই **প্রতিফলন**-ক্রিয়া একটি সুনির্দিষ্ট নিয়ম অনুসরণ করে ঘটে। নীচের সংজ্ঞাগুলি বিষয়টিকে বোঝানোর সাহায্য করবে।
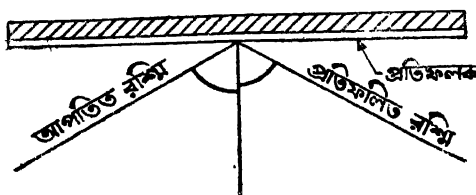
[চিত্র ২৫.১] আলোক প্রতিফলনের নিয়ম

আলোকরশ্মির প্রতিহত হওয়ার বিন্দুতে যদি একটি লম্ব কল্পনা করা হয়, তবে এই লম্বের সহিত আপতিত রশ্মিরেখার দ্বারা উৎপন্ন কোণকে বলা হয় **আপতন কোণ** ; এবং প্রতিফলিত রশ্মিরেখার দ্বারা উৎপন্ন কোণকে বলা হয় **প্রতিফলন কোণ**। এই উভয় কোণের সম্পর্ক [চিত্র ২৫.১] নীচের ভাষায় প্রকাশ করা যাবে :—

"আপতিত রশ্মি ও প্রতিফলিত রশ্মি এবং প্রতিফলন-বিন্দুতে কল্পিত লম্ব, এই তিনটিই এক তলে অবস্থিত।"

"প্রতিফলিত রশ্মিরেখা লম্বটিকে মাঝে রেখে, আপতিত রশ্মিরেখার বিপরীত দিকে নির্গত হয়।"

"আপতন ও প্রতিফলনের কোণ দুইটি সমান হবে।"

সাদা ব্লটিং কাগজেও প্রতিফলন হয়, আবার আয়না থেকেও প্রতিফলন ঘটে। পরিমাণের দিক থেকে উভয় বস্তুই প্রায় সমান আলো প্রতিফলিত করে ; কিন্তু প্রথমটির ক্ষেত্রে আলোকরশ্মি প্রতিহত হওয়ার পর চতুর্দিকে ছড়িয়ে বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিফলিত হয় ; এবং পরবর্তী বস্তুর ক্ষেত্রে প্রতিফলনের যথাযথ নিয়ম অনুসরণ করেই প্রতিফলন ঘটে। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর প্রতিফলনকে বলা হয় **নিয়মিত প্রতিফলন**। বস্তুভেদে সামগ্রিক প্রতিফলন এবং নিয়মিত প্রতিফলনের পরিমাণে যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। নীচের তালিকায়, প্রতিফলক হিসাবে ব্যবহৃত কয়েকটি সাধারণ বস্তুর তুলনামূলক প্রতিফলন পরিমাণ দেওয়া হলো :—

বস্তু	সামগ্রিক প্রতিফলনের মান	নিয়মিত প্রতিফলনের মান
পারদ-পৃষ্ঠ কাচের আয়না	শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ	শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ
কলাই করা পিতলের চাদর	,, ৮৫ ,,	,, ৮৫ ,,
ষ্টেনলেশ ষ্টীল	,, ৫৭-৬০ ,,	,, ৫০ ,,
ক্রোমিয়ামের পাত	,, ৬০-৬৫ ,,	,, ৫৫-৬০ ,,
এনোডাইজ করা এল্যুমিনিয়াম	,, ৮৪ ,,	,, ৮৩ ,,
সাদা ব্লটিং কাগজ	,, ৮০ ,,	,, ০ ,,

আলোক যন্ত্রে ব্যবহৃত প্রতিফলকগুলি সমতল হয় না—বিভিন্ন আকারে এগুলিকে বেঁকিয়ে ব্যবহার করা হয়। এর প্রধানতঃ দুটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, প্রতিফলকটি বাঁকা হওয়ার ফলে, ছোট আকারের প্রতিফলকেও অনেক বেশী পরিমাণের আলোকরশ্মি ধরা যায়। দ্বিতীয়তঃ, বক্রতার পরিমাণে তারতম্য ঘটিয়ে; প্রক্ষেপিত আলোকের রশ্মিকোণ ইচ্ছানুরূপ বাড়ানো বা কমানো যায়। এছাড়া, প্রতিফলকের গঠন বৈচিত্রের দ্বারাই প্রক্ষেপিত রশ্মিকে সংহত করা হয় বলে, অযথা বিরাট আকারের রঙিন মাধ্যম ব্যবহার করার প্রয়োজন হয় না।

যে সব প্রতিফলক আলোক যন্ত্রে সচরাচর ব্যবহৃত হয়, তাদের প্রকার-ভেদে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে।
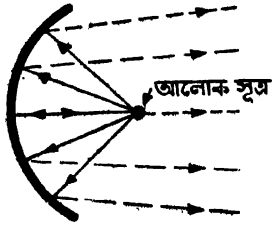
[চিত্র ২৫.২] স্ফেরিক্যাল প্রতিফলক

একজাতীয় প্রতিফলক আলোককে শুধু আবার ফিলামেণ্টের ভিতর দিয়ে সামনের দিকে চালিয়ে দেয়। অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি বাটি-আকারের এই জাতীয় প্রতিফলককে [চিত্র ২৫.২] বলে **স্ফেরিক্যাল** প্রতিফলক। সাধারণ স্পট-বাতী এবং ফ্লাড বাতীতে এই শ্রেণীর প্রতিফলকের ব্যবহারই বেশী।

দ্বিতীয় এক শ্রেণীর প্রতিফলকের কাজ, আলোকসূত্র থেকে সংগ্রহিত রশ্মিগুলিকে সমান্তরাল রেখায় প্রতিফলিত করা। এদের **প্যারাবোলিক** প্রতিফলক [চিত্র ২৫.৩] বলে। প্রোজেক্টার এবং ঝরির বাতীতে এই জাতীয় প্রতিফলক ব্যবহৃত হয়।
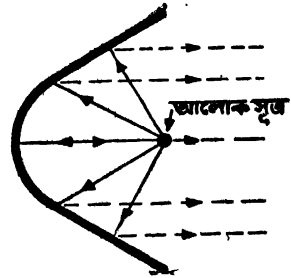
[চিত্র ২৫ ৩] প্যারাবোলিক প্রতিফলক

তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে **ঈলিপ্টিক্যাল** [চিত্র ২৫.৪] প্রতিফলক। 'ঈলিপ্সোডিয়াল রিফ্লেক্টার স্পট'বাতী নামক বিশেষ একশ্রেণীর
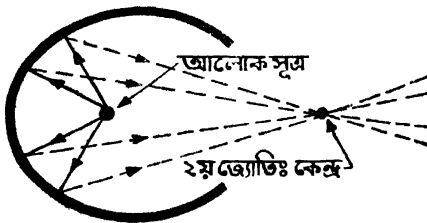
[চিত্র ২৫.৪]
ঈলিপ্টিক্যাল প্রতিফলক

আলোকযন্ত্র ও ফ্লাডবাতীগুলিতে এই ধরণের প্রতিফলক ব্যবহৃত হয়। এই শ্রেণীর প্রতিফলক, বিচ্ছুরিত আলোককে দ্বিতীয় একটি **জ্যোতিঃ-কেন্দ্রে** সংহত করতে পারে।

প্রতিফলকের সাহায্যে সাধারণ বাতীর আলোর পরিমাণ শতকরা ২৫ থেকে ৫০ গুণ বাড়িয়ে তোলা যায়। কিন্তু প্রতিফলকের কেন্দ্র, জ্যোতিঃকেন্দ্র ও আলোকসূত্রের কেন্দ্র একই রেখায় না থাকলে, প্রতিফলনের বিভ্রম ঘটে, এবং ঔজ্জ্বল্য নিয়মমতো বৃদ্ধি পায়না। এই কারণেই, আলোক-যন্ত্রে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত অথবা প্রিফোকাস ব্যবস্থাযুক্ত প্রতিফলক ব্যবহার করা উচিত।

প্রতিফলনের পরিমাণজ্ঞাপক তালিকায় আমরা দেখেছি, সর্বাধিক সামগ্রিক প্রতিফলন ক্ষমতা আছে আয়নার মধ্যে। কিন্তু প্রতিফলক হিসাবে আয়না ব্যবহৃত হলে, একটি বিরাট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। আয়নার নিখুঁত প্রতিফলনে, ফিলামেণ্টেরই কয়েকগুণ বর্দ্ধিত আকারের চিত্র প্রক্ষেপিত হবে, যা কিছুটা বিকৃত হয়ে আলোর অনেকগুলি আঁকাবাঁকা রেখার মতো দেখাবে। এইজাতীয় আঁকাবাঁকা আলোর দাগকে **ফিলোমেণ্ট-স্ট্রায়েশান** বলে। [আলোকসূত্র পিছিয়ে আতসকাচের জ্যোতিঃকেন্দ্রে নিয়ে গেলেও, ফিলামেণ্ট-স্ট্রায়েশান ঘটে]

এই ত্রুটির হাত এড়ানোর জন্য আয়নার চেয়ে কম পরিমাণে নিয়মিত প্রতিফলন হয়, এমন বস্তুর প্রতিফলক বেছে নেওয়া দরকার। অসমতল কাচের প্রতিফলকও ব্যবহৃত হতে পারে। **ক্যাথিড্রাল** এবং **সান্-রে** এই দুই জাতের কাচ এবিষয়ে খুবই প্রচলিত। প্রথম জাতের কাচের উপরিভাগ ঢেউ-খেলানো, এবং দ্বিতীয় জাতের উপরিভাগ আতাফলের মতো বুটিদার। এদের ব্যবহার করা হয় যথাক্রমে **সংকীর্ণ-রশ্মি** ও **প্রশস্ত রশ্মি** ক্ষেপণকারী আলোকযন্ত্রে।

যদি আটকানোর ব্যবস্থা মজবুতভাবে করা থাকে, তবে কাচের প্রতিফলকের ভঙ্গুরতা সম্পর্কে ভয়ের কিছু নেই। অবশ্য উচ্চশক্তিসম্পন্ন বাতীর খুব কাছাকাছি যদি ব্যবহৃত হয়, তবে দুই বা তিনবছর অন্তর, প্রতিফলকের পারদ স্তর নূতন করে নেওয়া উচিত। ধাতব প্রতিফলকেও এই একই সময় অন্তর পালিস করে জল ধরাতে হয়।

অদূর ভবিষ্যতে হয়তো প্রতিফলক নির্মাণ ব্যবস্থায়, জল ধরাণোর পরিবর্তে এনোডাইজ করা এল্যুমিনিয়মের ব্যবহার সমধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করবে। ঐ ধাতুর প্রতিফলক উচ্চশক্তিসম্পন্ন বাতীর খুবই কাছাকাছি রেখে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা যাচ্ছে।

প্রতিসরণ ও আতসকাচ

বাহ্যিক উপকরণের সাহায্যে আলোকরশ্মির প্রাখর্য্য বাড়ানোর দ্বিতীয় উপায়, **আতস কাচ**-এর ব্যবহার। পূর্ব অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, আলোকরশ্মি যখন কোনও উজ্বল অস্বচ্ছ বস্তুর উপরে পতিত হয়, তখন সেই রশ্মি প্রতিফলনের নিয়ম অনুসরণ করে ফিরে যায় অন্যদিকে। কিন্তু বস্তুটি যদি স্বচ্ছ হয়, তখন আর প্রতিফলন ঘটেনা—সেই বস্তুর ভিতর দিয়ে আলোক অতিক্রম করে, এবং অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে, যতক্ষণ না কোনও অস্বচ্ছ বস্তুর সম্মুখীন হচ্ছে। এই অতিক্রমণের সময় আলোকরশ্মির গতিপথ বেঁকে যায়, বা আলোকের **প্রতিসরণ** ঘটে। আতসকাচের প্রতিক্রিয়া **প্রতিসরণের নিয়মাবলী**তে বাঁধা।

আলোকরশ্মি তার গতিপথে যখনই মাধ্যম পরিবর্তন করে, অর্থাৎ বায়ুস্তর থেকে কাচের মধ্যে, বা জলের মধ্যে, এমন কি এক জাতীয় কাচ থেকে অন্যজাতীয় কাচের মধ্যে প্রবেশ করে, তখনই প্রতিসরণ ঘটে। প্রতিসরণের পরিমাণ শুধু যে মাধ্যমের উপরে নির্ভর করে তা নয়, আপতিত
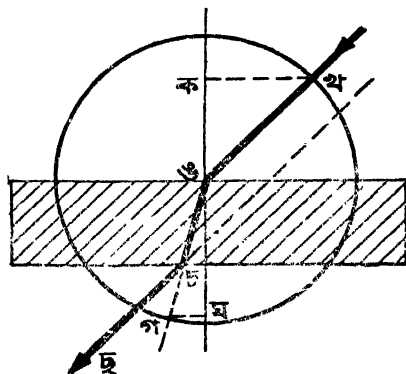
[চিত্র ২৬.১] আলোক প্রতিসরণের নিয়ম

রশ্মি কর্তৃক মাধ্যমতলের উপরে বর্ণিত কোণের পরিমাণের উপরেও নির্ভরশীল। উদাহরণস্বরূপ, বায়ুর স্তর এবং কাচের ক্ষেত্র ধরা যাক। এক্ষেত্রে আলোকের গতিপথে দুবার প্রতিসরণ ঘটবে: প্রথমবার, বায়ুস্তর থেকে কাচের মধ্যে অনুপ্রবেশের সময়; দ্বিতীয়বার কাচের স্তর অতিক্রমণের পর, বায়ুস্তরে বেরিয়ে আসার সময়।

আলোকতরঙ্গের দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রবেশের বিন্দুতে যদি একটি লম্ব কল্পনা করা যায়, তবে ঐ লম্বের সহিত আপতিত রশ্মিরেখার দ্বারা উৎপন্ন কোণকে বলা হয় **আপতন কোণ** ; এবং পরবর্তী মাধ্যমের মধ্যে প্রতিসরিত রশ্মিরেখার দ্বারা উক্ত লম্বের বর্দ্ধিতাংশের সহিত উৎপন্ন কোণকে বলা হয় **প্রতিসরণ কোণ** । এই উভয় কোণের সম্পর্ক নীচের সংজ্ঞায় প্রকাশ করা যাবে :—

"আপতিত রশ্মি, প্রতিসরিত রশ্মি ও প্রতিসরণ বিন্দুতে কল্পিত লম্ব, এই তিনটি রেখাই এক তলে অবস্থিত। এদের মধ্যে রশ্মি রেখা দুটি লম্বের উভয় দিকে থাকে।"

"প্রতিসরণ বিন্দুকে কেন্দ্র করে একটি বৃত্ত আঁকা হোক, যা ক্রমান্বয়ে আপতিত রশ্মি ও প্রতিসরিত রশ্মিরেখাকে দুটি বিন্দুতে ছেদ করবে। এই ছেদ বিন্দুদ্বয় থেকে যদি পূর্বোক্ত লম্বের উপরে দুইটি লম্ব টানা যায় [চিত্র ২৬.১ দ্রষ্টব্য : ক-খ ও গ-ঘ], তবে শেষোক্ত লম্ব দুটির অনুপাত, দুইটি নির্দিষ্ট মাধ্যমের ক্ষেত্রে ধ্রুবক হবে।"

উপরে বর্ণিত অনুপাত-সংখ্যাকে **প্রতিসরণফল** বলে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, বাতাস ও কাচের ক্ষেত্রে এই প্রতিসরণফল প্রায় ৩ : ২। অনুরূপ ভাবে বাতাস ও জলের ক্ষেত্রে ৪ : ৩ এর কাছাকাছি।

একটি **তিনপলা কাচ** নিয়ে যদি এই প্রতিসরণের পরীক্ষা চালানো যায়, দেখা যাবে, আলোক রশ্মি সর্বদাই তিনপলা কাচের ঘনতর অংশের দিকে [চিত্র ২৬.২] প্রতিসরিত হবে। [এই জাতীয় প্রতিসরণের ফলেই
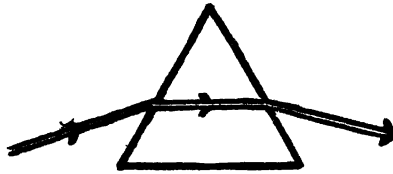
[চিত্র ২৬.২] তিনপলা কাচের মাধ্যমে আলোক প্রতিসরণ

বর্ণ-বিশ্লেষণ ঘটে—পরবর্তী পরিচ্ছেদে এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।] যদি সমান ঘনত্ব ও আকৃতি বিশিষ্ট দুটি তিনপলা কাচের ভূমি দুইটি পরস্পর সংলগ্ন অবস্থায় রেখে, তাদের ভিতর দিয়ে আলোকরশ্মির প্রতিসরণ ঘটানো

হয় [চিত্র ২৬.৩], দেখা যাবে প্রতিসরিত রশ্মি তিনপলা কাচ দুটির বিপরীত দিকে আলোকের একটি মোচার আকৃতিবিশিষ্ট গতিপথ সৃষ্টি করে, আবার সংহত হয়েছে।

এই জাতীয় সংহত প্রতিসরণের ক্রিয়া কাজে লাগানোর জন্য, কাচকে উপযুক্ত আকারে এনে তৈরী করা হয় **আতস কাচ** বা **লেন্স**—দীপচিত্রণ বিদ্যায় যার অবদানের সীমা নেই।
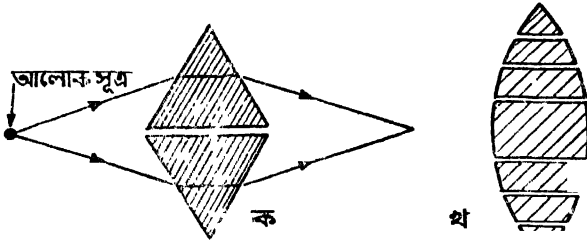
[চিত্র ২৬.৩] (ক) আলোক রশ্মির মোচার আকৃতি বিশিষ্ট গতি পথে প্রতিসরণ এবং (খ) আতস কাচের গঠন।

আতসকাচ একটি স্বচ্ছ গোলাকার কাচের তাল, যার মধ্যভাগ স্ফীত এবং প্রান্তভাগ ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে গেছে; অথবা ঠিক বিপরীত গঠনের—অর্থাৎ, মধ্যভাগ ক্ষীণ, এবং প্রান্তভাগ ক্রমশঃ স্ফীত হয়ে উঠেছে। মধ্যভাগ যাদের স্ফীত [চিত্র ২৬.৪-ক] তাদের বলা হয় **উত্তল আতস কাচ**। ক্ষীণ যাদের মধ্যভাগ [চিত্র ২৬.৪-খ], তাদের বলা হয় **অবতল আতস**

[চিত্র ২৬.৪] বিভিন্ন শ্রেণীর আতস কাচের প্রস্থচ্ছেদ চিত্র
[কঃ উত্তল, খঃ অবতল, গঃ সম-উত্তল, ঘঃ সম-অবতল, ঙঃ উত্তলাবতল]

কাচ। এই দুই প্রকার ছাড়াও একাধিক ভিন্ন শ্রেণীর আতস কাচ বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয়। তাদের মধ্যে **সম-উত্তল, সম-অবতল** এবং **উত্তলাবতল** শ্রেণীর আতসকাচগুলি [চিত্র ২৬.৪ যথাক্রমে গ. ঘ. ঙ.] সমধিক প্রচলিত।

এই বিভিন্ন শ্রেণীর আতস কাচগুলির মধ্যে **সম-উত্তল** শ্রেণীর আতস কাচ দীপচিত্রণের কাজে বিশেষ প্রয়োজনীয়। এই শ্রেণীর কাচের সাহায্যে সূর্য্যের সমান্তরাল রশ্মিকে একটি বিন্দুতে সংহত করা যায়। [এই বিন্দুকে বলা হয় আতসকাচের **জ্যোতিঃকেন্দ্র** বা 'ফোকাস', এবং আতসকাচের কেন্দ্র থেকে জ্যোতিঃকেন্দ্রের দূরত্বই হলো সেই কাচের **অধিশ্রয়ণ মান** বা 'ফোক্যাল লেংথ্'] অপরপক্ষে, এই বিন্দুতে যদি একটি আলোকসূত্র রাখা যায়, তবে তার বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি আতসকাচের ভিতর দিয়ে সংহত সমান্তরাল রশ্মি হয়ে বেরিয়ে যাবে। বলাবাহুল্য, আলোকসূত্রটি আতসকাচের জ্যোতিঃকেন্দ্রের সামনে বা পিছনে থাকলে, প্রার্থিত ফল পাওয়া যাবেনা। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, জ্যোতিঃকেন্দ্র থেকে সরিয়ে আলোকসূত্রকে যদি আতসকাচের কাছে আনা হয়, বিনির্গত রশ্মি তখন সমান্তরাল না হয়ে, পরিবর্দ্ধিত বৃত্তাকার পথে এগিয়ে চলে। এই পরিবর্দ্ধন ক্ষমতা এবং আতসকাচের অধিশ্রয়ণ মান নির্ভর করে, কাচের উপরিতলের বক্রতার উপরে।

আতসকাচের পরিচয় যথাক্রমে তার ব্যাস ও অধিশ্রয়ণ মানের উল্লেখে দেওয়া হয়। যেমন, একটি আতস কাচের ব্যাস ৫ ইঞ্চি, এবং অধিশ্রয়ণ মান ৮ ইঞ্চি—এই কাচটিকে বলা হবে ৫"×৮" আতসকাচ। অপর একটি আতস কাচ হয়তো ৫"×২০", অর্থাৎ ব্যাস উভয়ক্ষেত্রেই সমান, শুধু দ্বিতীয়টির অধিশ্রয়ণ মান প্রথমটির চেয়ে বেশী। এক্ষেত্রে বুঝতে হবে প্রথমটির বক্রতা অনেক বেশী। দ্বিতীয়টির উপরিভাগ সাধারণের চোখে প্রায় সমতল বলে মনে হবে।

বিভাজন ও ধাপযুক্ত আতসকাচ

আতসকাচের বক্রতা যত বেশী হবে, দীপচিত্রণের কাজে তার ব্যবহার হয়ে উঠবে ততই জটিল; কারণ বক্রতার আধিক্যে বিচ্ছুরিত রশ্মির বিকৃতি ও বর্ণবিশ্লেষণের সম্ভাবনা থাকবেই। বিভিন্ন বর্ণ তরঙ্গের প্রতিসরিত হওয়ার ক্ষমতা ভিন্ন ভিন্ন রকমের। আতসকাচের ভিতর দিয়ে প্রতিসরিত হওয়ার সময়, সাদা আলোর সব কয়টি রঙ একত্রে না বেরিয়ে, রশ্মিগুলির বিশ্লেষণ ঘটে। এই বিশ্লেষণাত্মক প্রতিসরণকে **বিভাজন** বলা হয়।

দীপচিত্রণের কাজে বিভাজনের ফলে, আলোকের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য অনেকখানি নষ্ট হয়। তাছাড়া, আতসকাচের স্ফীতকায় শরীরের মধ্যে আলোকের লক্ষণীয় অংশ পরিশোষিত হওয়ার ফলে অপচয় ঘটে। এই জাতীয় ত্রুটি সংশোধনের একাধিক ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়েছে। অনেক সময় দুই বা ততোধিক আতসকাচ উপর্যুপরি ব্যবহার করা হয় এই ত্রুটি সংশোধন করার জন্য। অনেক সময় দুটি ভিন্ন জাতীয় কাচে আতসকাচটি তৈরী করা হয়—এর ফলে একের ত্রুটি অন্যের দ্বারা শোধিত হয়। তবে এই জাতীয় আতসকাচগুলি অত্যন্ত দামী—মঞ্চে দীপচিত্রণের কাজে লাগানোর পক্ষে উপযোগী নয়। এই ত্রুটি সংশোধনের জন্য ধাপযুক্ত আতসকাচের [চিত্র ২৬.৫] ব্যবহারই মঞ্চে সমধিক প্রচলিত। আবিষ্কর্তার নামানুসারে একে **ফ্রেনেল**ও বলা হয়।

[২৬.৫] 'ফ্রেনেল' বা 'স্টেপ লেন্সে'র প্রস্থচ্ছেদ চিত্র

প্রদীপ যন্ত্র

ব্যবহার অনুসারে আলোকসম্পাতের কাজে ব্যবহৃত প্রদীপ যন্ত্রগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা—(ক) ঝরি বা পাদপ্রদীপমালা, (খ) ফ্লাড বাতী, (গ) স্পটবাতী এবং (ঘ) ম্যাজিক লণ্ঠন বা প্রক্ষেপক যন্ত্র। কিন্তু পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, অপরিসর ফ্লাডবাতী ও একশ্রেণীর স্পটবাতীর মধ্যে পার্থক্য খুবই কম—অন্যদিকে ঝরি বা পাদপ্রদীপমালা, সারবন্দী ছোট ছোট ফ্লাডবাতী ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগে বিভ্রান্তিকর ধারণা জন্মাতে পারে। দীপচিত্রণের যন্ত্রগুলিতে ব্যবহৃত প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার উপরে নির্ভর করে শ্রেণীভাগ করলেই, এই বিভাগ যথাযথ হবে।

প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার তারতম্য অনুযায়ী প্রদীপ যন্ত্রগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় :—

(ক) প্রথম শ্রেণীর সরঞ্জামে বাতী অর্থাৎ আলোকসূত্রটি প্রতিফলকের কাছ থেকে নির্দিষ্ট ব্যবধানে স্থায়ীভাবে সংবদ্ধ থাকে। এর ফলে, ঐ শ্রেণীর সরঞ্জাম দিয়ে নির্দিষ্ট ব্যাপ্তি ও পরিমাণের আলো পাওয়া যায়। [আতসকাচ ব্যবহৃত হলে, তারও স্থান স্থায়ীভাবে

নির্দিষ্ট থাকে] ফ্লাডবাতী, ঝরি এবং পাদপ্রদীপমালা এই শ্রেণীর প্রদীপ-যন্ত্রের তালিকায় পড়ে।

(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর সরঞ্জামে বাতী অর্থাৎ আলোকসূত্রটি আতসকাচ এবং প্রতিফলক উভয়ের বা কোনো একটির দিকে এগিয়ে বা পিছিয়ে নেওয়া যায়। ফোকাস লন্ঠন বা ক্রমবিলীয়মান সীমাযুক্ত স্পটবাতী এই শ্রেণীর প্রদীপযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে নিখুঁত প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা সম্বলিত প্রদীপযন্ত্রগুলি। এই জাতীয় ব্যবস্থায় প্রতিফলক ও আতসকাচ প্রভৃতির সংস্থাপনা নিখুঁত মাপজোপের উপরে নির্ভর করে। বিশেষ একশ্রেণীর স্পটবাতী এবং চিত্র প্রক্ষেপণ যন্ত্রগুলি পড়ে এই শ্রেণীর তালিকায়।

বিভিন্ন শ্রেণীর প্রদীপযন্ত্রের প্রত্যেকটির আবার আলোক পরিবেশনের নিজস্ব বিশেষ ধারা আছে। একজাতীয় প্রদীপযন্ত্র থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে সমুদয় স্থান আলোকিত করে। অন্য একশ্রেণীর প্রদীপযন্ত্র থেকে এত সংকীর্ণভাবে রশ্মি নির্গত হয় যে, লক্ষণীয় দূরত্ব অতিক্রমণের পরেও রশ্মির ব্যাপ্তি একটি মানুষের মুখের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। একশ্রেণীর প্রদীপযন্ত্র থেকে নির্গত রশ্মির সুনির্দিষ্ট আকৃতি থাকে এবং সীমারেখা স্পষ্ট বোঝা যায়। আবার ভিন্ন শ্রেণীর প্রদীপযন্ত্রের রশ্মি সীমার দিকে
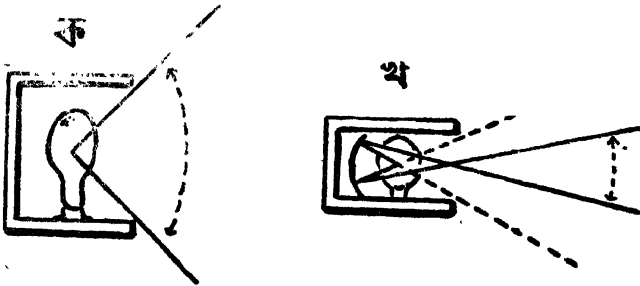
[চিত্র ২৭.১] (ক) প্রতিহত কোণ এবং (খ) রশ্মি কোণ

ক্রমশঃ অনুজ্জল হয়ে আসে। কোন শ্রেণীর যন্ত্রের কাছ থেকে কি ধরণের আলোক পরিবেশন পাওয়া যাবে জানতে হলে, **রশ্মিকোণ** এবং **প্রতিহত কোণ** সম্পর্কে জ্ঞান থাকা দরকার।

I

ভিতর দিকে কালো রঙ লাগানো একটি বাক্সে একটি বাতী রেখে, তার একটিমাত্র খোলা পথে যদি সামনের পর্দায় আলো ফেলা যায়, দেখা যাবে বাক্সের খোলামুখের আকৃতি নিয়ে আলো পড়েছে পর্দার উপরে। বাক্সের খোলামুখের সীমারেখার বাইরে আলো যায়নি। অর্থাৎ নির্গত আলোটুকু বাদে, বাকী আলো বাক্সের সীমায় প্রতিহত হয়েছে। বাতীর কেন্দ্রকে শীর্ষবিন্দু হিসাবে ধরে, প্রতিহত সীমায় আলোক রশ্মি যে কোণ রচনা করে [চিত্র ২৭.১ ক], তাকে বলা হয় **প্রতিহত কোণ** বা 'কাট্-অফ এ্যাঙ্গল'।

প্রতিফলকের ব্যবহারে, বাক্সের ভিতরে অপচয় হওয়া অনেকখানি রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে বাক্সের মুখ দিয়ে। এই সংযুক্ত ঔজ্জ্বল্য পূর্ববর্ণিত পর্দায় পড়া আলোর মাঝখানে একটি উজ্জ্বলতর অংশ হিসাবে দেখা যাবে। এই উজ্জ্বলতর অংশ সৃষ্টিকারী রশ্মিরেখা যে কোণ সৃষ্টি করে বেরিয়ে আসে [চিত্র ২৭.১ খ], তাকে বলা হয় **রশ্মি কোণ** বা 'বীম এ্যাঙ্গেল'।

প্রদীপযন্ত্রের গায় উল্লেখিত প্রতিহত কোণ ও রশ্মিকোণের তফাত থেকেই ঐ যন্ত্রের প্রকৃতি জানা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি প্রদীপযন্ত্রের প্রতিহত কোণ ও রশ্মিকোণ উভয়ই ৩০ ডিগ্রী। বুঝতে হবে, এটি একটি তীক্ষ্ণ সীমাবিশিষ্ট স্পটবাতী। অপর একটি যন্ত্রের রশ্মিকোণ ৩০ ডিগ্রী, প্রতিহত কোণ ১০০ ডিগ্রী—বুঝতে হবে, এটি একটি ফ্লাডবাতী, যা থেকে অনেকখানি ছড়িয়ে আলো বেরোয় এবং আলোকিত স্থানের কেন্দ্রস্থল থাকে উজ্জ্বলতম।
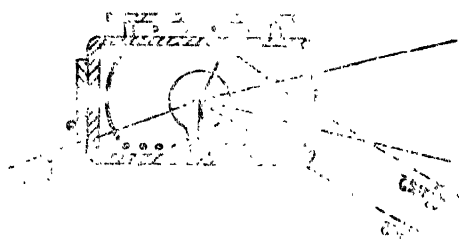
[চিত্র ২৭.২] অবাঞ্ছিত আলোকরেখা

প্রতিহত কোণদ্বারা সীমাবদ্ধ আলোকগণ্ডীর বাইরে বস্তুতঃ অন্ধকার থাকা উচিত। কিন্তু প্রদীপযন্ত্রের নির্মাণদোষে, বহু ছিদ্রপথে আলো বেরিয়ে গিয়ে **অবাঞ্ছিত আলোকরেখার** সৃষ্টি করে।

অনেকক্ষেত্রে আবার আভ্যন্তরীণ প্রতিফলনের ফলে, অথবা প্রতিফলক স্থাপনের ত্রুটিতে, আতসকাচের ভিতর দিয়েই এই অবাঞ্ছিত আলোকরেখা বেরিয়ে আসে, এবং মঞ্চের অপ্রয়োজনীয় স্থানে অনুজ্জ্বল আলোছায়ার মায়া সৃষ্টি করে। এদের বলা হয় **উপরশ্মি** বা 'ঘোষ্ট্ লাইট'। প্রদীপযন্ত্রের আলগা দরজার ফাঁক দিয়ে, অথবা হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থার ত্রুটিতে থেকে যাওয়া কোনো ছিদ্র পথে যখন অবাঞ্ছিত আলোকরেখা বেরিয়ে আসে, তখন তাকে বলে **নির্গত** বা 'স্ট্রে লাইট'। অবাঞ্ছিত স্থান আলোকিত করে তোলা ছাড়াও এই জাতীয় ত্রুটিগুলির [চিত্র ২৭.২] আর একটি দোষ, যন্ত্রের অবস্থানের দিকে দর্শকের দৃষ্টি টেনে নেওয়া ঘোষ্ট-লাইটের ত্রুটি যন্ত্রের ভিতর দিক ভালোভাবে ঘন রঙে রঞ্জিত এবং স্ট্রেলাইটের ত্রুটি, প্রদীপযন্ত্রকে প্রয়োজনমত কালো কাপড় বা কাগজে ঢেকে দূর করা যায়।

সাধারণ ফ্লাডবাতী

নির্দ্ধারিত ব্যাপ্তি পরিধির আলো-পরিবেশনকারী প্রদীপযন্ত্রের শ্রেণীতে সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত প্রদীপযন্ত্র **ফ্লাডবাতী** [চিত্র ২৮.১]। মঞ্চে ব্যবহারযোগ্য ফ্লাডবাতী সাধারণতঃ তিনটি আকারে তৈরী করা হয়। সবচেয়ে ছোট ফ্লাডবাতী তৈরী করা হয় ৬০ থেকে ১৫০ ওয়াটের বাতীর জন্য; মাঝারী আকারেরটিতে ৩০০ থেকে ৫০০ ওয়াটের এবং সবচেয়ে বড় আকারের ফ্লাডবাতীতে ১০০০ ওয়াটের বাতী ব্যবহৃত হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই 'ঘরোয়া বাতী' ব্যবহার করা হয় ফ্লাডবাতীর কাজে।

ফ্লাডবাতীকে যে কোনও অবস্থায় বসানো বা ঝোলানোর জন্য, কিম্বা টাঙে আটকে ব্যবহার করার সুবিধার্থে, উপযুক্ত হাতল ও ধারকের ব্যবস্থা রাখতে হয়। সেই সঙ্গে সামনে রঙিন মাধ্যম লাগানোর উপায়, এবং রঙিন মাধ্যম ও বাতীর মাঝে হাওয়া চলাচলের উপযুক্ত পথের ব্যবস্থাও রাখতে হবে। আরও লক্ষ্য রাখতে হবে, বিভিন্ন পরিবেশে ব্যবহারের জন্য এর কাঠামো যেন যথেষ্ট মজবুত হয়।
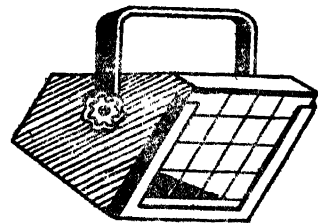
[চিত্র ২৮.১] ফ্লাডবাতী

অল্প দূর থেকে ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষ করে পশ্চাৎপট আলোকিত করার কাজে, প্রশস্ত কোণবিশিষ্ট প্রতিফলক লাগাতে হবে ফ্লাডবাতীর গায়। তেমনি আবার শুধু রঙ্গপীঠ আলোকিত করার জন্য ফ্লাডবাতী যখন ঝরিতে ব্যবহৃত হয়, তখন তার গায় লাগাতে হবে মাঝারী কোণ-বিশিষ্ট প্রতিফলক। আরও সংকীর্ণ কোণে আলো পাঠানোর প্রয়োজন হলে, রঙিন মাধ্যম লাগানোর যায়গায়, বিশেষ গঠনের চুঙ্গিক লাগাতে হয়।

অনেক সময় নানা আকারের ফ্লাডবাতীকে পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা রেখেই একত্র সারবন্দীভাবে লাগানো হয়। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় **ফ্লাড-ব্যাটেন**। আবার ছোট ছোট (বেবী) ফ্লাডবাতীকে পাশাপাশি সাজিয়ে, সমগ্রভাবে বা বিভিন্ন দলে নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা রাখা হয়। এই ধরণের আলোকযন্ত্রের সাধারণ নাম দেওয়া হয়েছে **প্রদীপ-ভাণ্ডার** বা 'ম্যাগাজিন'।

প্রদীপ ভাণ্ডার

একটিমাত্র প্রদীপযন্ত্রের খোলসে যখন একাধিক বাতী ব্যবহার করে, সমুদয় ব্যবস্থাকে একটি যন্ত্রে পরিণত করা হয়, তখনই তাকে বলা হয় **প্রদীপভাণ্ডার** [চিত্র ২৮.২]। এই জাতীয় প্রদীপযন্ত্রে, দুইটি বাতীর ব্যবধান কমপক্ষে ৬ ইঞ্চি থেকে বেশীর দিকে রাখা হয়। ৯ ইঞ্চি ব্যবধানযুক্ত ব্যবস্থায় উপযুক্ত প্রতিফলক লাগানো যেতে পারে।

প্রদীপ ভাণ্ডারের শ্রেণীতে পড়ে **ঝরির আলো** এবং **পাদপ্রদীপমালা**। এদের মধ্যে ঝরির বাতীগুলি নীচের দিকে, এবং পাদপ্রদীপমালা

[চিত্র ২৮.২] প্রদীপভাণ্ডার বা 'ম্যাগাজিন' ব্যবস্থা

উপরদিকে আলোকসম্পাত করে বলে, এদের গঠনবিন্যাস হয় ভিন্ন রকমের। উভয় ক্ষেত্রেই মাঝারী আকারের প্রতিফলক ব্যবহৃত হয়;

শুধু ভিন্নমুখী অবস্থানের জন্য, হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থায় পার্থক্য থাকে।

সাধারণ ঝরির জন্য মাঝারী কোণবিশিষ্ট প্রতিফলক ব্যবহার করা হয়। এর ফলে, আলোকরশ্মির তীব্রতর অংশ নীচে মঞ্চপিঠে অভিনেতাকে আলোকিত করার কাজে সাহায্য করে। এই ঝরি যখন অর্দ্ধবৃত্তাকার বলয়পটের জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন এতে লাগানো হয় প্রশস্তকোণী প্রতিফলক। এর ফলে বিস্তৃত অঞ্চলে আলোকবিকীরণ ও বর্ণবিন্যাস সহজতর হয়।

পাদপ্রদীপের ক্ষেত্রে একমাত্র প্রশস্তকোণী প্রতিফলকই ব্যবহারযোগ্য, কারণ অপেক্ষাকৃত কম দূরবর্তী অভিনেতাদের উপরে আলো পড়ে এই যন্ত্র থেকে। আরও একটি বিশেষ কারণ এই যে, পাদপ্রদীপের আলো যেন দূরবর্তী পশ্চাৎপটে তীব্র বা উজ্জ্বলভাবে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয় [নচেৎ, অভিনেতাদের বর্দ্ধিত আকারের ছায়া, পশ্চাৎপটে দৃষ্টিকটভাবে প্রক্ষেপিত হবে]। পাদপ্রদীপমালার ক্ষেত্রে প্রতিহত কোণ-টিও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য—লক্ষ্য রাখতে হবে, এই প্রদীপযন্ত্রের আলো যেন প্রেক্ষাগৃহাভিমুখে বেরিয়ে না আসে ; এমনকি মঞ্চমুখের খিলানেও এই আলোকের প্রতিফলন দোষজনক।

রঙ্গপীঠের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন স্পটবাতীর তীব্রতর আলোকিত অংশ-গুলিকে মৃদু আলোকপ্রলেপের দ্বারা সংযোজিত করাই হচ্ছে ঝরির আলোর প্রধান কাজ। যত বেশী স্থান জুড়ে এই কাজ করতে হবে, ঝরির আলোর প্রখরতা তত বাড়ানো দরকার। সুতরাং এই প্রখরতার পরিমাণ নির্ভর করে, রঙ্গপীঠের আয়তন, এবং রঙ্গপীঠ থেকে ঝরির অবস্থানের দূরত্বের উপরে।

ঝরির আলোয় সাধারণতঃ তিন বা চার রঙের (পৃথক তড়িৎচক্রে) বাতীর সারি জ্বলে। প্রত্যেক তড়িৎচক্রের বাতীগুলি থেকে, রঙিন মাধ্যম ভেদ করে, অন্যূন **২০ ফুট ক্যাণ্ডেল** উজ্জ্বলতা রঙ্গপীঠে এসে পৌঁছানো দরকার। প্রদত্ত তালিকায়, বিভিন্ন উচ্চতার জন্য কয়েকটি রাশি দেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট রাশিকে মঞ্চমুখের প্রস্থের সঙ্গে গুণ করলে, প্রদত্ত উচ্চতায় প্রথম ঝরির একটি তড়িৎচক্রে লাগানো বাতীগুলির সামগ্রিক ক্ষমতা জানা যাবে। সামগ্রিক ক্ষমতাকে বাতীর সংখ্যা দিয়ে ভাগ করলে, জানা যাবে এক একটি বাতীর ক্ষমতার পরিমাণ।

ঝরির দৈর্ঘ্য	১০ ফুট	১৫ ফুট	২০ ফুট	২৫ ফুট
প্রয়োজনীয় সামগ্রিক ক্ষমতা	২০	৪০	৬০	৮০

মঞ্চমুখের সমুদয় প্রস্থ জুড়ে ঝরির বাতী লাগানো উচিত নয়—এর প্রয়োজনও পড়েনা। তবে হিসাব অনুসারে পাওয়া বাতীগুলির সামগ্রিক ক্ষমতার কোনো পরিবর্তন ঘটবেনা। একাধিক ঝরি ব্যবহারের ক্ষেত্রে, প্রথম ঝরির চেয়ে পরবর্তী ঝরিগুলির সামগ্রিক ক্ষমতা কম রাখতে হবে। প্রথম ঝরির আলো (ঠিক প্রথম ঝালরের পিছনে লাগানো থাকে) সবচেয়ে বেশী প্রয়োজনীয়, কারণ 'সিলিং লাগানো দৃশ্যে' এই ঝরিটি ছাড়া অন্য কোনো ঝরিই কাজে লাগেনা।

বিজলীবাতীর ব্যবহার সুরু হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত, রঙ্গপীঠের পাদদেশই ছিল আলোকসজ্জার প্রশস্ততম স্থান। কয়েক শতাব্দীর ব্যবহারের ফলে, **পাদপ্রদীপালোক** কথাটি রঙ্গমঞ্চের ভাবার্থবোধক শব্দে পরিণত হয়েছে। বর্তমান যুগে কিন্তু পাদপ্রদীপের ব্যবহার বিধি বদলে গেছে সম্পূর্ণভাবে—সীমিত হয়েছে অনেকখানি।

পাদপ্রদীপমালা ব্যতীত মঞ্চের অন্য সমস্ত আলোই আসে উপর দিক থেকে; ফলে অভিনেতৃবর্গের নীচের অংশে, বিশেষ করে চোখের কোলে, গাল নাক ও চিবুকের নীচে ছায়ার সৃষ্টি হয়। এই ছায়া-পড়া অংশে, এবং পশ্চাৎপটের উপরে অনুজ্জ্বল আলোকের একটি প্রলেপ ছড়ানোর জন্য পাদপ্রদীপমালার বিশেষ প্রয়োজন।

পাদপ্রদীপমালার আর একটি সুন্দর ব্যবহার পদ্ধতি আছে। অভিনয় শুরু হওয়ার অব্যবহিত পূর্বে, দর্শকের দৃষ্টি ও মন মঞ্চমুখী করে তোলার জন্য প্রেক্ষাগৃহের আলো নিভিয়ে দেওয়া হয়। সেই সময়ে যবনিকার উপরিভাগ আলোকিত করে রাখার প্রকৃষ্টতম ব্যবস্থা পাদপ্রদীপের আলো। ঝুলবারান্দায় লাগানো স্পটবাতীর সাহায্যেও এই কাজ করা যায়—তবে তার দ্বারা সীমিত-প্রাণ প্রক্ষেপ বাতীগুলির অপব্যবহারই করা হয় মাত্র।

পাদপ্রদীপমালা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মঞ্চ-পৃষ্ঠ থেকে পাদপ্রদীপের উচ্চতা যেন ৩ ইঞ্চির বেশী না হয়। অন্যথায়

সামনের সারির দর্শকদের পক্ষে মঞ্চপৃষ্ঠ দেখতে পাওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি হবে। পাদপ্রদীপের প্রখরতার পরিমাণ বিভিন্ন বর্ণের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ ফুট ক্যাণ্ডেল থেকে, উর্দ্ধে ৫ বা ৭ ফুট ক্যাণ্ডেল হলেই চলে। মঞ্চমুখের প্রতিফুটে ২৫ থেকে ৪০ ওয়াটের বাতী [ভিন্ন ভিন্ন তড়িৎচক্রে] লাগালেই আবশ্যকীয় উজ্জ্বলতা পাওয়া যাবে। অভিনেতার ছায়া যেন দৃশ্যপটে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য দিতে হবে। এর জন্য পাদপ্রদীপের প্রত্যেক রঙের তড়িৎচক্রে কমপক্ষে দশটি বাতী থাকা উচিত। [অভিনেতার চলমান ছায়া যদি দৃশ্যপটের উপরে অনুভূত হয়, তবে বুঝতে হবে যে পাদপ্রদীপমালায় প্রয়োজনের চেয়ে কম সংখ্যার বাতী আছে, এবং বাতীগুলির ক্ষমতা অনেক বেশী।]

প্রদীপ ভাণ্ডারের কয়েকটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট, সাধারণভাবে ঝরি এবং পাদপ্রদীপমালা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। নীচে তার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা দেওয়া হলো :—

প্রদীপভাণ্ডার থেকে **ছায়াবিহীন আলোকসম্পাত** হওয়া দরকার। এরজন্য বাতীগুলি যত কাছাকাছি সম্ভব বসানো দরকার, এবং যতবেশী সংখ্যায় লাগানো যেতে পারে, লাগানো উচিত। যেখানে দুটি বাতীর সাহায্যে প্রয়োজনীয় উজ্জ্বলতা পাওয়া সম্ভব, সেখানে একটি বড় বাতী ব্যবহার করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না।

একই কক্ষে সারবন্দী বাতী লাগিয়ে এবং পৃথক কক্ষে পৃথক বাতী লাগিয়ে, দুই ভাবেই প্রদীপ ভাণ্ডার তৈরী করা যায়। তবে প্রথমটির ক্ষেত্রে বাতী গুলিকেই রঙিন করে নিতে হবে, দ্বিতীয়ক্ষেত্রে কক্ষের মুখে লাগানো ধারকের সাহায্যে প্রয়োজন মতো রঙিন মাধ্যম লাগানো যায়।

অনেক ক্ষেত্রে প্রদীপভাণ্ডারের মাঝে মাঝে অতিরিক্ত ফ্লাডবাতী বা স্পটবাতী লাগানোর ব্যবস্থা থাকে। আলোগুলিকে সরাসরি বিদ্যুৎচক্রে না লাগিয়ে কিছু প্লাগ বা কানেক্টারের ব্যবস্থা রাখলে এই ব্যাপারে কাজের সুবিধা হয়।

দীর্ঘ প্রদীপভাণ্ডারকে কয়েকটি খণ্ডে তৈরী করা যেতে পারে। এর ফলে ইচ্ছামতো এর কয়েকটি অংশ বাদ দেওয়া যায়, অথবা ভিন্ন স্থানে ব্যবহার করা যেতে পারে—সবার উপরে, এগুলি সহজ-বহনযোগ্য হয়ে ওঠে।

দৃশ্যপট ও রঙ্গপীঠে অপূর্ব বর্ণবিন্যাস সম্ভব হয় প্রদীপভাণ্ডারের দক্ষ ব্যবহারের ফলে। কিন্তু উদ্দেশ্যহীনভাবে ব্যবহৃত হলে, অলক্ষ্যে দৃশ্যসজ্জার স্বকীয় সৌন্দর্যও নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

ফোকাস লণ্ঠন অধুনা রঙ্গমঞ্চে ব্যবহৃত প্রদীপযন্ত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশী সংখ্যায় ব্যবহৃত হয় **ফোকাস লণ্ঠন** [চিত্র ২৮.৩]। সাধারণভাবে এদের **স্পটবাতী** বা 'স্পট' বলা হলেও, নামকরণটি কিন্তু যথাযথ নয়। ২৫০ ওয়াট থেকে ১000 ওয়াটের বাতী ধারণ করার জন্য, বিভিন্ন আকারের লণ্ঠন তৈরী করা হয়। তবে গঠন-প্রণালী সব আকারেই এক থাকে।

একটি ১000 ওয়াট ফোকাস লণ্ঠনের উদাহরণ দেখা যাক। লণ্ঠনের খাঁচায় একটি ৬″ × ১০″ সম-উত্তল আতসকাচের পিছনে, এগোনো-পিছানো
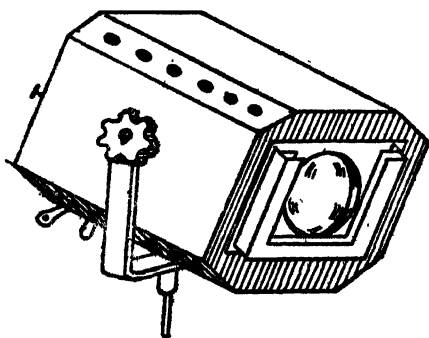
[চিত্র ২৮.৩] ফোকাস লণ্ঠন (নীচে ফোকাস লণ্ঠনের দৈর্ঘ্যচ্ছেদ চিত্র)
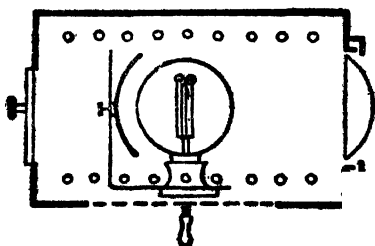
যায় এমন একটি আসনে বাতী দাঁড় করানো থাকে। সম-উত্তল আতস কাচের বদলে ৬″ × ৯″ 'ফ্রেনেল্'ও ব্যবহার করা যেতে পারে। আতস

কাচের জ্যোতিঃকেন্দ্রে বাতী থাকার সময়, বাতীর ফিলামেণ্টেরই একটি বহুগুণবর্দ্ধিত প্রতিবিম্ব, রশ্মি আকারে বিচ্ছুরিত হয়। বাতী হিসাবে সাধারণতঃ 'বি-ওয়ান' শ্রেণীর প্রক্ষেপক বাতী ব্যবহার করা হয়, প্রিফোকাস ধারকের সাহায্যে।

বাতীর পিছনে লাগানো হয় একটি স্ফেরিকাল প্রতিফলক, যার সাহায্যে বাতীর পিছন দিকের অনেকখানি আলো ফিলামেণ্টের ভিতর দিয়ে সামনের দিকে ফিরিয়ে আনা হয়। বাতী যখন আতসকাচের জ্যোতিঃকেন্দ্রে অবস্থান করে, তখন ফিলামেণ্টের প্রতিবিম্বের সঙ্গে প্রতিফলকের মারফত প্রতিফলিত ফিলামেণ্টের ছবি একত্রিত হয়ে, একটি সমোজ্জ্বল আলোকিত ক্ষেত্র সৃষ্টি করে।

বাতী ও প্রতিফলকযুক্ত আসন আতসকাচের দিকে যতই এগিয়ে নেওয়া যায়, ফিলামেণ্টের অপ্রীতিকর প্রতিবিম্বের আকার ততই বর্দ্ধিত হওয়ার ফলে আলোকিত রেখাগুলি (**ফিলামেণ্ট স্ট্রায়েশান**) ক্রমশঃ যুক্ত হতে থাকে, এবং পরিণতিতে তীক্ষ্ণ সীমাবিশিষ্ট একটি আলোকচক্রের রূপ নেয়। [৩১ নং হাল্কা 'ফ্রস্ট' রঙিন মাধ্যম ব্যবহারে স্ট্রায়েশান জনিত ত্রুটি কিছুটা দূর করা সম্ভব।]

ফোকাস লণ্ঠনের রশ্মিকোণ সাধারণতঃ ১১° থেকে ৪২° এর মধ্যে বাড়ানো বা কমানো চলে। প্রায় ২০° পর্য্যন্ত ফিলামেণ্ট স্ট্রায়েশান বোঝা যায়। এই জাতীয় লণ্ঠনের, প্রতিহত কোণ, রশ্মি কোণেরই সমান। এই জাতীয় লণ্ঠনের সাহায্যে কিন্তু নিখুঁত ছবি প্রক্ষেপণ করা সম্ভব নয়।

বৃহত্তর ব্যাসের ধাপযুক্ত আতসকাচ ও বৃহত্তর প্রতিফলক ব্যবহার করে লণ্ঠন নিঃসৃত আলোকচক্রের সীমারেখার তীক্ষ্ণতা নষ্ট করা যায়। এদের **ক্রমবিলীয়মান সীমাযুক্ত লণ্ঠন** বা 'সফ্‌ট্‌ এজ স্পট'ও বলা যেতে পারে। সচরাচর ব্যবহৃত এই শ্রেণীর লণ্ঠনের রশ্মিকোণ ১০° এবং ৪৫° এর মধ্যে বাড়ানো বা কমানো যায়।

চিত্র প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা

কোনও ছবির রেখাগুলিকে নিখুঁতভাবে প্রক্ষেপণ করার প্রয়োজনে, পৃথক আতসকাচের সংযোজন দরকার। এক্ষেত্রে ফোকাস লণ্ঠনের নিজস্ব আতসকাচ রশ্মি সংহতির (কণ্ডেন্‌সার) কাজ করে মাত্র। অতিরিক্ত সংযুক্ত আতসকাচটি (অব্‌জেক্‌টিভ্‌) দুই আতসকাচের মধ্যবর্তী "আকার পরিবর্তনসম্ভব মুখের" আকৃতি প্রক্ষেপণ করে। রশ্মি সংহতির স্থানে বিশেষ প্রবেশ

পথের সাহায্যে **স্বচ্ছচিত্র** বা 'স্লাইড' ঢোকানোর ব্যবস্থা থাকে। এই ব্যবস্থায় আতসকাচ, প্রতিফলক, বাতী, স্বচ্ছচিত্র প্রভৃতির সমগ্র আয়োজনটিকে [চিত্র ২৮.৪] একটি সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বেঁধে দেওয়া হয়—ফলে, রশ্মির আকার নির্দ্ধারণের উপরে পূর্ণমাত্রার ক্ষমতা প্রয়োগ করা সম্ভবপর হতে পারে।

একটি ম্যাজিক লণ্ঠন এই শ্রেণীর চিত্র প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার সরলতম উদাহরণ। এর যান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রথম কাজ, ফিলামেন্টের প্রতিবিম্বটি একটি আলোর পরিবর্তনশীল মুখের মাঝে এমনভাবে অধিশ্রয়ণ করা, যেখান থেকে আর একটি আতসকাচের সাহায্যে [সেই উন্মুক্ত মুখের আকৃতিকে] পরিবর্দ্ধিত রূপে প্রক্ষেপিত করা যায়।
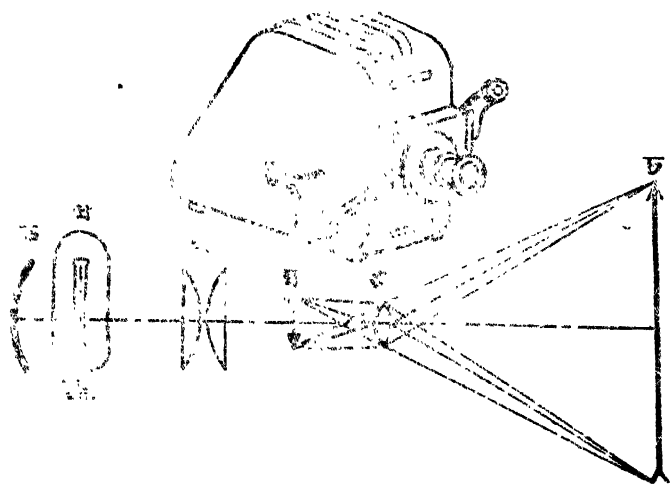
[চিত্র ২৮.৪] চিত্র প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা [ক-প্রতিফলক, খ-বাতী, গ-কণ্ডেনসার ঘ-স্বচ্ছচিত্র, ঙ-অবজেক্টিভ আতসকাচ, চ প্রক্ষেপিত চিত্র]

অনেক প্রক্ষেপণ ব্যবস্থায় আতসকাচের সামনে একটি গোলাকার দরজা (**আইরিস্ ডায়াফ্রাম**) লাগানো থাকে। এটি কিন্তু অবজেক্টিভের জ্যোতিঃকেন্দ্রে থাকে না—সেজন্য এর আকৃতির তারতম্যে, প্রক্ষেপিত রশ্মির আকৃতিতে কোনও পার্থক্য সৃষ্টি হয় না। এর একমাত্র বিনির্গত রশ্মির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত করা।

সচরাচর ব্যবহৃত ম্যাজিক লণ্ঠনে উত্তল অংশের দিকে সংযুক্ত দুটি সম-উত্তল আতসকাচ ব্যবহার করা হয় **কণ্ডেন্সার** হিসাবে। ফিলামেণ্টের প্রতিবিম্ব যেখানে সংহত হয়, সেখানে একটি বিশেষ প্রবেশ পথে (স্লাইড ক্যারিয়ারের সাহায্যে) **স্বচ্ছ**চিত্র ঢোকানোর ব্যবস্থা থাকে। এই স্বচ্ছ চিত্রটিকে **অবজেক্টিভ** আতসকাচ পরিবর্দ্ধিত আকারে প্রক্ষেপণ করে। আতসকাচের ভিতর দিয়ে প্রক্ষেপণের নিয়ম অনুসারে, চিত্রটির উল্টো প্রতিবিম্ব প্রক্ষেপিত হয়। এই ত্রুটি সংশোধন করা হয়, ম্যাজিক লণ্ঠনে স্বচ্ছচিত্রটিকে উল্টোভাবে লাগিয়ে। বিভিন্ন অধিশ্রয়ণ মানের আতসকাচ অবজেক্টিভ হিসাবে ব্যবহার করে প্রক্ষেপিত চিত্রের আকৃতি এবং প্রক্ষেপণ দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

কারসাজি কল

চলমান মেঘ, জ্বলন্ত আগুনের শিখা, বৃষ্টিধারা, উত্তাল তরঙ্গমালা প্রভৃতি সচল চিত্র অথবা বিভিন্ন পরিবেশের স্থিরচিত্র পশ্চাৎপটে বা বলয়পটে প্রক্ষেপণ করার যে সব **কারসাজি কল** বা 'এফেক্ট প্রোজেক্শান' ব্যবহৃত হয়, সেগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা সাধারণভাবে ম্যাজিক লণ্ঠনের মতো। এগুলিকে ইংরাজীতে **স্কিঅপ্টিকন**ও বলা হয়। চলমান চিত্র প্রক্ষেপণ ব্যবস্থায় [চিত্র ২৮.৫] স্বচ্ছ চিত্রগুলি একটি আবর্তনশীল কাচের চাকার গায় মুদ্রিত থাকে। বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায় অথবা হাতলের সাহায্যে চাকাটি প্রক্ষেপণকালে আবর্তিত হলে, চলমান চিত্র প্রক্ষেপিত হয়।
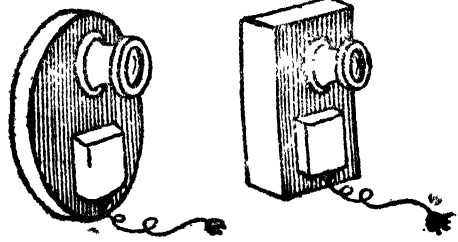
[চিত্র ২৮.৫] কারসাজি কল

বিভিন্ন দূরত্ব থেকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলার জন্য, এই জাতীয় কারসাজি কলে একাধিক অধিঃশ্রয়ণ মানবিশিষ্ট আতসকাচ ব্যবহার করার ব্যবস্থা থাকে। যেমন, মেঘ বা ঐ জাতীয় চিত্র যখন পর্দার পিছন থেকে বা পার্শ্বপটের আড়াল প্রভৃতি স্বল্প দূরত্বের স্থান থেকে প্রক্ষেপণ করা হয়, তখন রশ্মিকে প্রশস্তকোণী করার জন্য ৩ ইঞ্চি বা অনুরূপ কম অধিশ্রয়ণ মানের আতসকাচ ব্যবহার করা দরকার। এই প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা যদি

ব্যবহার করা হতো ঝুল বারান্দার সামনে থেকে, তবে হয়তো ২০ ইঞ্চি অধিশ্রয়ণ মানের আতসকাচ কার্যকরী হতো।

বিবিধ উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন স্পটবাতী

ম্যাজিক লণ্ঠনের ক্ষেত্রে যে নিখুঁত প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার দরকার হয়, সাধারণ উচ্চশক্তিসম্পন্ন স্পটবাতীর ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন অপেক্ষাকৃত কম। এজাতীয় প্রদীপযন্ত্রে কণ্ডেনসারের প্রয়োজন হয় না, দরকার হয় যথেষ্ট ক্ষমতাসম্পন্ন প্রতিফলন ব্যবস্থার।

ষ্টেলমার স্পটবাতীর দৃষ্টান্ত দেখা যাক। এর প্রতিফলন ব্যবস্থা বিশেষ লক্ষণীয়। বাতীর সম্মুখ থেকেও আলোক সংগ্রহ করে পিছনের স্ফেরিক্যাল প্রতিফলকে পাঠানোর জন্য একটি অতিরিক্ত বন্দোবস্ত থাকে এই স্পটবাতীতে। প্রতিফলকের সাহায্যে সামনে থেকে আসা এবং পিছনের সংগ্রহিত সমুদয় আলো ফিলামেণ্টের ভিতর দিয়ে পুনর্প্রতিফলিত করা হয়, সামনের দরজাযুক্ত অবজেক্টিভ আতসকাচের মাধ্যমে।

কতকগুলি স্পটবাতীতে স্ফেরিক্যাল ধাতব প্রতিফলকের পরিবর্তে, বৃহৎ ব্যাসযুক্ত আয়না ব্যবহার করা হয়। **মিরার স্পটবাতী** নামে খ্যাত এই শ্রেণীর স্পটগুলি আকারে ছোট করা যায়। দেখা গেছে, সাধারণ প্রতিফলন ব্যবস্থার চেয়ে এই জাতীয় প্রতিফলন ব্যবস্থার সাহায্যে প্রায় তিনগুণ বেশী উজ্জলতা পাওয়া সম্ভবপর। এই শ্রেণীর আলোক-যন্ত্রের রশ্মিকোণ ১১° থেকে ৩৭° পর্য্যন্ত পরিবর্তিত করার বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয় এদের অবজেক্টিভ আতসকাচের আয়োজনে।

মিরার স্পটবাতী বা **আয়নাবাতী**র বিশেষত্ব, এর সাহায্যে যে কোনও সম বা অসম আকৃতি বিশিষ্ট বস্তুর জন্য নির্দিষ্ট ক্ষেত্র জুড়ে তীক্ষ্ণ সীমাবিশিষ্ট রশ্মি প্রক্ষেপণ করা যায়। মঞ্চের সম্মুখভাগ থেকে আলোক প্রক্ষেপণ ব্যবস্থায়, এই শ্রেণীর স্পটবাতীই শ্রেষ্ঠ যন্ত্র। এর সাহায্যে পশ্চাৎপটে আলো না ফেলে, রশ্মিকে পাদপ্রদীপ থেকে উর্দ্ধরঙ্গের শেষ প্রান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা সহজ হয়।

ঈলীপটিক্যাল অথবা **ঈলীপসোডিয়াল রিফ্লেক্টার** স্পটবাতী এই শ্রেণীর স্পটবাতীগুলির আর একটি উচ্চতর ধাপ। এই যন্ত্রে [চিত্র ২৮.৬] বাতীটি প্রতিফলক দিয়ে প্রায় ঘিরে ফেলা হয়। টুপী উপরে রাখা অবস্থায় জ্বালানো যায়, এই ধরণের বিশেষ এক শ্রেণীর

নলাকৃতি বাতী ব্যবহৃত হয় এই প্রদীপযন্ত্রে। ঈষৎ বাঁকানো অবস্থায় বাতীটিকে একটি ঈলিপ্‌টিক্যাল প্রতিফলক আয়নার মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।
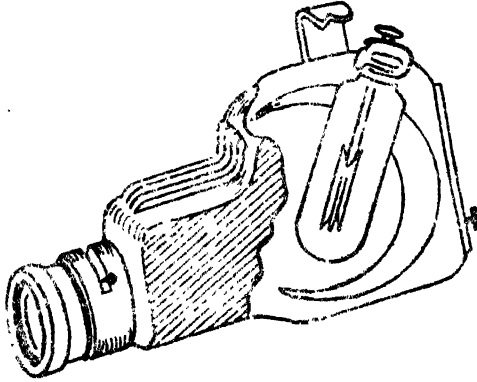
[চিত্র ২৮.৬] ঈলীপ্‌সোডিয়াল মিরার স্পটবাতী
(প্রদীপ যন্ত্রের খাঁচা কেটে বাতী ও প্রতিফলকের অবস্থান দেখানো হয়েছে)

নলাকৃতি বাতীর খুব কাছাকাছি সামনে ও পিছনে ১০ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত দুটি প্রতিফলক আয়না এবং যন্ত্রের মুখে ৮ ইঞ্চি ব্যাসের অবজেক্‌টিভ আতসকাচ ব্যবহার করে, তীব্রতর রশ্মিক্ষেপণকারী 'মিরার স্পটবাতী' তৈরী করা হচ্ছে আজকাল। এগুলি বহুদূর থেকে, মাত্র ১০০০ ওয়াট বাতীর সাহায্যে সর্বাধিক ১৫ ডিগ্রী রশ্মিকোণে তীব্র আলোকরশ্মি প্রক্ষেপণ করতে পারে। মুক্তাঙ্গণ অভিনয় ব্যবস্থা, সার্কাস প্রভৃতিতে এগুলি খুবই কার্য্যকরী।

প্রদীপযন্ত্রের কয়েকটি সাধারণ গুণ

সাধারণভাবে প্রত্যেক প্রদীপযন্ত্রেরই পাঁচটি বিশেষ গুণ থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। নিজের হাতে তৈরী করার সময়, অথবা দোকান থেকে কেনার সময়, এই বিশেষত্বগুলির কথা মনে রাখা দরকার।

(ক) অভিযোজন ক্ষমতা :

প্রয়োজনভেদে বিভিন্ন যন্ত্র বিভিন্ন স্থান থেকে, রকমারী প্রখরতাযুক্ত বাতী ও রঙিন মাধ্যম সহযোগে ব্যবহৃত হয়। একটি নাটকে সাধারণতঃ

নির্দিষ্ট প্রদীপযন্ত্র নির্দিষ্ট স্থান থেকেই ব্যবহার করা হয়—পরিবর্তিত হয় শুধু তার রশ্মিব্যাপ্তি, প্রখরতা এবং বর্ণ। এই পরিবর্তনগুলি কার্যকরী করার বিশেষ গুণ যেন প্রত্যেক প্রদীপযন্ত্রের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। অর্থাৎ, দেখতে হবে, বাতী ও প্রতিফলকের ধারকটি এগোনো-পেছানো যায় কি না; একাধিক শ্রেণীর বাতী ব্যবহার করার সুবিধা আছে কি না, এবং রঙিন মাধ্যম ধারণ করার সুবিধাজনক ব্যবস্থা রাখা হয়েছে কি না।

(খ) কর্মক্ষমতা :

প্রদীপযন্ত্রের ভিতরকার বাতীর শক্তির উপরে যন্ত্রটির কর্মক্ষমতা সর্বাধিক নির্ভরশীল হলেও, আরও কয়েকটি আনুষঙ্গিক উপকরণের প্রাধান্য এর সঙ্গে জড়িত থাকে। সেগুলি হচ্ছে আতসকাচ, প্রতিফলক, রঙিন মাধ্যম এবং ব্যবহৃত সার্সি বা দরজাগুলি। এগুলির কর্মক্ষমতা সমগ্র প্রদীপযন্ত্রের কর্মক্ষমতাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

(গ) যান্ত্রিক সরলতা ও নির্ভরতা :

প্রদীপযন্ত্র যেন সহজ ব্যবহারযোগ্য এবং মজবুত হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য দেওয়া উচিত। বিভিন্ন অংশের গঠন, আকৃতি ও ওজন এ বিষয়ে প্রণিধানযোগ্য। যন্ত্রের অংশগুলি সচরাচর ব্যবহৃত অংশের অনুরূপ হওয়াই বাঞ্ছনীয়—এর দ্বারা, অংশবিশেষ অকেজো হলে, সহজে বদলানো যাবে। খোলা যায় বা নাড়ানো যায়, এরূপ অংশ প্রদীপযন্ত্রে যত কম থাকে, ততই ভালো। বাতীটিকে রক্ষা করার এবং বদল করার সহজ ব্যবস্থা রাখা দরকার। যন্ত্রের খাঁচাটি এলোমেলো ব্যবহারের পক্ষে যথেষ্ট মজবুত করে তুলতে হবে।

(ঘ) বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা :

বাতী এবং রঙিন মাধ্যমের জীবনসীমা দীর্ঘ করার জন্য, এবং আগুন লাগার ভয় কমানোর জন্য, প্রদীপযন্ত্রের ভিতরের গরম বাতাস বেরিয়ে যাওয়া এবং ঠাণ্ডা বাতাস প্রবেশ করার সুবন্দোবস্ত থাকা দরকার; যন্ত্রের উপরের দিকে বায়ু চলাচলের ফাঁক, নীচের দিকের চেয়ে কমপক্ষে চারগুণ বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ভিতরে অগ্নিনিরোধক এসবেষ্টজের তৈরী প্রতিরক্ষক লাগানো হলে, বেই সুফল পাওয়া যায়। লক্ষ্য রাখতে হবে, দাহ্য কোনও বস্তু দিয়ে যেন যন্ত্রের কোনও অংশ গঠিত না হয়।

(ঙ) উপযুক্ত ধারণব্যবস্থা ঃ

প্রদীপ যন্ত্রের খাঁচাগুলি সাধারণতঃ ধাতুনির্মিত হওয়ার ফলে ভারী হয়। তাছাড়া এর মধ্যে একাধিক নিখুঁত এবং ভঙ্গুর অংশ সংযুক্ত থাকে। এগুলির ধারণব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যেন সাধারণ ধাক্কা বা কাঁপুনির ফলে এগুলির স্থানচ্যুতি না ঘটে। এগুলির কোনও অংশ যেন ঢিলে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, বা নিজেদের ভারে খসে না পড়ে। এই কারণে, সাধারণতঃ অংশগুলি মজবুত ও ভারী করেই তৈরী করা হয়। চাবির সাহায্যে আটকানোর ব্যবস্থাগুলি যথেষ্ট শক্ত করে তোলা দরকার, যার ফলে রঙিনমাধ্যম পরিবর্তন করা বা বাতী এগোনো-পেছোনোর সময় আলোকরশ্মির দিক পরিবর্তিত না হয়।

মঞ্চে ব্যবহৃত তার

মঞ্চে ব্যবহারের জন্য বিশেষ ধরণের নিরাপদ বৈদ্যুতিক তার গ্রহণ করা হয়। আপাতঃদৃষ্টিতে এগুলিকে পুরু রবার জাতীয় তড়িৎ নিরোধক আবরণে আচ্ছাদিত একটি মাত্র তার বলে মনে হতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই আবরণীর নীচে পৃথকভাবে রবার ও সুতায় আচ্ছাদিত দুটি আলাদা তারের লাইন থাকে। এদের প্রত্যেকটি তার আবার একগুচ্ছ সরু তার পাকিয়ে তৈরী করা হয়।
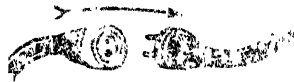
[চিত্র ২৯] মঞ্চে ব্যবহৃত তার সংযোজন ব্যবস্থা

মঞ্চে ব্যবহৃত অনধিক ১০০০ ওয়াট শক্তিসম্পন্ন স্পটবাতী, ফ্লাডবাতী এবং অন্যান্য অপসারণযোগ্য প্রদীপযন্ত্রের জন্য ১৪ নং গেজের তার ব্যবহার করাটি নিরাপদ। এই তারের সাহায্যে ১৫ এম্পিয়ার পর্যন্ত বিদ্যুৎ তরঙ্গ প্রবাহিত করা যায়। সারি বা পাদপ্রদীপের জন্য ৬ বা ৮ গাছি তারের সাহায্যে ৩ বা ৪টি তড়িৎচক্র সৃষ্টি করা হয়। এই গাছি কয়টিকেও একটি আবরণীতে জড়িয়ে নেওয়া সুবিধাজনক।

মঞ্চে স্থায়ীভাবে লাগানোর জন্য ১৪ নং এর কম শক্তিসম্পন্ন তার ব্যবহার করা নিরাপদ নয়। তবে আর্ক স্পটবাতীর জন্য ১৪ নং তারও

বিপজ্জনক, কারণ এই জাতীয় প্রদীপযন্ত্রে ২৫ থেকে ১০০ এম্পিয়ার পর্য্যন্ত বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হয়।

বিভিন্ন গেজের তার সর্বাধিক কি পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ বহন করার ক্ষমতা রাখে, নীচের তালিকাটি থেকে তা জানা যাবে :

তারের গেজ	১৮	১৬	১৪	১২	১০	৮	৬
এ্যাম্পিয়ার	৩	৬	১৫	২০	২৫	৩৫	৫০

মঞ্চে ব্যবহারের সুবিধার জন্য প্রত্যেক তারের উভয়প্রান্তে বিশেষ ধরণের **প্লাগ ও সকেট** লাগানো থাকে। উভয়ের মুখে মজবুত ভাবে আটকানোর উপযোগী প্যাঁচের ব্যবস্থা রাখা হয় [চিত্র ২৯]। সর্বদাই মনে রাখা দরকার, পকেট অংশটি থাকবে তারের তরঙ্গ-ধারক ভাগে, এবং প্লাগ-অংশটি থাকবে তারের নিষ্কৃয় দিকে। চিত্রে তীর চিহ্নের সাহায্যে তড়িৎপ্রবাহের বাঞ্ছিত দিক নির্দেশ করা হয়েছে।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমেই আলোকসম্পাতকারীর পরিকল্পনা বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক এবং নানাবিধ আতসকাচ যুক্ত সরঞ্জামাদির ভিতর দিয়ে দর্শকের চোখের সামনে উপস্থিত হয়। সুতরাং আলোকের এই **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে** দীপচিত্রণ শিল্পের মুখ্যতম সরঞ্জাম বলে গণ্য করা উচিত। পরবর্তী পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হলো।

চার আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

পরিচিতি ও সংজ্ঞা

আলোক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল **সুইচবোর্ড**—যেখান থেকে বিভিন্ন যন্ত্রপাতির মাধ্যমে আলোকের **প্রখরতা, পরিব্যাপ্তি** এবং **বর্ণবিন্যাস**-এর তারতম্য ঘটানো হয়। একাধিক অংশের সমন্বয় ঘটেছে এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায়, যাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং এই ব্যবস্থা সম্পর্কিত কয়েকটি পরিভাষার অর্থ তথা সংজ্ঞা নীচে বর্ণানুক্রমিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হলো। [অনেকগুলি সুপরিচিত ইংরাজী শব্দের বাংলা পরিভাষা প্রচলিত নয় বলে দেওয়া হয়নি]।

ইন্টারলকিং : একাধিক ডিমারকে যান্ত্রিক ব্যবস্থায় একটি মাত্র হাতলের সাহায্যে কার্যকরী করার আয়োজনকে **ইন্টারলকিং** [চিত্র ৩০.১] বলে। একটি সাধারণ অক্ষদণ্ডের সঙ্গে ডিমারের হাতলগুলিকে প্যাচের চাপে আটকিয়ে নেওয়ার পর অক্ষদণ্ডটি ঘোরালেই, আটকানো সব কয়টি ডিমারকে একসঙ্গে নামানো বা ওঠানো যায়।
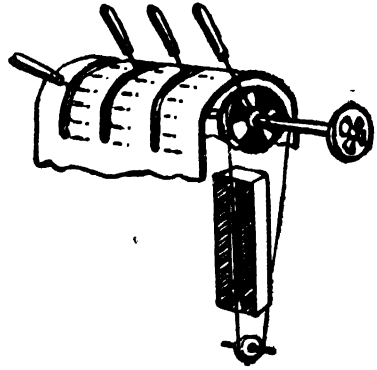
[চিত্র ৩০.১] ইন্টারলকিং ও মার্কিং ডায়াল

ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট : এগুলি তড়িৎ উৎস থেকে আনা পৃথক তড়িৎচক্র যা গ্র্যাণ্ড মাষ্টার বন্ধ করলেও তড়িৎপ্রবাহ অক্ষুন্ন রাখে। অন্ধকারে বোর্ডের সুইচ দেখার জন্য যে **কাজী** বা 'অপারেটিং লাইট' থাকে, সেটি এই জাতীয় **ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট**-এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

এলাইনমেণ্ট : নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিভিন্ন অংশগুলি উপর নীচুভাবে এবং পাশাপাশি সারবন্দীভাবে সাজানো থাকে। সাধারণতঃ উপর নীচ সারিতে থাকে আউটলেট, পাইলট, ফিউজ, ডিমার, সুইচ, ইণ্ডেক্স ইত্যাদি একটি প্রদীপযন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। এগুলির প্রত্যেকটির পাশাপাশি আবার একই শ্রেণীর অংশগুলি রাখা হয় [চিত্র ৩০.২]। এই ধরণের আয়োজনকে বলা হয় **এলাইনমেণ্ট**। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে সহজ পরিচালন-যোগ্য করে তোলাই এই ব্যবস্থার মুখ্য লক্ষ্য।
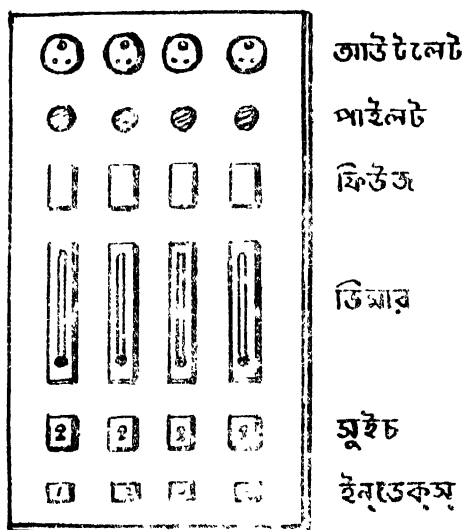
[চিত্র ৩০.২] এলাইনমেণ্ট

ওভারলোড : তড়িৎপ্রবাহক্ষম অংশগুলির নির্দ্ধারিত ক্ষমতার চেয়ে বেশী এম্পিয়ারে তড়িৎপ্রবাহ সংঘটিত হলে, **চাপাধিক্য** বা 'ওভারলোড' ঘটবে। এক্ষেত্রে উপযুক্ত ফিউজ দেওয়া থাকলে, ফিউজ গলে যাওয়ার ফলে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা রক্ষা পেতে পারে ; নচেৎ অগ্নিকাণ্ডের আশংকা থাকে।

কনট্যাক্টার : তড়িৎ-চুম্বক পদ্ধতিতে • কার্য্যকরী সুইচ-বিশেষ। বহুদূর থেকে এই জাতীয় সুইচকে ভিন্ন সুইচের দ্বারা অন-অফ্ করা যায়। **দূর-নিয়ন্ত্রণ** বা 'রিমোট-কণ্ট্রোল' পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে **কনট্যাক্টার** শ্রেণীর সুইচের উপরে।

কাজী : সুইচ বোর্ডে কাজ করার সুবিধার জন্য একটি বিশেষভাবে ঢাকা দেওয়া ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট বাতীর প্রয়োজন পড়ে। গ্র্যাণ্ড মাষ্টারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেও এটি নেভে না। বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে যেন মঞ্চ সম্পূর্ণভাবে অন্ধকার হওয়ার সময় এর থেকে কোনও রকম আলো মঞ্চে গিয়ে না পড়ে। এদের **কাজী** বা 'ওয়ার্কিং লাইট' বলে। মঞ্চে পর্দ্দার পিছনে কাজ করার জন্যও 'কাজী' ব্যবহার করা হয়, তবে এগুলিকে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট রাখা উচিত নয়।

কানেকটার : তার সংযোজক বিশেষ। পূর্ব পরিচ্ছেদে "মঞ্চে ব্যবহৃত তার" শীর্ষক অনুচ্ছেদে এই **কানেকটার** সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণী দ্রষ্টব্য। এক তার, দুই তার, তিন তার প্রভৃতি বিভিন্ন সংযোগের জন্য, ভিন্ন ভিন্ন ক্ষমতাসম্পন্ন কানেকটার পাওয়া যায়।

কেব্‌ল্ : বিদ্যুৎবাহী তারকে **কেব্‌ল্** বলে। মজবুত অন্তরণের মধ্যে এক বা একাধিক তার সমন্বিত করে বিবিধ প্রয়োজনের উপযোগী 'কেবল' তৈরী করা হয়। মঞ্চের প্রয়োজনীয় তার সম্পর্কে পূর্ব পরিচ্ছেদে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

কোম্পানী সুইচ : প্রত্যেক মঞ্চেই একটি স্থায়ী তড়িৎ সরবরাহ ব্যবস্থা, কোথাও প্লাগ আকারে, কোথাও বা মে'ন সুইচ আকারে দেওয়া থাকে। একে **কোম্পানী সুইচ** বলা হয়। বহনযোগ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করতে হলে, এটিকেই তড়িৎ-উৎস বলে ধরে নিতে হবে।

ক্যাপাসিটি : যে কোনও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের তরঙ্গ পরিবহন ক্ষমতাকে সেই যন্ত্রের 'ক্যাপাসিটি' বলে। এ্যাম্পিয়ার ও ওয়াট দিয়ে এর পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়।

ক্রশকানেক্‌টিং প্যানেল : এর চেহারা কতকটা হাতে বদলানো টেলিফোনের সুইচ বোর্ডের [চিত্র ৩০.৩]
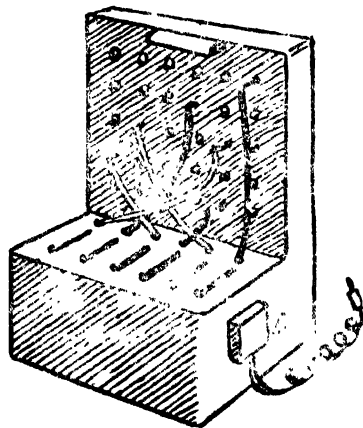
[চিত্র ৩০.৩] ক্রশকানেক্‌টিং প্যানেল

মতো। এই বোর্ড সংলগ্ন অনেকগুলি পকেটে, ডিমার মারফত নিয়ে আসা তরঙ্গবাহী তার থাকে। প্রদীপ যন্ত্রগুলি থেকে আনা তারের প্রান্তগুলিতে প্লাগ লাগিয়ে প্রস্তুত রাখা হয়। এদের উভয়ের সংযোগে, যে কোনও যন্ত্রে যে কোনও ডিমার-ব্যবস্থা মারফত তড়িৎ প্রবাহ ঘটানো সম্ভব। অপ্রয়োজনে এই সংযোগের বিচ্যুতি ঘটিয়ে, অন্য যন্ত্রের জন্য ডিমারের লাইনটি ব্যবহার করা চলে। প্লাগধারী এই জাতীয় তারের অংশকে **জাম্পার** বলে।

গ্রাউণ্ড [অথবা **আর্থ**] **:** সুইচবোর্ড সংলগ্ন সমস্ত ধাতব পদার্থকেই অন্য একটি সাধারণ তার মারফত মাটিতে সংযুক্ত করে রাখা দরকার। অসাবধানতায় বা আকস্মিভাবে যদি ঐসব অংশ কোনও ধনভাগের সংস্পর্শে আসে, তবে তা বিপদসৃষ্টি না করে, তড়িৎপ্রবাহ মাটির মধ্যে নিয়ে যাবে। এই ব্যবস্থাকে **গ্রাউণ্ড** অথবা **আর্থ** করা বলে।

গ্রুপ : অনেক সময় তিন, চার বা ছয়টি ডিমার বা সুইচকে পৃথক একটি ডিমার বা সুইচ মারফত নিয়ন্ত্রিত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়। এই ব্যবস্থাকে **গ্রুপ** বলে।

গ্র্যাণ্ড মাষ্টার : প্রেক্ষাগৃহের আলো এবং বিভিন্ন 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট' লাইন ব্যতীত, অন্য সমস্ত তড়িৎচক্রের প্রবাহ যে প্রধান সুইচটির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাকে **গ্র্যাণ্ড মাষ্টার** অথবা **মে'ন** বলে।

জাম্পার : প্লাগধারী ছোট ছোট তারের খণ্ড বিশেষ। নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় পরিবর্তন-সক্ষমতা আনার জন্য এই জাতীয় তারের টুকরো বিশেষ উপযোগী। হাতে চালানো টেলিফোন অপারেটিং বোর্ডে এই ধরণের **জাম্পার**-এর ব্যবহার [ক্রশকানেক্টিং প্যানেল দ্রষ্টব্য] সুপরিচিত।

ডিমার : এগুলির প্রধান কাজ, তড়িৎচক্রে তড়িৎপ্রবাহের পরিমাণ কমিয়ে, বাতীর ঔজ্জ্বল্য হ্রাস করা। সুইচবোর্ডের বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে এদের প্রধান অংশ হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। বাতীর সঙ্গে ডিমার 'সিরীজ'-এ সংযুক্ত থাকে, এবং তড়িৎচক্রের ঋণভাগে রাখাই বিধেয়—যেন তড়িৎপ্রবাহ প্রথমে বাতীর মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়। ক্রশকানেক্টিং বোর্ডের ক্ষেত্রে যদি এটি তড়িৎচক্রের ধনভাগে রাখা অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে ডিমারে অপ্রয়োজনে তড়িৎপ্রবাহ বন্ধ করার জন্য পৃথক সুইচ রাখতে হবে। [ডিমার সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পৃথক ভাবে দেওয়া হলো।]

ডেডফ্রন্ট : সুইচবোর্ডের তড়িৎপ্রবাহক্ষম সমস্ত অংশই ঢেকে রাখা উচিত, যেন তা অন্যমনস্কতার সুযোগে মানুষের নাগালে না আসে। ধাতুনির্মিত বহিরাবরণকে উপযুক্তভাবে 'গ্রাউণ্ড' করা দরকার। এই অবস্থাকে **ডেডফ্রন্ট** অথবা **ডেড ফেস** ব্যবস্থা বলে।

নির্গম : এগুলি তড়িৎপ্রবাহের উৎসমুখ বিশেষ। সাধারণ প্লাগ দিয়ে তৈরী করা **পকেট** বা **ফিমেল-এণ্ড** হিসাবে এগুলি তড়িৎ-চক্রে অবস্থান করে। সচরাচর এগুলি **আউটলেট** নামে সুপরিচিত।

নিয়ন্ত্রক : অভিনয় চলার সময় যে ব্যক্তি সুইচবোর্ড নিয়ন্ত্রিত করে, তাকে **নিয়ন্ত্রক** অথবা **অপারেটার** বলা হয়। আলোকসম্পাত-শিল্পীর প্রধানতম সহকারী হিসাবে গণ্য এই যন্ত্রীর উপরে কিন্তু দীপচিত্রণের অনেকখানি সাফল্য নির্ভর করে। বলাবাহুল্য, আলোকসম্পাত পরিকল্পক নিজেও নিয়ন্ত্রক হিসাবে কাজ করতে পারেন।

পাইলট : প্রত্যেক সুইচ সংলগ্ন একটি ছোট আলোকিত চাকতিকে **পাইলট লাইট** বলে। ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টভাবে সংযুক্ত এই বাতীগুলির সাহায্যে, তড়িৎচক্রের ধনভাগ কার্য্যকরী আছে কিনা, পূর্বাহ্ণেই জানা যায়।

প্রিসেট : সুইচ ও ডিমারের যে ব্যবস্থার সাহায্যে, একটি দৃশ্য চলার সময়েই পরবর্তী এক বা একাধিক দৃশ্যের আলোকসম্পাত ব্যবস্থা পরীক্ষা করে প্রস্তুত রাখা যায়, তাকে **প্রিসেট** পদ্ধতি বলে। সর্বাধুনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এই প্রিসেট কণ্ট্রোল আজ পরিপূর্ণভাবে কম্পিউটার দ্বারা চালিত হচ্ছে।

প্লাগ, পকেট ও প্লাগ-বাক্স : মঞ্চের কাজে ব্যবহৃত তারের প্রান্তে **প্লাগ** লাগানো থাকে। **পকেট**গুলি চীনামাটির তৈরী আধারে আবদ্ধ তামার দুটি উপযুক্ত পাত্র, যার মধ্যে প্লাগের ধাতব জিভগুলি শক্তভাবে ঢুকে থাকতে পারে। তামার পাত্র-দুটি তারের সাহায্যে তড়িৎ উৎসের সঙ্গে যুক্ত থাকে। অনেক সময় এক বা একাধিক পকেট পাত্রে সংবদ্ধ করে মঞ্চের দেয়ালে অথবা মেঝেতে ঢাকা লাগানো অবস্থায় [চিত্র ৩০.৪] বসানো হয়।
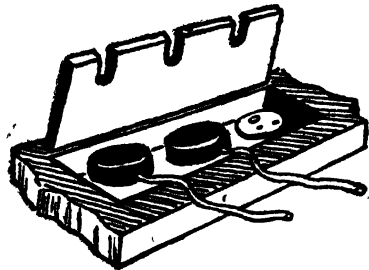
[চিত্র ৩০.৪] মঞ্চের 'পকেট'

প্লাগবাক্স একাধিক পকেট যুক্ত বহনযোগ্য ব্যবস্থা মাত্র। **স্বল্পদীর্ঘ** তারের সাহায্যে যে কোনও স্থায়ী পকেট থেকে এই বাক্সের পকেটগুলিতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ আনা যায়। বিশেষ করে, ঘূর্ণায়মান মঞ্চের দৃশ্যপটের গায় লাগানো আলোক ব্যবস্থাগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য, এই জাতীয় বাক্সের ব্যবহার অপরিহার্য্য।

ফিউজ ঃ বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে আকস্মিক চাপাধিক্য অথবা **শর্ট-সারকিট** জনিত বিপদের হাত থেকে রক্ষা করে **ফিউজ**। এটি সর্বদাই তড়িৎচক্রের ধনভাগে সংযুক্ত হওয়া বিধেয়।

ফিউজ, মিশ্রধাতুর একটি সূক্ষ্ম তার-বিশেষ, যা নির্দিষ্ট চাপের তড়িৎ-প্রবাহের চেয়ে বেশী চাপ পেলেই গলে যায়; ফলে তড়িৎচক্রে ভাঙ্গন ঘটে, এবং প্রবাহ বন্ধ হয়। তিন শ্রেণীর ফিউজ সচরাচর প্রচলিত। এদের মধ্যে সরলতম শ্রেণী হচ্ছে **প্লাগ জাতীয় ফিউজ**। এগুলি ১, ৫, ১০, ২০, ২৫ এবং ৩০ এ্যাম্পিয়ার শক্তিবিশিষ্ট পাওয়া যায়। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে **কার্টিজ ফিউজ**—এ শ্রেণীর ছোটগুলি ১০ থেকে ৩০ এ্যাম্পিয়ার এবং বড়গুলি ৪০ থেকে ৬০ এ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত শক্তিবিশিষ্ট হয়। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে ৬০ থেকে হাজার এ্যাম্পিয়ারের বিভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট **নাইফ-ব্লেড** শ্রেণীর ফিউজ।

বোর্ড অথবা **সুইচ বোর্ড ঃ** নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটিকেই চলতি কথায় **সুইচবোর্ড** বা সংক্ষেপে শুধু **বোর্ড** বলা হয়। যদিও ধ্বনিনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাতেও একটি বোর্ড থাকে, তবু প্রচলিত অর্থে বোর্ড বলতে শুধুমাত্র আলোকনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকেই বোঝায়।

ব্যাঙ্ক ঃ পাশপাশিভাবে সাজানো একসারি ডিমারকে ডিমারের **ব্যাঙ্ক** বলে। সাধারণতঃ বিভিন্ন রঙের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যাঙ্কে ডিমার সাজানো হয়। অনেকে নিজেদের রঙ্গালয়ের পরিকল্পনা মতো সুবিধাজনক ব্যাঙ্কে ডিমার সাজিয়ে নেন। পরিবর্তনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় ব্যাঙ্ক সাজানোর কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম নেই।

মার্কার ঃ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে বিশেষরূপে চিহ্নিত করার জন্য যে চিহ্ন, অক্ষর, সংখ্যা বা নাম ব্যবহার করা হয়, তাকে **মার্কার** বলে। প্রত্যেকটি সুইচসংলগ্ন চক্রের ব্যবহার ও সর্বাধিক ক্ষমতাও এতে উল্লিখিত হয়।

মার্কিং ডায়াল ঃ ডিমারের হাতলের পাশে একটি ঘরকাটা স্কেল [চিত্র ৩০.১] থাকে। এর দ্বারা ডিমারের অবস্থান বোঝা যায় এবং

সংকেত-লিখনে সুবিধা হয়। সাধারণতঃ সর্বোচ্চ অবস্থানে ১০ এবং সর্বনিম্ন অবস্থানে শূন্য রেখে, মাঝের ব্যবধানটিকে সমান দশ অংশে ভাগ করা হয়। অনেকক্ষেত্রে এই বিভাজন যথাক্রমে পূর্ণ, তিনচতুর্থাংশ, অর্দ্ধ, একচতুর্থাংশ ও শূন্য, এই পাঁচটি অবস্থানের দ্বারাও নির্দেশিত হয়ে থাকে।

মাষ্টার কণ্ট্রোল : একাধিক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থাকে একটি সুইচ বা ডিমারের অধীনে একত্রিত করাকে **মাষ্টার কণ্ট্রোল** ব্যবস্থা নামে অভিহিত করা হয়। মাষ্টার কণ্ট্রোল সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক অথবা বৈদ্যুতিক হতে পারে।

মে'ন : নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় **মে'ন** বলা হয় গ্র্যাণ্ড মাষ্টার তথা মাষ্টার কণ্ট্রোলকে। [গ্র্যাণ্ডমাষ্টার ও মাষ্টার কণ্ট্রোল দ্রষ্টব্য]

রিডিং : দৃশ্য বিশেষের জন্য ডিমার ও সুইচের বিশেষ অবস্থানকে **রিডিং** বলে। অভিনয় চলাকালীন প্রদর্শিকা হিসাবে সাহায্য পাওয়ার জন্য সংকেতলিপিতে এই রিডিং লিপিবদ্ধ রাখা হয়।

রিমোট কণ্ট্রোল : অনেকসময় খুব বড় আকারের সুইচকে বোর্ডে না রেখে, অন্যত্র রাখা হয়; এবং তড়িৎ চুম্বকের সাহায্যে বোর্ড থেকে সেটি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। এই জাতীয় ব্যবস্থা **দূরনিয়ন্ত্রণ** বা **রিমোট কণ্ট্রোল** নামে অভিহিত। এর ফলে বোর্ডের আকৃতি অযথা বড় হয়ে ওঠে না, এবং বড় সুইচের শব্দে ব্যাঘাত সৃষ্টির ভয় থাকে না।

লাইন : তড়িৎচক্রের ধনভাগকে **লাইন** বা **লাইভ** বলা হয়। এই লাইন যেন অন্যান্য ধাতব অংশ থেকে সু-অন্তরিত থাকে, সেদিকে সতর্ক থাকা উচিত।

লোড : যে কোনও তড়িৎচক্রের উপর যে পরিমাণ এ্যম্পিয়ার ও ওয়াটের **চাপ** দেওয়া হয়েছে, তাকেই সেই চক্রের **লোড বলে**। এই চাপ অতিক্রান্ত হলেই ফিউজ জ্বলে যাবে।

শ্যাফ্ট্ : ডিমারের হাতলগুলিকে ইণ্টারলকিং প্রথায় একত্রে কাজ করানোর জন্য ব্যবহৃত অক্ষদণ্ড বিশেষ [চিত্র ৩০.১]। পৃথক পৃথক ডিমারের হাতল ঘুরিয়ে এটিকে আঁকড়ে ধরা হয়। সেই অবস্থায় এই শ্যাফ্ট ঘোরালে, আঁকড়ে ধরা ডিমারের হাতলগুলি একসঙ্গে কাজ করে।

শু্য : ডিমারের হাতল সংলগ্ন সংযোগ বিশেষ। স্প্রিংয়ের সাহায্যে এই **শু্য** ডিমারের জড়ানো তারের গায় শক্তভাবে লেগে থাকে।
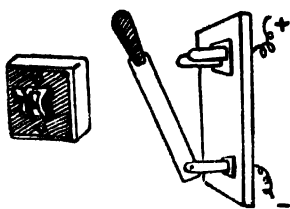
[চিত্র ৩০.৫] সুইচ্

সুইচ্ : তড়িৎচক্রে তড়িৎ প্রবাহ সৃষ্টি করার বা রোধ করার ব্যবস্থাকে [চিত্র ৩০.৫] **সুইচ** বলে। এগুলি তড়িৎচক্রে 'সিরীজ' অবস্থায় যুক্ত হয়। সুইচ তড়িৎচক্রের ধনভাগে যুক্ত হওয়াই বিধেয়; ফলে প্রবাহরুদ্ধ হলে, চক্রের পরবর্তী অংশ নিরাপদ থাকবে।

স্টেপ : ডিমারের সংযুক্তি বিন্দুর ব্যবধানকে **'স্টেপ'** বলে। [চিত্র ৩০.৬] সহজভাবে একটি বাতীকে কমানোর জন্য কমপক্ষে ১১০টি
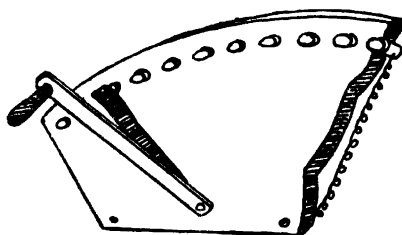
[চিত্র ৩০.৬] স্টেপ

স্টেপ রাখা উচিত। স্টেপের সংখ্যা কম হলে, কমানো বাড়ানোর সময়, বাতীর সাময়িক নিভে যাওয়া, কম্পন হিসাবে অনুভূত হবে।

ডিমার

যে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার সাহায্যে কোনও তড়িৎচক্রের নির্দ্দিষ্ট চাপ কমানোর ফলে, লাইনে সংযুক্ত বাতীর প্রখরতা প্রয়োজন অনুযায়ী হ্রাস করা সম্ভব হয়, তাকে **ডিমার** বলে। একটি পরিবর্তন-সম্ভব দৈর্ঘ্যের রেজিষ্ট্যান্স, বাতীর সঙ্গে সিরিজ-অবস্থায় সংযুক্ত করে [চিত্র ৩১.১] এই ডিমারের কাজ করা হয়। এই রেজিষ্ট্যান্স স্বাভাবিক বৈদ্যুতিক চাপ অর্থাৎ ২৩০ ভোল্টকে কমিয়ে আনে ৩২ ভোল্ট পর্য্যন্ত। ৩২ ভোল্টে জ্বলাকালীন [চিত্রে ৪র্থ অবস্থান দ্রষ্টব্য] যে কোনও বাতীকে সুইচের সাহায্যে অলক্ষিতভাবে নিবিয়ে

দেওয়া যায়। অনেক ডিমারে তড়িৎচক্র বিচ্ছিন্ন করার নিজস্ব ব্যবস্থা থাকে [চিত্রে ৫ম অবস্থান], সে ক্ষেত্রে পৃথক সুইচের প্রয়োজন হয় না।
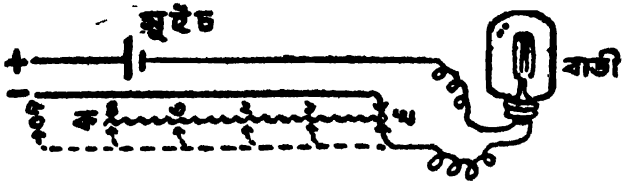
[চিত্র ৩১.১] ডিমারের কাজ [ক-খ রেজিস্ট্যান্স, ১, ২, ৩ ও ৪-এর সাহায্যে ব্যবহৃত রেজিস্ট্যান্সের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর উপায় দেখানো হয়েছে। ৫ম অবস্থানে তড়িৎচক্র বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে]

বলা বাহুল্য, যে বা যতগুলি বাতীকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে, তার বা তাদের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে যেন ব্যবহৃত ডিমারের ক্ষমতার সমতা থাকে। ডিমার কিছুটা অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন হলেও তেমন ক্ষতি নেই, কিন্তু কোনও ক্রমেই যেন বাতীর ক্ষমতার চেয়ে কম ক্ষমতাবিশিষ্ট ডিমার ব্যবহার করা না হয়। অনেক ক্ষেত্রে একটি ১000 ওয়াট বাতীকে ৫00 ওয়াটের ডিমারের সাহায্যে খুব দ্রুত নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জ্বালানো বা নেভানো হয়—এটি কিন্তু অনুমোদিত পন্থা নয় ; বিশেষ করে মনে রাখতে হবে, এ ধরণের অসম শক্তির ডিমার ব্যবহার কালে যেন কোনও ক্রমেই ডিমারের হাতল মাঝপথে বেশীক্ষণ রাখা না হয়—অর্থাৎ কম শক্তি সম্পন্ন ডিমারের সাহায্যে উচ্চতর শক্তির বাতীকে স্বল্পোজ্বল অবস্থায় ধরে রাখা যাবে না।

বিপরীত উদাহরণটিও লক্ষণীয়। একটি ৫00 ওয়াট ডিমারের সাহায্যে একটি ১00 ওয়াট বাতীকে কমানো বা বাড়ানোর চেষ্টা [একমাত্র আটো ট্রান্সফরমার ডিমার ছাড়া] সফল হবে না। বাতীটি হঠাৎ জ্বলে উঠলো, বা নিভে গেলো বলে মনে হবে। টেবিল ল্যাম্প বা আসবাববাতীতে ব্যবহৃত স্বল্প ক্ষমতার বাতীকে নিয়ন্ত্রণ করার সময় এই জাতীয় অসুবিধা দেখা দেয়। এরূপক্ষেত্রে ঐ বাতীর সঙ্গে বাকী ৪00 ওয়াটের বাতী যুক্ত করে রাখতে হবে একই তড়িৎচক্রে। এই ব্যবস্থাকে **ঘাটতি চাপ** বা 'ফ্যাণ্টম লোড' বলে। অবশ্যই ঘাটতি চাপের বাতিটি আড়ালে রাখা হয়।

ডিমারের জন্য ব্যবহৃত রেজিষ্ট্যান্স তরল অথবা ধাতব, দুই শ্রেণীর হয়ে থাকে। তরল পদার্থ-গঠিত ডিমারের ব্যবহার পেশাদার রঙ্গমঞ্চে কমে এসেছে। কিন্তু এর সহজলভ্য উপাদান এবং গঠন সারল্য হেতু, অপেশাদার মহল অনায়াসে এটিকে কাজে লাগাতে পারেন।

তরল পদার্থ গঠিত ডিমার

নিজেদের প্রয়োজনে উৎসাহী মঞ্চ-শিল্পীরা **তরল পদার্থ গঠিত ডিমার** নিজেরাই তৈরী করে নিতে পারেন। এরজন্য প্রয়োজনীয় বস্তুগুলি হচ্ছে; (ক) একটি পোড়া মাটির ড্রেন পাইপ, (খ) ভূমির সঙ্গে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত একটি ধাতব পাত, (গ) তারের প্রান্তে আটকানো একটি আলগা ধাতুর পাত, এবং (ঘ) কাপড় কাচার সোডা মিশ্রিত জল। সোডার পরিমাণের উপরে এই শ্রেণীর ডিমারের ক্ষমতার তারতম্য নির্ভর করে। সামান্য বুদ্ধির সাহায্যে তড়িৎ-চাপ হ্রাস বৃদ্ধির এই সরল উপায়-টিকে সহজ নিয়ন্ত্রণযোগ্য [চিত্র ৩১.২] করে নেওয়া যায়।
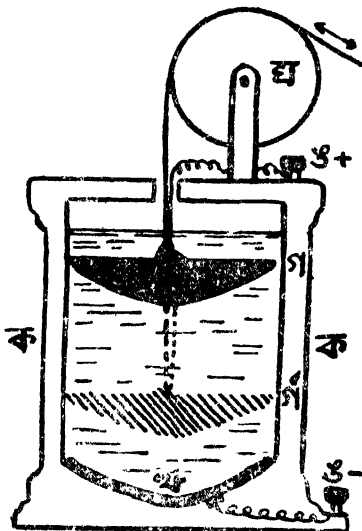
[চিত্র ৩১.২] তরল পদার্থ গঠিত ডিমার
[ক—ড্রেন পাইপের প্রাচীর, খ—স্থায়ীভাবে যুক্ত ধাতব পাত, গ—তারের প্রান্তে আটকানো ধাতব পাত, ঘ—কপিকল, ঙ—তড়িৎচক্রের দুইটি সংযোগ প্রান্ত]

এই জাতীয় ডিমারে ধাতব পাত দুটি সংযুক্ত থাকা অবস্থায়, তারের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক চাপে বিদ্যুৎতরঙ্গ প্রবাহিত হয়। সোডা জলে ডোবানো অবস্থায় ধাতব পাত দুটির মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি হলে, পাত দুটির মধ্যবর্তী সোডা জল রেজিষ্ট্যান্সের কাজ করে। ব্যবধান বৃদ্ধির ফলে রেজিষ্ট্যান্সের দৈর্ঘ্য বাড়ে, এবং তড়িৎচক্রে প্রবাহের চাপ কমতে সুরু করে।

তরল পদার্থ গঠিত ডিমার কিন্তু অত্যধিক সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করতে হয়, নচেৎ যে কোনও মুহূর্তে বিপদপাতের সম্ভাবনা থাকে।

ধাতব ডিমার

ধাতব ডিমারের মধ্যে সরলতম হচ্ছে **স্লাইডার ডিমার** [চিত্র ৩১.৩-ক]। পোরসিলেন-জাতীয় 'তড়িৎ প্রবাহে নিষ্ক্রিয়' বস্তু দিয়ে গড়া বর্তুল আধারের উপরে নিকেল করা তামার সরু তার জড়িয়ে এই জাতীয় ডিমারের রেজিষ্ট্যান্স তৈরী করা

হয়। সমান্তরালভাবে রক্ষিত ধাতব শলাকার সঙ্গে যুক্ত একটি স্থান পরিবর্তনক্ষম সংযুক্তির সাহায্যে উক্ত জড়ানো তারের উপরিভাগ চেপে ধরা হয়। তড়িৎপ্রবাহ এই শলাকার প্রান্তে প্রবেশ করে, সংযুক্তির মাধ্যমে জড়ানো তারের ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যায়। সংযুক্তির স্থান পরিবর্তনের দ্বারা, জড়ানো তারের কার্য্যকরী দৈর্ঘ্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো হয় এবং পরিণতিতে তড়িৎচক্রে চাপের তারতম্য ঘটে।
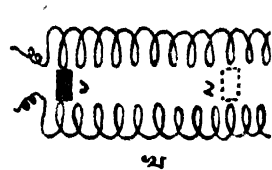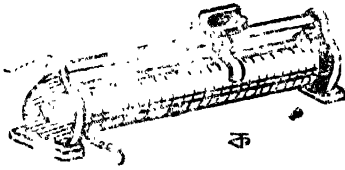
[চিত্র ৩১.৩] স্লাইডার ডিমার

অধিক চাপে কার্য্যকরী করার জন্য এই জাতীয় ডিমারের তার জড়ানো আধারটিকে খুব বেশী বড় আকারের করে তোলার দরকার পড়ে। এই অসুবিধা দূর করার জন্য, একটির বদলে দুটি বর্তুল আধারের মাঝে চলমান সংযুক্তিটি রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে [চিত্র ৩১.৩-খ], যার দ্বারা একই সঙ্গে উভয় আধারে জড়ানো তারই রেজিষ্ট্যান্সের কাজ করবে।

স্লাইডার ডিমারের ব্যবস্থায় অবশ্য একাধিক ত্রুটি বিদ্যমান। জড়ানো তারের উপরে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের ব্যবস্থাটি বৈদ্যুতিক মতে আদর্শ স্থানীয় নয়। এই সংযোগ অত্যন্ত দৃঢ় হলে কার্য্যকরী হবে না; আবার মৃদু বা শিথিল হলে আরও অসুবিধাজনক। তাছাড়া রেজিষ্ট্যান্স মারফত পরিশোষিত তড়িৎশক্তি উত্তাপে রূপান্তরিত হয়ে অপচয় হয়। এইসব অসুবিধা সত্ত্বেও স্লাইডার ডিমারের ছিমছাম গড়ন, এগুলিকে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অঙ্গীভূত করার বিষয়ে বিশেষ সহায়ক। বিশেষতঃ, জড়ানো তারের অগণিত ধাপে, বাতীর ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি খুবই মসৃণভাবে সম্পন্ন হতে পারে।

অন্যান্য ধাতব ডিমারগুলির মধ্যে **মাল্টিকণ্ট্যাক্ট, ট্রান্সফরমার, রিএক্টার** অথবা **চোক** এবং **ইলেক্ট্রনিক** শ্রেণীর ডিমারগুলি মঞ্চের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তবে এগুলি সংগ্রহ করা ব্যয়সাপেক্ষ, এবং

একমাত্র স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে ব্যতীত কাজে লাগানোর পক্ষে জটিল এবং অসুবিধাজনক।
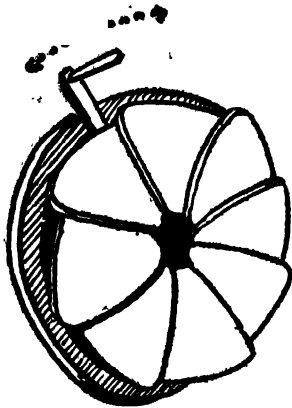
[চিত্র ৩১ ৪]
'আইরিশ ডায়াফ্রাম' শ্রেণীর
সার্সি—ডিমার

যান্ত্রিক ডিমার বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা ছাড়া যান্ত্রিক আয়োজনেও প্রদীপ যন্ত্র নিঃসৃত রশ্মির ঔজ্জ্বল্যে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো সম্ভব। এগুলির মধ্যে সুপরিচিত হচ্ছে **সার্সি ডিমার** বা 'শাটার'। **আইরিশ ডায়াফ্রাম**-এর [চিত্র ৩১.৪] সাহায্যে আলোক নিঃসরণ পথটিকে আস্তে আস্তে বন্ধ করা বা খোলার দ্বারা বাতীর ঔজ্জ্বল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো, এই জাতীয় ডিমারের কাজ।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার শ্রেণীভেদ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মুখ্য দুটি অংশ হচ্ছে, (১) বৈদ্যুতিক তারের ব্যবস্থা এবং (২) সুইচ-বোর্ড। তারের ব্যবস্থায় প্রথমতঃ পড়ে মূল তড়িৎ উৎস থেকে বোর্ডে তড়িৎ প্রবাহ নিয়ে আসার ব্যবস্থা ; এবং দ্বিতীয়তঃ পড়ে, বোর্ড থেকে প্রদীপযন্ত্রের উদ্দেশে প্রসারিত শাখা-প্রশাখা [চিত্র ৩২.১]। প্লাগ, পকেট, কানেক্টার ইত্যাদি তারের ব্যবস্থার অঙ্গীভূত বলে ধরা হয়।
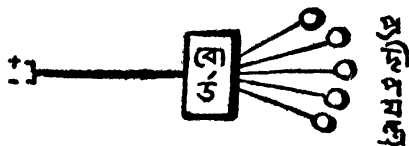
[চিত্র ৩২ ১] আলোক-নিয়ন্ত্রণে তারের ব্যবস্থা

সুইচ-বোর্ডের প্রধান কাজ প্রদীপ যন্ত্রগুলিতে পৃথকভাবে, বা প্রয়োজনে দলগতভাবে বিভিন্ন নির্দিষ্ট চাপে বিদ্যুৎতরঙ্গ বিতরণ করা।

এই কাজের জন্য নিয়োজিত সুইচ বোর্ডের মুখ্য অংশগুলি হচ্ছে: (ক) সুইচ, (খ) ডিমার এবং (গ) ফিউজ। সুইচের কাজ তড়িৎচক্রে তড়িৎপ্রবাহ চালানো বা বন্ধ করা। ডিমারের কাজ, নির্দিষ্ট তড়িৎচক্রে বিদ্যুৎপ্রবাহের চাপের তারতম্য ঘটিয়ে, প্রদীপযন্ত্র-নিঃসৃত রশ্মির প্রখরতায় হ্রাসবৃদ্ধি ঘটানো। ফিউজ, নির্দিষ্ট তড়িৎচক্রকে চাপাধিক্য বা শর্ট সারকিটের বিপদ থেকে রক্ষা করার সরঞ্জাম।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাগুলির চরিত্রগত পার্থক্যের উপরে ভিত্তি করে, তাদের তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। এই তিন শ্রেণীর প্রথমভাগে পড়ে **স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ** ব্যবস্থা ; দ্বিতীয়ভাগে পড়ে **পরিবর্তনীয় নিয়ন্ত্রণ** ব্যবস্থা ; এবং তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে **বহনযোগ্য নিয়ন্ত্রণ** ব্যবস্থা। যথেষ্ট সন্তোষজনক না হলেও, এই শ্রেণীভেদ সুপরিচিত হয়ে উঠেছে।

স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার নামেই তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট প্রকাশিত। এই ব্যবস্থায় সুইচ-বোর্ড থেকে সমস্ত প্রদীপযন্ত্রে যুক্ত তারগুলি **স্থায়ীভাবে** স্থাপন করা হয়। কোনও অবস্থাতেই সমস্ত তার না খুলে, তড়িৎচক্রের নির্দিষ্ট আয়োজনের ব্যতিক্রম বা পরিবর্তন ঘটানো যায় না। ফলে, সুইচ বোর্ডের নির্মাণকালে যে ভাবে ডিমার, ফিউজ ও সুইচের আয়োজন নির্দ্ধারিত হয় [চিত্র ৩২.২ ক], পরবর্তী কালে কাজের সুবিধার প্রয়োজনে, সাময়িক গ্রুপ করা বা অনুরূপ পরিবর্তন বা পরিবর্দ্ধন সম্ভবপর হয় না। আধুনিক দীপচিত্রণের পক্ষে এটি একটি বিরাট ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা। তবে নিরাপত্তার দিক থেকে স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দাবীই অগ্রগণ্য।

পরিবর্তনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

আধুনিক দীপচিত্রণ-পদ্ধতির প্রয়োজন মেটানোর প্রচেষ্টাতেই ক্রমোন্নতির ফলে এই **পরিবর্তনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার** সূত্রপাত। এই ব্যবস্থায় [চিত্র ৩২.২ খ] আলোকযন্ত্রগুলি সুইচ বোর্ডের সঙ্গে স্থায়ী-ভাবে যুক্ত থাকে না। সুইচ বোর্ড থেকে বিদ্যুৎবাহী তার মঞ্চের ও প্রেক্ষাগৃহের বহু স্থানাবাধি প্রসারিত করে, প্লাগ-পকেট বা বাক্সে সংযুক্ত করা হয়। ফলে, প্রয়োজনমতো যে কোনও প্রদীপযন্ত্র যে কোনও স্থানে স্থাপনা করে, বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, বিদ্যুৎ সরবরাহের এই আয়োজন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মারফতই পরিবেশিত হয়।

ডিমারগুলিও অনুরূপভাবে কোনও তড়িৎচক্রে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত থাকে না ; পৃথক সকেটের সাহায্যে প্রয়োজন মতো লাগিয়ে ব্যবহার করার
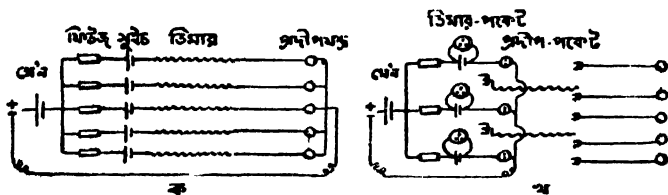
[চিত্র ৩২.২] (ক) স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ ও (খ) পরিবর্তনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার পার্থক্য

ব্যবস্থা থাকে। ফলে, স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সমসংখ্যক তড়িৎচক্র, এই ব্যবস্থায় অনেক কম সংখ্যক ডিমারের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়।

আধুনিক আলোকসম্পাত প্রণালীর প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সমধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে।
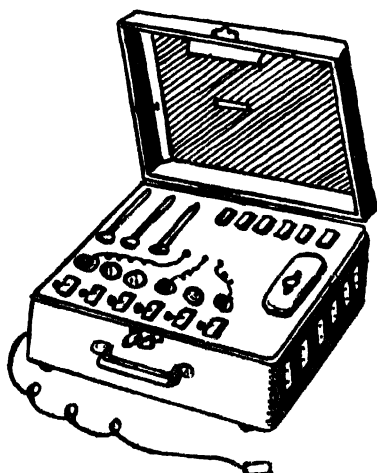
[চিত্র ৩২.৩] বহনযোগ্য নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা

বহনযোগ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা

অপেশাদার সংস্থা তথা ভ্রাম্যমান দলের জন্য বহনযোগ্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাই একমাত্র অবলম্বন। গঠনের দিক থেকে এবং চারিত্রিক বৈশিষ্টে, পূর্ববর্ণিত দুই শ্রেণীর ব্যবস্থা থেকে এর কিছুটা পার্থক্য আছে।

একটি সহজ বহনযোগ্য ধাতুর পাতে মোড়া কাঠের বাক্সে সুইচ, ফিউজ, ডিমার প্রভৃতি লাগিয়ে এই শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা [চিত্র ৩২.৩] তৈরী হয়। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাতেও তরঙ্গবাহী লাইনগুলি এক একটি সকেটে গিয়ে শেষ হয়। প্রদীপযন্ত্রগুলি তার ও প্লাগের সাহায্যে এই সকেট থেকে নিয়ন্ত্রিত চাপে বিদ্যুৎপ্রবাহ সংগ্রহ করে।

সমগ্র ব্যবস্থাটিকে যতদূর সম্ভব অল্প আয়তনের মধ্যে নিবদ্ধ রাখার দিকে যত্ন নেওয়া হয়; এর জন্য সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার অনেক নিয়মই এখানে মানা হয় না। সুবিধার জন্য বাক্সের গায় একটি তালা লাগানো ঢাকা, এবং ভারী হলে, চাকা লাগানো পায়ার ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে।

নীচের তালিকায়, তিন শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সুবিধা অসুবিধার দিক থেকে একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হলো :

স্থায়ী	পরিবর্তনীয়	বহনযোগ্য
নিরাপদ	কম নিরাপদ	বিপদের ভয় বেশী
অপসারণযোগ্য নয়	অপসারণযোগ্য নয়	অপসারণযোগ্য
প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবস্থার পরিবর্তন সম্ভব নয়	প্রয়োজন অনুযায়ী নানা ব্যবস্থার উপ-যোগী করে ব্যবহার করা যায়	প্রয়োজনের অনুরূপ পরিবর্তন সাধন সম্ভব, কিন্তু ক্ষুদ্রায়তন হও-য়ায়, ক্ষমতা সীমীত
তৈরী করা অত্যধিক ব্যয়সাপেক্ষ	তৈরী করা তুলনা-মূলকভাবে সস্তা	তৈরী করা, আয়ো-জনের তুলনায় ব্যয়-সাপেক্ষ
এলাইনমেণ্ট সর্বতো-ভাবে মেনে যন্ত্রপাতি সাজানো হয়	স্থায়ী কয়েকটি অংশে মাত্র এলাইনমেণ্ট রাখা সম্ভব	স্থান সংকুলানের অগ্রা-ধিকারে এলাইনমেণ্ট মেনে চলা প্রায়ই সম্ভবপর হয় না
বহু যন্ত্র অব্যবহৃত পড়ে থাকে	স্বল্প সংখ্যক যন্ত্রে বহু কাজ করা যায়	প্রয়োজনে, একাধিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এক-সঙ্গে কাজে লাগানো যায়

স্থায়ী	পরিবর্তনীয়	বহনযোগ্য
নিয়ন্ত্রণ করা অত্যন্ত সহজ	নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অত্যন্ত জটিল	নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যথেষ্ট সতর্ক ব্যবহারের অপেক্ষা রাখে

সামান্য অভ্যাসেই একজন নিয়ন্ত্রকের পক্ষে আলো এবং ধ্বনি একসঙ্গে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে, যদি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি ঐ জাতীয় দ্বিমুখী কাজের উপযোগী করে তৈরী করা হয়। এক্ষেত্রে সাধারণ আলোক-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার সঙ্গে একটি ছোট টেপ রেকর্ডার, মণিটার স্পীকার অথবা হেডফোন এবং টু-ওয়ে সুইচ সম্বলিত একটি অতিরিক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা যুক্ত করতে হবে। বলা বাহুল্য, সমগ্র ব্যবস্থাটির আয়তন একজন যন্ত্রীর নাগাল পাওয়ার মতো আকারে সংক্ষিপ্ত করেই তৈরী করা উচিত।
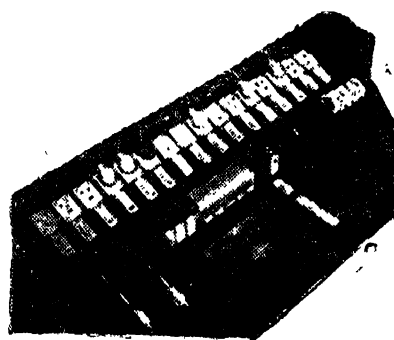
[চিত্র ৩২.৪] বহনযোগ্য ধ্বনি ও আলোক নিয়ন্ত্রণের যুগ্ম-ব্যবস্থা *

স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ বা বড় কোনও দলের জন্য এই জাতীয় সংক্ষেপিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় প্রয়োজন পড়ে না। ছোট ভ্রাম্যমান দলের পক্ষেই এই শ্রেণীর যুগ্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা [চিত্র ৩২.৪] খুব কার্য্যকরী এবং সুবিধাজনক।

বহনযোগ্য এই শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণের কিছু যন্ত্র পা দিয়ে চালানোরও ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। সামান্য বুদ্ধি খাটিয়ে টেপরেকর্ডারের 'টেম্পোরারি স্টপের' একটি এক্সটেনসান স্যুইচ যদি পায়ে ধরে রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়, তবে যুগপৎ আলোক ও ধ্বনির নিয়ন্ত্রণ খুব সহজসাধ্য হয়ে উঠবে।

পূর্ববিন্যাস-নিয়ন্ত্রণ

আধুনিক দীপচিত্রণের সর্বাধুনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা **পূর্ববিন্যাস** বা 'প্রিসেট' নিয়ন্ত্রণ। এই ব্যবস্থায় দুই থেকে দশটি দৃশ্যের ডিমার-নিয়ন্ত্রণ পূর্বাহ্নেই সাজিয়ে রাখা যায়। নিয়ন্ত্রক একটি মাষ্টারের সাহায্যে শুধু সাজানো নিয়ন্ত্রণ সারির কাজটি শুরু করে দেন—তার পরের কাজগুলি পূর্ববিন্যাস মতো স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে সাধিত হয়। অনেকক্ষেত্রে কম্পিউটারের 'পাঞ্চিং কার্ড' প্রণালীতেও পূর্ববিন্যাস চালানোর ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থায় মাঝপথে কোনও ছোটখাটো পরিবর্তনের প্রয়োজন হলে, পূর্ণ একটি সারির বিন্যাসকেই বদলে নিতে হবে।

আকার ও সংস্থাপন

স্যুইচ বোর্ডের আকার এমন হওয়া উচিত, যেন একটি লোক এক জায়গায় বসে সমগ্র ব্যবস্থার নাগাল পেতে পারে। অর্থাৎ, উভয় পাশে দুই প্রসারিত হাতের চরম দৈর্ঘ্য [৬ ফুট] হওয়া উচিত এর সর্বাধিক দৈর্ঘ্য এবং হাত বাড়িয়ে সামনের দিকে এগিয়ে ধরার মতো ২' ৬" বা ৩ ফুটের মধ্যে হওয়া উচিত এর প্রস্থ বা উচ্চতা। এখানে বলা যেতে পারে, **এলাইনমেণ্ট**-এর অনুসরণে একই জাতীয় যন্ত্রগুলিকে লম্বভাবে না রেখে, ভূমি সমান্তরালভাবে সাজানোর প্রচলিত ধারাটি [চিত্র ৩০.২] নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার উচ্চতাধিক্যের দিক বিবেচনা করেই স্থিরীকৃত হয়েছে।

স্থায়ী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় কিন্তু সরঞ্জামের আধিক্য হেতু, উপরোক্ত মাপের মধ্যে বোর্ড তৈরী করা সব সময় সম্ভব হয় না। এমন বোর্ড আছে, যেখানে নিয়ন্ত্রককে দাঁড়িয়ে এবং ঘুরেফিরে সমগ্র বোর্ডটির নাগাল পেতে হয়। প্রয়োজনে একাধিক নিয়ন্ত্রকও নিযুক্ত হন, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য। তবে **দূর নিয়ন্ত্রণ** বা 'রিমোট কন্ট্রোল ব্যবস্থা' আবিষ্কারের পর, স্থায়ী বিরাট বোর্ডও এখন একজন নিয়ন্ত্রক এক জায়গায় বসে, টাইপরাইটার যন্ত্রের সমান আকৃতিবিশিষ্ট একটি ছোট সহকারী বোর্ডের সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত করতে পারছেন।

বলা বাহুল্য, **বহনযোগ্য ব্যবস্থা** কোনও ক্রমেই প্রদত্ত পরিমাপের চেয়ে বড় হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমন স্থানে স্থাপিত হওয়া উচিত, যেখান থেকে নিয়ন্ত্রক মঞ্চের উপরে সমস্ত পরিবেশটুকু পরিষ্কারভাবে দেখতে পান। সচরাচর যে কোনও একটি পার্শ্বরঙ্গে এরজন্য স্থান নির্দিষ্ট হয়। কিন্তু এটি আদর্শ স্থান নয়। অবশ্য সুবিধাজনক ব্যবস্থা থাকলে, এখান থেকে সমগ্র রঙ্গপীঠ ভালোভাবেই দেখা যায়; কিন্তু এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রক অভিনেতা বা দৃশ্যাপটাদির এমন একটি পাশের ছবি দেখতে পান, যেটি দর্শকের দেখার কথা নয়। ফলে, নিয়ন্ত্রণরত অবস্থায় দীপচিত্রণের চরম পরিণতি উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না।

সেদিক থেকে অধিরঙ্গের সামনে **বাদ্যপীঠ** [চিত্র ৩২.৫] অথবা দোতলার আসন শ্রেণীর একটি পাশ অপেক্ষাকৃত ভালো যায়গা। কিন্তু এদুটি স্থানের কোনও একটিতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপিত হলে. নিয়ন্ত্রণজনিত নানা শব্দ, নিকটবর্তী দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদন করবে। তাছাড়া মঞ্চের বাহির থেকে ভিতরে যোগাযোগ রাখার জন্য ব্যবহৃত টেলিফোনে কথাবার্তা বলাও এ যায়গা থেকে বাধাসৃষ্টিকারী। [একমাত্র, আলোকসংকেতে যোগাযোগ রাখা এক্ষেত্রে সুবিধাজনক।]

সবদিক থেকে বিচার করে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা স্থাপনের আদর্শ স্থান হচ্ছে **প্রোজেকশান বুথ,** [চিত্র ৩২.৫] অর্থাৎ দর্শকের আসন সারির

[চিত্র ৩২.৫] প্রোজেকশান বুথ ও বাদ্যপীঠে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্থাপনের নমুনা। ডাইনে ঃ সারকারিণায় প্রোজেকসান বুথ থেকে নিয়ন্ত্রনের ব্যবস্থা। সামনের পাতায় ঃ রবীন্দ্র-ভারতীতে বাদ্যপীঠে সংস্থাপিত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা [অধুনা অপসারিত]

পিছনে, প্রাচীরের ওপাশে বিশেষভাবে নির্মিত কক্ষে। প্রাচীরের মাঝে কাচ দিয়ে আটকানো জানালা দিয়ে, নিয়ন্ত্রক তাঁর দীপচিত্রণের সমগ্র ফলাফল দর্শকের দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখতে পারেন ; অথচ ধ্বনিনিরোধক কক্ষে থাকায়, দর্শকদের বিরক্তি উৎপাদক কোনো শব্দসৃষ্টির সম্ভাবনা নেই।*

শেষোক্ত এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি লাইন টেনে আনতে হবে প্রেক্ষাগৃহের পিছনের প্রস্থ ও পাশের দৈর্ঘ্য পার করে মঞ্চের মধ্যে প্রয়োজনীয় স্থানে ; এ'জন্য এই জাতীয় সংস্থাপন রীতিমত ব্যয়সাপেক্ষ। তাছাড়া, পর্য্যাপ্ত মহলা না দেওয়া থাকলে, নিয়ন্ত্রকের সঙ্গে সর্বদা যোগাযোগ রাখা অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার যোগাযোগ সাধনের জটিল পন্থায় [টেলিফোন, ঘণ্টা বা আলোকসঙ্কেত] অভ্যস্ত হতে সময় লাগে। এই দুই প্রধান কারণেই, নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সংস্থাপনের এই আদর্শ উদাহরণটি এখনো জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি।

---

* ভারতবর্ষে গ্রন্থকারই প্রথম এই দুই ধরণের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। প্রথম নমুনা তৈরী হয় কলিকাতার থিয়েটার সেণ্টার মঞ্চে [প্রোজেকশন বুথ শ্রেণী]। পরের দুটি বাদ্যপীঠ-শ্রেণীর প্রথমটি তৈরী হয়েছিল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবনমঞ্চে [আপাততঃ ব্যবস্থাটি অপসারিত] এবং দ্বিতীয়টি তৈরী হয় হায়দ্রাবাদে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় রঙ্গমঞ্চে। প্রোজেকশান বুথ শ্রেণীর পরবর্তী নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নির্মিত হয়েছে সারকারিণায়।
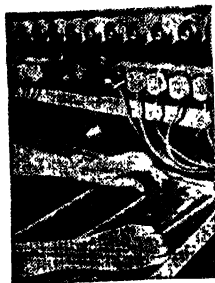
পাঁচ রঙ্গপীঠ দীপন

রঙ্গপীঠ ও মঞ্চভাগ

মঞ্চের যে অংশটুকু প্রেক্ষাগৃহ থেকে দেখা যায়, অর্থাৎ অভিনেতৃবর্গ মঞ্চের যে অংশটুকুতে তাঁদের অভিনয় সীমাবদ্ধ রাখেন, তাকে **রঙ্গপীঠ** বলা হয়। অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে এই রঙ্গপীঠে অবস্থানকালে যেন সম্যকভাবে দেখতে পাওয়া যায়, এই কথাটি আলোকসম্পাতকারীকে সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে। যেভাবে সূর্য্যরশ্মি সবকিছুকে আলোয় ভাসিয়ে দৃশ্যমান করে তোলে, সেইভাবেই রঙ্গপীঠের উপর বেশ কিছুটা উঁচু থেকে একটি তীব্র আলোকরশ্মি ক্ষেপণ করে এই দেখানোর সমস্যা মেটানো যেতে পারতো। কিন্তু বস্তুতঃ, মঞ্চের সীমীত আবেষ্টনীর মধ্যে, সূর্য্যরশ্মির অনুরূপ কোনও আলোকসূত্র সৃষ্টি করা, বা তাকে প্রয়োজনীয় দূরত্বে ধরে রাখার ব্যবস্থা করা সম্ভবপর নয়। বাধ্য হয়েই আমাদের একাধিক বিভিন্ন আলোকসূত্রের সাহায্য নিতে হয় প্রয়োজনীয় ঔজ্জ্বল্য সৃষ্টি করার কাজে।

[চিত্র ৬৩.১] রঙ্গপীঠ ছয়ভাগে ভাগ করার রীতি

প্রচলিত ধারা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন আলোকসূত্র ব্যবহার করা হয়, রঙ্গপীঠের বিভিন্ন অংশ আলোকিত করার জন্য। অভিনেতা তাঁর

অভিনয়ের গতিতে রঙ্গপীঠের যে কোনও অংশেই যেতে পারেন ; সেক্ষেত্রে প্রতিটি অংশই মূল্যবান এবং সমানভাবে আলোকিত হওয়ার দাবী রাখে।

সাধারণতঃ বলা হয়ে থাকে, রঙ্গপীঠকে ছয়টি সমান ভাগে ভাগ করে নেওয়ার কথা—সামনের অর্দ্ধেকে তিনভাগ এবং পিছনের অর্দ্ধেকে বাকী তিনভাগ [চিত্র ৩৩.১]। এই ভাগগুলির প্রত্যেকটিকে পৃথক পৃথক আলোকসূত্রের সাহায্যে আলোকিত করা দরকার। বিভিন্ন আলোকসূত্রের বিচ্ছুরিত রশ্মি যেন স্বাভাবিক ব্যাপ্তিতে নির্দিষ্ট মঞ্চাংশে অবস্থিত অভিনেতাকে আলোকিত করে। এইভাবে মঞ্চভাগের ফলে যে শুধু সমগ্র রঙ্গপীঠ সমানভাবে আলোকিত করা সম্ভব, তাই নয় ; সেই সঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন মঞ্চাংশের আলোক-প্রখরতা ও বর্ণবিন্যাসের তারতম্য ঘটিয়ে একঘেঁয়েমী কাটিয়ে তোলা সম্ভবপর হয়। একটি মাত্র আলোকসূত্র সমগ্র রঙ্গপীঠের জন্য ব্যবহৃত হলে, এই একঘেঁয়েমী কাটানো সম্ভব হতো না।
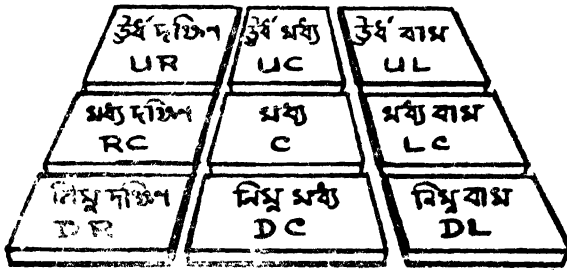
[চিত্র ৩৩.২] রঙ্গপীঠ নয়ভাগে ভাগ করার রীতি

বৃহত্তর মঞ্চের ক্ষেত্রে কাজের সুবিধার জন্য মঞ্চকে ছয় ভাগের পরিবর্তে নয় [চিত্র ৩৩.২] থেকে পনেরো ভাগ পর্য্যন্ত করা চলে। রঙ্গপীঠের এই অংশগুলিকেই শুধু আলোকিত করার জন্য যে সব আলোকসূত্র ব্যবহার করা হয়, তাদের **রঙ্গপ্রদীপ** বা 'এ্যাক্‌টিং এরিয়া লাইটস্‌' বলে। সাধারণভাবে অভিনেতৃবর্গের মুখমণ্ডলে পর্য্যাপ্ত আলোকপাতের উদ্দেশে, আলোকিতকরণের 'তল'টিকে ধরা হয়, পাটাতন থেকে ন্যুনাধিক সাড়ে পাঁচফুট উপরে।

নিয়ন্ত্রিত এবং সীমীত আলোক-সম্পাতের প্রয়োজনীয়তা

সমুদয় রঙ্গপীঠটিকে অনায়াসে শুধুমাত্র প্রচুর সংখ্যক ঝরি ও পাদপ্রদীপের সাহায্যে আলোকিত করা যেতে পারতো ; কিন্তু তার ফলে প্রচুর আলো অযথা ছড়িয়ে পড়তো সমস্ত যায়গায়। সেক্ষেত্রে পশ্চাৎপট কর্তৃক প্রতিফলিত আলোকের বাধা অতিক্রম করে অভিনেতৃবর্গকে স্পষ্টরূপে দেখাতে হলে, প্রচুর প্রখরতা সৃষ্টি করার প্রয়োজন হতো। পশ্চাৎপট যত অনুজ্জ্বল বর্ণেই চিত্রিত হোক না কেন, স্থিরভাবে যে বস্তু দাঁড়িয়ে থাকে, সচল বস্তুর তুলনায় তার আলোক প্রতিফলনের ক্ষমতা অনেক বেশী। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, অল্প আলোর সাহায্যে দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা বাড়াতে হলে, পশ্চাৎপটের উপরে পড়বেনা, এমনভাবে আলোক নিয়ন্ত্রিত ও সীমীত ভাবে ফেলা দরকার। পশ্চাৎপট অপেক্ষাকৃত অনুজ্জ্বল থাকলে, তুলনামূলক বৈষম্য সৃষ্টির দ্বারা দর্শকের দেখতে পাওয়ার ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। পুরাতন প্রথানুসরণে শুধু ঝরি ও পাদপ্রদীপের সাহায্যে এই জাতীয় বৈসম্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়।

রঙ্গপীঠ আলোকিত করার সময় চারটি প্রধান বিষয়ে মনযোগ আকর্ষণ করতে হবে, এবং সেগুলি যথাক্রমে :

(ক) আলোকের প্রাখর্য্য,
(খ) আলোকের বর্ণভেদ,
(গ) আলোকরশ্মির পরিবেশন, এবং
(ঘ) আলোকসম্পাত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা।

নীচের অনুচ্ছেদগুলিতে পৃথকভাবে এদের প্রত্যেকটি বিষয়ে আলোচনা করা হলো।

আলোকের প্রাখর্য্য

একটি বিশেষ বস্তুকে সম্যকরূপে দেখতে পাওয়ার জন্য যে পরিমাণ আলোকের প্রয়োজন হয়, সেই পরিমাণকে বলা হয় ব্যবহৃত **আলোকের প্রাখর্য্য** বা 'ইণ্টেন্‌সিটি'। বস্তুভেদে এই আলোক-প্রখরতার বিভিন্নতা ঘটে থাকে। এখানে বলে রাখা যাক, অভিনেতার মুখমণ্ডল দেখানোর জন্য আলোকের যতটুকু প্রখরতা প্রয়োজন, তাকেই অভিনেতার সমুদয় শরীরের জন্য যথেষ্ট বলে মেনে নেওয়া হয়। এই মুখমণ্ডল ও পশ্চাৎপটের ঔজ্জ্বল্যের

তুলনামূলক বৈসম্যের উপরেই আলোকপ্রখরতা নির্দ্ধারণের কাজটি মুখ্যতঃ নির্ভর করে। যেমন, পশ্চাৎপট যদি ঔজ্বল্যের দিক থেকে অভিনেতার মুখমণ্ডলের চেয়ে কম হয়, তবে স্বল্প প্রখরতার সাহায্যেই অভিনেতাকে দেখা যাবে—বিপরীত ক্ষেত্রে অধিক প্রখরতার প্রয়োজন।

দুটি বিষয় এই আলোক-প্রখরতাকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করে। প্রথমতঃ আলোকসূত্র থেকে আলোকিত বস্তুর দূরত্ব; এবং দ্বিতীয়তঃ, নির্দিষ্ট আলোকিত স্থানে আলোকরশ্মির কৌণিক ব্যাপ্তি।

আলোকিত বস্তু এবং আলোক-সূত্রের মধ্যে ব্যবধান যত বাড়বে, বস্তুর উপরে আলোকেব প্রখরতা ততই কমে যাবে। সুতরাং যে সব রঙ্গপ্রদীপ অপেক্ষাকৃত দূরে অবস্থিত, তাদের শক্তিশালী রাখা উচিত। আতসকাচ ব্যবহারের দ্বারা আলোকসূত্রের সাধারণ প্রখরতা অনেকগুণ বাড়িয়ে এই কাজে লাগানো হয়। অনুরূপভাবে রশ্মিকোণের পরিমাণ বৃদ্ধিব সঙ্গে সঙ্গে প্রখরতার পরিমাণ কমতে থাকে। আতসকাচ থেকে বাতীর দূরতা হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা বশ্মিকোণের ব্যাপ্তি বাড়ানো বা কমানো হয়।

আলোকের প্রখরতা পরিমাপের নিম্নতম মান বা **একক** হচ্ছে **ফুট-ক্যাণ্ডেল**—যা থেকে সচরাচর প্রচলিত **ক্যাণ্ডেল-পাওয়ার** কথাটি এসেছে। একটি সাধারণ মোমবাতী এক ফুট দূরবর্তী স্থানে যে পরিমাণ প্রখরতা সৃষ্টি কবে, তাকেই প্রখরতা পরিমাপের নিম্নতম মান হিসাবে নাম দেওয়া হয়েছে 'এক ফুট-ক্যাণ্ডেল'। সাধারণ বিজলীবাতীর এক **ওয়াট** পরিমাণ বলতেও এই একই প্রখরতা বোঝায়।

একটি ১০,০০০ ওয়াটের স্পটবাতী পূর্ণ প্রখরতায় জ্বলছে ধরে নিয়ে, পার্শ্বের রেখাচিত্রে একটি তালিকা দেওয়া হলো। এই চিত্রে দেওয়া হিসাবের সাহায্য নিয়ে, যে কোনও শক্তিসম্পন্ন বাতী যে কোনও দূরত্বে যে প্রখরতা সৃষ্টি করতে পারে, তা নির্দ্ধারণ করা খুবই সহজ।
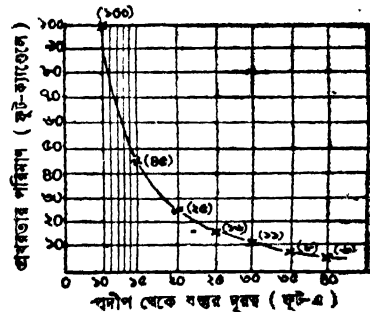
দৃষ্টান্তের সাহায্যে রেখাচিত্রটিকে কাজে লাগানোর ধারা বোঝানো যাক। (ক) ধরা যাক ব্যবহৃত বাতীটির নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য ২000 ওয়াট। ২৩ ফুট দূরবর্তী স্থানে ঐ বাতীর সাহায্যে কতখানি প্রখরতার সৃষ্টি হবে? চিত্রের বর্ণনানুসারে ২৩ ফুট দূরে ১0,000 ওয়াট বাতী থেকে পাওয়া যাবে ২0 ফুট-ক্যাণ্ডেল প্রখরতা। অতএব ২000 ওয়াট বাতী তার পঞ্চমাংশ, অর্থাৎ 8 ফুট-ক্যাণ্ডেল প্রখরতা দিবে। (খ) ধরা যাক, রঙ্গপীঠের একটি নির্দিষ্ট স্থানে ৫ ফুটক্যাণ্ডেল প্রখরতা প্রয়োজন। স্থানটি আলোকসূত্র থেকে ২0 ফুট দূরে অবস্থিত। কত শক্তিসম্পন্ন আলোকসূত্র ব্যবহার করা উচিত? চিত্রের বর্ণনানুসারে ২0 ফুট দূরে ২৫ ফুট ক্যাণ্ডেল প্রখরতা সৃষ্টি করে ১0,000 ওয়াটের বাতী। অতএব ঐ দূরত্বে ৫ ফুটক্যাণ্ডেল প্রখরতার জন্য ২000 ওয়াট শক্তিসম্পন্ন বাতীর প্রয়োজন হবে।

অবশ্য ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ৫ ফুট ক্যাণ্ডেলের জন্য ২000 ওয়াট বাতী ব্যবহার করা হয় না—আতসকাচ ব্যবহার করে, আলোকসূত্রের প্রক্ষেপিত রশ্মির কৌণিক ব্যাপ্তি সংহত করে, প্রখরতা অনেকগুণ বাড়িয়ে নেওয়া হয়। নীচের তালিকায় বিভিন্ন আতস কাচের মারফত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাপ্তিতে আলোকরশ্মির প্রখরতা বর্দ্ধিত হওয়ার পরিমাণ লিপিবদ্ধ হলো :

		ফুটক্যাণ্ডেলে প্রখরতার সর্বোচ্চ পরিমাণ		
মূল বাতী	আতস কাচ	৭° ব্যাপ্তিতে	২0° ব্যাপ্তিতে	৩৫° ব্যাপ্তিতে
২৫0 ওয়াট	8½"×৭½"	১0,000	২,000	৯00
800 ওয়াট	৫"×৯"	১৯,000	৩,৭00	১,৬00
১,000 ওয়াট	৬"×১0"	৫0,000	১0,000	8,000
১,৫00 ওয়াট	৮"×১২"	৮৫,000	১৬.000	৭ 000

কোনও নির্দিষ্ট বিন্দুতে আলোক-প্রখরতার পরিমাণ ফুট-ক্যাণ্ডেলে নির্দ্ধারণ করার জন্য, ব্যবহৃত ক্যাণ্ডেল পাওয়ার বা বাতীর শক্তিকে,

আলোক সূত্র ও নির্দিষ্ট বিন্দুর ব্যবধানের বর্গ দিয়ে ভাগ দিতে হবে।

সূত্রটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে :

$$\text{প্রখরতা} = \frac{\text{বাতীর শক্তি}}{(\text{ব্যবধান})^২}$$

উদাহরণ : একটি ১৫০০ ওয়াট বাতী স্পট লাইটের মাধ্যমে মধ্যম ব্যাপ্তিতে ২০ ফুট দূরে কি পরিমাণ প্রখরতা সৃষ্টি করবে ?

উত্তর : একটি ১৫০০ ওয়াট স্পট থেকে মধ্যম (২০°) ব্যাপ্তিতে প্রখরতা পাওয়া যায় ১৬,০০০ ফুট-ক্যাণ্ডেল।

[পূর্ব পৃষ্ঠায় প্রদত্ত চার্ট দ্রষ্টব্য]

ব্যবধানের বর্গ = ২০×২০ অথবা ৪০০

∴ আলোক প্রখরতা = ১৬,০০০ ÷ ৪০০ = ৪০ ফুট-ক্যাণ্ডেল।

কয়েকটি বাহ্যিক উপকরণেও আলোক-প্রখরতা প্রভাবিত হয়, যাদের মধ্যে ডিমার এবং রঙিন মাধ্যমের ব্যবহার মুখ্য বলে গণ্য হতে পারে।

ডিমারের সাহায্যে আলো জ্বালানো বা নেভানোর কাজগুলি যেমন মসৃণভাবে করা সম্ভব, অপরপক্ষে তেমনি এদের সাহায্যে যে কোন বাতীর নিজস্ব ঔজ্জ্বল্য কমিয়ে রাখা যায়। রঙিন মাধ্যমগুলির মারফত যদিও প্রায় শতকরা ৮৫ থেকে ৯০ ভাগ পর্য্যন্ত আলোক প্রতিসরিত হয়, তবু রশ্মি ব্যাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনীয় স্থানে এই প্রখরতা শতকরা ৫০ ভাগেরও নীচে নেমে যায়। বর্ণভেদের উপরে আবার প্রতিসরণের বাধা অনেকাংশে নির্ভরশীল। হলুদ বা লাল রঙের মাধ্যমে সাধারণ বিজলী বাতীর আলো যত সহজে বেরিয়ে আসে, নীল রঙের মাধ্যমে ততটা আসে না। আবার, আমাদের চোখ হলুদ ও সবুজ রঙ যত সহজে গ্রহণ করতে পারে, নীল বা লাল রঙ তত সহজে গ্রহণ করতে পারে না।

একই 'লট' থেকে সংগ্রহিত দুটি এক রঙের রঙিন মাধ্যম প্রায়ই হুবহু এক হয় না ; তবু বিশেষ অনুধাবনের সাহায্যে, বিভিন্ন রঙের মাধ্যমে আলোক প্রতিসরণের একটি উপান্তিক তালিকা পরের পৃষ্ঠায় রেখাচিত্রে দেখানো হলো :
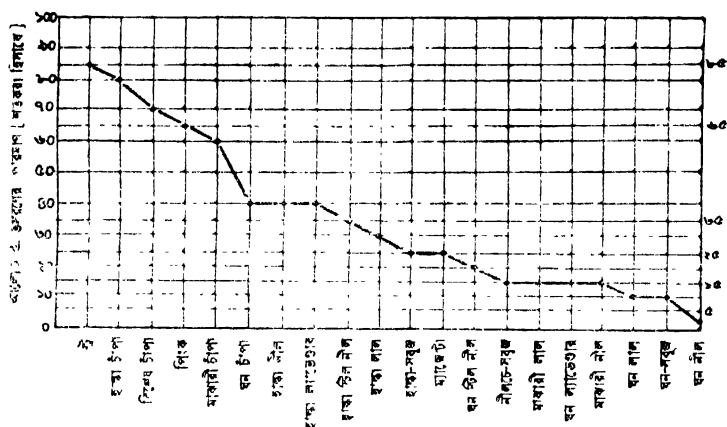
আলোক-প্রখরতা প্রভাবিত করার বাহ্যিক উপকরণগুলির মধ্যে আতস কাচ ও প্রতিফলকের স্থান নগণ্য নয়। রঙিন মাধ্যম বা ডিমার যেমন প্রখরতার হ্রাস ঘটানোয় সাহায্য করে, আতসকাচ ও প্রতিফলক তেমনি প্রখরতার বৃদ্ধি ঘটায়। অভিজ্ঞতাই বলে দিবে, কি পরিবেশে রঙ্গপীঠে কত ওয়াটের বাতী দরকার হতে পারে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে, অন্যান্য বহু বিদ্যার মতো, এটিও আলোকসম্পাতকারীর নিজস্ব বিশেষ বিচার ক্ষমতার আওতায় এসে যায়।

আলোকের বর্ণভেদ

রঙ্গপীঠ আলোকিত করার বিষয়ে আলোকের বর্ণ আর একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করে। নাটকের অভিপ্রায় ও ভাবকে যথাযথ ফুটিয়ে তুলতে বহুভাবে সাহায্য করে আলোকের বর্ণবৈচিত্র। শুধু তাই নয়; অভিনেতার মুখমণ্ডলে তার চরিত্রানুগ রূপটি বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলতে হলে, বর্ণ বিন্যাসের প্রয়োজন হয়।

যে যুগে পাদপ্রদীপমালা এবং ঝরির আলোই ছিল মঞ্চের একমাত্র আলোকসূত্র, সে যুগে একঘেঁয়েমী কাটানোর জন্য অভিনেতৃবর্গের মুখমণ্ডল বিশেষভাবে রঞ্জিত করা হতো। আজকের যুগে চরিত্র ফোটানোর জন্যই মুখরঞ্জনের ব্যবহার করা হয়। বলা বাহুল্য, আলোকের বর্ণ ও মুখরঞ্জনের বর্ণ যেন পরস্পরের পরিপূরক হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখা দরকার।

প্রদীপের কম্পমান আলোক, চাঁদের আলো, মশালের লালচে আভা প্রভৃতি অসংখ্য দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যেখানে বিশেষ ধরণের আলোর

ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন হয়। এসবের জন্য পৃথক যে আলোকসূত্র প্রস্তুত রাখা হয়, তাদের **সূত্র-প্রদীপ** বা 'মোটিভেটিং লাইট্স্' বলে। এই সূত্রপ্রদীপ সমূহের জন্য বর্ণ নির্বাচনের সময় বিশেষ সতর্কতা প্রয়োজন। বাস্তবক্ষেত্রে যে সূত্র থেকে যে রঙের যে পরিমাণ আলো পাওয়া সম্ভব, মঞ্চে তাকেই যথাসম্ভব অনুসরণ করে চলা কাম্য। এরজন্য যদি প্রয়োজন হয়, অনুরূপ আলোকিত পরিবেশে, রূপসজ্জার উপরে কি প্রভাব পড়ে, সে বিষয়ে পূর্বাহ্নেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সূর্য্যাস্তের লালচে হলুদ আলোয় যদি কেউ নীল পোষাকে এসে দাঁড়ায়, তবে তার পোষাকের নীল রঙ অনুজ্বল ধূসর বর্ণের বলে মনে হবে। এক্ষেত্রে, পরিচ্ছদের নিজস্ব বর্ণ দর্শকের চোখে ফুটিয়ে তুলতে হলে, রঙ্গপ্রদীপে নীল রঙের ব্যবহারও আবশ্যক। আলোক-প্রলেপের মধ্যে নীল রঙ থাকলেও চলতে পারে।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা যাবে, বর্ণবিন্যাসের এই ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য দুই ভিন্ন দিক থেকে আসা রশ্মিধারার প্রয়োজন। সূত্রপ্রদীপগুলির দিকে যে সব রঙ্গপ্রদীপ থাকবে, তাদের বর্ণ থাকবে মোটামুটি সূত্রপ্রদীপেরই অনুরূপ। ভিন্ন দিকে স্থাপিত রঙ্গপ্রদীপে থাকবে পূর্ব ব্যবহৃত বর্ণের পরিপূরক বর্ণ। সংক্ষেপে বলা চলে, একদিকে **উষ্ণবর্ণ** ব্যবহৃত হলে, অন্য দিক থেকে **শীতলবর্ণ** ব্যবহার করা উচিত। বাস্তবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, রোদলাগা মুখের এক দিক যেমন উষ্ণবর্ণে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ছায়ায় পড়া দিকটিও কিন্তু কালো দেখায় না—প্রতিফলিত শীতলবর্ণে কিছুটা অনুজ্বল দেখায় মাত্র।

মুখরঞ্জনের প্রধান সমস্যা হলো, মুখের বিভিন্ন অংশে কিছু দাগ টানা বা বর্ণলেপন করা, যার ফলে এক অংশ অন্য অংশের চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী আলো প্রতিফলিত করতে পারে। মুখরঞ্জনে ব্যবহৃত বর্ণের প্রতিফলন ক্ষমতাটাই মুখ্য—বর্ণের প্রাধান্য লক্ষ্যণীয় নয়। বিভিন্ন বর্ণের প্রতিফলনক্ষমতা বিভিন্ন রকমের। দেখা গেছে, রঙ্গপীঠ-দীপণে উষ্ণ ও শীতল বর্ণের যৌগিক ব্যবহারের ক্ষেত্রে, পারপল্ এবং নীল রঙে টানা রেখা, সাধারণ চামড়ার আভা ফুটিয়ে তুলতে পারে।

সর্বদাই লক্ষ্য রাখতে হবে, অভিনেতার মুখমণ্ডল যেন সাধারণক্ষেত্রে স্বাভাবিক দেখায়। এর জন্য রঙ্গপ্রদীপে কিছুটা রঙের অভাব রাখা দরকার। তবে লাল, নীল, সবুজ প্রভৃতি গাঢ় রঙ সর্বদাই এড়িয়ে চলা উচিত, কারণ

এসব রঙ মুখাবয়বের স্বাভাবিকতাটুকু নষ্ট করে ফেলে। স্বাভাবিকতা ফোটানোতে সাহায্য করে চাঁপা, ল্যাভেণ্ডার, পিঙ্ক্, ষ্টীল-নীল প্রভৃতি হাল্কা রঙগুলি। গাঢ় রঙের চেয়ে হাল্কা রঙে রঞ্জিত বিষয়-বস্তু আমরা ভালোভাবে দেখতে পাই। তাছাড়া, গাঢ় রঙের মাধ্যমগুলির তুলনায় হাল্কা রঙের মাধ্যম দিয়ে শতকরা বেশীভাগ আলো অতিক্রম করে, এবং রঙ্গপ্রদীপের আলোক-নিঃসরণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এর দ্বারা পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণচ্ছটা প্রায় অপরিবর্তিত থাকে। অবশ্য যেক্ষেত্রে বিশেষ কোন মেজাজ ফুটিয়ে তোলার জন্য, জমকালো গাঢ় রঙই দরকার, সেক্ষেত্রে অভিনেতার মুখমণ্ডলে স্বাভাবিকতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য বিশেষ আলোকসূত্র ব্যবহার করা উচিত।

আলোকরশ্মির পরিবেশন

রঙ্গপীঠে আলোকরশ্মির পরিবেশনের উপরেই দৃশ্যের নাটকীয় রূপটি প্রধানতঃ নির্ভর করে। পরীক্ষার দ্বারা দেখা যাবে, একই বস্তুর উপরে বিভিন্ন দিক থেকে এসে পড়া আলোর ধারা, সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন ফল সৃষ্টি করে। সুতরাং কোনও একটি বস্তুকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট নিয়ে সম্যক দৃষ্টিগোচর করে তোলার জন্য রশ্মির পরিবেশন নিয়ন্ত্রিত করা, তথা আলোকসূত্রের জন্য উপযুক্ত স্থান নির্বাচন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

বিভিন্ন দিক থেকে আসা আলোকরশ্মির পরিবেশন তারতম্যে, আলোকিত বস্তুর উপরে যে ফলাফলের তারতম্য ঘটে, তার একটি সাধারণ তালিকা নীচে দেওয়া হলো :
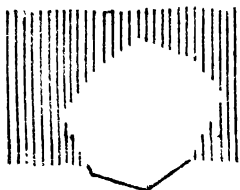
[চিত্র ৩৪.১] ছায়াবিহীন আলোকসম্পাত

সমান প্রখরতাসম্পন্ন একাধিক আলোক-সূত্র যদি চারদিক থেকে একটি বস্তুকে আলোকিত করে [চিত্র ৩৪.১], তবে আলোকিত বস্তুটির উপরে সর্বতোভাবে ছায়াবিহীন আলোকসম্পাত ঘটবে। এই ছায়াবিহীনতার ফলে, বস্তুটির ঘনত্ব হারিয়ে যাবে, এবং ঘনত্ববোধহীন উক্ত বস্তুকে সমভাবে আলোকিত পশ্চাৎপটের [অবশ্য যদি সম্পূর্ণ বিপরীত বর্ণের না হয়] থেকে পৃথক করে চেনা কষ্টকর হয়ে উঠবে। ঠিক সম্মুখভাগ [যেমন ঝুলবারান্দা] থেকে

যদি একটিমাত্র আলোকসূত্র ব্যবহার করা হয় কোনো বস্তুকে আলোকিত করার জন্য, সেক্ষেত্রেও বস্তুটির দৃশ্যভাগ ছায়াবিহীন হবে। উপরন্তু পশ্চাৎপটের গায় একটি সুস্পষ্ট কালো ছায়া দেখা যাবে। ঠিক সম্মুখবর্তী আলোকধারা যদি কোণাকুণিভাবে [অর্থাৎ, প্রেক্ষাগৃহের মধ্যবর্তী কড়ি থেকে] এসে বস্তুটিকে আলোকিত করে, তবে পিছনের ছায়ার আকার কমিয়ে ফেলা সম্ভব হয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও দৃশ্যভাগে ছায়াবিহীনতা দোষ থেকেই যায়।

অনুরূপ সম্মুখবর্তী আলোকসূত্রকে যদি নীচে নামিয়ে দেওয়া যায় [পাদপ্রদীপের কাছে, অথবা একেবারে বস্তুর পায়ের কাছে], পিছনের ছায়ার আকার হয়ে ওঠে অস্বাভাবিক দীর্ঘ। উপরন্তু আলোকিত বস্তুর উপরিভাগ অন্ধকার থেকে যায়। যেহেতু স্বাভাবিক-ক্ষেত্রে **ঊর্দ্ধমুখী আলো** দেখা যায়না, সেই কারণেই এই জাতীয় আলোকসম্পাতে [চিত্র ৩৪.২] অস্বাভাবিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মুখাবয়বের উপরে এই ধরণের আলোক পরিবেশন বিভৎসতা আনে।
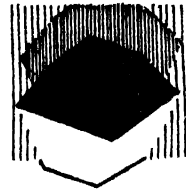
[চিত্র ৩৪.৪] ঊর্দ্ধমুখী আলোকসম্পাত

সোজাসুজি উপর থেকে যদি আলো এসে পড়ে, আলোকিত বস্তুর উপরিভাগ আলোকিত হবে সত্য [চিত্র ৩৪.৩], কিন্তু **নিম্নমুখী** এজাতীয়
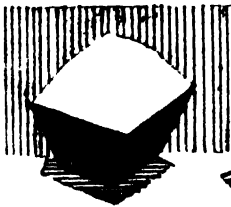
[চিত্র ৩৪.৩] নিম্নমুখী আলোকসম্পাত
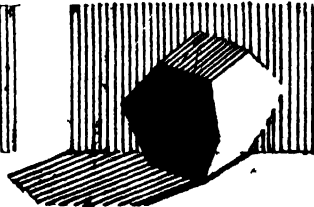
চিত্র ৩৪.৪] একপার্শ্বমুখী আলোকসম্পাত

আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও সম্মুখের দুই লম্বভাগ অন্ধকারে থেকে যাবে। মুখমণ্ডলের ক্ষেত্রে, কপাল, গাল, নাক ও চিবুক প্রভৃতি উঁচু অংশের

এমন দীর্ঘ ছায়া পড়বে তার ঠিক নীচে যে, অভিনেতার স্বাভাবিক আকৃতি বিকৃত এবং জীর্ণ দেখাবে।

আলোকসূত্রকে বস্তুর যে কোনও একপাশে [পার্শ্বপটের দিকে] নেওয়া যাক। আলোকিত বস্তুর একটি দীর্ঘ ছায়া পড়বে আলোকসূত্রের বিপরীত দিকে। দৃশ্যঅংশের দুই লম্বভাগে আলো-ছায়ার যে প্রখর তারতম্য সৃষ্টি হবে [চিত্র ৩৪.৪] তা হয়ে উঠবে পীড়াদায়ক। বস্তুর উপরিভাগ অনালোকিত থাকার সম্ভাবনাই বেশী। এই **পার্শ্ববর্তী আলোকসূত্র**কে যদি কোণাকুণিভাবে [অর্থাৎ ৪৫° কোন সৃষ্টি করে] উপরে তুলে দেওয়া যায়, বিপরীত দিকের ছায়ার দৈর্ঘ্য অনেকটা হ্রাস পাবে, এবং বস্তুর উপরিভাগ আলোকিত হবে। কিন্তু বস্তুর সম্মুখবর্তী দৃশ্যভাগে আলোর প্রখরতার দৃষ্টিকটু তারতম্য সংশোধিত হবেনা।

[চিত্র ৩৪.৫] পশ্চাদ্দীপন

পশ্চাতে স্থাপিত আলোকসূত্র যদি উপযুক্ত স্থানে রাখা হয়, আলোকিত বস্তুকে পশ্চাৎপট থেকে সুন্দরভাবে পৃথক করে দেখানো সম্ভব হতে পারে। কিন্তু সামনের প্রয়োজনীয় অংশের খুঁটিনাটি প্রেক্ষাগৃহ থেকে দেখা যাবেনা। বিশেষ মেজাজ ফুটিয়ে তোলার জন্য অবশ্য এই ধরণের **পশ্চাদ্দীপনের** [চিত্র ৩৪.৫] মূল্য অনস্বীকার্য্য।

আলো যদি সম্মুখ ও পার্শ্বের মধ্যবর্তী স্থান থেকে **কোণাকুণিভাবে** [কর্ণ বরাবর] আসে, তবেই দেখা যাবে, বস্তুর দৃশ্যভাগের উপরে এবং দুই লম্বভাগে আলোকসম্পাতের ভারসাম্য ঘটেছে।

এই পরীক্ষায় একধাপ অগ্রসর হওয়া যাবে, যদি দুটি আলোকসূত্র দুই ভিন্ন কর্ণে স্থাপন করা যায়। এক্ষেত্রে উভয়দিকের ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য ঘটানো হয়ে থাকে, আলোকের প্রখরতায় পার্থক্য ঘটিয়ে, অথবা বিভিন্ন রঙিন মাধ্যম ব্যবহার করে। তাছাড়া, রঙ্গপীঠে একমাত্র মধ্যভাগ-গুলিতে ছাড়া অন্যান্য অংশে দুই দিকের আলোকসূত্রের দূরতা পৃথক হতে বাধ্য।
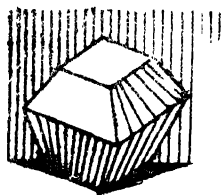
[চিত্র ৩৪.৬]
যুগ্মকর্ণ আলোকসম্পাত

সুতরাং প্রখরতার পার্থক্য ঘটানোর জন্য সেসব ক্ষেত্রে বাহ্যিক উপকরণ বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়না। মঞ্চের যে কোনও একটি অংশের জন্য এই ধরণের **যুগ্মকর্ণ** আলোকসম্পাতের ব্যবস্থাই [চিত্র ৩৪.৬] রঙ্গপীঠ-আলোকিত-করণের প্রকৃষ্ট উপায় হিসাবে স্বীকৃত।

উপরে বর্ণিত পরীক্ষাগুলি ছাড়াও, একাধিক দিক থেকে বিভিন্ন আলোকসূত্রের উপর্যুপরি ব্যবহারের ফলাফল নিয়েও পরীক্ষা করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কোণাকুণি আলোকসম্পাতের সঙ্গে সোজাসুজি উপর থেকে আলোর ব্যবহারে, অথবা একই সঙ্গে কোণাকুণি-ভাবে এসে পড়া আলোর সাথে উপর, নীচু এবং পিছন দিক থেকে বিভিন্ন আলোকসূত্রের সাহায্য নিলে কি ফল দাঁড়ায়, তা জেনে রাখা দরকার। অনেকক্ষেত্রেই এই ধরণের একাধিক আলোকসূত্র ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে।

এই পরীক্ষাগুলি থেকে একটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায় যে, কর্ণ বরাবর এসে পড়া আলোর সাহায্যেই সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া সম্ভব। বস্তুর [বা ব্যক্তির] ঘনত্ব সবচেয়ে ভালোভাবে ফুটে ওঠে, যখন আলো তার উপরে ৪৫° **কোণ** সৃষ্টি করে কর্ণ বরাবর এসে পড়ে। বলাবাহুল্য, আলোকসূত্রের অবস্থান অবশ্যই দর্শকদের দিকে হওয়া চাই।

আলোকসূত্র স্থাপনের জন্য স্থান নিরূপণের সহজতম উপায়, রঙ্গপীঠের নির্দিষ্ট অংশে একটি ঘনতল কল্পনা করে নেওয়া। ঐ ঘনতলের কর্ণদ্বয় যদি প্রেক্ষাগৃহের দিকে বর্দ্ধিত করা যায় [চিত্র ৩৫.১], তবে ঐ কল্পিত রেখাদ্বয় ছাদের নীচের দিক, দেয়াল অথবা ঝুলবারান্দার যেখানে বাধা পাবে, সেই সেই স্থানই হবে, ঐ অংশের জন্য আলোকসূত্র স্থাপনার উপযুক্ত স্থান। দেখা গেছে নিম্নরঙ্গের প্রয়োজনে ব্যবহৃত রঙ্গপ্রদীপগুলির জন্য উপযুক্ত যায়গা পাওয়া যায় ছাদের নীচের দিকে, প্রেক্ষাগৃহের পার্শ্ববর্তী
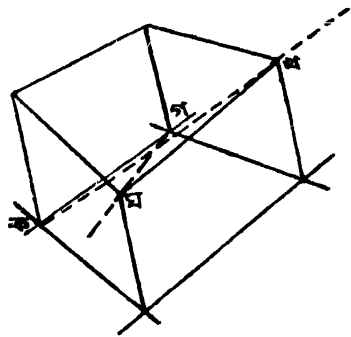
[চিত্র ৩৫.১] রঙ্গপ্রদীপের স্থান-নিরূপণের জন্য ঘনতলের পরিকল্পনা

দেয়ালের উপরি অংশে অথবা ঝুলবারান্দার সম্মুখভাগে। উর্দ্ধরঙ্গের রঙ্গপ্রদীপের জন্য স্থান পাওয়া যায় মঞ্চমুখের পিছনদিকের উপরিঅংশে।

ছায়ার পরিমাপ দেখে আলোকসূত্র সংস্থাপনের একটি অপেক্ষাকৃত সহজ উপায় আছে। আলো যখন কোন'ও বস্তুর উপরে ৪৫° **কোণে** পতিত হয়, তখন সেই বস্তুর **ছায়ার দৈর্ঘ্য** সেই **বস্তুরই দৈর্ঘ্যের সমান** হয়ে থাকে [চিত্র ৩৫.২]। প্রদত্ত চিত্রে কখ নির্দিষ্ট বস্তু, খগ তার ছায়া। ∠কগখ ৪৫° হলে, ∠খকগ-ও ৪৫° হবে। অতএব সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ কখগ-এর কখ=খগ। এই উপপাদ্যটি স্মরণে রেখে মঞ্চের উপরে রচিত কোনো বস্তুর ছায়া মেপে, আলোকসূত্রের জন্য স্থান নির্বাচন করা খুবই সহজ।
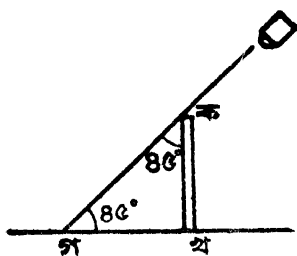
[চিত্র ৩৫.২] ৪৫° কোণ নির্দ্ধারণের ব্যাখ্যা

আলোকসূত্র স্থাপনার ব্যবস্থা যত বেশী স্থানে সম্ভব রাখা যেতে পারে, ততই কাজের পক্ষে সুবিধাজনক হবে। অভিনয় চলার সময়, আলোকসূত্রের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা থাকা আরও বাঞ্ছনীয়, কারণ প্রায়শঃই এগুলির বর্ণমাধ্যম অথবা রশ্মিব্যাপ্তি পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দেয়।

স্থান নিরূপিত হলেই, রঙ্গপীঠ থেকে রঙ্গপ্রদীপের দূরত্ব নির্দ্ধারিত হয়ে যায়। এরপর এগুলির জন্য প্রয়োজনীয় বাতী ঠিক করা কষ্টকর নয়।

যদিও রঙ্গপীঠের বিভিন্ন অংশের জন্য পৃথক পৃথক রঙ্গপ্রদীপ ব্যবহৃত হয়, তবু লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন দুটি পাশাপাশি থাকা অংশের জন্য নিয়োজিত আলোকরশ্মি পরস্পরের সীমারেখায় কিছু অংশ চেপে থাকে। নচেৎ দুই প্রদীপের দ্বারা প্রক্ষেপিত আলোকবৃত্তের সীমা বরাবর অন্ধকারের একটি বিভাজন-রেখা সৃষ্ট হবে, যে অংশ অতিক্রমনকালে, অভিনেতার মুখাবয়ব দৃষ্টিগোচর হবে না। এই শ্রেণীর অন্ধকার অংশকে **অন্ধ-যতি বা 'ডেড্ পকেট'** বলে। আরও একটি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে অভিনেতার ছায়া সম্পর্কে। অভিনেতার চলমান ছায়া পশ্চাৎপটের উপরে পড়ে যেন বিসদৃশ না দেখায়, সেজন্য রঙ্গপ্রদীপের আলোক বিচ্ছুরণ রঙ্গপীঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। অবশ্য যেসব ক্ষেত্রে অভিনেতাকে

পশ্চাৎপটের যথেষ্ট নিকটবর্তী হতে হয়, সেসব ক্ষেত্রের কথা পৃথকভাবে বিবেচ্য।

স্পটবাতীর আলো সাধারণতঃ বর্তুলভাবে বা ডিম্বাকৃতি নিয়ে পড়ে। কিন্তু রঙ্গপীঠের সাধারণ গঠন গোলাকার নয়, অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতিও নয়, এমনকি বাঁকাও নয় যে তার উপরে গোলাকৃতি আলোকরশ্মির যথার্থতা ফুটে উঠতে পারে। সেজন্য রঙ্গপ্রদীপগুলির মুখে ধাপবিশিষ্ট আতসকাচ অথবা পরিশোষক লাগানো দরকার—যার মাধ্যমে বিচ্ছুরিত রশ্মির সীমারেখা ক্রমশঃ অস্পষ্ট হয়ে যাবে, এবং আকৃতিগত বৈশিষ্ট বোঝা যাবে না। কিন্তু পরিশোষক ব্যবহারের ফলে আলোকের ঔজ্জ্বল্য যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পায়। তাই পরিশোষক নির্বাচনে সতর্কতা প্রয়োজন। পরিশোষক ব্যবহার না করে রঙিন মাধ্যমের প্রান্তভাগ ঈষৎ ক্ষয় করে, অথবা একটি ঘসা জিলেটিনের মধ্যবর্তী অংশ তৈলাক্ত করে নেওয়ার দ্বারাও কাছাকাছি ফল পাওয়া যায়। সাধারণ আতসকাচের প্রান্তভাগ সাবধানতার সঙ্গে ঘসে নিলেও একই ফল পাওয়া যাবে।

আলো যতটুকু স্থানে দরকার, তারই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার বিষয়ে বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। আলোকসূত্র-বিচ্ছুরিত রশ্মির স্বাভাবিক আকৃতিকে তাই অনেকক্ষেত্রেই নষ্ট করার দরকার পড়ে। এরজন্য নানা আকার ও গঠনের চুঙ্গি, কপাট [চিত্র ৪২.২] জালতি, ঢাকনা বা সার্সি ব্যবহার করা হয়। এগুলিকে সাধারণভাবে **রোধক** বা 'কাটঅফ' বলে।

আলোক-সম্পাত নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা

আলোকসম্পাত নিয়ন্ত্রণ বললে বুঝতে হবে, আলোকের প্রখরতা, বর্ণবিন্যাস ও পরিবেশনের নিয়ন্ত্রণ। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার চাবিকাঠি হচ্ছে **সুইচবোর্ড**, যার গঠন, চরিত্র এবং শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

অভিনয়ের মহলার মতো, আলোকসম্পাতেরও মহলা চালানো বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। এই মহলার মাধ্যমে আলোকসম্পাতকারী শুধু যে বিভিন্ন দৃশ্যের প্রয়োজনীয় অংশগুলি বুঝতে পারেন, তাই নয়—বিভিন্ন আলোকসূত্রকে প্রয়োজনমতো একই সুইচ বা ডিমারে **গ্রুপ** করে নেওয়ারও সুযোগ পান।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দৃশ্য চলার কালে, রঙ্গপ্রদীপের স্থান পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় না। সূত্রপ্রদীপ অথবা পশ্চাৎপট আলোকিত

করার উদ্দেশে নিয়োজিত **পটপ্রদীপ**-গুলিই দৃশ্য চলার সময় স্থানান্তরিত হতে পারে। নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা সুচারুরূপে চালানোর জন্য তাই দুটি পৃথক নির্দেশিকা তৈরী করলে কাজের সুবিধা হয়। যে নির্দেশিকায় রঙ্গপ্রদীপের অবস্থান, জ্বালানো বা নেভানোর সংকেত, প্রখরতার পরিমাণ তথা ডিমারের অবস্থান এবং বর্ণবিন্যাসের বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা হয়, তাকে বলে **সম্পাত-সঙ্কেত** বা 'সেট-আপ শীট'। অন্য নির্দেশিকাটিতে লিপিবদ্ধ করা হয় সূত্রপ্রদীপ এবং পটপ্রদীপগুলির পরিবর্তনসূচী। একে বলা হয় **বিন্যাস-সঙ্কেত** বা 'কিউ-শীট'। অবশ্য একই লোকের হাতে যখন উভয়বিধ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার ভার ন্যস্ত থাকে, তখন দুটি নির্দেশিকার চেয়ে একটি সামগ্রিক নির্দেশিকার ব্যবহার অনেক বেশী সুবিধাজনক। এই জাতীয় নির্দেশিকাকে সাধারণভাবে **দীপচিত্রণ সংকেত** বলা যেতে পারে।

প্রয়োজনবোধে, দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে যাওয়ার অবকাশে, রঙ্গমঞ্চে দাঁড় করিয়ে রাখা আলোকসূত্রগুলিরই স্থান পরিবর্তন করা সম্ভবপর। ঝোলানো বা আটকানো আলোকসূত্রগুলি উপর নীচু করা চলে, বা তাদের রশ্মি-বিস্তারের তারতম্য ঘটানো যায় মাত্র। ঝরি বা পাদপ্রদীপে যেখানে একাধিক রঙের জন্য পৃথক পৃথক তড়িৎচক্রের ব্যবস্থা থাকে, সেখানে ডিমারের সাহায্যে এক রঙ থেকে অন্য রঙে পরিবেশ বদলে নেওয়া সম্ভব। কিন্তু, একক স্পটবাতীর কেবল প্রখরতা ও বিস্তারের পরিবর্তনই করা চলে—সুষ্ঠু বর্ণ পরিবর্তন সম্ভবপর নয়। স্পট-বাতীর মুখ থেকে একটি বর্ণ মাধ্যম সরিয়ে অপরটি লাগানো যায় বটে, কিন্তু এই পরিবর্তনের আকস্মিকতা দৃষ্টিকটু হবে
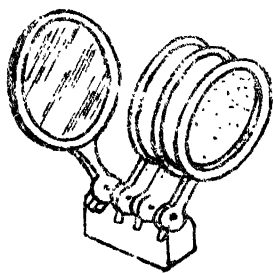
[চিত্র ৩৬] দূর-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় রঙ্গীনমাধ্যম পরিবর্তনের যন্ত্র

আধুনিক যন্ত্রপাতির উৎকর্ষতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে **দূর নিয়ন্ত্রণ** বা 'রিমোট কণ্ট্রোল' ব্যবস্থার সাহায্যে, নাগালের বাইরে থাকা স্পটবাতীর ব্যাপ্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণ বিন্যাসেরও পরিবর্তন ঘটানো যাচ্ছে। কিন্তু যান্ত্রিক জটিলতাও [চিত্র ৩৬] বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সঙ্গে। আমাদের ব্যবহারিক প্রয়োজনে আপাততঃ শুধু মেনে নেওয়া যাক যে, দৃশ্য চলার কালে রঙ্গপ্রদীপের দিক ও ব্যাপ্তিরই পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব—সুষ্ঠু বর্ণ পরিবর্তন সম্ভবপর নয়।

ছয় পশ্চাৎপট-দীপন

পশ্চাৎপট ও পটপ্রদীপ

মঞ্চের উপর, রঙ্গপীঠের অব্যবহিত পরবর্তী দৃষ্টি অন্তর্ভুক্ত অংশকে **পশ্চাৎপট** বা 'ব্যাক গ্রাউণ্ড' বলা হয়। এই পশ্চাৎপটের উপরে পতিত আলো অনেকাংশে রঙ্গপীঠের আলোকসম্পাতকে প্রভাবিত করে, তাই এ সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা প্রয়োজন। পশ্চাৎপট আলোকিত করার জন্য যে আলোকসূত্রগুলি ব্যবহৃত হয়, সেগুলি এক কথায় **পটপ্রদীপ** বা 'মুড লাইট' নামে পরিচিত।

উজ্জ্বলতা একটি আপেক্ষিক গুণ। কোনও পদার্থকে উজ্জ্বল বা অনুজ্জ্বল বলা হয়, তার পারিপার্শ্বিক আলোকিত অংশের উজ্জ্বলতার সঙ্গে তুলনা করে। অন্ধকার ঘরে একটি মাত্র মোমবাতীর আলোতেই যথেষ্ট উজ্জ্বলতা পাওয়া যায়; কিন্তু যেখানে পশ্চাৎপট ১০০ ফুট ক্যাণ্ডেল আলোয় উজ্জ্বল, সেখানে ১০ ফুট ক্যাণ্ডেলের বাতীও অনুজ্জ্বল মনে হবে। এই কারণেই, অভিনেতৃবর্গ তথা রঙ্গপীঠের প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিকে সম্যকরূপে দৃষ্টিগোচর করাতে হলে, পশ্চাৎপটের চেয়ে বেশী উজ্জ্বল করে তোলা দরকার। অর্থাৎ, তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপটের উপরে আলোকসম্পাতের প্রখরতা হওয়া উচিত, রঙ্গপীঠের প্রখরতার চেয়ে কম।

মঞ্চের পাটাতন থেকে অভিনেতার মুখমণ্ডলের উচ্চতা সাধারণতঃ সাড়ে পাঁচ ফুট থেকে ছয় ফুটের মধ্যে থাকে। পশ্চাৎপটের উচ্চতা বারো থেকে ষোলো ফুট, কিম্বা আরো বেশী হতে পারে। পশ্চাৎপটের উপর আলোকসম্পাত এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, যেন তার রশ্মির ঔজ্জ্বল্য উপরের দিকে ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে—অর্থাৎ, রঙ্গপীঠ সংলগ্ন অংশেই দর্শকের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখতে হবে।

পশ্চাৎপটের মধ্যে লাগানো জানালা, দরজা, খিলান প্রভৃতির পিছনে রাখা **আড়াল** বা 'ব্যাকিং'গুলিও পশ্চাৎপটেরই অংশবিশেষ। এগুলিও

যথোপযুক্তভাবে আলোকিত হওয়া দরকার, যেন সমগ্রভাবে এগুলি স্থান ও কাল বোঝানোর কাজে সাহায্য করে।

আগের যুগে এঁকে দেখানো ঘনত্ব-যুক্ত ঝোলানো পশ্চাৎপটগুলিকে সাধারণ ঝরি দিয়েই আলোকিত করা হতো। দীর্ঘকাল ধরে সেই প্রথাই চলে এসেছে পশ্চাৎপটে আলোকসম্পাতের ধারা হিসাবে। আধুনিক বাস্তবানুগ মঞ্চসজ্জায়, অথবা বলয়পটের ব্যবহারে, আলোকসম্পাতের প্রণালী গেছে বদলে। চিত্রিত-ছায়াযুক্ত দৃশ্যপটের দিন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, পশ্চাৎপট আলোকিত করার বিষয়টিও, মঞ্চে সার্থক চিত্রসৃষ্টির কাজে অন্যতম প্রধান অঙ্গ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

বলয়পট

দুই শ্রেণীর আধুনিক বলয়পট আজ সুপরিচিত। প্রথম শ্রেণীতে পড়ে ঋজু এবং মসৃণভাবে ঝোলানো পর্দায় তৈরী বলয়পট। এটির মোটামুটি চেহারা আগের যুগের ঝোলানো দৃশ্যপটেরই মতো—পার্থক্যের মধ্যে, এটি আগাগোড়া একবর্ণে রঞ্জিত। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ে নিরেট অর্দ্ধ-গোলার্দ্ধাকার বলয়পট, যার উপরিভাগ ফণার মতো সামনে এগিয়ে এলে **গম্বুজ** নামে [চিত্র ৫.৩] অভিহিত হয়।

পর্দায় তৈরী **বলয়পট** একটি ঝোলানো বিরাট পর্দা-বিশেষ। কোথাও ভালোভাবে বর্ণ প্রতিফলনের উদ্দেশ্যে এগুলি দামী কাপড়ে তৈরী করা হয়। আবার অনেকক্ষেত্রে, প্রতিফলন রোধের জন্য কালো ভেলভেটজাতীয় কাপড় ব্যবহৃত হয় এর উপাদান হিসাবে। এই শ্রেণীর বলয়পটগুলি রঙ্গপীঠের আলোকসীমা থেকে বেশ কিছুদূরে সরিয়ে, অর্দ্ধবৃত্তাকারে [চিত্র ৫.২] মসৃণভাবে ঝোলানো হয়।

আমেরিকায় বলয়পটগুলি সাধারণতঃ ধূসর-নীল বর্ণে রঞ্জিত করা হয়। জার্মাণীতে মঞ্চের আয়তন আমেরিকার মঞ্চের চেয়েও বড়। সেখানে একাধিক মঞ্চে দুটি বলয়পট টাঙানোর ব্যবস্থা করা আছে। প্রয়োজনবোধে এ'দুটি মঞ্চের উভয়দিকে দুইটি সমবর্তুল আধারে জড়িয়ে নেওয়া যায়। এই দুইটি বলয়পট সাদা ও ঘননীল রঙে রঙ করা থাকে, এবং যথাক্রমে দিন ও রাত্রির পশ্চাৎপট হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে স্থায়ী রঙ্গমঞ্চে বলয়পটের ব্যবস্থা আজও প্রচলিত হয়নি। তবে, অপেশাদার বহু সৌখীন সংস্থাই আজ গতানুগতিক দৃশ্যপটের পরিবর্তে, ছায়াপ্রক্ষেপণের সাহায্যে দৃশ্যরচনার দিকে আগ্রহ দেখাচ্ছেন।

ছায়া ধারণের জন্য ব্যবহৃত সাদা পর্দাটি যে বলয়পটেরই অপভ্রংশ, একথা বলা বাহুল্য।

গম্বুজের ভূমিচিত্র প্রায় পর্দায় তৈরী বলয়পটেরই অনুরূপ। সাধারণতঃ মঞ্চের উপরিভাগে যেখানে স্থানাভাব, সেখানেই এই শ্রেণীর গম্বুজের ফণার আড়াল কাজে লাগানো হয়। গম্বুজের স্বাভাবিক বর্ণ রাখা হয় সাদা অথবা নীলাভ-ধূসর।

আধুনিক মঞ্চে, সীমাহীন আকাশের মহাশূণ্যতাকে তার বর্ণবৈচিত্র্যসহ উপস্থাপিত করাই বলয়পটের প্রধান কাজ। বলয়পটের পর্দা বা গম্বুজের উপরিভাগে যেন কোনও দাগ বা কোঁচকানো ভাব, অথবা অসমতল অংশ না থাকে, সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। যদি কোথাও কোনো অসমতল অংশ বা কোঁচকানো ভাব থেকে যায়, আলোকসম্পাতের কৌশলে তা ঢেকে দেওয়া উচিত।

গম্বুজ বা বলয়পট উভয়ক্ষেত্রেই আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা তথা পটপ্রদীপগুলিকে রাখতে হবে উপরে বা নীচে খুব কাছে, অথবা বেশ কিছু দূরে—রঙ্গপীঠের উপরবর্তী কোনও স্থানে। ভূমিস্থ পটপ্রদীপ হিসাবে, অপেক্ষাকৃত উচ্চশক্তিবিশিষ্ট প্রদীপভাণ্ডারের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ বিশেষভাবে কার্য্যকরী। মৌলিক রংগুলির সাহায্যে এই ব্যবস্থায় সূর্য্যাস্তের প্রায় সমস্ত বর্ণ-বৈচিত্র্যই ফোটানো যাবে।

বলয়পটের উপরিভাগের জন্য অনুরূপভাবে প্রতিফলকযুক্ত প্রদীপভাণ্ডার রাখার ব্যবস্থা করা হয়, যার আলো সমুদয় বলয়পটকে উদ্ভাসিত করতে পারে। এই ব্যবস্থার একটি প্রধান অসুবিধা এই যে, যদি বলয়পটে কোথাও কোনও অসমতল যায়গা থাকে, তবে সেটি বেশীভাবে চোখে পড়বে। বলয়পট থেকে বেশ কিছু দূরে একাধিক ফ্ল্যাডবাতীর সারি বা প্রদীপভাণ্ডারের কয়েকটি বিচ্ছিন্ন অংশ স্থাপনা করা, অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক ব্যবস্থা। এগুলি নিম্নরঙ্গপীঠের উপরে, দর্শকের দৃষ্টিবহির্ভূত অঞ্চল থেকে সরাসরি বলয়পটের উপরে আলোকসম্পাত করে।

বলয়পট আলোকিত করার জন্য পটপ্রদীপমালায় ব্যবহৃত বাতীর পরিমাণ বলয়পটের আয়তনের উপরে নির্ভর করে। রঙিন কাপড়ে তৈরী বলয়পটের চেয়ে অস্বচ্ছ বলয়পটের জন্য কম শক্তিসম্পন্ন বাতী দরকার। সাদা রঙের বলয়পটের জন্যও অনুরূপভাবে ধুসর-নীল বর্ণের বলয়পটের চেয়ে কম শক্তিসম্পন্ন বাতীর প্রয়োজন হয়।

সাধারণ মেঘমুক্ত আকাশের চারিত্রিক বৈশিষ্ট হচ্ছে, নীল রঙের সুসম পরিব্যাপ্তি, এবং দিগ্বলয় সীমায় ঈষৎ রঙের আভাষ। উজ্জ্বল দুপুরের আকাশের ক্ষেত্রে কিন্তু শুধু নীল রঙের উপরে নির্ভর করলে চলবেনা ; বরং মাঝারী ষ্টীল-নীলের সঙ্গে অন্য দুটি মৌলিক রঙের মাঝারী-অবস্থা মিশিয়ে দেওয়া দরকার। রাত্রির কথা বলাই বাহুল্য— সেখানেও নীলের প্রয়োজন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বলয়পট আলোকিত করার বিষয়ে নীল রঙের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। কিন্তু নীল রঙের মাধ্যমে আলোকের অতিক্রমণ হয় সবচেয়ে কম পরিমাণে। সেইজন্য নীল রঙের জন্য নির্দ্ধারিত তড়িৎচক্রে বাতীগুলির ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী রাখা দরকার।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বলয়পটের প্রতি বর্গফুটের জন্য নীল রঙের তড়িৎচক্রে ২ ওয়াট, লাল রঙের তড়িৎচক্রে ১½ ওয়াট এবং সবুজ রঙের তড়িৎচক্রে ১ ওয়াট শক্তিসম্পন্ন বাতী রাখলে সুফল পাওয়া যায়। এখন, বলয়পটের ক্ষেত্রফল দিয়ে প্রদত্ত সংখ্যাগুলিকে গুণ করে, বাতীর শক্তিনির্দেশক সংখ্যা দ্বারা ভাগ করলেই, প্রত্যেক তড়িৎচক্রের জন্য প্রয়োজনীয় বাতীর সংখ্যা পাওয়া যাবে। যেমন :—

প্রশ্ন :—একটি ৪০ ফুট প্রস্থ ও ১৬ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট বলয়পটের উপরের প্রদীপভাণ্ডারের জন্য বিভিন্ন রঙের তড়িৎচক্রে ৪০ ওয়াটের কয়টি হিসাবে বাতী দরকার ?

উত্তর :—বলয়পটের ক্ষেত্রফল ৪০′ × ১৬′ = ৬৪০ বর্গফুট

∴ নীল রঙের তড়িৎচক্রে লাগবে $\frac{৬৪০ \times ২}{৪০}$ = ৩২টি বাতী,

লাল রঙের তড়িৎচক্রে লাগবে $\frac{৬৪০ \times ৩}{৪০ \times ২}$ = ২৪টি বাতী,

এবং সবুজ রঙের তড়িৎচক্রে লাগবে $\frac{৬৪০ \times ১}{৪০}$ = ১৬টি বাতী।

বলয়পটের নিকটবর্তী পটপ্রদীপগুলিকে আলোক পরিবেশনের ব্যাপারে এমনভাবে সুসংহত করা দরকার, যেন সেগুলির আলো বলয়পটের উপরে এবং নীচে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। গম্বুজের ক্ষেত্রে উপরের ঝরিতে, প্রদত্ত হিসাবের অর্দ্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ উজ্জ্বলতা হলেই কাজ চলে। কারণ, গম্বুজের উপরিভাগের বাঁকা অংশ আলোকযন্ত্রের দিকে এগিয়ে আসার ফলে

এবং বিশেষভাবে তার বক্রতার জন্য আলোকের গ্রহণ ও প্রতিফলন বলয়-পটের চেয়ে অধিক পরিমাণে সাধিত হয়।

বলয়পট বা গম্বুজের নিম্নদেশে ব্যবহৃত প্রদীপভাণ্ডারকে **বলয়প্রদীপ-মালা** বা 'হরাইজন ষ্ট্রীপ' তথা 'সাইক ফুট' বলে। সাধারণ পশ্চাৎপটের তুলনায় এর অবস্থান কেন্দ্রের নিকটবর্তী, এবং বিশেষ করে বলয়পট বা গম্বুজের নিম্নরঙ্গ প্রান্তদ্বয় আলোকিত করার প্রয়োজন হয় না বলেই, বলয়প্রদীপমালার দৈর্ঘ্য বলয়পটের দৈর্ঘ্যের শতকরা ৬০ ভাগের বেশী করার প্রয়োজন হয় না।

গম্বুজ ব্যবস্থায় বলয়প্রদীপমালার উপরে অনেকবেশী নির্ভর করতে হয়, তাই এক্ষেত্রে আরও ৫০% বেশী শক্তিসম্পন্ন বাতী লাগানো দরকার। তবে গম্বুজের বর্ণ যদি সাদা হয়, তবে বলয়প্রদীপমালা ও ঝরির আলোর পরিমাণ অর্দ্ধেক কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে। বলা বাহুল্য, রঙ্গপীঠে সামান্য উজ্বলতা থাকলেই, সাদা বলয়পট বা গম্বুজে রাত্রির দৃশ্য ফোটানো কষ্টকর হয়ে ওঠে।

লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন বলয়প্রদীপমালা ও ঝরির আলো বলয়পট বা গম্বুজের গায় অনির্দিষ্ট রেখায় ধীরে মিশ্রিত হয়। বলয়পটের নিম্নরঙ্গ অঞ্চলে আলোকের তীব্রতা ক্রমশঃ কমে আসা উচিত। যখন সাধারণ ফ্ল্যাডবাতীর সাহায্যে বলয়পটের মতো প্রশস্ত ক্ষেত্র আলোকিত করার সময় বাতীটিকে বলয়পটের যথেষ্ট নিকটে রাখা হয়, তখন আলোকিত ক্ষেত্রের সামান্য দূরেই ঔজ্বল্যের হঠাৎ পতন ঘটে। এই অসম পার্থক্য দূর করার প্রকৃষ্ট উপায়, আলোকসূত্রটিকে আলোকিত ক্ষেত্রের সমুদয় অংশ থেকে সমদূরবর্তী স্থানে স্থাপনা করা; অথবা এমন প্রতিফলক ব্যবহার করা উচিত, যার দ্বারা নিকটবর্তী ও দূরবর্তী সমুদয় অংশেই সমান ঔজ্বল্যের সঙ্গে আলোক পরিবেশিত হয়। স্থূলকোণী দীর্ঘমুখী প্রতিফলকের সাহায্যে, বলয়পটের যথেষ্ট নিকটবর্তী অবস্থান থেকেও, বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মিকে দুই দিকে প্রসারিত করা যায়; এবং এর ফলে সমবর্ণের আলোকের মিশ্রণও ভালো হয়।

রঙ্গপীঠে অভিনয়ের জন্য যথেষ্ট স্থান ছেড়ে দেওয়ার ফলে, বলয়প্রদীপ-মালার অবস্থান বলয়পটের খুবই নিকটে হতে বাধ্য হয়, তবে এরই মধ্যে যতটা বেশী ব্যবধান রাখা সম্ভব, রাখা উচিত। বলয়প্রদীপের আলোকরশ্মি বলয়পটের তলের সঙ্গে সমান্তরাল অবস্থান ছেড়ে, যত বেশী কোণ সৃষ্টি

করবে, বলয়পটের উপরে কোঁচকানো অবস্থা বা সেলাইয়ের দাগ-জনিত ত্রুটি-বিচ্যুতি ঢেকে রাখা ততই সহজ হবে। মাঝারি বিস্তারযুক্ত ফ্লাডবাতী বা বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ঝরি, মঞ্চের ঠিক মাঝখানে উপর থেকে বলয়পটের জন্য ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে আলোকসূত্রগুলিকে ঢেকে রাখার জন্য উপযুক্ত ঝালরের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পাটাতন থেকে ঝালরের নিম্নাংশের উচ্চতা, দর্শকদের সম্মুখ সারি ও বলয়পটের শীর্ষদেশ যোগকারী দৃষ্টিরেখার উপরে নির্ভর করে।

বলয়প্রদীপমালার সংস্থাপনা একটি সমস্যাজনক ব্যাপার। যদি মঞ্চে এগুলির জন্য বিশেষ ফোকর থাকে, তবে আর অতিরিক্ত আড়াল দেওয়ার দরকার হয় না। আলোকরশ্মির ব্যাপ্তি ব্যাহত না হওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে, ফোকরগুলিকে যথেষ্ট প্রশস্ত করতে হবে। যখন এই বলয়প্রদীপ-মালা রঙ্গমঞ্চের উপরেই স্থাপিত হয়, তখন এগুলিকে দর্শকের দৃষ্টিপথ থেকে গোপন করার জন্য, বিশেষ ধরণের ক্ষুদ্রাকৃতি দৃশ্যপটের আড়ালে রাখা হয়। এই জাতীয় দৃশ্যপটকে **ভূমিপট** বা 'গ্রাউণ্ড রো' [চিত্র ৪.৪] বলে।

চলমান মেঘ বা বহমান নদীর চিত্র প্রক্ষেপণকারী **কারসাজি কল**গুলি বলয়পট আলোকিত করার কাজে আজ এতবেশী সুপ্রচলিত যে, অনায়াসে এই যন্ত্রগুলিকে পটপ্রদীপের শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়া চলে। চলচ্চিত্র ছাড়া নানা রকমের স্থিরচিত্র প্রক্ষেপণের সাহায্যে দৃশ্য রচনার কাজে বলয়পটের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেখা গেছে, বলয়পটের উপরে প্রক্ষেপণের ফলে, দৃশ্যের গভীরতাবোধ বেড়ে যায়। মূল রঙ্গমঞ্চের অন্যান্য সজ্জার সঙ্গে প্রক্ষেপিত দৃশ্যের সংযোগ বজায় রাখতে হলে, যথেষ্ট সাবধানতার প্রয়োজন আছে।

ভূমিপট

বলয়পটে পরিস্ফুট দিগ্বলয় এবং রঙ্গপীঠে বর্ণিত স্থানের মধ্যবর্তী ব্যবধানের পরিমাণ নির্দেশ করার জন্য **ভূমিপট** বা 'গ্রাউণ্ড রো' ব্যবহৃত হয় [চিত্র ৪.৪]। এগুলির উপরে পাহাড় বা পর্বতমালা, ঝোপজঙ্গল বা মাটির পাড়ের ছবি আঁকা থাকে। এগুলির আরও একটি বিশেষ প্রয়োজন, বলয়প্রদীপমালাকে আড়াল করে রাখা। অনেকসময় যথেষ্ট গভীরতা ফুটিয়ে তোলার জন্য দুই বা তিনসারি ভূমিপটও ব্যবহৃত হয়। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন বলয়পট ও ভূমিপটের মাঝে প্রয়োজনীয় আলোক সরঞ্জাম স্থাপনা করার যথেষ্ট স্থান থাকে।

উপযুক্ত আলোকসম্পাত ব্যতীত, শুধু চিত্রাঙ্কণের উপরে নির্ভর করে ভূমিপটের পরিকল্পিত রূপ ফোটানো অসম্ভব। অনেকসময় ভূমিপটের সামনে পাতলা গজ কাপড় টাঙিয়ে দূরতা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়। সবচেয়ে ভালো ফল পাওয়া যাবে, যদি ভূমিপটে চিত্রাঙ্কণের সঙ্গে সঙ্গে সত্যকার উঁচু-নীচু ভাবটিও তৈরী করা হয় বিশেষ তল নির্মাণের প্রথায়।

বলয়পটের জন্য ব্যবহৃত উপরের ঝরি যখন যথেষ্ট সামনে থাকে, তখন ভূমিপটও একই সূত্র থেকে কিছুটা আলোকিত হতে পারে। কিন্তু যখন বলয়পট কেবল বলয়প্রদীপমালার উপরে নির্ভর করে, ভূমিপটগুলি তখন কৃষ্ণ-চিত্র বা 'সিল্যুয়ে'তে পরিণত হয়।

একাধিক ভূমিপট ব্যবহারের সময়, প্রত্যেক সারির সামনে অনতিদূরে একটি নীলরঙের প্রদীপভাণ্ডার রাখলে, ভূমিপটগুলির মধ্যে দূরতা ফুটিয়ে তোলা সহজ হয়। সাধারণ 80 ওয়াটের রঙিন বাতীই এ কাজের পক্ষে যথেষ্ট। সূর্য্যাস্ত বা সূর্য্যোদয়ের দৃশ্যাবলীতে ভূমিপটের পাহাড় পর্বত বা গাছপালার চূড়ায় বিশেষ রঙের খেলা দেখানোর জন্য, ছোট ছোট স্পটবাতী সাবধানতার সঙ্গে ব্যবহার করা যেতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে ভূমিপটের কোনও অংশের ছায়া অসাবধানতা-বশতঃ বলয়পটের উপরে পড়ে যেন বিভ্রাট না বাধায়।

আড়াল

মঞ্চভূমিতে রাখা প্রায় যে কোনও রকমের ঢাকার জন্য ব্যবহৃত ব্যবস্থাকেই আড়াল বা 'ব্যাকিং' বলা হয়। সাধারণতঃ দরজা, জানালা বা অনুরূপ খোলা পথে মঞ্চের পিছন দিকের অনাবশ্যক অঞ্চল যেন দৃষ্টিরেখায় না আসে, সেজন্য এই আড়াল-এর ব্যবস্থা। এগুলিকেও বিশেষভাবে আলোকিত করা উচিত, নচেৎ অভিনেতার প্রবেশ বা প্রস্থানগুলি অন্ধকারে হারিয়ে যাবে।

বস্তুতঃ সম্পূর্ণ ভিন্ন গোষ্ঠীর আলোকসূত্র কাজে লাগানো হয় এই আড়ালগুলির জন্য, এবং এগুলি সূত্রপ্রদীপ শ্রেণীতে পড়ে। সারবন্দী কয়েকটি বাতী এই ব্যাপারে প্রবেশপথের উপরে বা পাশে এমনভাবে লাগানো দরকার, যেন আড়ালটির উপরে আলোকের সুষম পরিবেশন ঘটে, এবং অভিনেতার চলাফেরায় তার ছায়া না পড়ে।

আড়ালের জন্য ব্যবহৃত সূত্রপ্রদীপ প্রবেশ পথের উপরে টাঙানোর ব্যবস্থা করতে হলে, সেটিকে দৃশ্যপটের পিছনে, দরজার অন্যূন তিনফুট

উপরে লাগানো উচিত। যদি দরজার পাশে লাগাতে হয়, তবে তা লাগানো উচিত দরজার নিম্নরঙ্গভাগের পিছনে প্রায় তিনফুট দূরে। সারবন্দী আলোকমালা খাড়াভাবে ব্যবহৃত হলে, নীচের বাতীটি যেন মঞ্চভূমি থেকে চার-পাঁচ ফুট উপরে রাখা হয়, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। আলোকসূত্রগুলি যেন কোনও ক্রমেই দর্শকের দৃষ্টিপথে না পড়ে। জানালার ক্ষেত্রে অবশ্য সমস্যা কিছুটা কম, কারণ জানালা দিয়ে প্রবেশ-নির্গমনের ব্যস্ততা থাকে না।

আরও দুটি বিষয়ে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। দৃশ্যপট আটকানোর ধারকগুলি অনেক সময় এই ধরণের আলোকসম্পাতে অবাঞ্ছিত ছায়ার সৃষ্টি করে। আলোর ব্যবস্থা হওয়ার পরে, প্রয়োজনমতো ধারক-গুলি সরিয়ে উপযুক্ত স্থানে লাগানো উচিত। দ্বিতীয়তঃ, দৃশ্যপটের কাপড় ভেদ করে পিছনে লাগানো সূত্রপ্রদীপের অস্তিত্ব নজরে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে দৃশ্যপটের পিছনে পুরু চট বা কাগজ দিয়ে এই ত্রুটি শোধরানো বিশেষ প্রয়োজনীয়।

পশ্চাৎপটে প্রক্ষেপিত চিত্র বা ছায়া

চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণের জন্য ব্যবহৃত পর্দার কায়দায় একটি সমতলভাবে টাঙানো সাদা পর্দাকে চিত্র বা ছায়া প্রক্ষেপণের জন্য সমগ্র দৃশ্যের একটি সাধারণ পশ্চাৎপট হিসাবে ব্যবহার করার বিষয়টি আজকাল ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এ ধরণের চিত্র বা ছায়া পর্দার পিছন দিক থেকে ফেলা হয়। সামনের দিক থেকে ফেলতে হলে, পর্দাটির উপর বা দুই পাশ থেকে তীর্যকভাবে প্রক্ষেপণ করা ছাড়া উপায় থাকে না; নচেৎ প্রক্ষেপিত আলো অভিনেতার শরীরে পড়ার আশঙ্কা থাকে।*

এই জাতীয় প্রক্ষেপণের যন্ত্রপাতি এবং কায়দা ইত্যাদি দীপাচিত্রণ-বিজ্ঞানে **কল্লাসাজি**-র অন্তর্ভুক্ত। পৃথক পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

* বিশেষ কারসাজির প্রয়োজনে অভিনেতৃবর্গের উপরেও চিত্র প্রক্ষেপিত হতে পারে। সেক্ষেত্রে পশ্চাৎপটটি কালো রাখা উচিত—যেন অভিনেতা অভিনেত্রী কারও ছায়া বোঝা না যায়।

সাত আলোকের বর্ণবিন্যাস
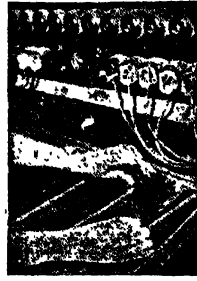
বর্ণের মৃণ্ময়ী পর্য্যায়

বর্ণ বলতে আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা "আলোকের বর্ণ" ধরে নিব। আলোকের ক্ষেত্রে সাদা রঙের অর্থ, একই সঙ্গে সব কয়টি রঙের অনুভূতি। সুতরাং রঙিন আলো বললেই, সাদা আলোর চেয়ে কিছু কম বোঝাবে।

যে প্রাকৃতিক কারণে বর্ণের অনুভূতি জাগে, সেই কারণ সম্পর্কিত দিক নিয়ে আলোচনাকে বর্ণের **মৃণ্ময়ী পর্য্যায়** বলা হয়। বর্ণের অনুভূতি এবং বর্ণঘটিত মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়াকে বলে বর্ণের **তন্ময়ী পর্য্যায়**। অবশ্য, এই দুই পৃথক পর্য্যায়ের মাঝে সুনির্দিষ্ট সীমারেখা টানা সহজ নয়।

বর্ণের মৃণ্ময়ী পর্য্যায়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে, প্রথমে দেখা যাক বর্ণের উৎপত্তির কথা। যেহেতু সবকয়টি রঙের এককালীন অনুভূতিতে সাদা রঙের অনুভূতি জাগে, অতএব সাদা রঙের আলোকে বিশ্লেষণ করলেই বিভিন্ন
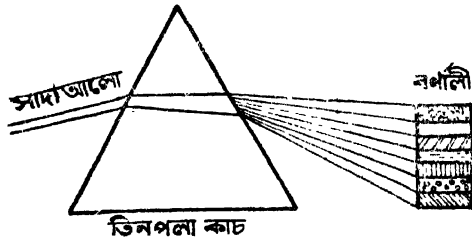
[চিত্র ৩৭] তিনপলা কাচের মাধ্যমে সাদা আলোর বিশ্লেষণ

রঙের আলো পাওয়া যাবে। এই বিশ্লেষণ ক্রিয়া ঘটে প্রতিসরণের দ্বারা। সাদা আলোকে যদি একটি ছিদ্রপথে চালিত করে, সেই ছিদ্র বিনির্গত আলোক ধারাকে একটি তিন-পলা কাচের ভিতর দিয়ে চালানো হয় [চিত্র ৩৭],

দেখা যাবে প্রতিসরণের ফলে সাদা আলোর বিশ্লেষণ ঘটেছে। এই বিশ্লেষিত আলোর মালায় সাতটি রঙ স্পষ্ট চেনা যায়: লাল, কমলা, হলুদ, সবুজ নীলাভ-সবুজ, নীল এবং বেগুণী। সাতটি রঙের এই বিশ্লেষিত অবস্থানকে **বর্ণালী** বলে। বস্তুতঃ এই বর্ণালী কয়েক শত বিভিন্ন রঙের সমষ্টি, যাদের আপাতঃদৃষ্টিতে সাতটি বিভাগে ফেলা যায়, এবং সেই সাতটি বিভাগকে আমরা পূর্ববর্ণিত সাতটি রঙের নামে অভিহিত করেছি।

আলোকের এই জাতীয় বিশ্লেষণ সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন **স্যার আইজ্যাক নিউটন**, ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। আকাশে রামধনুর সৃষ্টিও আলোকের প্রাকৃতিক আলোকবিশ্লেষণ মাত্র। কৃত্রিম ও প্রাকৃতিক উভয় বিশ্লেষণ ক্রিয়াতেই বর্ণগুলির ক্রম একই থাকে।

তবে, স্যার নিউটনের আবিস্কৃত বর্ণালীর সঙ্গে অধুনাপ্রচলিত প্রতিসরণ-ক্রিয়ায় প্রাপ্ত বর্ণালীর কিছুটা প্রভেদ দেখা যায়। নিউটনের লিপিবদ্ধ বর্ণালীর ক্রম ছিল বেগুণী, ঘননীল, নীল, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। বর্তমানে ঘননীল রঙটিকে বর্ণালী থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে; কারণ, পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বিশ্লেষিত বর্ণালীতে ঘননীলের প্রাধান্য তত বেশী নয়। বরং নীলের পরে আর একটি নূতন বর্ণ সংযোজিত হয়েছে: নীলাভ-সবুজ। এই রঙটির ব্যবহারিক উপযোগিতা ক্রমেই বেড়ে চলেছে, বিশেষ করে রঙ্গমঞ্চে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এর জন্য যুগ্মপদ ব্যবহার না করে, পৃথক কোনো নামকরণের ব্যবস্থা আজও হয়নি।

সাদা রঙের আলো প্রতিসরণের ফলে এভাবে বিশ্লেষিত হওয়ার কারণ, বিভিন্ন রঙের আলোকতরঙ্গের প্রতিসরিত হওয়ার ক্ষমতা সমান নয়। কাচের ভিতর দিয়ে যাওয়ার সময় বেগুণী রঙের আলো সবচেয়ে বেশী বেঁকে যায়। তারপরের রঙগুলির বক্রগতি ক্রমপর্য্যায়ে কমতে থাকে; লাল রঙের ক্ষেত্রে এই বক্রতা সবচেয়ে কম। এই কারণেই প্রতিসরণের ফলে সাদা রঙের আলো বিশ্লেষিত হয়ে যায়।

বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বর্ণালী সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। খালি চোখে বর্ণালীর যেটুকু নজরে পড়ে, তার বাইরে আরও দুটি রঙ অদৃশ্য থেকে যায়—লাল রঙের প্রান্তে 'অবলোহিত' বা 'লাল-উজানী' আলো, এবং বেগুণী রঙের সীমায় 'অতিবেগ্‌নী' রঙ। সাধারণ চোখে অদৃশ্য এই রঙ দুটি আলোকচিত্রে ধরা পড়ে। বিশেষতঃ অতিবেগ্‌নী রঙটিকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে দীর্ঘতর আলোক-তরঙ্গে পরিবর্তিত করা

যায়—প্রতিপ্রভার মূলে রয়েছে এই প্রক্রিয়া। রঙটি চোখের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর। তবে সুখের বিষয় এই যে, বিশেষ কারসাজি দেখানো ছাড়া এই মারাত্মক রঙের আলো মঞ্চে ব্যবহারের প্রয়োজন পড়ে না ; এবং সাধারণ কাচের ফলকেও এর গতিরুদ্ধ হয়ে যায়।

বর্ণ উৎপাদন মঞ্চের প্রয়োজনে যে প্রক্রিয়ায় বর্ণ উৎপাদন করা হয়, তাকে **পরিশোষণ** বলে। এরও আবার দুটি পৃথক উপায় আছে। একটিকে বলা হয় **নির্বাচিত নিষ্ক্রমণ**, এবং অন্য উপায়টিকে বলা হয় **নির্বাচিত প্রতিফলন**।

পূর্বেই বলা হয়েছে, সাদা আলো আপাতঃদৃষ্টিতে বর্ণহীন মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে সব কয়টি রঙের আলো তার মধ্যে সমপরিমাণে বিদ্যমান আছে। যখন যে রঙটি আবশ্যক হবে, তখন সেটিকে বাদ দিয়ে বাকী রঙগুলি সাদা আলো থেকে শোষণ করে নিলেই, আবশ্যকীয় রঙটি থেকে যাবে। 'পরিশোষণে'র এই ক্রিয়া সাধিত হয় **বর্ণ-মাধ্যম**-এর দ্বারা। প্রয়োজনীয় রঙটি বেছে নেওয়া এবং অনাবশ্যক রঙগুলিকে বাতিল করাই এই বর্ণমাধ্যমের কাজ।

সাদা আলো যখন কোনো স্বচ্ছ রঙিন পদার্থের ভিতর দিয়ে চালিত করা হয়, তখন ঐ স্বচ্ছ পদার্থের নিজস্ব রঙটি ব্যতীত বাকী রঙগুলি পরিশোষিত হয়—নিস্ক্রান্ত হয় শুধু রঙিন পদার্থের নিজস্ব রঙের অনুরূপ রঙিন আলো। এই প্রণালীর পরিশোষণ ক্রিয়াকেই বলা হয় **নির্বাচিত নিষ্ক্রমণ**। অস্বচ্ছ কোনও রঙিন বস্তুর উপরে সাদা আলো পতিত হলে, প্রতিফলনের পূর্বেই উক্ত বস্তুর নিজস্ব রঙের অনুরূপ রঙ ব্যতীত, বাকী রঙগুলি পরিশোষিত হয়। প্রতিফলিত আলোর রঙ বস্তুটির নিজস্ব রঙের অনুরূপ দেখায়। এই প্রণালীর নাম দেওয়া হয়েছে **নির্বাচিত প্রতিফলন**।

নির্বাচিত নিষ্ক্রমণ প্রথায় বর্ণ উৎপাদনের জন্য রঙিন কাচ, জিলেটিন বা সেলোফেন কাগজ জাতীয় স্বচ্ছ রঙিন পদার্থ ব্যবহার করা হয়। এক কথায় এগুলিকে বলে **বর্ণ-মাধ্যম** বা **ফিল্টার**। বিভিন্ন রঙের অতিক্রমণ রোধের ফলে অনেকখানি আলো অপচয় হয়, এবং বর্ণমাধ্যমের গায় তা রূপান্তরিত হয় উত্তাপে।

পরিশোষণ প্রথায় বর্ণউৎপাদনের বিষয়ে বিশেষ একটি প্রাকৃতিক নিয়মের সঙ্গে পরিচিত হওয়া দরকার। একটি লাল রঙের পর্দার উপরে সাদা

আলো এসে পড়লে, পর্দাটি লাল দেখায়। এক্ষেত্রে পর্দাটি সাদা আলোর সব কয়টি রঙ শোষণ করে নেয় ; শুধু লাল রঙটি প্রতিফলিত করে বলেই আমরা তাকে লাল দেখি। শুধু লাল রঙের আলো ফেললেও পর্দাটি, বলা বাহুল্য, লালই দেখাবে। অতএব লাল পর্দাকে লাল দেখাতে হলে, সাদা বা লাল অথবা লালযুক্ত কোনো রঙের আলো ফেলা দরকার। যদি নীল রঙের আলো ব্যবহার করা হয়, পর্দাটি ঐ রঙ সম্পূর্ণ শোষণ করে নিবে ; ফলে পর্দার উপবিভাগ হতে কোনও রঙই প্রতিফলিত না হওয়ার ফলে পর্দাটি কালো মনে হবে।

বিশেষ কোনও কারসাজি দেখানোর প্রয়োজনে এইজাতীয় বর্ণবিভ্রম সৃষ্টি করা যেতে পারে। অন্যথায় লক্ষ্য রাখতে হবে, পোষাক পরিচ্ছদ ও দৃশ্যপটের মূল রঙটি যেন তাদের উপরে এসে পড়া আলোতেও বর্তমান থাকে। আরও মনে রাখতে হবে, অনুজ্জ্বল সাদা আলোতেও আবার অস্বচ্ছ পদার্থের নিজস্ব রঙ সম্যক বোঝা যায় না। উজ্জ্বল তারকালোকিত রাত্রে অনেক রঙই কালো দেখায়। বর্ণবিভ্রম সৃষ্টির এই ফলাফলকে মঞ্চের কাজে যিনি প্রথম ব্যবহার করেন, তাঁরই নাম অনুসারে এই ধরণের কারসাজিকে **পারকিঞ্জ এফেক্ট** নামে অভিহিত করা হয়েছে।

বর্ণের শ্রেণীভেদ

আলোকের তথা স্বচ্ছবর্ণের ক্ষেত্রে লাল, সবুজ এবং নীল রঙ তিনটিকে বলা হয় **মৌলিক বর্ণ**। এই তিন রঙের সমপরিমাণ মিশ্রণের ফলে সাদা আলো পাওয়া যায়। সমপরিমাণ দুইটি মৌলিক বর্ণ মিশ্রণের ফলে যে রঙ পাওয়া যায় তাকে **যৌগিক বর্ণ** বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, লাল ও নীলের মিশ্রণে 'বেগুনে', নীল ও সবুজের মিশ্রণে 'নীলাভ-সবুজ' এবং সবুজ ও লালের মিশ্রণে পাওয়া 'হলুদ', এই তিনটি রঙ যৌগিক বর্ণ।

সাদা আলো থেকে যে কোনও একটি রঙ বাদ দিলে, বাকী রঙগুলির মিশ্রিত অনুভূতিকে বাদ দেওয়া রঙের **প্রতিপূরক বর্ণ** বলা হয়। আর একভাবে বলা যেতে পারে, যখন দুটি রঙের আলোর সংমিশ্রণে সাদা আলো পাওয়া যাবে, তখন সেই রঙ দুটিকে বলা হবে পরস্পরের প্রতিপূরক। যেহেতু তিনটি মৌলিক বর্ণের আলো একত্রিত হলে সাদা রঙের আলো পাওয়া যায়, সুতরাং যে কোনও একটি মৌলিক বর্ণ অপর দুটির যোগফলের প্রতিপূরক বর্ণ।

আলোকের **বর্ণচক্র** [চিত্র ৩৮] অনুধাবন করলে বিষয়টি মনে রাখা সহজ হবে।* বর্ণচক্রে ত্রিভুজের তিন বিন্দুতে তিনটি মৌলিক বর্ণের উল্লেখ করা হয়েছে। এদের সমপরিমাণ মিশ্রণের ফল রাখা হয়েছে কেন্দ্রে। দুটি
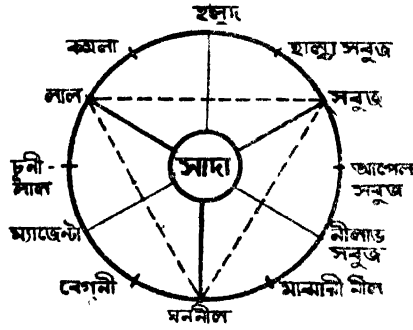
[চিত্র ৩৮] আলোকের বর্ণচক্র

মৌলিক বর্ণের মাঝে উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মিশ্রণে প্রাপ্ত যৌগিক বর্ণ। বর্ণচক্রে উল্লিখিত মুখোমুখী যে কোনও দু' বর্ণ পরস্পরের প্রতিপূরক।

বিভিন্ন বর্ণের সংখ্যাবাচক পরিচিতি

ষ্ট্র্যাণ্ড ইলেকট্রিক্ কোম্পানীই প্রথম মঞ্চে ব্যবহৃত সুপরিচিত রঙগুলির জন্য পৃথক পৃথক পরিচিতি সংখ্যা নির্দ্ধারণ করে। পরে ব্রিটিশ-প্রথা প্রচলিত দেশগুলিতে এই সংখ্যাবাচক পরিচিতিই সর্ববাদিসম্মত পরিচিতি হিসাবে পরিগণিত হয়েছে। আলোকসম্পাত বিষয়ক বহু নিবন্ধ বা নির্দেশ-পত্রে বর্ণমাধ্যমগুলি কেবলমাত্র সংখ্যার দ্বারাই উল্লিখিত হয়। বোঝার সুবিধার জন্য, এখানে প্রচলিত বর্ণমাধ্যমগুলির বর্ণানুক্রমিক এবং সংখ্যানুক্রমিক তালিকা দেওয়া হলো।

বর্ণ [রঙ] অনুক্রমিক তালিকা			**সংখ্যানুক্রমিক তালিকা**
সাদা :	হাল্কা ফ্রস্ট	৩১	১ হলুদ
	গাঢ় ফ্রস্ট	২৯	২ হাল্কা এম্বার

* বস্তুর তথা অস্বচ্ছ বর্ণচক্র [চিত্র ১৫]-এর সঙ্গে আলোকের তথা স্বচ্ছ বর্ণ-চক্রের পার্থক্য লক্ষণীয়।

বর্ণ [রঙ] অনুক্রমিক তালিকা			সংখ্যানুক্রমিক তালিকা	
হলুদ :	ফ্যাকাশে হলুদ	৫০	৩	ট্রু
	হলুদ	১	৪	মাঝারী এম্বার
	ক্যানারী	৪৯	৫	কমলা
এ্যাম্বার :	ট্রু	৩	৫-ক	গাঢ় কমলা
	হাল্কা এম্বার	২	৬	মৌলিক লাল
	মাঝারী এম্বার	৪	৭	হাল্কা গোলাপী
	গাঢ় এম্বার	৩৩	৮	স্যালমন [এম্বার-পিঙ্ক]
	স্যালমন [এম্বার-পিঙ্ক]	৮	৯	হাল্কা স্যালমন
	সোণালী এম্বার	৩৪	১০	মাঝারী গোলাপী
	গাঢ় সোণালী এম্বার	৩৫	১১	গাঢ় পিঙ্ক
কমলা :	কমলা	৫	১২	ঘন গোলাপী
	গাঢ় কমলা	৫-ক	১৩	ম্যাজেণ্টা
পিঙ্ক :	সোণালী টিণ্ট্	৫১	১৪	রুবী
	ফ্যাকাশে সোণালী	৫২	১৫	ময়ূরকণ্ঠী নীল
	ফ্যাকাশে স্যালমন	৫৩	১৬	নীলাভ সবুজ
	হাল্কা স্যালমন	৯	১৭	ষ্টীল নীল
	হাল্কা গোলাপী	৭	১৮	হাল্কা নীল
	ফ্যাকাশে গোলাপী	৫৪	১৯	গাঢ় নীল
	ল্যাভেণ্ডার		২০	মৌলিক ঘন নীল
	[সারপ্রাইজ পিঙ্ক]	৩৬	২১	বাদামী সবুজ
	মাঝারী গোলাপী	১০	২২	শ্যাওলা সবুজ
	গাঢ় পিঙ্ক	১১	২৩	হাল্কা সবুজ
	উজ্জল গোলাপী	৪৮	২৪	গাঢ় সবুজ
	ঘন গোলাপী	১২	২৫	পারপল্
	ম্যাজেণ্টা	১৩	২৬	মভ্
লাল :	মৌলিক লাল	৬	২৯	গাঢ় ফ্রষ্ট
	রুবী	১৪	৩১	হাল্কা ফ্রষ্ট
	মভ্	২৬	৩২	মাঝারী নীল
	পারপল্	২৫	৩৩	গাঢ় এম্বার
	ফ্যাকাশে বেগুনী	৪২	৩৪	সোনালী এম্বার

বর্ণ [রঙ] অনুক্রমিক তালিকা			সংখ্যানুক্রমিক তালিকা	
নীল :	ষ্টীল নীল	১৭	৩৫	গাঢ় সোনালী এম্বার
	ফ্যাকাশে নীল	৪০	৩৬	ল্যাভেণ্ডার [সারপ্রাইজ পিঙ্ক]
	ফ্যাকাশে নেভী	৪৩		
	হাল্কা নীল	১৮	৩৮	ফ্যাকাশে সবুজ
	উজ্জল নীল	৪১	৩৯	মৌলিক সবুজ
	মাঝারী নীল	৩২	৪০	ফ্যাকাশে নীল
	গাঢ় নীল	১৯	৪১	উজ্জল নীল
	মৌলিক ঘননীল	২০	৪২	ফ্যাকাশে বেগুনী
	ময়ূরকণ্ঠী নীল	১৫	৪৩	ফ্যাকাশে নেভী
সবুজ :	নীলাভ সবুজ	১৬	৪৮	উজ্জল গোলাপী
	ফ্যাকাশে সবুজ	৩৮	৪৯	ক্যানারী
	বাদামী সবুজ	২১	৫০	ফ্যাকাশে হলুদ
	শ্যাওলা সবুজ	২২	৫১	সোনালী টিণ্ট্
	হাল্কা সবুজ	২৩	৫২	ফ্যাকাশে সোনালী
	মৌলিক সবুজ	৩৯	৫৩	ফ্যাকাশে স্যালমন
	গাঢ় সবুজ	২৪	৫৪	ফ্যাকাশে গোলাপী
প্রভাবহীন বা নিউট্রাল :	চকোলেট টিণ্ট্	৫৫	৫৫	চকোলেট টিণ্ট্
	ফ্যাকাশে চকোলেট	৫৬	৫৬	ফ্যাকাশে চকোলেট্
	ফ্যাকাশে ধসর	৬০	৬০	ফ্যাকাশে ধসর ।

বর্ণের বিযুক্তি ও ভগ্নমিশ্রণ

বর্ণ মাধ্যমের তালিকায় ৪৮ রকমের পৃথক জিলেটিন বা সিনাময়েড পাওয়া যায়। এর এক তৃতীয়াংশ পরিপৃক্ত বর্ণের—এগুলি বর্ণালীর কোনও না কোনও অংশ সম্পূর্ণরূপে আটকে রাখে। অন্যগুলি ফ্যাকাশে রঙ। এগুলি বর্ণালীর বর্ণ ঔজ্জল্য কতকাংশে কমিয়ে দেয় মাত্র।

৪৮টি রঙ প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। তাই একটি বর্ণমাধ্যমের উপরে আর একটি মাধ্যম চাপিয়ে নূতন নূতন রঙ সৃষ্টি করার [চিত্র ৩৯.১ ক] চেষ্টা করা হয়। এরূপ ক্ষেত্রে, দুটি বর্ণমাধ্যমের মধ্যে যে রঙ সাধারণ নয়, সেগুলি বাদ পড়ে। যেমন, বেগুনী মাধ্যমে বেরিয়ে

আসে লাল ও নীল রঙের আলো ; নীলাভ-সবুজ মাধ্যমে বেরিয়ে আসে নীল ও সবুজ আলো। এই দুইটি মাধ্যম উপর্যুপরি ব্যবহার করা হলে, লাল ও সবুজ রঙের আলো পরিশোষিত হবে—পাওয়া যাবে শুধু নীল, যা উভয় মাধ্যমেরই সাধারণ রঙ। এই জাতীয় মিশ্রণকে বর্ণের **বিযুক্তি মিশ্রণ** বলা হয়। লিখিতভাবে উল্লেখ করার সময় এই জাতীয় মিশ্রণকে লেখা হবে **বেগুনী—নীলাভ সবুজ** ; অর্থাৎ বেগুনী থেকে নীলাভ-সবুজ বিয়োগ করা হলো।

একটির পর একটি বিয়োগ ক্রমান্বয়ে চালিয়ে গেলে, একসময় অবশিষ্ট কিছুই থাকবে না ; অর্থাৎ ফল হবে **কালো**। বিভিন্ন বর্ণমাধ্যম নিয়ে এই জাতীয় মিশ্রণের পরীক্ষায় নানা রঙ সৃষ্টি করার বৈচিত্র্য অনুভব করা যায়।

সচরাচর ব্যবহৃত এই জাতীয় 'বিযুক্তি মিশ্রণে'র কয়েকটি ফলাফল নীচের তালিকায় দেওয়া হলো :

৫৫ নং কমলা — ১১ অথবা ১২ নং গোলাপী = রক্তাভ কমলা

১০ নং পিঙ্ক — ৪ নং এম্বার = সূর্যাস্ত বা অগ্নিশিখার বর্ণ

৮ নং স্যালমন — ২ নং এম্বার = অগ্নিশিখার বর্ণ

১৯ নং নীল — ১ নং হলুদ ১৬ নং নীলাভ সবুজ — ২৪ নং সবুজ ৫০ নং হলুদ — ১৭ নং ষ্টীল নীল	প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিভিন্ন ঘনত্বের সবুজ রং পাওয়া যাবে।
৫৪ নং পিঙ্ক — ১৭ নং ষ্টীল নীল ৩৬ নং পিঙ্ক — ৫০ নং হলুদ	উভয় ক্ষেত্রেই ভিন্ন ঘনত্বের ধূসর বর্ণ পাওয়া যাবে, যা ৬০ নং বর্ণের তুলনায় পৃথক।
৩৬ নং পিঙ্ক — ১৭ নং ষ্টীল নীল ৩৬ নং পিঙ্ক — ৩ নং ষ্ট্র	৩৬ নং পিঙ্কের তুলনায় নূতনতর রঙের সৃষ্টি হবে।

[চিত্র নং ৩৯.১] কঃ বিযুক্তি মিশ্রণ, খঃ ভগ্নমিশ্রণের জন্য ব্যবহৃত বর্ণমাধ্যম
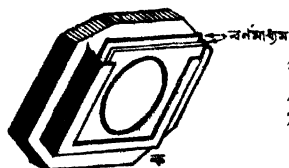
বর্ণমাধ্যমগুলিকে উপর্যুপরি না রেখে, একটি মাত্র মাধ্যমধারকে বর্ণগুলিকে যদি পাশাপাশি রাখা হয় [চিত্র ৩৯.১ খ], তাহলে হবে বর্ণের **ভগ্ন মিশ্রণ**। এর ফলে বিভিন্ন বর্ণের পৃথক সত্বা লুপ্ত না করেই তাদের মেশানো সম্ভবপর হবে।

একটি বর্ণমাধ্যমের মাঝের কিছু অংশ কেটে নিয়ে, সেখানে অন্য বর্ণের চাকতি লাগিয়ে এই ভগ্ন মিশ্রণের জন্য ব্যবহার করা যায়। অনেক সময় একাধিক বর্ণের জিলেটিন ফিতের মতো কেটে, জানালার গরাদের মতো লাগিয়েও এই কাজে ব্যবহৃত হয়। ত্রিভুজাকৃতি বর্ণ-মাধ্যমের কোণগুলি এক এক রঙের এবং মাঝের যায়গাটি ভিন্ন রঙের সিনাময়েডে তৈরী করেও এই ভগ্নমিশ্রণ সাধিত হতে পারে। আলোক-সম্পাতকারীর কাছে বর্ণের এই জাতীয় মিশ্রণ, এক নূতন কৌতুহলোদ্দীপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ খুলে দেয়।

বর্ণের সংযুক্তি মিশ্রণ

যদি একটি স্পট-বাতীতে ৬ নং লাল এবং অন্য একটি স্পটবাতীতে ৩৯ নং সবুজ বর্ণমাধ্যম লাগিয়ে, উভয়ের আলো একই যায়গায় ফেলা যায়, মিশ্রিত রশ্মির রঙ হবে হলুদ। ৩৯ নং সবুজের বদলে যদি ১৬ নং নীলাভ সবুজ মাধ্যম ব্যবহার করা হতো, তবে মিশ্রণের ফলে পাওয়া যেত সাদা আলো। এই ধরণের মিশ্রণকে [চিত্র ৩৯.২] বর্ণের **সংযুক্তি মিশ্রণ** বলে। এই ফলাফল থেকে বোঝা যাবে, বিযুক্তি মিশ্রণ বা অস্বচ্ছ বর্ণের মিশ্রণের ক্ষেত্রে যে নিয়মগুলি কাজে লাগে, এক্ষেত্রে তা কার্য্যকরী হয় না।
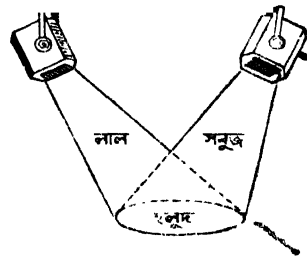
[চিত্র ৩৯.২] বর্ণের সংযুক্তি মিশ্রণ

'সংযুক্তি মিশ্রণে'র ফলাফল জানার জন্য বর্ণচক্রের [চিত্র ৩৮] সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। তিনটি মৌলিক বর্ণের স্থান যোগ করে যে ত্রিভুজ পাওয়া যাবে, তার প্রত্যেক বাহুর মধ্যবিন্দুতে, বাহুর প্রান্তবর্তী বর্ণদুটির সমপরিমাণ মিশ্রণ ঘটেছে ধরা হয়। যেমন, লাল ও নীলের সমপরিমাণ মিশ্রণের ফলে পাওয়া যাবে ম্যাজেণ্টা। এটি সবুজের প্রতিপূরক। ম্যাজেণ্টার মধ্যে লালের পরিমাণ বাড়ালে, অর্থাৎ বর্ণচক্রের পরিধি

বরাবর লালের দিকে এগোলে, পাওয়া যাবে চূণী-লাল বা রুবী রঙ। অনুরূপভাবে পরিধি বরাবর নীলের দিকে এগোলে, অর্থাৎ নীলের মাত্রা বাড়ালে, ম্যাজেণ্টা বেগুণী রঙে পরিণত হবে।

বর্ণের তন্ময়ী পর্য্যায়

আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়ে যদি বর্ণানুভূতি না থাকতো, কেবল উজ্জ্বলতার তারতম্যবোধের দ্বারাও আমরা যে কোনও বস্তুর উপস্থিতি, আকৃতি ও গঠন সম্পর্কে ধারণা করে নিতে পারতাম, সন্দেহ নেই। কিন্তু নিঃসংশয়ে বলা যায়, বর্ণানুভূতির এক বিশেষ আবেদন আছে, যার মধ্য দিয়ে দৃশ্যমান বস্তুর উপস্থিতি, আকৃতি ও গঠনবোধের সঙ্গে উদ্ভাসিত হয় তার বৈচিত্র, সৌন্দর্য্য ও আকর্ষণক্ষমতা—সেইসঙ্গে আমাদের চেতনার স্তরে বিশেষ বিশেষ ভাব উদ্রেকে সাহায্য করে।

পরস্পর-বিরোধী বর্ণের সমাবেশেই বর্ণগুলি দর্শকের দৃষ্টিতে প্রকট হয়ে ওঠে। একটি মঞ্চের সমুদয় দৃশ্যাবলী যদি বেশ কিছুক্ষণ শুধু লাল রঙের আলো দিয়ে রাঙিয়ে রাখা হয়, তবে লাল রঙের লালিমা শীঘ্রই নষ্ট হয়ে দৃশ্যটিকে পিঙ্ক মনে হবে। ঐ লাল রঙের আলোয় আলোকিত অংশ যদি নীল রঙের আলোয় নীলাভ কিছু অংশ দিয়ে ঘিরে রাখা যায়, তবে তার ঔজ্জ্বল্য হয় সম্পূর্ণ পৃথক ধরণের। এই পরীক্ষা থেকে সিদ্ধান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যে বর্ণ বা বর্ণগুলি মঞ্চে বিশেষভাবে দেখানো দরকার, তাদের খণ্ড খণ্ড অংশে অথবা উচ্চালোকিত স্থানসমূহে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। চাঁদের আলো বা অনুরূপ কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে এই জাতীয় **বিরোধাত্মক** বর্ণসমাবেশের প্রয়োজন না পড়তে পারে। কোন রঙ কতখানি ব্যবহার করা হবে, এবং কি জাতীয় বিরোধাত্মক বর্ণসমাবেশ ঘটানো দরকার, এর কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। বিষয়টি আলোকম্পাতকারীর ব্যক্তিগত শিল্পবোধের উপরে নির্ভর করে।

পদার্থবিজ্ঞানের কোন নিয়মে মানুষের এই বর্ণ-অনুভূতি পরিচালিত হচ্ছে, তা আজও সঠিক এবং চরমভাবে নির্দ্ধারিত হয়নি। সরল এবং জটিল বহু তত্ত্বই এ সম্পর্কে প্রচারিত হয়েছে—যাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক **থমাস ইয়ং হেলম্‌হোজ্‌**-এর ব্যাখ্যাই সরলতম এবং সুপরিচিত।

উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে জন্মগ্রহণ করেন বৈজ্ঞানিক ইয়ং। তাঁর মতে মানুষের দর্শনেন্দ্রিয়ের মধ্যে তিন শ্রেণীর বর্ণসচেতন শিরা আছে। এগুলি যথাক্রমে তিনটি মৌলিক বর্ণের আলোকতরঙ্গের আঘাতে কম্পন

অনুভব করে। যখন লাল রঙের আলো চোখে পড়ে, তখন লাল রঙের প্রতি সচেতন শিরাটিই পূর্ণবেগে কাঁপতে থাকে ; বাকী দুটি থাকে নিষ্ক্রিয়—ফলে, আমাদের লাল রঙের অনুভূতি জাগে। যদি হলুদ রঙের আলো চোখে পড়তো, তবে লাল এবং সবুজ আলোয় সচেতন শিরাদুটি একত্রে কম্পন অনুভব করতো। অনুরূপভাবে তৃতীয় শিরাটিও যদি সমান বেগে কাঁপতে সুরু করে, তবে আমরা সাদা রঙের অনুভূতি পাই। কোনো তরঙ্গই যখন শিরাগুলিতে আঘাত করে না, তখন চোখের সামনে থাকে কালো রঙ, অর্থাৎ অন্ধকার।

পূর্বেই বলা হয়েছে, একটি রঙ দীর্ঘক্ষণ দেখার ফলে, রঙের ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পাচ্ছে বলে মনে হয়। ইয়ংয়ের বর্ণিত ব্যাখ্যা থেকে এই সমস্যারও সমাধানে আসা যায়। একে বলা হয় **বর্ণক্লান্তি**। দীর্ঘক্ষণ একটি মাত্র শিরার উপরে আলোকতরঙ্গ আঘাত করার ফলে, শিরাটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, এবং পূর্ণবেগে কম্পনে অস্বীকৃতি জানায়। এই বর্ণক্লান্তি-তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে আলোকসম্পাতের বর্ণনিরূপণে নানারকম বৈশিষ্ট আনা যেতে পারে। পরবর্তী দৃশ্যের জন্য নিরূপিত আলোকের মুখ্যবর্ণ যদি নীল হয়, তার অব্যবহিত পূর্বে যবনিকাটিকে লাল রঙের পাদ-প্রদীপালোকে আলোকিত করা, অথবা, দৃশ্যের নীলাভাকে নিস্প্রভ দেখানোর প্রয়োজনে নীল পাদপ্রদীপালোকে যবনিকা রঞ্জিত করে রাখা প্রভৃতি এই বৈশিষ্টের পর্য্যায়ে পড়ে।

রঙিন বস্তুর উপর রঙিন আলোকের প্রভাব

মঞ্চে আলোকসম্পাতের বর্ণ এবং দৃশ্য পরিকল্পনার বর্ণ-বৈচিত্র পরস্পরের উপরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। আপাতঃদৃষ্টিতে চমকপ্রদ দৃশ্যপট, পোষাক-পরিচ্ছদ, এমনকি রূপসজ্জাও অনুপযুক্ত আলোকসম্পাতের দোষে সর্বতোভাবে নষ্ট হতে পারে।

আলোর রঙ যদি সাদা অথবা আলোকিত বস্তুর অনুরূপ হয়, তবে উক্ত বস্তুর নিজস্ব রঙই ধরা পড়বে আমাদের চোখে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, একটি লাল রঙের বস্তুকে সাদা বা লাল রঙের আলোয়তো লাল দেখাবেই ; ম্যাজেণ্টা, চুণীলাল, কমলা ও হলুদ রঙের আলোতেও লাল দেখাবে। কিন্তু বর্ণচক্রের অন্য রঙগুলিতে আর লাল দেখাবে না।

লাল রঙের বস্তুটির পশ্চাৎপট যদি সাদা রঙের হয়, এবং পশ্চাৎপট ও বস্তুকে যদি একই প্রখরতার লাল আলোয় উদ্ভাসিত করা যায় [চিত্র ৪০]

তবে বস্তুর অবস্থিতি দূর থেকে দেখতে পাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য হয়ে উঠবে। এর কারণ, পশ্চাৎপট ও বস্তু উভয়েই একই রঙের আলো প্রতিফলিত করার ফলে তাদের পারস্পরিক বিরোধাত্মক ভাব নষ্ট হবে, যার পরিণতিতে বস্তুর পৃথক অবস্থিতি নির্ণয় করা হয়ে উঠবে কষ্টকর। এই অদৃশ্য হয়ে
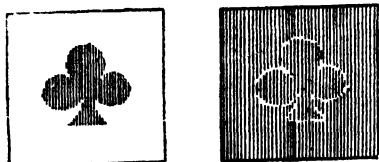
[চিত্র ৪০] বিরোধাত্মক ভাব নষ্ট হওয়ার ফলে বস্তুর অদৃশ্য হওয়া

যাওয়ার তত্ত্বের উপরে নির্ভর করে আলোকের সাহায্যে দৃশ্য পরিবর্তন করা সম্ভবপর। আলোকসম্পাত বিজ্ঞানে এই প্রণালীটি **পয়েন্টিলেজ দৃশ্যাঙ্কণ প্রথা** এবং **সাময়লফ কারসাজি** দুই নামেই সুপরিচিত [বিবিধ কারসাজি পরিচ্ছেদে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য]।

স্বাভাবিক ধারণায় মনে হতে পারে যে উপরে বর্ণিত দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে লাল রঙে রঞ্জিত যায়গাটি লাল আলোয় আরও ঘন লাল দেখাবে, এবং সাদা রঙের যায়গাটি থেকে তার পার্থক্য রজায় রাখতে সক্ষম হবে। কিন্তু এ ধারণা ভুল। বর্ণ-অনুভূতির মূল কথাটি স্মরণ করলেই বোঝা যাবে যে, কোনও বস্তুর নিজস্ব কোনও বর্ণ-উৎপাদনের ক্ষমতা নেই—আছে শুধু পতিত আলো থেকে নির্বাচিত অংশ প্রতিফলিত করার ক্ষমতা। সুতরাং আলোচ্য দৃষ্টান্তে লাল অংশটি পতিত লাল রশ্মিটুকুই ফেরত পাঠাবে, তার সঙ্গে নূতন রশ্মি সংযোগ করতে পারবে না।

বিভিন্ন রঙের আলোয় বিভিন্ন বস্তুর নিজস্ব রঙে যে পরিবর্তন ঘটে, তার বহু তালিকা পরীক্ষাদির সাহায্যে প্রণীত হয়েছে। মঞ্চে প্রয়োজনীয় আলো, দৃশ্যপট, পরিচ্ছদ ও রূপসজ্জায় ব্যবহৃত বর্ণাবলীর উপরে নির্ভর করে, কাজের সুবিধার জন্য, বাছাই করা কয়েকটি ফলাফলের সংক্ষিপ্ত তালিকা পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হলো :

বস্তুর বর্ণ	আপতিত আলোকের বর্ণ			
	ঘন নীল	সবুজ	চাঁপা	লাল
বেগুনী	নীলাভ-বেগুনী	গাঢ় নীল	গাঢ় কমলা	লালচে পারপল্
ঘন নীল	ঘন নীল	ঘন নীলাভ সবুজ	গাঢ় হলদে-সবুজ	নীল্চে বেগুনী
নীলাভ সবুজ	গাঢ় সবুজে নীল	নীলাভ সবুজ	হলুদে সবুজ আভা	কাল্চে নীল
সবুজ	গাঢ় নীলাভ সবুজ	সবুজ	গভীর হলুদে আভা	গাঢ় কমলা
হলুদ	গাঢ় হলদে সবুজ	হলদে সবুজ	গভীর হলুদ	কমলা
কমলা	ঘন কমলা	সবজে হলুদ	গভীর কমলা	স্কারলেট লাল
লাল	গাঢ় লাল্চে পারপল্	গাঢ় কমলা	গভীর কমলা-লাল	লাল

রূপসজ্জার জন্য ব্যবহৃত রঙও অন্যান্য রঙিন বস্তুর মতো আলোকের অধীনে প্রভাবিত হয়। এ সম্পর্কে দুটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, গাঢ় রঙের ব্যবহার পারতঃপক্ষে পরিহার করা উচিত। গাঢ় রঙের উপরে বিভিন্ন পরিবেশে আলোকের প্রতিক্রিয়ার এতখানি পার্থক্যের সৃষ্টি হয় যে, মুখমণ্ডলের প্রার্থিত রূপটি বদলে যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, সজ্জাকক্ষের আলো ও মঞ্চের আলোয় উজ্জ্বলতাগত ও বর্ণগত বিশেষ পার্থক্য যেন না থাকে। অন্যথায়, রূপসজ্জাকরের প্রয়াস ক্ষেত্রবিশেষে ব্যর্থ হতে পারে। বিভিন্ন প্রখরতায় বিভিন্ন বর্ণের আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা সম্বলিত একটি **বর্ণপরীক্ষণ কক্ষ** এই বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্যকারী। পৃথক কক্ষের অভাবে, একটি একদিক খোলা বড় কাঠের বাক্সেও 'বর্ণ-পরীক্ষণ কক্ষ' তৈরী করে নেওয়া যায়। মঞ্চশিল্পী এর সাহায্যে তাঁর

পরিকল্পনা অনুযায়ী উপাদানের নমুনাগুলির উপরে, বিভিন্ন রঙের আলোর প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। রূপসজ্জাকরও তাঁর ব্যবহৃত রঙের নমুনাগুলির উপরে আলোকের প্রভাব পূর্বাহ্নে জানতে পারলে, কাজের যথেষ্ট সুবিধা হয়।

বর্ণের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

বিভিন্ন বর্ণ দর্শক সাধারণের মনে পৃথক পৃথক ভাবের উদ্রেক করে। সাধারণভাবে চারটি ভাবের কথা উল্লেখ করা হয় ; যথা :—উষ্ণ, শীতল, উৎসাহব্যঞ্জক এবং অবসাদজনক। বর্ণের এই ভাবব্যঞ্জনাকে তার মনস্তাত্ত্বিক দিক বলা হয়।

এককথায় বলতে গেলে, বর্ণালীর লাল রঙের দিকে থাকা রঙগুলির **ভাবগত মূল্য** উষ্ণ ও উৎসাহব্যঞ্জক ; অপরপক্ষে নীলপ্রান্তে শীতল ও অবসাদজনক।

বর্ণের ভাবগত মূল্যের সঙ্গে মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে ওতোপ্রোতঃভাবে জড়িয়ে আছে তার **উপমাত্মক মূল্য** অথবা তার **আবেগ মান**। কোন বর্ণ কি অবস্থা, কি পরিবেশ বর্ণনা করে, এবং কিসের ছাপ রেখে যায় দর্শকের মনে, এইগুলিই হচ্ছে সেই বর্ণের উপমাত্মক মূল্য বা আবেগ মান।

সচরাচর ব্যবহৃত কয়েকটি বর্ণের ভাবগত ও উপমাত্মক মূল্য সম্বলিত মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত তালিকা নীচে দেওয়া হলো :

লাল রঙটি উত্তপ্ত বর্ণ এবং উত্তেজনাব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। রক্ত এবং আগুনের সমবর্ণ হওয়ার ফলে, এর উপমাত্মক মূল্যে রক্ত, যুদ্ধ, শহীদত্ব, বিপদসঙ্কেত, ধ্বংস, আগুন, উত্তাপ, সাহস, বীরত্ব, শক্তি, প্রতিশোধ, হিংসাবৃত্তি, ঘৃণা, লজ্জা, ক্রোধ, লালসা ও কামনার প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। লাল রঙের তিনটি পৃথক মাত্রায় সৃষ্টি হয় পিঙ্ক, স্কারলেট এবং ক্রিমসন। এদের মধ্যে **পিঙ্ক** প্রতিনিধিত্ব করে সত্য, প্রেম, সলজ্জতা, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্যের। **স্কারলেট** বিশেষভাবে বোঝায় রক্ত, ক্রোধ, বিজয় এবং সৌন্দর্য্য। **ক্রিমসন** ফুটিয়ে তোলে মাধুর্য্য, উদারতা এবং ভদ্রতা।

কমলা রঙটি উষ্ণ এবং উৎসাহবর্দ্ধক। এর মনস্তাত্ত্বিক দিক প্রভাবিত হয়েছে শরৎকাল এবং অগ্নিশিখার সঙ্গে এর বর্ণসাদৃশ্য থেকে। উপমাত্মক মূল্যে তাই পাওয়া যায় শরৎকাল, ধান কাটার সময়, ফলভারে আনতভাব, প্রাচুর্য্য, পরিতুষ্টি, সুখ, হাস্য, উষ্ণতা এবং কতকাংশে উত্তাপ

এবং আগুনের প্রতিচ্ছবি। রঙটি একাধারে জীবন্ত, উৎসাবর্দ্ধক, উষ্ণ, ভাস্বর এবং সন্তোষ বিধায়ক।

হলুদ রঙ মাঝারী গোছের উষ্ণবর্ণ এবং আনন্দদায়ক। সূর্য্যের সঙ্গে বর্ণসৌসাদৃশ্য এবং অপেক্ষাকৃত উচ্চতর পর্য্যায়ের প্রখরতা এর মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যাগুলিকেও প্রভাবিত করেছে। এই রঙের উপমাত্মক মূল্যে উল্লেখ করা যায় সূর্য্যালোক, উজ্জ্বলতা, প্রাচুর্য্য, আনন্দ, প্রলোভন এবং প্রাখর্য্যের কথা। অসুস্থ ব্যক্তির গায়ের রঙের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকার ফলে, অনেকক্ষেত্রে এই রঙটি মাত্রাবিশেষে অসুস্থতা, মরণশীলতা, অশোভনতা, কাপুরুষতা, অসংহতি ও প্রতারণা বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়।

সবুজ রঙটি উষ্ণ নয়, শীতলও নয়। নিরপেক্ষ এর অভিব্যক্তি। মানুষ এই রঙটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে আসে তার চতুষ্পার্শবর্তী সদাবর্তমান উদ্ভিদ জগতের মাধ্যমে। বর্ণটি উৎসাহব্যঞ্জক নয়. আবার অবসাদজনকও নয়। বসন্তকালের বর্ণসমারোহের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য হেতু, এই রঙটির উপমাত্মক মূল্য হচ্ছে সজীবতা, যৌবন, কৌমার্য্য, বিশ্বাস, আশা, বিজয়, শান্তি প্রভৃতি।

নীলাভ-সবুজ রঙটিতে সবুজ এবং নীল উভয় রঙেরই গুণগুলি একত্রে বর্তমান। এটি শীতলবর্ণ এবং প্রতিক্রিয়ায় কিছুটা ক্লান্তিকর। রঙটির প্রয়োগে একাকীত্ব, দূরত্ব এবং রহস্যের কিছু আভাষ পাওয়া যায়।

নীল রঙ সর্বতোভাবে শীতল এবং অবসাদ স্থষ্টিকারী। আকাশ তথা স্বর্গের রঙ হিসাবে নীল রঙের উপমাত্মক অর্থ হচ্ছে অধ্যাত্মবাদ, ভগবৎশক্তি, রহস্য, পবিত্রতা, গাম্ভীর্য্য, শীতলতা, ক্লান্তি, প্রেম, উদারতা প্রভৃতি। নীল রঙ একাধারে অবসর-বিনোদক, আরামদায়ক, তৃষ্ণা নিবারক ও প্রশান্ত। এই রঙের গাঢ়তর পর্য্যায়গুলি মনে অবসন্নতা ফুটিয়ে তোলে।

বেগুনী একটি স্বাভাবিক শীতল এবং অবসাদব্যঞ্জক বর্ণ। দুঃখ, ভাব-প্রবণতা, করুণা, রোগযন্ত্রণা, কামনা, ভালোবাসা, সততা প্রভৃতি বোঝানোর জন্য এই রঙের ব্যবহার করা যেতে পারে। রঙটি ক্লান্তিকর, কঠিন, নৈরাশ্যব্যঞ্জক এবং বিষণ্ণভাব স্থষ্টি করে।

পারপল্ রঙে নীল ও লালের মাত্রানুসারে এটি উষ্ণ, উৎসাহবর্দ্ধক অথবা শীতল এবং ক্লান্তিকর দুই-ই হতে পারে। সাধারণতঃ রাজকীয়তা, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ, জাঁকজমক, গাম্ভীর্য্য প্রভৃতি বোঝানো যায় এই রঙটির সাহায্যে।

পদার্থ বিজ্ঞানের ভাষায় সাদা, ধূসর এবং কালো, এই তিনটি নাম রঙের পর্য্যায়ভুক্ত নয়।* কিন্তু অনুভূতির দিক থেকে অন্যান্য রঙের মতো এদেরও মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে, সেইজন্য এই তালিকায় এগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা হ'ল।

সাদা রঙটি শীতল, ক্লান্তি-অপনোদক এবং গ্লানি দূর করার বিষয়ে সাহায্যকারী। উপমাত্মক মূল্যের দিক থেকে সাদা রঙে শীতকাল, আত্মবলীদান, নিগ্রহ, গভীরতা, সততা, আলোক, শান্তি, পবিত্রতা, অজ্ঞতা, ভদ্রতা, অবিকৃতি, নারীত্ব, ভঙ্গুরতা, দুর্বলতা প্রভৃতি প্রতিবিম্বিত হয়।

ধূসর রঙটি শীতল এবং অবসাদজনক। এর সাহায্যে শীতের আকাশ, অবসন্নতা, দুঃখ, গোপনতা, প্রশান্তি, নিস্তব্ধতা, ঝড়ের পূর্বাভাস, বার্দ্ধক্য প্রভৃতি বোঝানো যায়।

বর্ণ অনুভূতির অভাবেই **কালো** রঙের সৃষ্টি। রাত্রি, অন্ধকার, গ্লানি, রহস্য, ডাকিনীবিদ্যা, নিঃসামতা, নিদ্রা, মৃত্যু, হতাশা, আতঙ্ক, শঠতা, অপরাধ প্রভৃতির ছবি ফুটে ওঠে কালো রঙের মাধ্যমে। নিঃসন্দেহে এটি মনের মধ্যে অবসাদজনক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

বিভিন্ন বর্ণের মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণের এই সংক্ষিপ্ত সূচী একটি সাধারণ ভিত্তি মাত্র। আলোকসম্পাতকারীকে এই ভিত্তির উপরে নির্ভর করে, নিজস্ব অনুভূতি কাজে লাগাতে হবে, তবেই বর্ণের প্রয়োগ হয়ে উঠবে যথাযথ।

---

* 'সাদা' সমস্ত বর্ণের একত্র সমাহার, 'কালো' বর্ণানুভূতির অভাব এবং 'ধূসর'কে সাদা এবং কালোর মধ্যবর্তী অবস্থা বলা হয়।

আট দীপচিত্রণের প্রয়োগবিধি

আলোক-সম্পাতকারী

দৃশ্যপট পরিকল্পকের মতো আলোকসম্পাতের জন্যও একজন পরিকল্পনাকারী দরকার। অনায়াসে এই দুটি কাজ একই শিল্পীর দ্বারা সাধিত হতে পারে, এবং সেক্ষেত্রে ভালো ফলই পাওয়া যায়। দৃশ্যপরিকল্পনাকারীর পক্ষে যেমন ছুতার মিস্ত্রীর কাজ জানা অবশ্যকর্তব্য নয়—কারণ, দৃশ্যপট গড়ার জন্য বহু ছুতার মিস্ত্রী ও কারিকর লাগানো হয়—তেমনি, আলোকসম্পাতকারীর পক্ষে স্বয়ং বৈদ্যুতিক-মিস্ত্রী না হলেও চলে—কারণ বিদ্যুৎব্যবস্থার ভার অনায়াসে একজন তড়িৎ-বিজ্ঞানীর হাতে ছেড়ে দেওয়া যায়। আলোক-সম্পাত-পরিকল্পনাকারীকে হতে হবে এমন একজন শিল্পী, যাঁর আলোকের সাহায্যে চিত্রাঙ্কন করার বিষয়ে সম্যক ধারণা থাকবে।

নাটক এবং নেপথ্য শিল্পীবৃন্দের সঙ্গে আলোকসম্পাতকারীর নির্বাচন হওয়ার পরে পরেই সুরু হয় তাঁর কাজ। বিভিন্ন মহলা দেখার সঙ্গে সঙ্গে, দৃশ্যপরিকল্পনা এবং রঙ্গপীঠে ঘটনাপ্রবাহের গতিপথ, আবর্ত এবং কেন্দ্রগুলি অনুধাবন করতে হয় তাঁকে ; বিশেষভাবে জেনে নিতে হয় প্রাধান্য আরোপের জায়গাগুলি—সেইসঙ্গে কোন শ্রেণীর আলোকযন্ত্র ব্যবহৃত হবে, কোথায় কি ভাবে সেগুলি স্থাপনা করা হবে, কি কি বর্ণমাধ্যম লাগানো হবে কাজে, এবং কখন কি ধরণের পরিবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে, এসবের একটি খসড়া তৈরী করার দরকার পড়ে। এই সমস্ত কাজেই তাঁকে চলতে হয় প্রযোজক, তথা নির্দেশকের পরিচালনায়। তবে বলা বাহুল্য, অন্যান্য শিল্পীবৃন্দের মতো তাঁরও নিজস্ব বিভাগে আলোচনা ও মতামত প্রকাশ করার পূর্ণ স্বাধীনতা থাকে।

আলোক-সম্পাতের মহলা

দৃশ্যপটসহ আলোকসম্পাতের মহলাকে অনায়াসে একটি পর্ণাঙ্গ অভিনয় হিসাবে গণ্য করা চলে। অবশ্য খরচের দিকে লক্ষ্য রেখে, অনেকসময় শুধু বিশেষ পরিবর্তনগুলির মহলা করে নেওয়া হয় বারম্বার।

এইজাতীয় মহলাতেই আলোকসূত্রগুলির চূড়ান্ত স্থান [চিত্র ৪১.১] নির্দিষ্ট হয়ে যায়; বর্ণমাধ্যম নির্বাচন করা হয় এবং লাগানো হয়;
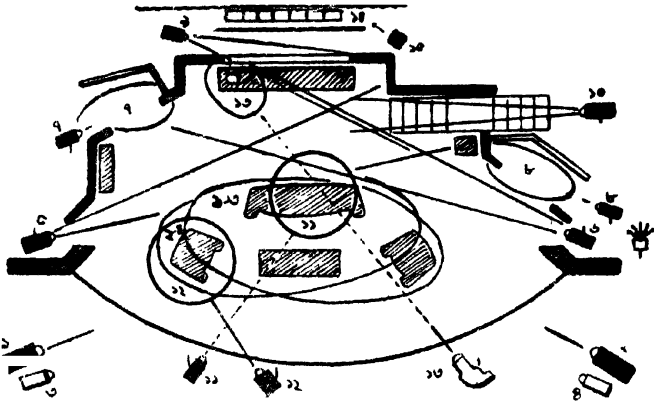
[চিত্র ৪১.১] ভূমিচিত্রে আলোক যন্ত্রের স্থান-নির্দেশ ও আলোক পরিবেশনের খসড়া

পরিবর্তনের তালিকা অনুযায়ী সহকারীদের নির্দেশ দিয়ে প্রস্তুত করে নেওয়া হয়। নিয়ন্ত্রক যদি পৃথক ব্যক্তি হন, তাঁকে অবশ্যই মহলায় উপস্থিত থেকে, বিশেষ পরিকল্পনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। যেখানে নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র থেকে রঙ্গপীঠ ভালোভাবে এবং পূর্ণভাবে দেখা যায়না, সেখানে মঞ্চ অবধায়কের কাছ থেকে সঙ্কেত পাঠানোর ব্যবস্থা রাখা দরকার।

দীপচিত্রণ-সংকেত

মহলার সময়েই আলোকসম্পাতের খসড়া তৈরী থেকে সুরু করে **দীপচিত্রণ-সংকেত** তৈরী শেষ করে নেওয়া উচিত। ঐ সংকেত অনুসারে একবার অন্তত: মহলা দিলে, সংকেতের ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা পড়তে পারে। সংকেতলিপিতে প্রধানতঃ উল্লেখ করা হয়, আলোকের প্রখরতা, পরিবেশন এবং বর্ণ

পরিবর্তনের 'সময়' এবং 'ধরণ'। 'পরিবর্তনীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা'র ক্ষেত্রে ডিমার বা বাতীর প্লাগ-পরিবর্তনের নির্দেশও যথাস্থানে লিপিবদ্ধ রাখতে হয়। ছোট ছোট বা জড়ানো অক্ষরে বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করা উচিত নয়; কারণ কাজের সময় স্বল্প আলোকে নির্দেশ অনুধাবন করা দুরুহ হয়ে ওঠে।

সংকেত লিপিবদ্ধ করার কাজটি দুইভাবে করা যায়। সহজ উপায়, মূল পাণ্ডুলিপির একটি নকল নিয়ে, তার মার্জিনে আবশ্যকীয় নির্দেশগুলি টুকে রাখা। এক্ষেত্রে নির্দেশগুলিকে সংক্ষিপ্ত করার জন্য, ব্যবহৃত

[চিত্র ৪১.২] সচরাচর ব্যবহৃত আলোকসূত্র ও নিয়ন্ত্রণযন্ত্রগুলির শ্রেণীগত প্রতীক

আলোকযন্ত্রগুলির শ্রেণীগতভাবে এক একটি প্রতীক [চিত্র ৪১.২] ঠিক করে নিলে কাজের সুবিধা হয়। একই শ্রেণীর একাধিক যন্ত্রের ক্ষেত্রে, তাদের অবস্থানগত পরিচিতি [বাম, মধ্য বা দক্ষিণ—সংক্ষেপে বাঃ, মঃ এবং দঃ], মঞ্চভাগের পরিচয় [নিম্ন বা ঊর্দ্ধরঙ্গ—সংক্ষেপে নিঃ এবং উঃ]

এবং ক্রমিক সংখ্যা [১, ২, ৩, ইত্যাদি] দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত করা দরকার। সেইসঙ্গে ব্যবহৃত বর্ণমাধ্যমের কথাও উল্লেখ করতে হয়।

দ্বিতীয় উপায়, পৃথক সংকেতলিপি প্রস্তুত করা। এক্ষেত্রে বিভিন্ন যন্ত্রের জন্য পৃথক স্তম্ভ [চিত্র ৪১.৩] তৈরী করে নিতে হয় একটি বড় কাগজে। বাম দিকের একটি স্তম্ভে লিখে নেওয়া হয় সংকেত বাক্য বা ঘটনার কথা। এরপর যেক্ষেত্রে যে যে যন্ত্র কাজ করবে, তাদের স্তম্ভে পরিবর্তনের নির্দেশ লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই পরিবর্তনের নির্দেশনামা সংক্ষেপিত করার জন্য প্রতীকও ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য এসম্পর্কে কোনও বাঁধাধরা প্রতীকের প্রচলন নেই। নিজস্ব প্রতীক ঠিক করে নিলে, সংকেলিপির গোড়ায় সেই প্রতীকগুলির একটি

দীপচিত্রণ

অঙ্ক ....

দৃশ্য ....

স্থান ও কাল ....

নাটক ....

ক্রমসংখ্যা	সংকেত	রঙ্গপ্রদীপসমূহ						
		[illegible] ১	[illegible] ২	[illegible] ১	[illegible] ২	[illegible] ১	[illegible] ২	[illegible]
				এ্যাম্বার	সবুজ			লা/স

[চিত্র ৪১.৩] দীপচিত্রণের আদর্শ সংকেতলিপির স্তম্ভশীর্ষকসমূহ

পরিচয়-লিপি রাখা উচিত। বর্ণমাধ্যমের ব্যবহার লিপিবদ্ধ করার জন্যও সংকেতলিপিতে নির্দিষ্ট স্থান আছে।

বিশেষভাবে স্মরণে রাখা দরকার, পর্দা বা দৃশ্যপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যপটসহ আলোকসম্পাতের মূল বক্তব্যটি যেন নিমেষের মধ্যে ধরা পড়ে। এর জন্য, মূল বক্তব্যটি প্রত্যেক দৃশ্যের সুরুতে লিখে রাখা উচিত। এই মূল বক্তব্য বলতে ঘটনার **স্থান** ও **কাল** সম্পর্কে সম্যক পরিচয় জ্ঞাপনকেই বোঝানো হচ্ছে। নাটকের প্রয়োজনে যে কোনও স্থানেরই

দৃশ্যপট নির্মিত হতে পারে ; সম্বৎসরের যে কোনও ঋতুতে, যে কোনও সময়ে ঘটনাটি ঘটতে পারে। তবে কাজের সুবিধার জন্য স্থান ও কালকে মাত্র চারটি শ্রেণীতে ভাগ করে নেওয়া হয়েছে; এবং সেগুলি হচ্ছে—(ক) দিবালোকে বহির্দৃশ্য, (খ) বহির্দৃশ্যে রাত্রি, (গ) দিবালোকে আভ্যন্তরীণ দৃশ্য এবং (ঘ) আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে রাত্রি।

আলোকনিয়ন্ত্রণের সময় বাতীর প্রখরতা কমানো বা বাড়ানোর মতো, জ্বালানো বা নেভানোর কাজও মসৃণভাবে সম্পন্ন করার জন্য, ডিমারের সাহায্যে করা হয়। মহলার সময়, বিভিন্ন পরিবর্তনের কালে ডিমারের হাতল কোন অবস্থানে রইছে, তা মার্কিং ডায়াল দেখে টুকে রাখা উচিত। একমাত্র যেখানে সরাসরি সুইচ টিপে আলো জ্বালা বা নেভানোর নির্দেশ দেওয়া থাকে নাটকে, সেখানেই কয়েকটি বাতীকে

সংকেতলিপি

পৃষ্ঠা -----

মূলপাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠাঙ্ক -----

সূত্রপ্রদীপসমূহ					পটপ্রদীপসমূহ				মন্তব্য
[illegible]	[illegible]	[illegible]	কারম্যাজিকল		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]					
নীল	ল্যা-হ		নীল	কমলা	পিংক	নী-স			

এবং আলোকযন্ত্র ও বর্ণমাধ্যমের বিবরণী লেখার নমুনা

গ্রুপ করে সুইচের সাহায্যে নেভানো যেতে পারে। প্রক্ষেপবাতীযুক্ত কোনও আলোকযন্ত্র পারতঃপক্ষে সুইচের সাহায্যে জ্বালানো বা নেভানো উচিত নয়। সুইচের ব্যবহার প্রক্ষেপবাতীর জীবনসীমা কমিয়ে দেয়—অনেকক্ষেত্রে সুইচ ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বাতীটি কেটে যেতে পারে।

ডিমার ও সুইচের সাহায্যে উপরোক্ত কাজগুলি করা ছাড়া, আরও যে কয়টি কাজ নিয়ন্ত্রক অথবা তার সহকারীদের করতে হয় সেগুলি

হচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকানো জাতীয় কারসাজির প্রয়োজনে বাতীগুলি **ঘন ঘন জ্বালানো-নেভানো,** রশ্মিকোণের ব্যাপ্তি **প্রশস্ত** বা **সংহত** করা, বর্ণমাধ্যম **বদল করা** এবং অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে রশ্মিধারায় **অনুসরণ করা** প্রভৃতি। অনেক সময় বিশেষ কোনো নিয়ন্ত্রণের কাজটি একাধিক সংকেত অতিক্রম করে চলতে থাকে। যেমন, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে আলো কমে আসা, অথবা ঝড় বৃষ্টির নির্দেশক বিদ্যুৎচমক প্রভৃতি চলা কালীন, আরও অনেক ছোটখাটো পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। সংকেতলিপিতে এগুলিও যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

দীপচিত্রণ সংকেতে সচরাচর যে পরিবর্তনগুলি লিপিবদ্ধ করতে হয়, সেগুলির জন্য ব্যবহৃত চিহ্নাদির একটি নমুনা নীচে [চিত্র ৪১.৪] দেওয়া হলো। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, আলোচ্য চিহ্নগুলি গ্রন্থকার কর্তৃক প্রবর্তিত মৌলিক প্রতীক।

✓ বাতী সুইচের সাহায্যে জ্বালাতে হবে X বাতী সুইচের সাহায্যে নেভাতে হবে 0, ১/৪, ১/২, ৩/৪ পূর্ণ [বা ইংরাজীতে F] :- ডিমারের সাহায্যে বাতী জ্বালানো-নেভানো বা কমানো-বাড়ানোর নির্দেশ	ঘন ঘন জ্বালানো-নেভানো লা > নী বর্ণমাধ্যম পরিবর্তনের সংকেত [এখানে লালের বদলে নীল লাগাতে বলা হচ্ছে] রশ্মি-সংহতি ঘটাতে হবে রশ্মি-ব্যাপ্তি ঘটাতে হবে	চিহ্নিত অংশ জুড়ে পরিবর্তনের কাজ চলবে

[চিত্র ৪১.৪] দীপচিত্রণ সংকেতলিপির প্রয়োজনে ব্যবহৃত পরিবর্তন নির্দেশক চিহ্নাবলী

নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশাদি সংকেতলিপির **মন্তব্য**-শীর্ষক স্তম্ভে লিখিত হবে। এছাড়া, নাটকের নাম, দৃশ্য ও অঙ্ক পরিচিতি, মূল পাণ্ডু-লিপির পৃষ্ঠাঙ্ক লিপিবদ্ধ করতে হবে সংকেতলিপির উপরে; নীচে থাকবে আলোকসম্পাত পরিকল্পনাকারী, নিয়ন্ত্রক এবং নাট্য পরিচালকের স্বাক্ষর। আলোচিত সংকেতলিপি লিখন প্রণালীতে [চিত্র ৪১.৩] **সম্পাত-সঙ্কেত** এবং **বিন্যাস-সংকেত** একত্র ধরা হয়েছে।

মূলসূত্র অভিনেতাকে দর্শকের সামনে পরিস্ফুট করে তোলার জন্য যে আলোকসূত্র মুখ্যত: কাজ করে, তাকে **মূলসূত্র** বলে। এই মূলসূত্রের কয়েকটি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন। সর্বপ্রধান গুণ হিসাবে বলা যেতে পারে যে, এই বিশেষ সূত্রটির আলোক-পরিবেশনের **দিক** হবে **সুনির্দিষ্ট,** এবং সম্মুখের কোনও দিক ; **বর্ণ** এবং **ঔজ্জ্বল্য** হবে অন্যান্য আলোকসূত্রের তুলনায় লক্ষ্যণীয়। নাটকের প্রয়োজন অনুসারে আলোকের বিশেষ চরিত্র যেন ধরা পড়ে মূলসূত্রের মাধ্যমে।

যে সব আলোকযন্ত্রের সাহায্যে সীমাবদ্ধ স্থানে আলোকসম্পাত করা যায়, সেই সব যন্ত্রই মূলসূত্রের পক্ষে উপযোগী। মঞ্চের সম্মুখ থেকে যে সব স্পটবাতী ব্যবহৃত হয়, অথবা মঞ্চমুখের পিছনে, তোরণের উপরে বা উঁচু ধারকে দাঁড় করানো স্পটবাতীগুলি মূলসূত্র হিসাবে চমৎকার কাজ করে। বলা বাহুল্য, ঝরি বা পাদপ্রদীপ মূলসূত্র হিসাবে অচল।

উপসূত্র মূলসূত্রের দ্বারা আলোকিত বস্তুতে কি পরিমাণ ছায়ার অংশ থাকবে, তা নির্ভর করে **উপসূত্র** ব্যবহারের উপরে। উপসূত্রের ঔজ্জ্বল্য, বর্ণ, পরিবেশন যদি মূলসূত্রের সমান হয়, তবে ছায়ার পরিমাণ সর্বতোভাবে কম হবে। দুই শ্রেণীর সূত্রের মধ্যে চরিত্রগত পার্থক্য যত বৃদ্ধি পাবে, আলোকিত বস্তুর উপরে আলোছায়ার বৈচিত্র্য সৃষ্টি হবে তত বেশী। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, মূলসূত্রের আলোকবিন্যাসকে উপসূত্রই সার্থক করে তোলে।

মূলসূত্রকে লক্ষ্যণীয় রাখার জন্য, উপসূত্রের চরিত্রকে ম্লানতর রাখা দরকার—শ্রেষ্ঠ উপায়, বর্ণের দিক থেকে উপসূত্রকে মূলসূত্রের প্রতিপূরক করে রাখা। মূলসূত্রের যেমন দিক, ঔজ্জ্বল্য ও বর্ণের সুনির্দিষ্টভাব থাকে, উপসূত্রের ক্ষেত্রে এগুলি হওয়া উচিত বিপরীতধর্মী ; অর্থাৎ, দিক হবে একাধিক, ঔজ্জ্বল্য হবে তারতম্যযুক্ত, এবং বর্ণে রইবে প্রতিপূরক বর্ণের বিশ্লেষিত রূপ। তবে এসবই নির্দ্ধারিত হবে, আলোকিত বস্তু বা ব্যক্তির উপরে নাটকীয় দীপচিত্রণের চাহিদা অনুযায়ী।

সীমালোক বস্তু বা ব্যক্তির পশ্চাদ্দীপনের কৌশলযুক্ত প্রয়োগের সাহায্যে কয়েকটি সীমারেখাকে উজ্জল করে তোলার নাম **সীমালোক**-আলোকসম্পাত। সবক্ষেত্রেই যে এ ধরণের আলোকসম্পাতের

প্রয়োজন হয়, তা নয়—তবে এই ধরণের সংযুক্তি, দৃশ্যবস্তুর সার্থক চিত্র-রূপদানে অনেকখানি সাহায্য করে।

মঞ্চে অন্যান্য বিভিন্ন সূত্রে ব্যবহৃত বাতীর চেয়ে 'সীমালোক'-এর জন্য ব্যবহৃত বাতীর ঔজ্জ্বল্য তীব্রতম হওয়া দরকার। উচ্চালোকিত অংশের প্রখরতা, অবশিষ্ট অংশের তুলনামূলক ঔজ্জ্বল্যের উপরে নির্ভর করে। এই অংশের পরিবেশন নির্ভর করে, দৃষ্টিরেখার সঙ্গে আলোকরেখার দ্বারা উৎপন্ন কোণের উপরে। ভূমিসমান্তরালগামী দৃষ্টিরেখার উপরে ১২০ ডিগ্রী থেকে ১৫০ ডিগ্রী কোণে এসে পড়া আলোর সাহায্যেই সীমালোকের কাজ সবচেয়ে ভালোভাবে সম্পন্ন হয়।

সার্থক চিত্ররূপদানের কথা বাদ দিলেও, সীমালোকের আর একটি বিশেষ অবদান, কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করা। উপযুক্ত সীমালোক-আলোকবিন্যাসের দ্বারা, খোলা চুলগুলিকে ঝলমলে করে তোলা যায়।

পূর্তি বা আলোক প্রলেপ

মূলসূত্র, উপসূত্র বা সীমালোকের আলোকবিন্যাসে স্পট-বাতীর ব্যবহার অপরিহার্য্য। সুনির্দিষ্ট সীমাযুক্ত এই জাতীয় আলোকসম্পাতের কৃত্রিমতা লুপ্ত করে, বিভিন্ন স্পটবাতীর রশ্মিগোলকগুলিকে যুক্ত করার জন্য **পূর্তি বা আলোক প্রলেপের** প্রয়োজন। পাদপ্রদীপই এই শ্রেণীর আলোক-বিন্যাসে শ্রেষ্ঠ উপকরণ। পাদপ্রদীপালোক যে শুধু মূলসূত্র ও উপসূত্রের দ্বারা স্বষ্ট ছায়াগুলিকে মৃদ করে দেয়, তাই নয়—মঞ্চের অন্যান্য আলোক-সূত্রের তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন দিক থেকে আসে বলে, এর গুরুত্ব অনস্বীকার্য্য। বলা বাহুল্য, পূর্তির জন্য নিয়োজিত আলোকসূত্রের ঔজ্জ্বল্য হবে সবচেয়ে কম, এবং এখানে বহু বর্ণের সমাবেশ ঘটানো দরকার, যার ফলে কোনও বিশেষ বর্ণই প্রাধান্য পাবে না।

অনেক সময় এই পূর্তির জন্য একাধিক ঝরি কাজে লাগানো হয়। সেক্ষেত্রে প্রত্যেক ঝরিতে পৃথক বর্ণের বাতী ব্যবহার করা উচিত। মঞ্চের সম্মুখ থেকে পশ্চাৎভাগ পর্য্যন্ত বর্ণের এই স্তর বিন্যাসের দ্বারা পূর্তির কাজ সুন্দরভাবে সাধিত হয়।

দিবালোকে বহির্দৃশ্য

বহির্দৃশ্যে দিনের আলো বোঝাতে হলে, আলোয় ভরিয়ে তোলা গোছের ভাব স্বষ্টি করতে হবে। আলোক-সম্পাতকারীর পক্ষে সবচেয়ে অসুবিধাজনক অবস্থা,

বহির্দৃশ্যে দুপুরবেলা সৃষ্টি করা। প্রথমতঃ, যত বাস্তবানুগ করেই দৃশ্যপট গড়া হোক না কেন, বর্ণহীন এবং ছায়াবিহীন আলোকসম্পাতের মাঝে তার কৃত্রিমতা ধরা পড়বেই। দ্বিতীয়তঃ, উপরের ঝালর, পার্শ্বপট, বলয়পট প্রভৃতি কোনো কিছুকেই প্রচুর আলোর মাঝে বাস্তব দৃশ্যসজ্জার সঙ্গে খাপ খাওয়ানো সহজ হবে না।

মাঝারী রশ্মিকোণযুক্ত ফ্লাডবাতী বা প্রদীপ ভাণ্ডারকে পূর্ণ প্রখরতায় রেখে এই **দুপুরের আলো** সৃষ্টি করা হয়। চোঙা দিয়ে আলোকবিচ্ছুরণকে কিছুটা সংযত করে নেওয়া যেতে পারে। সামান্য রঙিন আভাষ আনার প্রয়োজনে, রঙ্গপ্রদীপে ৫১ নং সোনালী টিণ্ট বা ৫২ নং ফ্যাকাশে সোনালী বর্ণমাধ্যম ব্যবহার করা যায়। অন্যান্য রঙিন ঝরিগুলি পূর্ণ প্রখরতায় একযোগে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। সূর্য্যের কিরণ বোঝানোর জন্য ৫০ নং ফ্যাকাশে হলুদ ব্যবহার করা যেতে পারে।

মঞ্চের আলোকসম্পাত প্রখরতার দিক থেকে সত্যকার দিবালোকের কতখানি সমকক্ষ হলো, তা দেখার প্রয়োজন নেই—দিনের কতটা সৌন্দর্য্য ফোটানো সম্ভব হলো, সেদিকেই দৃষ্টি দেওয়া উচিত। রঙিন বলয়পট এ্যাম্বার বা হলুদ রঙে আলোকিত করা উচিত নয়। একমাত্র দিনটিকে অপ্রসন্ন বা অস্বস্তিকর বোঝানোর জন্য ঐ দুটি রঙ ব্যবহার করা যেতে পারে।

আকাশের একঘেঁয়েমী কাটাতে মেঘের জুড়ি নেই। বলয়পটে কয়েক টুকরো মেঘ জুড়ে দিলেই, নানা রকমের রঙ ব্যবহার করার অপূর্ব সুযোগ এসে যায় হাতে।

খুব **সকালবেলা**। সূর্য্য এখনও ওঠেনি। ঝরি থেকে অল্প পরিমাণে শীতলবর্ণের আলোয় দৃশ্যপট ফুটিয়ে তুলে, যে কোনও এক পাশ থেকে উষ্ণবর্ণের আলোকরশ্মি ক্রমশঃ চাপিয়ে দিতে হবে। আস্তে আস্তে দিন বাড়ার সঙ্গে উষ্ণবর্ণের আলোকসূত্রের রঙ পরিবর্তিত হয়ে চলবে সোনালীর দিকে, এবং সেই সঙ্গে ঝরির প্রখরতা বাড়তে সুরু করবে।

শীতকালের **কুয়াশাচ্ছন্ন সকালবেলা**র দৃশ্যে উষ্ণবর্ণ ব্যবহৃত হবে না, এবং বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, ছায়া সৃষ্টিকারী কোনও আলোকসূত্র যেন কার্য্যকরী না থাকে। প্রয়োজনবোধে পাদপ্রদীপের তীব্রতা এই একই কারণে বাড়িয়ে দিতে হবে।

আলোকসম্পাতকারীর কাছে **সূর্য্যোদয়** এবং **সূর্য্যাস্তের** দৃশ্য দেখানো একটি চরম কৌতুহলোদ্দীপক কাজ। সাধারণ দুপুরের দৃশ্য ফোটানোর

তুলনায় এগুলি কষ্টকর নয়। সূর্য্যের উদয় এবং অস্ত বিভিন্ন দৃশ্যে থাকলেও, এ দুয়ের পরিবেশনগত পার্থক্য থাকা উচিত। সাধারণতঃ রঙ্গপীঠের যে কোনও একটি পাশকে সূর্য্যোদয়ের দিক হিসাবে ধরে নেওয়া হয়। সাধারণ আকারের মঞ্চে এরজন্য ১000 ওয়াট বাতীযুক্ত একটি ক্রমবিলীয়মান-সীমাবিশিষ্ট লণ্ঠন ব্যবহার করা যেতে পারে মূলসূত্র হিসাবে। প্রথমে কেবল ঝরি থেকে আস্তে আস্তে উজ্জলতা বাড়িয়ে রঙ্গপীঠ আলোকিত করে তুলতে হবে। তারপর মূলসূত্রের উজ্জলতা বৃদ্ধির সাথে, বলয়পটের উপরি-অংশে ফুটিয়ে তুলতে হবে লালচে পিঙ্কের ঈষৎ আভা। বলয়পটে থাকবে মৃদু ঠাণ্ডা রঙের আলো। মূলসূত্রে বিয়োগান্তক মিশ্রণ প্রণালীতে ১0 নং—৩৩ নং রঙিন মাধ্যম ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। এরপর মঞ্চের অন্যান্য আলোগুলি বাড়তে বাড়তে যখন রঙিন আভা সম্পূর্ণ ডুবে যাবে, তখন মূলসূত্রটি সরিয়ে নেওয়া চলতে পারে।

বলয়পটের দিকটিকে সূর্য্যাস্তের দিক বলে ধরে নেওয়া হয়। বলয়-প্রদীপমালায় তিনটি মৌলিক বর্ণের মাধ্যমে, এবং পিছনের ঝরিতে ৫ (ক) নং গাঢ় কমলা, ১৬ নং নীলাভ-সবুজ এবং ২0 নং ঘননীল ব্যবহার করে, সূর্যাস্তকালীন আকাশের বিচিত্র বর্ণচ্ছটা সাফল্যের সঙ্গে দেখানো যায়।

সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত দেখানোর জন্য মঞ্চে সর্ববাদিসম্মতভাবে এই প্রচলিত প্রথা মেনে চলার পিছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। এর ফলে, আলোর প্রখরতা ক্রমশঃ হ্রাসের দিকে, না বৃদ্ধির দিকে চলেছে বুঝে নেওয়ার আগেই, সময় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ধারণায় আসা সম্ভব হয়। বহু দৃশ্যেই ঘটনাপ্রবাহ আলো কমে যাওয়া বা বেড়ে ওঠার অপেক্ষা রাখে না। তবে, কিভাবে এই দিক দুটির ব্যবহার সুনির্দিষ্ট হলো, এবং কেন হলো, এ সম্পর্কে তত্ত্বমূলক কোনও কারণের সন্ধান পাওয়া যায়নি। মনে হয়, সূর্য্যোদয়ের দৃশ্য বলয়পটে দেখাতে হলে, প্রয়োজনের তাগিদে পশ্চাৎপটকে ক্রমাগত উজ্জলতর করে তোলার দ্বারা, রঙ্গপীঠের প্রাধান্য নষ্ট করার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। অন্যপক্ষে, সূর্য্যাস্তের ক্রমশঃ নিস্তেজ হয়ে আসা আলোর সঙ্গে বর্ণবৈচিত্রের সংযোগ, রঙ্গপীঠের প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ রেখেই মনোরম পশ্চাৎপট সৃষ্টি করে।

বলয়পট তথা সমুদয় মঞ্চ জুড়ে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের এই কারসাজি দেখাতে হবে ডিমারের সাহায্যে। নির্দিষ্ট আলোকসূত্র ও ডিমার নিয়ে পূর্বাহ্নে যথেষ্ট অভ্যাস করে নেওয়া দরকার, যেন পরিবর্তনগুলি মসৃণভাবে

সাধিত হয়। আচমকা আলোর উজ্জ্বলতা বৃদ্ধি বা হ্রাসজনিত ত্রুটি সাবধানতার সঙ্গে কাটিয়ে উঠতে হবে। মহলার সময় ঘটনার অগ্রগতি ও সমাপ্তির সময় সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়ে নেওয়া দরকার। নচেৎ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে আলোকসম্পাতের কৌশল দেখানোর কাজ না হওয়া, বা আগেই শেষ হয়ে যাওয়া, উভয় ব্যাপারই আলোকসম্পাতকারীর ত্রুটি হিসাবে গণ্য হবে।

বহির্দৃশ্যে রাত্রি

রাতের কালো আকাশ ফুটিয়ে তোলার জন্য শুধু সব আলো নিভিয়ে দিলেই চলবে না। ২০ নং নীল, ডিমারের এক বা দুই-দশমাংশ অবস্থানে জ্বালিয়ে রাখতে হবে। সামান্য এইটুকু আলোর সংযুক্তি অন্ধকারকে গাঢ়তর করে তুলতে অনেকখানি সাহায্য করে।

অন্ধকারকে অন্ধকার বলে বোঝানোর আর একটি সহজ উপায়, তুলনা-মূলক অন্য বর্ণের আলোকসূত্র নিম্নরঙ্গে উপস্থাপিত করা। রাস্তার আলো, শিবিরে জ্বালানো আগুন, ঘসাকাচের জানালা দিয়ে বেরিয়ে আসা বাড়ীর আলো প্রভৃতি এই কাজে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায়। যেখানে এই জাতীয় কোনও সূত্রই কাজে লাগানোর সুবিধা থাকে না, সেখানে নিম্ন রঙ্গপীঠে নীলের মাত্রা কিছুটা বাড়িয়ে দিয়ে কাজ চালাতে হয়। আসল কথা, তুলনামূলক উজ্জ্বলতার উপস্থিতি ছাড়া অন্ধকারের বোধ জাগানো কষ্টকর। সম্ভবপর ক্ষেত্রে কয়েকটি তারা, বা ঝড়ের কালোমেঘের সংযুক্তি, রাত্রির আকাশকে ছবির মতো ফুটিয়ে তুলতে অনেকখানি সাহায্য করে।

রাত্রির দৃশ্যে খুব বেশী নীল রঙের ব্যবহার কিন্তু ত্রুটিজনক। ২০ নং মৌলিক নীলের ব্যবহারই যথাযথ; তবে নানা অছিলায় ভিন্ন ধর্ম্মী কিছু রঙের উপস্থিতি, পরিবেশের একঘেঁয়েমী কাটিয়ে তুলবে।

পাদপ্রদীপমালাকে রাত্রিকালীন বহির্দৃশ্যে যতটা সম্ভব ঢেকে রাখা দরকার, যেন স্বল্পালোকিত বলয়পটে কোনো অবাঞ্ছিত ছায়ার সৃষ্টি না হয়। পাদপ্রদীপের জন্য ব্যবহৃত বর্ণমাধ্যমগুলির উপরের দুই-তৃতীয়াংশ বন্ধ করে রাখলে, এই কাজটি সহজ হয়ে ওঠে।

চাঁদের আলো বোঝানোর জন্য, সুনির্দিষ্ট রশ্মিরেখাযুক্ত একটি বা একজোড়া স্পটবাতী ফ্লাইগ্যালারীর মতো উঁচু যায়গায় বসিয়ে, রঙ্গপীঠে

আলো ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। এই কাজে ৩১ নং ফ্রন্টযুক্ত ১০০০ বা ৫০০ ওয়াটের ফোকাশ লণ্ঠণ খুব কার্য্যকরী। ফ্ল্যাড বা স্থূল রশ্মি-কোণবিশিষ্ট স্পটবাতী ব্যবহার করা উচিত নয়—এর ফলে ছায়াগুলি ছড়িয়ে যায়।

বড় রঙ্গমঞ্চে, যেখানে সারবন্দী পার্শ্বপটশ্রেণীর পিছন থেকে চাঁদের আলো এসে পড়ার কথা, সেখানে প্রতি জোড়া পার্শ্বপটের মাঝখান দিয়ে পৃথক পৃথক সূত্রপ্রদীপ মারফত চাঁদের আলো ফেলার ব্যবস্থা রাখতে হবে। অন্যথায়, পার্শ্বপটগুলির দীর্ঘ ছায়া পড়বে রঙ্গপীঠের উপর।

চাঁদের আলোর বর্ণ, স্বাভাবিক অবস্থায় মৃদু শীতল সাদা রঙ। এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট, ঘন ছায়া সৃষ্টি করা, এবং আলোছায়ায় পূর্ণমাত্রায় সাদাকালো ভাব ফুটিয়ে তোলা। কৃত্রিম উপায়ে ১৭ নং ষ্টীল নীল বর্ণমাধ্যম ব্যবহারের দ্বারা অনেকাংশে চাঁদের আলোর নকল করা যায়। চাঁদের আলোয় দেখানোর জন্য পৃথক দৃশ্যপট ব্যবহার করার সুযোগ থাকলে, দৃশ্যপট, পোষাক এবং রূপসজ্জার যাবতীয় কাজ সাদা ও কালো রঙে সম্পন্ন করে, উপর্য্যুপরি চাপানো দুটি ১৭ নং ষ্টীল নীল বর্ণমাধ্যমের মারফত আলোকিত করা যেতে পারে। চাঁদের আলো বোঝানোর জন্য এর চেয়ে প্রকৃষ্টতর উপায় আর নেই। অন্যান্য রঙের উপস্থিতিতে, চাঁদের আলোটি মৃদু দিনের আলো বলে ভুল হওয়া খুবই সম্ভব।

অন্যান্য রঙের উপস্থিতি রোধ করা সম্ভব না হলে, ৪০ নং নীল অথবা ৪০ নং—৫০ নং বর্ণমাধ্যম ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে অন্যান্য রঙগুলি চাপা পড়ে যাবে, এবং এ্যাম্বার বা লাল রঙের বিশেষ কোনও পার্থক্যসৃষ্টিকারী আলোর উপস্থিতি না থাকলে, পরিবেশে নীলাভ ভাবও যথেষ্ট মৃদু রইবে।

আকাশে চাঁদ দেখানোর বিষয়টি কারসাজির পর্য্যায়ে পড়ে। পৃথক পরিচ্ছেদে এসম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দিবালোকে আভ্যন্তরীণ দৃশ্য

গৃহাভ্যন্তরীণ দৃশ্যে ঝালরের বদলে সিলিংয়ের ব্যবহার আজকাল যথেষ্ট পরিচিতি লাভ করেছে। সিলিং ব্যবহৃত হওয়ার ফলে, রঙ্গপীঠে আলো আসার একটি মাত্র দিক বাকী থাকে—সেটি হচ্ছে মঞ্চমুখের দিক। সব অবস্থাতেই মূলসূত্র ব্যবহারের পিছনে যুক্তি থাকা দরকার। এক্ষেত্রেও

মূলসূত্রটি নির্দিষ্ট করার আগে, গৃহাভ্যন্তরে প্রাকৃতিক আলো কোন দিক থেকে আসছে, তা ঠিক করে নেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। বলা বাহুল্য, অধিকাংশ আলোকসূত্রই যখন মঞ্চমুখের দিকে ছাড়া অন্যত্র ব্যবহার করার সুযোগ নেই, তখন কাল্পনিক আলোকের উৎসটিকে মঞ্চের পিছন দিকে কল্পনা করে নেওয়ার কোনও কারণ থাকতে পারে না। রঙ্গপীঠের যে কোনও পার্শ্ববর্তী খোলা জানালাগুলিকে আলোকের উৎসরূপে ব্যবহার করাই সবচেয়ে সুবিধাজনক।

জানালার ভিতর দিয়ে আসা আলোকরশ্মির জন্য মাঝারী বা চওড়া মুখযুক্ত ফ্লাডবাতী ব্যবহার করা উচিত নয়। এসব কাজে সংহত রশ্মি-প্রক্ষেপণকারী লণ্ঠনই প্রযোজ্য। জানালার 'আড়াল'গুলিকে আলোকিত করার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হবে। ঊর্দ্ধরঙ্গে অবস্থিত জানালা-গুলির জন্য বলয়পটই ভালো আড়ালের কাজ করতে পারে। রঙ্গপীঠের পাশের আনালাগুলির জন্য পৃথক 'আড়াল' আবশ্যক, এবং লক্ষ্য রাখতে হবে, আড়ালগুলির উপরে পতিত আলো যেন মূল আলোকসম্পাতের সঙ্গে সুরে মেলে। কদাচিত একই শ্রেণীর অনেকগুলি আড়াল জোগাড় করা সম্ভব হয়; তাই সম্ভবপর ক্ষেত্রে জানালায় নেট বা অনুরূপ পাতলা কাপড়ের পর্দার ভিতর দিয়ে আলো আসার ব্যবস্থা রাখলে, আড়ালগুলির গঠন বা বর্ণগত পার্থক্য, ত্রুটি হিসাবে দৃষ্টিগোচর হবেনা। জানালার বিপরীত দিকের দেয়ালের জন্য অতিরিক্ত উজ্বলতার ব্যবস্থা রাখতে হবে। সিলিংয়ের জন্যও বিশেষ আলোর ব্যবস্থা রাখা দরকার—তবে এর উজ্বলতা হবে মৃদু, এবং ভাবটা হওয়া উচিত ছড়ানো গোছের। পাদপ্রদীপমালা বা বিশেষভাবে উপরদিকে মুখ করে বসানো ফ্লাডবাতী এক্ষেত্রে ভালো কাজ দেয়।

সূত্রপ্রদীপগুলি নির্দ্ধারিত হওয়ার পরে, রঙ্গপ্রদীপ সাজানো দরকার। দিনের দৃশ্যে আলোর ছড়ানো ভাবটি রঙ্গপ্রদীপেও রাখতে হবে। প্রয়োজন বোধে, রঙ্গপ্রদীপের তীব্রতা বাড়াতে হলে, সূত্রপ্রদীপেরও তীব্রতা বাড়ানো উচিত—অর্থাৎ উভয়ের তুলনামূলক পার্থক্য যেন আগাগোড়া এক থাকে।

রঙ্গপ্রদীপগুলির বর্ণ ও পরিবেশন যেন সূত্রপ্রদীপের বর্ণ ও পরিবেশনের পরিপন্থী না হয়। সমগ্রদৃশ্যে প্রধান আলোকসূত্র [এক্ষেত্রে কল্পিত সূর্য্য] যেন একটি সুনির্দিষ্ট দিকে আছে, এই ভাবটি বজায় রাখতে হবে।

আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে রাত্রি

রাত্রিকালীন আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে আলোকসূত্রের কৈফিয়ত হিসাবে, সত্যকার কিছু আলোর ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে দৃশ্যপটের সঙ্গে। টেবিলল্যাম্প, ঝোলানো বাতী, দেয়ালে ব্র্যাকেট আলো, হ্যারিকেন, মোমবাতী অথবা পুরাতন যুগের ঝাড় বা দেয়ালগিরি এই জাতীয় আলোর ব্যবস্থার মধ্যে পড়ে। দৃশ্যপটের সঙ্গে সংযুক্ত অবস্থায় থাকলে এগুলিকে **আসবাব বাতী** বা 'ফিক্সচার' বলে। ভালোভাবে ঢাকা দেওয়া বা রঙ করে নেওয়ার উপায় না থাকলে, এগুলিতে ১৫ ওয়াটের বেশী শক্তিসম্পন্ন বাতী লাগানো উচিত নয়। যে ভাবেই ব্যবহৃত হোক না কেন, লক্ষ্য রাখতে হবে, বাতীর উজ্জ্বলতা যেন সরাসরি দর্শকের চোখে পীড়ার সৃষ্টি না করে। তুলনামূলকভাবে যথেষ্ট কম শক্তিসম্পন্ন হলেও, সামান্যতম আলোকসূত্র সরাসরি চোখের সামনে থাকলে, সেটিই বেশী উজ্জ্বল বলে মনে হবে—বাকী তথা মুখ্য অংশেরই প্রাধান্য যাবে কমে।

আসবাব বাতী ব্যবহৃত হলে, অভিনেতাকে আলোকিত করার কাজে ব্যবহৃত মূলসূত্রের দিকটিও যেন তার সঙ্গে ঐকতান বজায় রাখে, সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। টেবিলল্যাম্প জাতীয় ঢাকাযুক্ত আসবাব বাতীতে বেশী ওয়াটের বাতী লাগিয়ে, ল্যাম্পটিকেই মূলসূত্র হিসাবে ব্যবহার করা সুবিধাজনক। প্রয়োজনে ৫৫, ৫৬ বা ৬০ নং 'প্রভাবহীন' বর্ণমাধ্যম ব্যবহার করে, শেডের দিকে বাতীর তীব্রতা কমিয়ে দেওয়া চলে। অনুরূপভাবে চুল্লী থেকে আসা জ্বলন্ত আগুনের আভাও চুল্লীর ভিতরেই সৃষ্টি করা যায়। এসম্পর্কে বিশদ আলোচনা 'কারসাজি' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে কৃত্রিম আলোর বর্ণ, দিনের আলোর চেয়ে উষ্ণতর রাখতে হবে। তুলনামূলকভাবে রশ্মিগুলিও সুসংহত হওয়া দরকার। প্রচলিত ধারায়, দিবালোকের ক্ষেত্রে ফ্ল্যাডবাতীর আলোক-সম্পাতকে সাহায্য দেওয়ার জন্য ফোকাশ লণ্ঠণ ব্যবহার করা হয়; রাত্রির দৃশ্যে ফোকাশলণ্ঠনের আলোকসম্পাতে সাহায্য দানের জন্য ফ্ল্যাডবাতীর দরকার পড়ে। রাত্রিকালীন আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে দৃশ্যপটের উপরিভাগ এবং সিলিং সাধারণতঃ অন্ধকার রাখা উচিত। বর্ণমাধ্যম ব্যবহার করতে হলে, যেদিকে সরাসরি আলো পড়েছে, সেদিকে জোড়া ৫১ বা ৫২ নং এবং যেদিকে আলো পড়েনি, সেদিকে ৩ নং—৩৬ নং অথবা ২ নং—৩৬ নং ব্যবহার করা চলতে পারে।

পাদপ্রদীপমালার ব্যবহার একান্তই পরিহার করা সম্ভব না হলে, প্রখরতা যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে রাখা দরকার। লণ্ঠন বা মোমবাতী জাতীয় আলোকসূত্রের ক্ষেত্রে, সমুদয় রঙ্গপীঠ ও দৃশ্যপট আলোকিত করা উচিত নয়। এক্ষেত্রে নিম্নরঙ্গে এবং অভিনেতার মুখমণ্ডলে আলোকসম্পাতের জন্য রঙ্গমঞ্চের বাইরে লাগানো স্পটবাতীগুলি খুবই কার্য্যকরী।

যে ক্ষেত্রে বাস্তববোধ ফোটানোর প্রশ্ন ওঠে না, সেক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ রাত্রিকালীন দৃশ্যে ঘন রঙও ব্যবহৃত হতে পারে। দৃশ্যপটের পরিবর্তে যেখানে শুধু কালো পর্দার সম্মুখে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়, সেখানে ৮ নং পিঙ্ক, ৭ নং—২ নং অথবা ৭ নং—৩ নং বর্ণমাধ্যম ব্যবহারে সুফল পাওয়া যাবে।

ঘটনার দাবীতে বহুক্ষেত্রে ঘরের আলো নিভিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে। এসবক্ষেত্রে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার পরেও যদি অভিনয়ের গুরুত্ব থাকে, তবে প্রয়োজনানুসারে ঈষৎ নীলাভ আলো আগে থেকেই অনুজ্জ্বলভাবে পূর্ববর্তী আলোর সঙ্গে মিশিয়ে রাখতে হবে। অন্ধকার হওয়ার পরে, এই অনুজ্জ্বল আলো প্রয়োজনবোধে খুব আস্তে আস্তে বাড়িয়ে নেওয়া যেতে পারে। আড়ালের জন্য ব্যবহৃত আলোগুলি ঘরের আলো নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে বেশী উজ্জ্বল মনে হয়। যুক্তিহীন হলেও, বাতী নোভানোর সঙ্গে সঙ্গেই এগুলির উজ্জ্বলতা কমিয়ে দেওয়া দরকার।

ফোকাশ লণ্ঠনের আতসকাচ খুলে নিয়ে জাজ্-জিলেটিনের মাধ্যম ব্যবহার করলে, ঘসা কাচের ভিতব থেকে আসা আলোর আভাষ পাওয়া যায়। ঘসা কাচ সরাসরি দেখাতে হলে, দৃশ্যপটের জানালায় শক্ত করে আঁটা স্বল্পস্বচ্ছ **এলকাথিন,** পুরু বোনা **গজ** অথবা **ট্রেসিং পেপার** ব্যবহার করা যেতে পারে। বলা বাহুল্য, ঘসা কাচই ঘসা কাচের উপযুক্ত প্রতিনিধি। কিন্তু মঞ্চে ব্যবহারের জন্য কাচ মোটেই নিরাপদ নয়।

নৃত্যানুষ্ঠানে আলোক-সম্পাত

পাশ্চাত্য দেশসমূহে নৃত্যের ক্ষেত্রে দেহভঙ্গিমা এবং নৃত্যশিল্পীর গতির স্থান সবার আগে; মুখ ভঙ্গিমার প্রাধান্য দেওয়া হয় তার পরে। প্রধান আলোকসূত্রগুলিকে এর জন্য উভয়পাশে রাখা দরকার। এর ফলে নৃত্যশিল্পীর শরীরের কাঠামো পরিস্কারভাবে ফুটে ওঠে, এবং পশ্চাৎপট থেকে শিল্পীকে সহজেই পৃথক করে দেখা সম্ভব হয়; সেইসঙ্গে নৃত্যানুষ্ঠানের আনুষঙ্গিক প্রক্ষেপণ ব্যবস্থাদির জন্য বলয়পট অনালোকিত রাখা সহজ হয়ে

ওঠে। মঞ্চের সামনে থেকে আসা আলোকরশ্মি পারতঃপক্ষে পরিহার করা উচিত। একান্ত প্রয়োজনে, মঞ্চমুখের উভয় পাশ থেকে কোণাকুণিভাবে আলো পাঠানো যেতে পারে।

ব্যালে-অনুষ্ঠানাদিতে **সীমালোক** আলোকসম্পাতের প্রচলন খুব বেশী। পাতলা কাপড়ের ফোলানো পোষাক, আর শ্যাম্পু করা ফোঁপানো চুলের উপর এই জাতীয় আলোকসম্পাত বিশেষ সৌন্দর্য্য সৃষ্টির সহায়ক হয়। ভূমি সংলগ্ন রশ্মিপাতেরও বিশেষ আয়োজন রাখা হয় ব্যালের ক্ষেত্রে। পায়ের নিখুঁত কাজ ও নৃত্যশিল্পীর গতি বোঝানোর পক্ষে, কালো বা অনুরূপ গাঢ় রঙের মঞ্চপীঠে ভূমিসংলগ্ন আলোকসম্পাত যথেষ্ট সাহায্য করে।

আমাদের দেশীয় নৃত্যগুলির মধ্যে ভরতনাট্যম এবং কত্থক-এর ক্ষেত্রে এই জাতীয় ভূমিসংলগ্ন আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা রাখা যেতে পারে। কত্থকের 'তৎকার' জাতীয় শুধু পায়ের কাজ দেখানোর সময়, এই বিশেষ আলোকসূত্রগুলিকে কার্য্যকরী রেখে, বাকী সমস্ত মঞ্চের উজ্জ্বলতা কমিয়ে আনলে, ভালো ফল পাওয়া যাবে। পিছনে যদি প্রক্ষেপিত কোনো দৃশ্য থাকে, নৃত্যশিল্পীর শরীরের কাঠামো সেই দৃশ্যের সামনে রূপান্তরিত হবে **কৃষ্ণচিত্রে**। সীমালোকেরও সফল প্রয়োগ করা সম্ভব বহুক্ষেত্রে। মণিপুরী নৃত্যের জন্য ব্যবহৃত পাতলা ওড়নায়, সার্থক দিক থেকে আসা সীমালোক-আলোকসম্পাত, সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে।

বলা বাহুল্য, ভরতনাট্যম, কথাকলি, কত্থক প্রভৃতি ভারতীয় নৃত্যে অঙ্গভঙ্গীর সঙ্গে মুখভঙ্গীমার স্থানও যথেষ্ট মুখ্যস্থানের অধিকারী। বিশেষ আলোর ব্যবস্থা এজন্য রাখা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তবে তীব্র রশ্মির সাহায্যে নৃত্যশিল্পীকে অনুসরণ করা কখনোই যুক্তিসঙ্গত নয়। এর ফলে মঞ্চশিল্পের যান্ত্রিকতার দিকে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মহলার সময় নৃত্যশিল্পীর বিশেষ বিশেষ অবস্থানগুলি চিহ্নিত করে, সেই স্থানগুলিকে উজ্জ্বলতর করে তোলার ব্যবস্থা রাখা দরকার। একান্তই অনুসরণ করা অপরিহার্য্য হলে, ক্রমবিলীয়মান সীমাযুক্ত স্পটবাতী ব্যবহার করা উচিত; এবং অনুসরণের কাজটি যত সাবলীল হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বর্ণ পরিবর্তনের কাজ সর্বদাই বিভিন্ন সূত্র থেকে হওয়া দরকার। আলোকসূত্রের সংখ্যা কম থাকলেই, আলোকিত স্পটবাতীর সামনে বর্ণ মাধ্যম পরিবর্তন করা অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। সম্ভব হলে, বাতী নিভিয়ে

বা কমিয়ে বর্ণমাধ্যম পরিবর্তন করা উচিত। যে ভাবেই বর্ণপরিবর্তনের কাজটি করা হোক না কেন, যন্ত্রসংগীতের তালে তাল মিলিয়ে সেটি করা উচিত। এই জাতীয় বর্ণ পরিবর্তনে আলোকসম্পাতও যন্ত্র সংগীতের মতো নৃত্যের অনুষঙ্গী হয়ে ওঠে। আমাদের লোকনৃত্যগুলিতে তালের সঙ্গে বর্ণ পরিবতনের চমৎকার সুযোগ পাওয়া যায়।

এরিণায় দীপচিত্রণ

এরিণা বা কেন্দ্রায়ত অভিনয় ব্যবস্থায় আলোকসম্পাত করার সময় কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্নতর রীতি অনুসরণ করতে হয়। এক্ষেত্রে যেহেতু দর্শক রঙ্গপীঠটিকে ঘিরে বসেন, সেইহেতু দর্শণীয় ঘটনাবলীর চতুর্দিকেই আলো ফেলতে হবে। অথচ প্রসেনিয়াম থিয়েটারের মতো আলোকসম্পাত করা চলবে না—কারণ সে ধরণের আলো বিপরীত দিকে বসে থাকা দর্শকের চোখের উপরে পড়ে, দেখার কাজে বিঘ্ন ঘটাবে।

এরিণা রঙ্গপীঠের ঠিক উপরে একটি বর্তুলাকার গম্বুজ থেকে এই ধরণের দীপচিত্রণের ব্যবস্থা করা হয়। আলোক যন্ত্রগুলি এমনভাবে রাখা হয় যেন তার আলোকরশ্মি রঙ্গপীঠের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে [চিত্র ৪২.১],
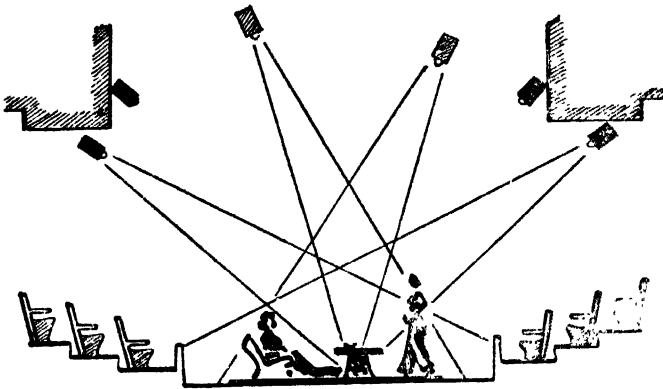
[চিত্র ৪২ ১] এরিণায় আলোকসম্পাত—পার্শ্বচ্ছেদ চিত্র

কোনো ক্রমেই দর্শকের উপরে না পড়ে। বলা বাহুল্য, এর ফলে আপতিত রশ্মির কোণ উর্দ্ধমুখী হতে বাধ্য। এ ধরণের আলোকসম্পাতে বিশেষ করে মুখের নীচু দিকের খাঁজগুলিতে আলো না পড়ার সম্ভাবনা। কিন্তু

তা হয় না। রঙ্গপীঠের পাটাতন থেকে প্রতিফলিত আলো, সুন্দর আলোক-প্রলেপে ঐ স্থানগুলি ভরে দেয়।

কেন্দ্রায়ত রঙ্গপীঠটি কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নেওয়া হয় সাধারণ রঙ্গমঞ্চের মতোই। তবে এক্ষেত্রে ভাগের সংখ্যা পাঁচ হলে ভালো হয়। এই পাঁচ ভাগের একটি হয় বৃত্তাকার, এবং এটি ধরা হয় রঙ্গপীঠের মাঝে এক পঞ্চমাংশ যায়গা জুড়ে। আংটির মতো বাকী অংশটুকু চার ভাগ করে নেওয়া হয় সমানভাবে।

এদের প্রত্যেকটি ভাগের জন্য কম পক্ষে তিনটি আলোকযন্ত্র একই কাজে ব্যবহার করতে হবে, যেন চারদিকে ঘিরে বসে থাকা দর্শকের প্রত্যেকে একই পরিণতি অনুভব করেন। এছাড়া বিভিন্ন প্রাধান্য আরোপের ক্ষেত্রে সরাসরি মাথার উপর থেকে আসা আলোর ব্যবহার খুব ভাল ফল দেয় এরিণায়।

আজকাল দর্শকদের দৃষ্টিরেখার মধ্যে রেখেও আলোকযন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এরিণায় প্রায় সব আলোই থাকে দর্শকদের মাথার উপরে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে, কোনও যন্ত্রের রশ্মি যেন দর্শকদের উপরে না পড়ে। এর জন্য বিভিন্ন আকারের চুঙ্গি এবং কপাট শ্রেণীর রোধক [চিত্র ৪২.২] খুব প্রয়োজনীয় উপকরণ। বিশেষভাবে তৈরী রঙ্গালয়ে শিলিংয়ের প্রয়োজনীয় অংশে ছিদ্র করেও এই আলোকযন্ত্র বসানো হয়। সেক্ষেত্রে যন্ত্রগুলিকে দর্শকদৃষ্টির আড়ালে রাখা যেতে পারে খুব সহজে।
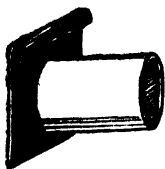
[চিত্র ৪২.২]
চুঙ্গি বা কপাট

দীর্ঘ প্রবেশপথগুলিতেও যদি নাটকের কোনও অংশ অভিনীত হওয়ার পরিকল্পনা থাকে, তবে তার জন্য পৃথক আলোকযন্ত্র যথোপযুক্ত স্থানে লাগাতে হবে। তীক্ষ্ণ-সীমাযুক্ত আলোকযন্ত্র বা ইলিপসোডিয়াল-রিফ্লেক্টার স্পটবাতী এসবক্ষেত্রে বেশী কার্য্যকরী।

এরিণায় দর্শকবৃন্দ অভিনয়-স্থলের এত কাছে থাকেন যে, বর্ণের সৌন্দর্য্য সম্যকভাবে অনুধাবন করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তাই পারতঃপক্ষে এরিণার জন্য দীপচিত্রণে বর্ণের ব্যবহার না করাই ভালো। তবে সামগ্রিকভাবে বিশেষ কোনও পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একটি মাত্র বর্ণের ব্যবহার

চলতে পারে। যে পরিকল্পনাই নেওয়া হোক, তা নিতে হবে একই কাজে ব্যবহৃত সবকয়টি স্পটবাতীতেই। কাজের সুবিধার জন্য তাই এই ধরণের গ্রুপগুলিকে একই ডিমারের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। বলা বাহুল্য, প্রসেনিয়াম রঙ্গমঞ্চের মতো সর্বতোভাবে ৪৫°তে যন্ত্রস্থাপনা এরিণার ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

ছায়া

মঞ্চের উপরে **ছায়াবিহীন আলোকসম্পাত** কোনও ক্রমেই কাম্য নয়। বরং বলা যেতে পারে, আলোক-সম্পাতের অন্তর্নিহিত কৌশল নির্ভর করে **ছায়া**র সুচতুর বিন্যাসের উপরে: আলোছায়ার বিরোধ ও বৈষম্যে। তবে, **নিয়ন্ত্রিত ছায়া** এবং **অবাঞ্ছিত ছায়া**র মধ্যে প্রভেদ জেনে রাখা দরকার।

বস্তুর আকৃতিগত বৈশিষ্ট হেতু, আপতিত আলোকরশ্মি বস্তুটির বিভিন্ন অংশ থেকে প্রতিফলিত হয় বিভিন্ন ঔজ্বল্য নিয়ে। এক্ষেত্রে উজ্জলতর অংশের তুলনায় ম্লান অংশগুলিতে **আলোছায়া** বা **শেড** পড়েছে বলা হয়। বলা বাহুল্য, এই ছায়ার দ্বারাই বস্তুটির স্বরূপ নির্ণয় করা সম্ভব। সুতরাং এ জাতীয় ছায়া অতিশয় মূল্যবান।

অস্বচ্ছ বস্তুর দ্বারা আলোকের গতি রুদ্ধ হওয়ার ফলে, বস্তুর অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট একটি অনালোকিত অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। একেও বাংলায় **ছায়া** বলে। পৃথকভাবে চেনানোর জন্য এই ছায়াকে আমরা **নিক্ষিপ্ত ছায়া** নামে উল্লেখ করবো। এই ছায়া বা **শ্যাডো** বস্তুর অনুষঙ্গী মাত্র ; বস্তুর স্বরূপ নির্ণয়ে এর কোনও অবদান নেই। বরং এই ধরণের নিক্ষিপ্ত ছায়া পার্শ্ববর্তী অন্য বস্তুর সৌন্দর্য্য বিনষ্ট করতে পারে। নিক্ষিপ্ত ছায়ার হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার সহজতম উপায়, এগুলিকে ভূমিতে আবদ্ধ রাখা। [আলোকরশ্মি যখন ৪৫ ডিগ্রী কোণ থেকে আসে, তখন নিক্ষিপ্ত ছায়া ও বস্তুর দৈর্ঘ্য থাকে সমান। এই কোণ যত বৃদ্ধি পায়, ছায়ার আকার তত খর্ব হতে থাকে ; অন্যপক্ষে, রশ্মিরেখা অনুভূমিক হতে আরম্ভ করলে, ছায়ার দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি পায়। ছায়াকে আয়ত্বে আনার কাজে বিষয়টি প্রণিধান যোগ্য।]

আলোকসূত্র তুলনামূলকভাবে ক্ষুদ্রতর হলে, নিক্ষিপ্ত ছায়া ঘন এবং সুনির্দিষ্ট সীমাযুক্ত হয়। স্পটবাতী বা সরু ছিদ্রবিশিষ্ট রোধকযুক্ত ফ্লাডবাতীর সাহায্যে এই ধরণের ছায়া সৃষ্টি করা যাবে। বৃহৎ

প্রতিহত কোণবিশিষ্ট আলোকসূত্রের ব্যবহারে ছায়ার বর্ণ ম্লান হয়ে যায়, এবং সীমা হয়ে ওঠে অস্পষ্ট। বস্তুটি ছায়াপ্রক্ষেপণের জন্য নির্দিষ্ট স্থানের নিকটবর্তী হলেও ছায়ার বর্ণ ঘন এবং সীমারেখা সুনির্দিষ্ট হয়ে ওঠে।

নিক্ষিপ্ত ছায়াকে সুচতুর বিন্যাসের দ্বারা নাটকীয় করে তোলা সম্ভব। বিশেষতঃ, হত্যামূলক বা ভীতিজনক দৃশ্যাবলীর ক্ষেত্রে নিক্ষিপ্ত ছায়ার ব্যবহার তুলনাহীনরূপে কার্যকরী। এমন বহুদৃশ্য, যা প্রকাশ্যে দেখানোর বহুবিধ অসুবিধা আছে, নিক্ষিপ্ত ছায়ার সাহায্যে খুব সহজেই দেখানো যায়। নিক্ষিপ্ত ছায়াকে বিকৃত করে ফেলার দ্বারা, অস্বাভাবিকতা, মানসিক বিকৃতি, শয়তানের উপস্থিতি, ভয়ঙ্কর ভাব প্রভৃতি ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। এই দিকগুলির বিচারে নিক্ষিপ্ত ছায়াও অবহেলার বিষয় নয়।

নৃত্যানুষ্ঠানে, একটু চেষ্টা করলেই, নৃত্যশিল্পীর নৃত্যভঙ্গীমার নিক্ষিপ্ত ছায়া বলয়পটে ফেলা যায়। পাদপ্রদীপালোকের স্থানে যদি তীব্র রশ্মি এবং সরু মুখবিশিষ্ট আলোকসূত্র স্থাপনা করা হয়, তবেই নৃত্যশিল্পীর বর্দ্ধিতাকার ছায়া পিছনে প্রক্ষেপিত হবে। যদি ঈষৎ ব্যবধানে স্থাপিত ঐ ধরণের দুটি আলোকসূত্রে বিভিন্ন জাতীয় বর্ণমাধ্যম ব্যবহার করা হয়, তবে প্রক্ষেপিত ছায়ার বৈচিত্র লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। যেমন, বর্ণমাধ্যম দুটি যদি লাল ও সবুজ হয়, তবে সাধারণভাবে বলয়পটের বর্ণ হবে হলুদ ; কিন্তু ছায়া দুটির একটি হবে সবুজ, অপরটি হবে লাল। একাধিক আলোকসূত্রে সুনির্বাচিত বর্ণমাধ্যম ব্যবহার করে, একাধিক রঙের অনেকগুলি ছায়া সৃষ্টি করা যেতে পারে। আবার, একটি মাত্র আলোকসূত্রের সাহায্যে প্রক্ষেপিত ছায়াকে বলয়প্রদীপের সাহায্যে বিভিন্ন রঙে পরিবর্তিত করাও সম্ভব। নৃত্যানুষ্ঠানে এই জাতীয় ছায়ার সংযুক্তি, পরিবেশনের সৌন্দর্য্য বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে। ছায়াসৃষ্টির কাজে ব্যবহৃত আলোকসূত্রে প্রতিফলক বা আতসকাচ না ব্যবহার করাই বাঞ্চনীয়।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পর্দার পিছনে করে, তার কৃষ্ণচিত্র দর্শককে দেখানো যায়। একটি সরু ছিদ্রপথে কালোরঙের বাক্সের ভিতর থেকে আসা প্রক্ষেপবাতীর আলো, এই জাতীয় ছায়ানুষ্ঠানের আদর্শ আলোকসূত্র। পর্দাটি এর জন্য চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার মতো চারদিক থেকে শক্ত

করে বাঁধা দরকার। সম্ভব হলে, আলোকসূত্রকে কেন্দ্র করে ঈষৎ বৃত্তাকারে পর্দাটি টাঙানো যেতে পারে। এই শ্রেণীর অনুষ্ঠানে পর্দার সামনে রঙ্গভূমির প্রয়োজন থাকেনা ; সুতরাং অনায়াসে পর্দাটি যবনিকার অব্যবহিত পরেই স্থাপনা করা যেতে পারে। আলোকসূত্রের অবস্থান পর্দা থেকে যত দূরে রাখা যায়, ছায়া প্রক্ষেপণের পক্ষে ততই উপযোগী হয়ে উঠবে। ১000 ওয়াটের বর্তুল প্রক্ষেপবাতীই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য। শিল্পীদের, যতদূর সম্ভব, পর্দার কাছে অঙ্গভঙ্গী করতে হবে, তবেই তাঁদের নিখুঁত ছায়া স্পষ্ট এবং গাঢ়ভাবে পড়বে। পর্দার পিছনে, দুই বা তিন ফুট উঁচু একটি বেদী তৈরী করা দরকার এই অনুষ্ঠানের জন্য। এর দ্বারা প্রথমতঃ শিল্পীদের আপাদমস্তক ভালোভাবে দেখার সুবিধা হয় ; দ্বিতীয়তঃ আলোকসূত্রের অবস্থান পর্দার ভিতর দিয়ে আর দেখা যায়না। সবার উপরে, আলোকসূত্রের কাছাকাছি উপস্থিত থেকে যে সব নেপথ্য-শিল্পীদের কাজ করতে হয়, তাদের পক্ষে আত্মগোপন করা সহজ হবে।

বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, ছায়াভিনয়ের ক্ষেত্রে শিল্পী যত বেশী পাশ ফিরে থাকবেন, ততই তাঁর মুখভঙ্গীমা ও কার্য্যাবলী ভালোভাবে বোঝা যাবে। বলা বাহুল্য, একটি ছায়ার উপরে আর একটি ছায়া কাজ করেনা—সুতরাং একাধিক শিল্পী একই যায়গায় যেন উপর্যুপরি ছায়া সৃষ্টি না করেন। সেইসঙ্গে ছায়ার উচ্চতা সাধারণক্ষেত্রে স্থায়ী রাখার জন্য, শিল্পীদের যতটা সম্ভব পর্দা থেকে সমদূরবর্তী অংশে অবস্থান করা বাঞ্ছনীয়। পরস্পরকে অতিক্রম করার কাজটি দ্রুত করে নেওয়া উচিত।

অভিজ্ঞ ও দক্ষ আলোকসম্পাতকারীর হাতে এই নিয়মগুলির ব্যতিক্রমেও আকর্ষণীয় ফলাফলের অবতারণা সম্ভবপর। একটি মাত্র আলোকসূত্রের পরিবর্তে একাধিক সূত্র ব্যবহার করে, স্বল্প কয়েকজনের দলকে বিরাট জনতায় পরিণত করা যায়। পর্দা থেকে বিভিন্ন দূরত্বায় ব্যক্তি বা বস্তু স্থাপনা করে, আকৃতির তারতম্য ঘটানো যায় বিবিধ প্রয়োজনে। পর্দার সামনের দিক সাধারণ নিয়মে অন্ধকার রাখা উচিত। তবে অল্পশক্তি-বিশিষ্ট রঙিন পাদপ্রদীপের আলোক ছায়াগুলিকে বিভিন্ন রঙে রাঙিয়ে তোলার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

ছায়াভিনয়ের জন্য রূপসজ্জার প্রয়োজন খুবই কম। মুখরঞ্জনের প্রয়োজনই হয়না। সজ্জার চারিত্রিক বৈশিষ্টগুলি যেন ছায়ায় ফুটে

ওঠে, সেদিকেই শুধু লক্ষ্য রাখা দরকার। এর জন্য অনেক সময় প্রচলিত ধারার সম্পূর্ণ বিপরীতে অঙ্গসজ্জা করার প্রয়োজন হয়। বহু নকল ও সুলভ বস্তু নিয়ে নানাধরণের ছায়া সৃষ্টি করার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাঝে, আলোকসম্পাতকারীর কল্পনাশক্তি প্রয়োগের বিস্তৃত ক্ষেত্র পড়ে আছে।

মনস্তাত্ত্বিক আলোক-সম্পাত

আলোকসম্পাতের মাধ্যমে যদি পরিবেশ ও ঘটনার অন্তর্নিহিত ভাবার্থ ফুটে না ওঠে, তবে সেই আলোকসম্পাত শুধু উজ্জলতা সৃষ্টির নামান্তর হয়ে দাঁড়ায়। নাটকের মনস্তত্ত্ব উদ্ভাসিত না করে, আলোক-সম্পাতকে কেবল বাস্তবানুগ করার চেষ্টায় কোনও সার্থকতা নেই।

প্রযোজক বা পরিচালক তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকের অন্তর্নিহিত ভাবার্থ বিচার করে, তাঁর সহকর্মীদের ভালোভাবে বুঝিয়ে দিবেন। অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে আলোকসম্পাতকারীকেও সেই ভাবার্থই মেনে চলতে হবে নাটকটির বিচারে। নচেৎ, প্রয়োগের ক্ষেত্রে সফলতার চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভবপর হবেনা।

নাটকের মেজাজ ফোটানোর জন্য রঙের ব্যবহার খুবই সুফলপ্রসূ। তবে মেজাজের পরিবর্তনের সঙ্গে বর্ণের পরিবর্তন ঘটানোর কাজটি এত সাবলীল এবং ধীরগতি হওয়া উচিত, যেন এই পরিবর্তনের দিকে দর্শকের দৃষ্টি সজাগ হয়ে ওঠার কারণ না ঘটে।

বিশেষ চরিত্র বা রঙ্গপাঠের অংশবিশেষের উপরে প্রাধান্য আরোপ করার উদ্দেশ্যে, তীক্ষ্ণ সীমাবিশিষ্ট স্পটবাতীর সাহায্যে তীব্র রশ্মিসম্পাতের প্রথা অত্যন্ত ক্ষতিকর। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উজ্জলতার পরিমাণ ঈষৎ বাড়িয়ে তোলা, অথবা অন্যান্য অংশের ঔজ্জ্বল্য ঈষৎ কমিয়ে আনাই প্রকৃষ্ট উপায়। এসব কাজে ডিমার চালনার গতি এত মন্থর ও সাবলীল হওয়া উচিত, যেন দর্শকের মনে প্রাধান্যটুকুই ছাপ ফোটায়, পরিবর্তনটুকু যেন চোখে ধরা না পড়ে।

প্রদীপভাণ্ডারের সাহায্যে বর্ণের আমূল পরিবর্তন ঘটানো অর্থহীন। মঞ্চের উপরে পরস্পর-বিরোধী বর্ণের সমাবেশ হওয়া একান্ত দরকার।

ব্যতিক্রমের ব্যবহারে সুফল লাভের সুযোগ এ ক্ষেত্রেও আছে। হঠাৎ কোনও পরিবর্তন দর্শককে চমকিয়ে দিতে পারে। অভিনেতার চমকে ওঠার ভাবটি দর্শকের মধ্যে সংক্রামিত করার এটি একটি সহজ উপায়।

বিশেষকরে হাস্যরসাশ্রিত নাটকে এই ধরণের আলোকসম্পাতের দ্বারাই আবহসঙ্গীতের অভাব মেটানো সম্ভবপর।

বিরতিজ্ঞাপন আলোকসম্পাতের সাহায্যে বিরতি বা **কালের ব্যবধান** জ্ঞাপন, আলোকসম্পাতের আর একটি মূল্যবান ব্যবহার বলে ধরা যেতে পারে। ·

আস্তে আস্তে সমগ্র দৃশ্য অন্ধকারে মুছে দিয়ে, আবার আস্তে আস্তে সেটিকে আগের মতোই আলোয় নিয়ে আসার দ্বারা **কিছু সময় কেটে যাওয়ার** ইঙ্গিত দেওয়া হয়। সময়ের ব্যবধান দীর্ঘতর বোঝানোর জন্য, পরবর্তী আলোকসম্পাতের বর্ণ, উজ্জ্বলতা ও পরিবেশনে পার্থক্য আনতে হবে।

দৃশ্যপটহীন অভিনয় ব্যবস্থায়, শুধু আলোকসম্পাতের চরিত্র পরিবর্ত্তনের সাহায্যে, সময়ের সঙ্গে স্থানেরও পরিবর্তন বোঝানো যায়। মূলচরিত্রকে অস্পষ্ট আলোয় রেখে, বাকী অংশ আস্তে আস্তে অন্ধকার করার পর, অন্ধকার অংশে একের পর এক ঘটনা এক বা একাধিক তীক্ষ্ণ সীমাবিশিষ্ট স্পটবাতীর আলোয় দেখানো যেতে পারে। অভিনেতার কল্পনাকে মঞ্চের উপরে এইভাবে রূপায়িত করা হয়।

সম্ভাব্য ত্রুটিসমূহ ছবি আঁকার মতো আলোকসম্পাত তথা দীপচিত্রণের ক্ষেত্রেও, সব ব্যবস্থা হয়ে যাওয়ার পর একবার **শেষের ছোঁয়া** বুলিয়ে নেওয়া দরকার হয়। সমগ্র পরিবেশনটিকে ত্রুটিমুক্ত করে তোলাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য। সম্ভাব্য ত্রুটিগুলির সম্বন্ধে সচেতনতাই এবিষয়ে প্রধান পথপ্রদর্শক হবে :—

মঞ্চমুখ বা পার্শ্বপটের উপরে রশ্মির উজ্জ্বলতা প্রতিভাত হলে, আলোকসূত্রের অবস্থান সম্পর্কে দর্শককে সচেতন করে দেওয়া হয়।

দৃশ্যপটগুলির পিছনে কোনও আলোকসূত্র স্থাপনের ব্যবস্থা করা হলে, আলোকের উজ্জ্বলতা যেন দৃশ্যপটের কাপড় বা জোড় মাথার ফাঁক ভেদ করে বেরিয়ে না আসে, সেদিকে সতর্ক থাকতে হবে।

অবাঞ্ছিত নিক্ষিপ্ত ছায়া অভিনেতার প্রাধান্য বাহুলাংশে খর্ব করে। ছায়ার অপসারণ সম্ভব না হলে, ছায়ার গাঢ়তা নষ্ট করার দিকে লক্ষ্য দেওয়া দরকার।

০

ঝরির আলোয় ঝালরের ছায়া, আড়ালের গায় জানালার গরাদের ছায়া, পার্শ্বপটের উপরে অপেক্ষমান অভিনেতা বা স্মারকের ছায়া—এগুলি অসাবধানতার পরিচায়ক।

আলোকযন্ত্র পরিচ্ছন্ন না থাকলে, যন্ত্রের ব্যবহারে সুফল পাওয়ার আশা কম। আতসকাচ ও প্রতিফলকগুলি বিশেষ নরম ঝাড়ন দিয়ে পরিস্কার করতে হয়। বাতীর ফিলামেণ্ট, আতসকাচ ও প্রতিফলকের কেন্দ্র একরেখায় না থাকলে চরম উজ্জলতা পাওয়া যায়না।

দৃশ্যপট আটকানোর জন্য ব্যবহৃত ধারকগুলির ছায়া যেন দৃশ্যপটের উপরে না পড়ে, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

একটি বিষয়ে অভিনেতারাই শুধু সাহায্য করতে পারেন। কোনও ক্রমে কোনও আলোকসূত্রের মুখ সামান্য নড়ে যাওয়ার ফলে যদি প্রয়োজনীয় অংশে অসুবিধার সৃষ্টি হয়, অভিনেতা যেন কৌশলে স্থান পরিবর্তন করে আলোকিত অংশে চলে যান। আলোকসম্পাতকারীর পক্ষে সঙ্গে সঙ্গে ত্রুটি সংশোধন করা উচিত নয়। হঠাৎ ঘটে যাওয়া ত্রুটি বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দর্শকের চোখে পড়েনা; কিন্তু তা শোধরানোর চেষ্টা করলেই ত্রুটি ধরা পড়ে।

পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে কয়েকটি বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করে চললে, নাটক চলাকালীন অনেক অঘটন এড়ানো সম্ভব হয়:—

খোলা টেলিস্কোপিক স্ট্যাণ্ডের 'নব'গুলি যেন যথাযথ দৃঢ়তার সঙ্গে আটকানো থাকে।

অস্থায়ী ব্যবস্থায় বিদ্যুৎবাহী তারগুলি যেন চলাচলের পথ থেকে সরানো থাকে, এবং কোনও ক্রমেই যেন ধ্বনি-সংক্রান্ত তারগুলিকে ছুঁয়ে না থাকে, বা অতিক্রম না করে।

সমস্ত যন্ত্র লাগানোর পর, একবার সব কয়টি আলো এক সঙ্গে জ্বালিয়ে কয়েক মিনিট রেখে দেওয়া উচিত—লাইন ঐ চাপ ঠিকমতো সহ্য করতে পারবে কিনা, তার পরীক্ষা হয়ে যায় এর ফলে।

মুক্তাঙ্গনে বিদ্যুৎবাহী তারগুলিকে উঁচুতে রাখা প্রদীপযন্ত্র থেকে সরাসরি টেনে এনে বোর্ডে যুক্ত করা সমীচীন নয়—তার আগে কিছুটা তার ঢিলে-ভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। নচেৎ হঠাৎ আসা বৃষ্টি বা শিশির গড়িয়ে এসে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় বিভ্রাট বাধাতে পারে।

নয় বিবিধ কারসাজি

সূত্রপ্রদীপের সাহায্যে বর্ণিত কাল্পনিক আলোক-উৎসগুলিকে যখন আলোকসম্পাতের কৌশলে মঞ্চের উপরেই উপস্থাপিত করা হয়, তখন সেগুলি **কারসাজি**-র পর্যায়ে পড়ে। যেমন চাঁদের আলো বোঝানো সূত্রপ্রদীপের কাজ, কিন্তু বলয়পটে চাঁদ দেখানোর কাজটি একটি 'কারসাজি'। আলোকের উৎস নয়, এমন বহু বিষয়ও আলোকসম্পাতের কৌশলে মঞ্চে প্রদর্শিত হয়। যেমন মেঘ, জল, কুয়াশা প্রভৃতি। এগুলিও বিবিধ কারসাজির অন্তর্ভুক্ত। [আলোকের সংশ্রব ব্যতিরেকেই যদি এগুলি দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়, তবে এদের 'দৃশ্যানুষঙ্গিক' পর্যায়ে ফেলা হবে।] বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই, নিয়ন্ত্রণকারী তথা অপারেটারকে বাদ দিয়ে এক বা একাধিক সাহায্যকারীর দরকার হয় একটি কারসাজি দেখানোর জন্য। কারসাজিগুলি বিনা প্রয়োজনে এবং সংযতভাবে ব্যবহৃত না হলে, অযথা চমক সৃষ্টির দ্বারা নাটকের সাবলীল গতি নষ্ট করতে পারে।

আলোচ্য পরিচ্ছেদে কয়েকটি সচরাচর ব্যবহৃত কারসাজি দেখানোর প্রচলিত ধারা বর্ণিত হলো। বলা বাহুল্য, কারসাজি দেখানোর বিষয়বস্তুর যেমন অন্ত নেই, পন্থাও তেমনি নূতন নূতন আবিষ্কৃত হতে পারে।

লিনেবাচ লণ্ঠন ও স্থিরচিত্র প্রক্ষেপণ

সাধারণ ছায়া-প্রক্ষেপণের নীতি অনুসরণ করেই **লিনেবাচ লণ্ঠন** কাজ করে। এই ব্যবস্থায় ছোট আকারের উচ্চশক্তিসম্পন্ন একটি আলোকসূত্র থেকে, সরাসরি একটি বড় আকারের **স্বচ্ছচিত্র**, বা কেটে তৈরী করা একটি অস্বচ্ছ চিত্রের ভিতর দিয়ে আলো পাঠানো হয় [চিত্র ৪৩.১] বলয়পট অথবা ছায়াপ্রক্ষেপণের জন্য বিশেষ-ভাবে টাঙানো পর্দার উপরে। চিত্রের আকার এবং বাতী ও পর্দা থেকে

তার অবস্থানের দূরত্বের উপরে, প্রক্ষেপিত চিত্রের আকৃতি নির্ভর করে। বিষয়টিকে নীচের সূত্রে বর্ণনা করা যায় :

$$\frac{\text{চিত্রের আকার}}{\text{প্রক্ষেপিত চিত্রের আকার}} = \frac{\text{বাতী থেকে চিত্রের দূরত্ব}}{\text{চিত্র থেকে পর্দার দূরত্ব}} \quad \text{অর্থাৎ}$$

$$\text{প্রক্ষেপিত চিত্রের আকার} = \frac{\text{চিত্রের আকার} \times \text{চিত্র থেকে পর্দার দূরত্ব}}{\text{বাতী থেকে চিত্রের দূরত্ব}}$$
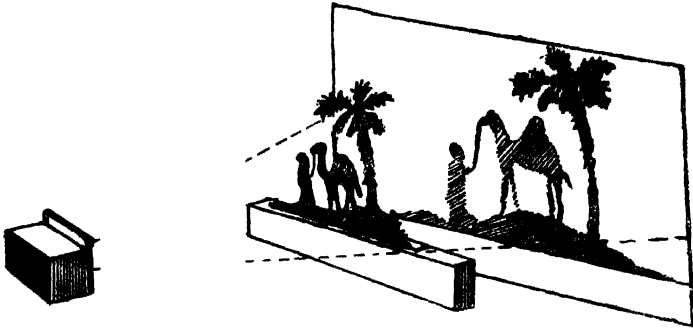
[চিত্র ৪৩.১] লিনেবাচ-লণ্ঠন প্রথায় ছায়া-প্রক্ষেপ ব্যবস্থা

কেটে তৈরী করা অস্বচ্ছ চিত্র বা **কাট আউট** তৈরী করার সময় সূক্ষ্ম কারুকার্য এড়িয়ে চলা উচিত। ছবির যাবতীয় রেখা পুরু ধরণের হওয়া দরকার। ছায়াভিনয়ের যাবতীয় নিয়মাবলী এখানেও সমানভাবে প্রযোজ্য। ছায়াপ্রক্ষেপণের উৎকর্ষ সাধনের জন্য পাশাপাশি রাখা দুটি লণ্ঠণ ব্যবহার করা যেতে পারে। এর সাহায্যে একটি দৃশ্যের বিলুপ্তির মাঝে বা সঙ্গে সঙ্গে, পরবর্তী দৃশ্য দেখানোর কাজটি সম্ভব হয়।

লিনেবাচ লণ্ঠন অথবা যে কোনও প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার সাহায্যে যখন দৃশ্য রচনার ব্যবস্থা করা হয়, তখন রঙ্গপীঠে একমাত্র বিন্যাসধর্মী দৃশ্যপট ছাড়া অন্য কোনও শ্রেণীর দৃশ্য ব্যবহার করা উচিত নয়।

যে ক্ষেত্রে একটিমাত্র প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে সমুদয় বলয়পটে দৃশ্য ভরে তোলা সম্ভব হয় না, সেখানে দুটি যন্ত্রের সাহায্যে একই চিত্রের দুটি অংশ পৃথকভাবে প্রক্ষেপণের ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে, দুটি চিত্রাংশের সংযোগ স্থল যেন নির্দিষ্ট সরলরেখায় [চিত্র ৪৩.২] না থাকে।

[এ রকম হওয়া উচিত নয়]
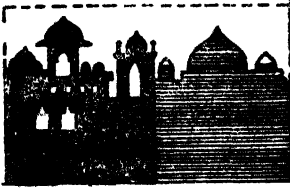
[এ রকম হওয়াই বাঞ্ছনীয়]
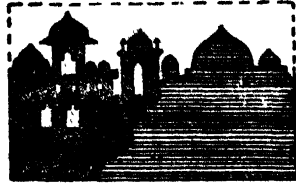
[চিত্র ৪৩.২] দুইটি প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার সাহায্যে চিত্র প্রক্ষেপণ

স্থানাভাবে যেখানে পর্দার উপরে লম্বভাবে চিত্র পক্ষেপণের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না, সেখানে পর্দার নিকটবর্তী উভয়দিকের পার্শ্বপটের আড়াল থেকে চিত্র প্রক্ষেপণ করা চলে। তবে এক্ষেত্রে চিত্রের বিকৃতি ঘটতে বাধ্য। চিত্র নির্মাণের সময় সম্ভাব্য বিকৃতির ক্ষতিপূরণ করে নিলে, প্রক্ষেপণের সময় বিকৃতিজনিত ত্রুটি অনেকাংশে সংশোধিত হবে। অবশ্য এর জন্য বিশেষ ধৈর্য্য, অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের প্রয়োজন।

লিনেবাচ লণ্ঠনে কোনও প্রতিফলক বা আতসকাচ ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। আতসকাচ ও প্রতিফলন ব্যবস্থাযুক্ত ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে চিত্র প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে, **অভিলক্ষ্য** বা অবজেক্টিভ আতসকাচের অধিঃশ্রয়ণ মানের উপরে প্রক্ষেপিত চিত্রের আকৃতি নির্ভর করে। যন্ত্র থেকে পর্দার দূরত্ব এবং প্রক্ষেপিত চিত্রের প্রয়োজনীয় আকৃতি নির্দ্ধারণ করার পরে অভিলক্ষ্য আতসকাচ নির্বাচন করা হয়। নীচে কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :

যন্ত্র থেকে পর্দার দূরত্ব	প্রক্ষেপিত চিত্রের প্রয়োজনীয় আকৃতি	আবশ্যকীয় আতসকাচের অধিঃশ্রয়ণ মান
১০ ফুট	১ ফুট বর্গ	২৪ ইঞ্চি
ঐ	৬′–৬″ বর্গ	৪ ইঞ্চি
ঐ	১৪ ফুট বর্গ	২½ ইঞ্চি

স্বচ্ছচিত্র বা স্লাইডের প্রচলিত আকার ৩″×৩″ ধরেই তালিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

মঞ্চের সামনে থেকে ব্যবহারের সময় [যখন যন্ত্র ও পর্দার ব্যবধান অনেক বেশী থাকে] ৫ ইঞ্চি থেকে সুরু করে ১২ বা ১৪ ইঞ্চি অধিঃশ্রয়ণ মানের অভিলক্ষ্য ব্যবহার করা হয়।

কাঠ ও সিনাময়েডের ৬ ফুট বর্গ কাঠামোতে তৈরী চিত্রের পিছনে এক বা একাধিক আলোকসূত্রের ব্যবস্থা রেখে, স্থিরচিত্র প্রক্ষেপণের একটি অন্য ধরণের ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। এই ব্যবস্থায় আলোকসূত্রগুলিকে এগিয়ে পিছিয়ে দৃশ্যের বহুধা রূপান্তর ঘটানো হয়ে থাকে। এই জাতীয় চিত্র প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে **পেনাস্কোপ**।

স্কিঅপ্টিকন ও চলমান চিত্র প্রক্ষেপণ

পুরাতন ম্যাজিক লণ্ঠনের পদ্ধতি অনুসরণেই **স্কিঅপ্টিকন** জাতীয় [চিত্র ২৮.৫] কারসাজিকলের সৃষ্টি। সাধারণ স্পটবাতীর সঙ্গে কণ্ডেন্সার, স্বচ্ছচিত্র-ধারক এবং অভিলক্ষ্য আতসকাচ লাগিয়ে এই যন্ত্র তৈরী করা হয়। চলমান চিত্র প্রদর্শনের জন্য স্প্রিং অথবা বৈদ্যুতিক মোটর চালিত ব্যবস্থা থাকে। ভিন্ন ভিন্ন কারসাজির প্রয়োজনে মোটরগুলিকে রকমারী গতিতে চালানোর প্রয়োজন হয়। কয়েকটি বিভিন্ন কারসাজির জন্য ব্যবহৃত স্কিঅপিটিকনের বর্ণনা এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হলো :

মেঘ-এর চলমান চিত্র প্রক্ষেপণের যন্ত্রটি ১৯½ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট একটি এল্যুমিনিয়ামের আধার, যার মধ্যে মেঘের চিত্র সম্বলিত একটি ৩ মিলি-
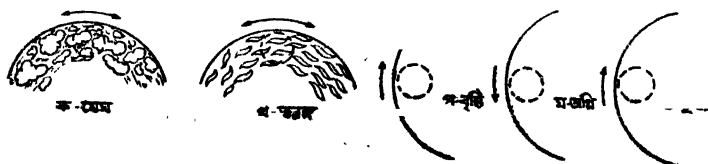
[চিত্র ৪৪.১] ঘূর্ণায়মান স্বচ্ছচিত্র : [স্কিঅপ্টিকনের সাহায্যে বিভিন্ন কারসাজি দেখানোর জন্য ব্যবহৃত ভিন্ন ভিন্ন চিত্রসম্বলিত কাচের থালা। তীর চিহ্নের দ্বারা থালা ঘোরানোর দিক, এবং বৃত্তের দ্বারা আলোক প্রক্ষেপণের স্থান বোঝানো হয়েছে।]

মিটার পুরু কাচের থালা ঘোরানোর ব্যবস্থা আছে। এই জাতীয় মেঘের চিত্র [চিত্র ৪৪.১ ক] খুব বেশী পরিস্কার করে প্রক্ষেপণ না করলেই ভালো ফল পাওয়া যায়। ষ্টীল নীল, ফ্যাকাশে নীল বা ফ্যাকাশে ধূসর

বর্ণমাধ্যম এর সঙ্গে ব্যবহার করা লাভজনক। তীর্য্যক প্রক্ষেপণের দ্বারা লব্ধ বিকৃতি, মেঘ প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

স্থির মেঘ দেখানোর জন্য ম্যাজিক লণ্ঠনে পৃথক স্বচ্ছচিত্র ব্যবহার করার ব্যবস্থা রাখা উচিত। স্কিঅপ্টিকন থামিয়ে স্থিরচিত্র দেখানোর চেষ্টা করলে, কাচের থালাটি উত্তাপে ফেটে যাবে।

মেঘের মতোই জলস্রোত চিত্রিত কাচের থালার সাহায্যে **তরঙ্গ** দেখানো যায়। আঁকা জলস্রোতের ঢেউগুলিকে বাস্তবানুগ করার জন্য, স্বচ্ছচিত্রের পরেই একটি ঢেউ খেলানো কাচের চাদর রাখা থাকে। আঁকা ঢেউগুলি [চিত্র ৪৪.১ খ] এর মধ্য দিয়ে বিভিন্ন কোণে প্রতিসরিত হওয়ার ফলে, পরস্পরের উপর ভেঙে পড়ছে বলে মনে হয়।

মেঘ ও তরঙ্গ উভয় প্রক্ষেপণ ব্যবস্থাতেই কাচের থালাটির শীর্ষদেশ থেকে চিত্র প্রক্ষেপিত হয়, এবং থালার গতি ডাইনে বা বাঁয়ে যে কোনও দিকে রাখা যায়।

বৃষ্টি, অগ্নিকাণ্ড বা **তুষারপাত** একই উপায়ে, কাচের থালায় আঁকা বিভিন্ন চিত্রের সাহায্যে দেখানো হয়। তবে এগুলির ক্ষেত্রে থালার পাশ থাকে চিত্র প্রক্ষেপিত হয় এবং থালার গতি নির্দিষ্ট দিকে হওয়া দরকার। [চিত্র ৪৪.১ গ ঘ ঙ-তে ছোট ছোট বৃত্তের সাহায্যে প্রক্ষেপণের স্থান এবং তীর চিহ্নের সাহায্যে থালা ঘোরানোর সঠিক দিক দেখানো হয়েছে।] অভিলক্ষ্যের ভিতর দিয়ে চিত্র অতিক্রম করার সময় উল্টে যায়—এই নিয়মের উপরেই থালা ঘোরানোর দিক নির্দ্ধারিত হয়েছে। যেমন, বৃষ্টির জল ও তুষার নিম্নমুখী গতিতে প্রক্ষেপিত হওয়া উচিত ; স্কিঅপ্টিকনের থালাটি তাই উর্দ্ধমুখী ঘোরানো হয়। অগ্নিশিখার ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে বিপরীত ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার।

কাচের থালা ঘোরানোর গতিবেগও নির্ভর করে বিষয়বস্তুর উপরে। মেঘের গতি হওয়া উচিত অত্যন্ত ধীর। গতির দিক থেকে এর পরেই আসে তুষারপাত। এই উভয়বিধ প্রক্ষেপণ ব্যবস্থাই, দুটি যন্ত্র থেকে বিভিন্ন গতিতে যুগপৎ প্রদর্শিত হলে, উৎকৃষ্টতর ফল পাওয়া যাবে। তরঙ্গ ও বৃষ্টিধারা প্রক্ষেপণের সময় স্কিঅপ্টিকনের চাকার গতি হবে যথেষ্ট দ্রুত এবং সবচেয়ে দ্রুতগতিতে চালানো দরকার অগ্নিকাণ্ডের দৃশ্য প্রক্ষেপণের সময়। এদের মধ্যে বৃষ্টিধারা ও তুষারপাত দেখানোর সময় স্কিঅপ্‌টিকন থেকে নিম্নমুখী আলোক প্রক্ষেপনের ব্যবস্থা করলে ভালো

ফল পাওয়া যাবে। যন্ত্রটিকে এরজন্য পর্দার পিছনে উঁচু জায়গায় স্থাপনা করা দরকার। শেষের তিনটি কারসাজি প্রয়োজনবোধে রঙ্গপীঠের সামনে থেকেও প্রক্ষেপণ করা চলে। অভিনেতা তথা দৃশ্যপটাদির উপর এই চিত্র প্রক্ষেপণ বাস্তববোধ ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবে।

মঞ্চমুখে ঝোলানো একটি গজের পর্দার উপরে ধীরগতিতে চলমান মেঘের ছায়া খুব অস্পষ্টভাবে, প্রক্ষেপিত হলে কুয়াশা বলে মনে হবে। প্রয়োজন মতো ১৭ নং ষ্টীল নীল, ১৮ নং হাল্কা নীল, ৩ নং ষ্ট্র, ৪ নং মাঝারী এ্যাম্বার, ৩৮ নং ফ্যাকাশে সবুজ, ৬০ নং ফ্যাকাশে ধূসর প্রভৃতি বর্ণমাধ্যমের যে কোনও একটি এই কারসাজিতে ব্যবহার করা চলে।
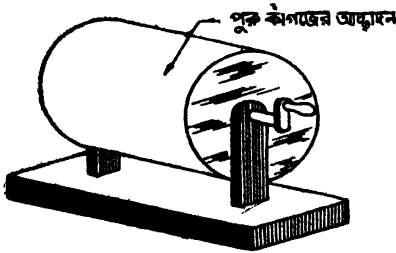
[চিত্র ৪৪.২] হাতে তৈরী কারসাজিকল

স্কিঅপটিকনের মতো দামী যন্ত্র যোগাড় করা যেখানে সম্ভব নয়, সেখানে মেঘ ব্যতীত বাকী চিত্রগুলি, নীচে বর্ণিত হাতে তৈরী কারসাজিকলের সাহায্যে ভালোভাবেই দেখানো যাবে। হাতলযুক্ত একটি অক্ষের দুইপ্রান্তে লাগানো দুটি চাকার উপরে, পুরু কাগজের একটি আচ্ছাদন চাপিয়ে [চিত্র ৪৪.২] একটি ঘোরানোর যোগ্য সমবর্তুল ব্যবস্থা তৈরী করা দরকার। এবার কাগজটিতে প্রয়োজনীয় চিত্রের উপযোগী ফাঁক কেটে নিতে হবে। স্পটবাতীর আলো এই কাগজের মধ্য দিয়ে ফেলা হয় পর্দার গায়। চাকাটি ঘোরালেই, তরঙ্গ, বৃষ্টিধারা, তুষারপাত বা অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদির চিত্র পাওয়া যাবে। বিভিন্ন চিত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োজনমতো বর্ণমাধ্যম লাগিয়ে নিতে হবে স্পটবাতীর মুখে।

চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকা

মঞ্চের প্রয়োজনে প্রক্ষেপিত পূর্ণচন্দ্র ও সূর্য্যে বর্ণের পার্থক্য ছাড়া আর সব ব্যবস্থাই এক। একটি আয়না-বাতীর মুখে প্রয়োজনমতো আকারের জালতি লাগিয়ে একটি গোলাকার আলোকিত স্থান সৃষ্টি করাই চাঁদ বা সূর্য্য দেখানোর কৌশল। লক্ষ্য রাখতে হবে, তীর্য্যক প্রক্ষেপণের দোষে চাঁদ বা সূর্য্যের নিখুঁত বৃত্তাকার আকৃতিতে যেন বিকৃতি লক্ষিত না হয়। গাছপালার ছায়াযুক্ত দিগ্বলয় এবং মেঘযুক্ত আকাশের পটভূমি তৈরী করে

নিলে চাঁদ বা সূর্য্যের ছবি আরও বাস্তব হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে ওঠানো বা নামানোর প্রয়োজনে, সাবলীল গতি বজায় রাখার জন্য প্রচুর মহলা দেওয়া উচিত। **বাঁকা চাঁদ** দেখাতে হলে স্থির চিত্র প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা তথা অভিলক্ষ্য আতসকাচের সাহায্য নিতে হবে।

ম্যাজিক লণ্ঠনে স্বচ্ছচিত্রের জায়গায়, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ধাতব-পাত লাগিয়ে **তারকাখচিত আকাশ**-এর ছবি প্রক্ষেপণ করা যায়। ছিদ্রগুলি এলোমেলোভাবে থাকা উচিত। ১৭ নং ষ্টীল নীল বর্ণমাধ্যমে, চিত্রটি অনেকটা বাস্তবানুগ হয়ে উঠবে। পশ্চাৎপটে আঁকা অন্ধকার আকাশের গায় টর্চ্চলাইটের বাতী লাগিয়ে **তারা** দেখানো যায়। এক্ষেত্রে বাতীর সম্মুখে সামান্য অংশ ছাড়া, বাকী অংশ কালো করে দেওয়া উচিত, যেন পর্দায় কোনো আলো না পড়ে। বাতীগুলি ষ্টীল নীল সেলোফেনে মুড়ে নেওয়া যেতে পারে।

বিবিধ সূত্রপ্রদীপ ও আসবাব বাতীর কারসাজি

দর্শককে কিছুমাত্র বিব্রত না করে, আলোকের কয়েকটি উৎস সরাসরি মঞ্চের উপরে দেখানো যেতে পারে। যেমন, মোমবাতী, হ্যারিকেন লণ্ঠন, অগ্নিস্থলীর আগুন, মশাল প্রভৃতি কৃত্রিম উৎস অথবা বিদ্যুৎ, জলের উপরে প্রতিফলিত আলো প্রভৃতি প্রাকৃতিক উৎসগুলি নাটকের প্রয়োজনে ব্যবহার করার দরকার পড়ে। এগুলি যে শুধু পরিবেশ বোঝাতে সাহায্য করে তাই নয়, মঞ্চপরিকল্পনায় বিশেষ সৌন্দর্য্য সংযুক্তির কাজেও এদের অবদান অনস্বীকার্য্য।

তেলের সত্যকার বাতীর বদলে, সেই যায়গায় বৈদ্যুতিক বাতী ঢুকিয়ে দেওয়াই **লণ্ঠনের আলো** দেখানোর সবচেয়ে ভালো ব্যবস্থা। লণ্ঠনের দর্শকমুখী অংশে কায়দা করে কিছু আড়াল দিলে, বা কাচে কালি ফেলার ব্যবস্থা করলেই, ব্যাপারটির কারসাজি ধরা পড়ার ভয় থাকেনা। লণ্ঠনটি জ্বালানো অবস্থায় হাতে নিয়ে যদি প্রবেশ বা প্রস্থানের প্রশ্ন থাকে, তবে তৈলাধারে ব্যাটারী রেখে, টর্চের বাতী ব্যবহার করতে হবে। অভিনেতাকে দিয়ে যদি বাতীটি জ্বালানো বা নেভানোর প্রয়োজন পড়ে; তবে অভিনয়সূত্রে যতদূর সম্ভব স্বাভাবিকতা বজায় রেখেই, আলোকসূত্রকে আড়াল করে দাঁড়াতে হবে নিজের শরীর দিয়ে। সত্যকার তেলের বাতী-যুক্ত লণ্ঠনও ব্যবহার করা যেতে পারে।

মোমবাতীর আলো দেখাতে হলে, মোমবাতীর শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি মোমবাতী। কারণ এর শিখা-কম্পনের ভাবটি অন্য কিছু দিয়ে আনা সম্ভব নয়। সত্যকার মোমবাতী ব্যবহারের সময় দৃশ্যপট এবং অন্যান্য দাহ্যবস্তু থেকে যথেষ্ট দূরে, সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। অন্ধকার রঙ্গমঞ্চে একটি মোমবাতীর আলোই দর্শকের চোখে যথেষ্ট আঘাত করবে। সেই আঘাত দূর করার জন্য, রঙ্গপীঠে যৎসামান্য সহযোগী উজ্জলতা বাড়িয়ে তোলা দরকার। এই উজ্জলতার জন্য ব্যবহৃত স্পটবাতীটিকে মাটিতে বসিয়ে ঈষৎ ঊর্দ্ধমুখী আলোক প্রেরণের ব্যবস্থা করা উচিত। সেইসঙ্গে এ্যাম্বার বর্ণমাধ্যম লাগিয়ে, গাছের ডাল বা আঙ্গুলের সাহায্যে শিখা কম্পনের ভাবটি সৃষ্টি করেতে হবে।

আগুনের চারিত্রিক বৈশিষ্টে এমন এক নাটকীয় সৌন্দর্য্য প্রচ্ছন্ন আছে যে, নাটক-অভিনয়ে এর বহুরকমের ব্যবহার খুবই সুপরিচিত। শীত-প্রধান দেশের আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে **অগ্নিস্থলি**র উপস্থিতি একটি অপরিহার্য্য বিষয়। **যজ্ঞস্থল** অথবা শিবিরের **অগ্নিকুণ্ড** একইভাবে পরিবেশ রচনায় সহায়ক।

একটি উপরমুখীভাবে বসানো বৈদ্যুতিক পাখার উপরে উপযুক্ত ধারকের সাহায্যে একটি তারের ঢাকা দিয়ে [চিত্র ৪৪.৩] তার গায় বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের শিল্ক বা জিলেটিনের ফিতে লাগিয়ে দিতে হবে। পাখাটি ঘুরলেই ফিতেগুলি ঊর্দ্ধমুখী হয়ে কাঁপতে সুরু করবে। পাখার নীচে এম্বার ও লাল রঙের বাতী জ্বাললেই দূর থেকে ফিতে-গুলিকে মনে হবে আগুনের শিখা। ব্যবস্থাটির সামনে জ্বলন্ত কয়লার অনুকৃতি তৈরী করে ক্ষুদ্রাকৃতি ভূমিপট হিসাবে ব্যবহার করা দরকার। রাসায়নিক প্রকৃয়ায় অথবা নলের ভিতর দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়া পাঠিয়ে, আগুনের সঙ্গে ধোঁয়ার সংযোগ ফুটিয়ে তুললে, কারসাজিটি বাস্তবানুগ হয়ে উঠবে।
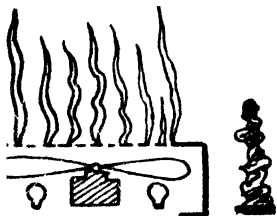
[চিত্র ৪৪.৩] অগ্নিশিখা দেখানোর ব্যবস্থা

এই ব্যবস্থায় কাঁপানো ফিতেগুলির ভিতর দিয়ে স্পটবাতীর সূক্ষ্মকোণী রশ্মি পাঠালে, জ্বলন্ত আগুন থেকে পাওয়া আলোর মতো সেই রশ্মি

কাঁপতে আরম্ভ করবে দৃশ্যপটের উপরে। এর সঙ্গে উপযুক্ত বর্ণমাধ্যম ব্যবহার করা অবশ্যই কর্তব্য। দূরস্থিত মশাল বা জ্বলন্ত চিতার আলো এইভাবে দেখানো যেতে পারে।

ঘন ঘন ঝরির বাতী ও ফ্লাডবাতী জ্বালিয়ে নিভিয়ে **বিদ্যুতের আলো** বোঝানো যায়। ঈষৎ ষ্টীলনীল আভা থাকা উচিত বিদ্যুতের আলোয়। আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে বিদ্যুতের আলো জানালা বা খোলা দরজার পথেই আসা উচিত। এক্ষেত্রে ঝরি ব্যবহার করা উচিত নয়।

[চিত্র ৪৪.৪]
বিদ্যুৎ-জালতি

ধাতবপাতে কাটা বিদ্যুৎ-জালতি [চিত্র ৪৪.৪] ম্যাজিকলণ্ঠন মারফত বলয়পটে প্রক্ষেপণ করেও বিদ্যুৎ দেখানো যায়। যন্ত্রের মুখে হাত নেড়ে বা বিশেষ সাগি-ব্যবস্থার সাহায্যে বিদ্যুতের চমকানো ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা সম্ভব। প্রক্ষেপিত মেঘের চিত্রের উপরে, নেপথ্য শব্দব্যঞ্জনার সঙ্গে ব্যবহৃত হলেই, বিদুৎচমক বাস্তবানুগ মনে হবে।

বিদ্যুৎচমক দেখানোর প্রয়োজনে ঘন ঘন বাতী জ্বালানো নেভানোর কাজটি সুইচ মারফৎ না করে ফিউজ মারফত করা সুবিধাজনক। সুইচ ব্যবহারে অবাঞ্ছিত শব্দের উৎপত্তি হয়; তাছাড়া সুইচ অকেজো হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

জলের বুকে আলো পড়লে, তার **কম্পিত প্রতিবিম্ব** প্রতিফলিত হয় আশপাশের যায়গাগুলিতে। মঞ্চের উপরে এই কারসাজি দেখানোর কায়দা নীচে বলা হলো:

একটি তিন ইঞ্চি ধার বিশিষ্ট চারকোণা বড় পাত্রের মধ্যে অনুরূপ আকৃতির একটি আয়না বসাতে হবে। এবার পাত্রটি জলপূর্ণ করে, একটি ছোট স্পটবাতীর আলো এমনভাবে তার উপরে ফেলতে হবে, যেন প্রতিফলিত রশ্মি দৃশ্য-পটের প্রয়োজনীয় স্থানে পড়ে [চিত্র ৪৪.৫]।

[চিত্র ৪৪.৫] কম্পিত প্রতিবিম্ব দেখানোর কারসাজি

এই অবস্থায় জলে সামান্য নাড়া দিলেই, প্রতিফলিত রশ্মি টুকরো টুকরো হয়ে কাঁপতে সুরু করবে।

আয়নার উপরে গোলাকার বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ছিদ্র যুক্ত জালতি চাপিয়ে জল স্থির রেখে, চাঁদের প্রতিবিম্ব ফেলা যেতে পারে। জলে ঢিল ফেলার ভঙ্গীর সঙ্গে পাত্রের জল কাঁপিয়ে দিলেই, চাঁদের প্রতিবিম্ব বিরাট আলোড়নের সঙ্গে খান খান হয়ে ভেঙে যাবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, জলে কম্পন জাগানোর জন্য, জলের স্তরে কাঠি বা আঙ্গুল ছোঁয়ানোই যথেষ্ট। হাত দিয়ে নাড়াতে গেলে, প্রতিবিম্ব এতবেশী বিকৃত হয়ে যাবে যে, তা আর বোঝা যাবে না। জল নাড়ানোর জন্য বৈদ্যুতিক পাঁখারও সাহায্য নেওয়া চলে, তবে হাওয়ার বেগ পূর্বাহ্নে পরীক্ষা করে নির্ধারিত করা উচিত।

মঞ্চে **ধোঁয়া সৃষ্টি** করার জন্য নানা রকমের উপায় ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে **ফ্ল্যাশ-বক্স** তড়িৎশক্তির সাহায্যে কাজ করে। জালের নীচে বাক্সবন্দী একটি কম এ্যাম্পিয়ারের ফিউজের উপর ফ্ল্যাশ-পাউডার [পটাশ ও মোম-ছালের মিশ্রণ] রেখে, প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ঐ তড়িৎচক্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ করলেই, ফিউজটি জ্বলে যায় এবং পাউডারে আগুণ লাগার ফলে ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। এছাড়া আরও কয়েকটি উপায় আছে ধোঁয়া সৃষ্টি করার। **স্মোকবম্ব** নামে ধোঁয়া তৈরীর একজাতীয় বাজী পাওয়া যায়। এর পলতেতে আগুণ ধরালেই ধোঁয়া বেরোতে থাকে। **বরফের** উপরে হঠাৎ **ঈষৎ গরম জল** ঢাললেও বাষ্প সৃষ্টি হবে। **স্যাল এ্যালমোনিয়াক** অথবা যে কোনও খনিজ তেল গরম করলেই ধোঁয়া বেরোয়। **টাইটেনিয়াম টেট্রাক্লোরাইড**-এর সঙ্গে জল মেশালেও ধোঁয়ার সৃষ্টি হয়। **সালফিউরিক এসিডে** চিনি মেশালে ধোঁয়া ওঠে। **মেটালিক সোডিয়াম**-এর সঙ্গে **মোমছাল** মিশিয়ে জলের সংস্পর্শে আনলেই ধোঁয়ার সৃষ্টি হবে। মনে রাখতে হবে, ধোঁয়া সৃষ্টি করলেই চলবে না—উপযুক্ত দীপচিত্রণের সাহায্যে তাকে স্পষ্ট করে তুলতে হবে। যে জায়গায় ধোঁয়া তৈরী হচ্ছে, ঠিক তার উপরে ঝোলানো বাতী থেকে আলো ফেললে, ধোঁয়া খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে, এবং অনেক উঁচুতে ওঠা পর্য্যন্ত দেখা যায়।

সাময়লফ কারসাজি

একটি আলোকসূত্রের মুখে যদি নীলাভ-সবুজ বর্ণমাধ্যম লাগানো হয়, তবে সেই আলোকসূত্র নির্গত রশ্মি লাল রঙের উপরিভাগবিশিষ্ট বস্তুর উপর প্রতিফলিত হয়ে

ফিরে আসবে না। ফলে, বস্তুটি কালো রঙের বলে মনে হবে। যদি লাল রঙের বর্ণমাধ্যম ব্যবহার করা হয়, তবে উপযুক্ত বর্ণবিরোধের অভাবে, বস্তুটি লাল আলোয় সাদা রঙের বস্তু দেখার তুল্য মনে হবে। ধরা যাক, একজন অভিনেতাকে লাল রঙের সাহায্যে রূপসজ্জা করা হয়েছে, এবং পরানো হয়েছে কালো এবং নীলাভ সবুজের ডোরাযুক্ত পোষাক। লাল আলোয় এই অভিনেতাকে মনে হবে, একজন কালো পোষাকী ফর্সা লোক বলে ; নীলাভ সবুজ আলোয় কিন্তু তার বর্ণ হবে কালো, আর পোষাকের ডোরাকাটা ভাবটি পরিস্ফুট হবে উঠবে।

উপরে বর্ণিত কারসাজি কাজে লাগিয়ে, পশ্চাৎপটে উপর্যুপরি আঁকা ছবিকে বিভিন্ন রঙিন আলোয় নানাভাবে পরিবেশন করা যায়। গ্রেট ব্রিটেনে **এড্রিয়ান সাময়লফ** প্রথম এই চিত্তাকর্ষক কারসাজি দেখান, এবং সেই থেকেই কারসাজিটি তাঁরই নামে পরিচিত হয়ে আসছে। মার্কিন-মুলুকে এটি **পয়েন্টিলেজ** চিত্রাঙ্কন প্রথা নামেও পরিচিত। পশ্চাৎপটের গায় কালো রঙের গাছের গুঁড়ি, লাল রঙের ফুল, সবুজ রঙের পাতা প্রভৃতি এঁকে যদি নীলাভ-সবুজ আলোয় উদ্ভাসিত করা হয়, তবে সমগ্র দৃশ্যটির একটি সাদা-কালো সাধারণ প্রতিচ্ছবি দেখা যাবে। এরসঙ্গে লাল আলোর সংযোগ ঘটলে, প্রতিফলনজনিত ত্রুটি সংশোধিত হওয়ার ফলে, শীতের রাজ্যে বসন্ত আসার দৃশ্যটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠবে।

দৃশ্যপটের আমূল পরিবর্তন ঘটানোর ব্যপারেও এই কারসাজি সুন্দর-ভাবে কাজে লাগানো যায়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, একটি দৃশ্যপটে স্বচ্ছ লাল রঙে তাজমহলের দৃশ্য আঁকা হলো। রঙ ভালোভাবে শুকিয়ে যাওয়ার পর, সেই দৃশ্যপটের উপরেই স্বচ্ছ নীলরঙে আঁকা হলো সাগর-বেলার দৃশ্য। সমুদয় দৃশ্যপটটি নীলরঙে আলোকিত করলে, সাগরবেলা অদৃশ্য হয়ে যাবে ; ফুটে উঠবে তাজমহলের ছবি। লাল আলোয় বিপরীত ঘটনা ঘটবে—অর্থাৎ তাজমহল যাবে মিলিয়ে ; ফুটে উঠবে সাগরবেলা। চিত্রায়ণের সময় লাল ও নীলরঙের জিলেটিনের ভিতর দিয়ে দেখে দেখে আঁকলে, কাজটি সঠিক এবং সহজ হয়। পরিকল্পনাকারীর চিন্তাশক্তির পরিচয় দেওয়ার প্রচুর সুযোগ লুকিয়ে আছে এই জাতীয় কারসাজি দেখানোর মাঝে। অনেকক্ষেত্রে এই কারসাজি **পারকিন্‌জ্‌ এফেক্ট** নামেও পরিচিত।

অতিবেগুণী আলোর ব্যবহার

বর্ণালীর সাতটি রঙের আলো তাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের গুণে আমাদের চোখে ধরা পড়ে। ঐ বর্ণগুলির চেয়ে কম বা বেশী দৈর্ঘ বিশিষ্ট তরঙ্গের কিছু আলো আছে, যা আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। **অতি বেগুণী** বা **আলট্রা ভায়লেট** ঐ ধরণের একটি বেশী দীর্ঘ তরঙ্গের আলো, যা আমাদের স্বাভাবিক দৃষ্টিতে সরাসরি ধরা পড়ে না। একমাত্র সাদা রঙের কোনও বস্তুর উপরে এই আলো পড়লে, বস্তুটি উজ্বল হয়ে ওঠে। অথবা প্রতিপ্রভ বা ফ্লুরোসেণ্ট বর্ণে রঞ্জিত যে কোনও বস্তুই এই আলোতে জ্বলজ্বল করে।*

ম্যাজিক প্রদর্শনী বা অনুরূপ কোনও ক্ষেত্রে অদৃশ্য করার কারসাজি দেখানোর জন্য এই অতিবেগুণী আলোর ব্যবহার বহুল প্রচলিত। সাধারণতঃ মার্কারী ল্যাম্পেই এই বর্ণ ব্যবহার করা হয় বলে, এগুলি সঠিক মুহূর্তের বেশ কিছুক্ষণ আগে জ্বেলে নিতে হয়, কারণ পূর্ণপ্রভ হতে এধরণের বাতী কিছুটা সময় নেয়। একবার জ্বেলে নেভানোর পর বাতী সম্পূর্ণ ঠাণ্ডা না হওয়া পর্য্যন্ত পনরায় জ্বালানো যায় না। ব্যবহারের সময় এই সতর্কতাগুলি স্মরণে রেখে পরিকল্পনা করতে হবে।

মঞ্চের উপর যে বস্তুগুলিকে চোখের সামনে অদৃশ্য করতে হবে, সেগুলিকে বিভিন্ন সাধারণ রঙে রাঙিয়ে রেখে, যেটি অদৃশ্য হবে না, তাকে সাদা রাখতে হয়। অন্যান্য আলোর মাঝেই অতিবেগুণী বাতীকে পূর্ণপ্রভ করে নিতে হবে। তারপর প্রয়োজনীয় মুহূর্তে অন্যান্য আলোগুলি নিবিয়ে দিলেই, সাদা বস্তু ছাড়া বাকী সবকিছু মুছে যাবে দৃষ্টি থেকে।

দুটি কথা এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। (১) মানুষের চুলের রঙ কালো হলেও, অতিবেগুণীতে চুল অদৃশ্য হয় না—ধূসর দেখায়। সে ক্ষেত্রে কোনও মানুষকে অদৃশ্য করার সময় তার মাথায় আগে থেকে কালো কাপড় অথবা নকল চুলের পরচুলা পরিয়ে রাখতে হবে।

(২) দাঁতের রঙ যাই হোক না কেন, অতিবেগুণী আলোয় দাঁতের পাটি ভীষণভাবে ঝক্ ঝক্ করে। অতএব অদৃশ্য হওয়া চরিত্র যেন ভুলেও অদৃশ্য হওয়ার পরে মুখ না খোলে।

অতিবেগুণী রশ্মির তরঙ্গ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উপরের পোষাক ভেদ করে ঢুকে যায়। তাই অদৃশ্য হওয়া চরিত্রের অন্তর্বাসও যেন সাদা না থাকে। আর একটি সাবধানতার কথা স্মরণে রাখতে হবে। চোখের পক্ষে এই আলো ক্ষতিকারক। এই আলোয় অভিনয় করার সময় অভিনেতৃবৃন্দ যেন আলোকসূত্রের দিকে না তাকান। বেশীক্ষণ এই আলো দৃষ্টিপথে এলে, মাথায় যন্ত্রণা অনুভূত হতে পারে।

গজ কাপড় বা নেটের কারসাজি

যে কোনও দৃশ্যের সামনে যদি একটি গজ কাপড়ের পর্দা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, তবে দৃশ্যটি ঝাপসা দেখাবে। ভোর বা রাতের কুয়াশা বোঝানোর জন্য এই কারসাজি খুবই বাস্তবধর্মী চিত্র ফুটিয়ে তোলার কাজে লাগে।

নেটের পর্দার সাহায্য নিয়ে সহজেই কোনও দৃশ্য, বস্তু বা ব্যক্তিকে অদৃশ্য করা যায়। যা কিছু অদৃশ্য করা হবে, তার সামনে থাকবে এই
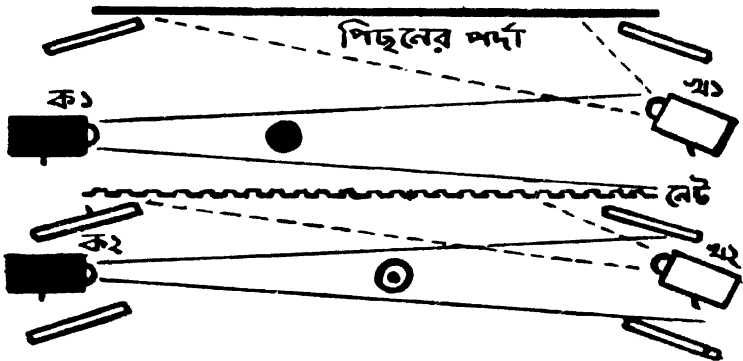
[চিত্র ৪৪.৬] নেটের পর্দা ব্যবহারের কারসাজি

নেটের পর্দা। পর্দার পিছনে অদৃশ্য করার বিষয়টিকে এমনভাবে পাশের দিক থেকে আলোকিত করতে হবে, [চিত্র ৪৪.৬] যেন সেই আলোর রশ্মি নেটের পর্দা বা পশ্চাৎপটকে স্পর্শ না করে। নেটের সামনে রাখা বিষয়-গুলিকেও অনুরূপভাবে পাশের দিক থেকে আলোকিত করতে হবে, যেন

সেই আলো নেটের পর্দা ভেদ করে পিছনে না যায়। ক-অবস্থান দু'টিতে আলোক যন্ত্র রাখা অবস্থায়, নেটের পিছন দিকের আলো নিভে গেলে, পিছনের বিষয়টি [চিত্রে কালো রঙের বৃত্ত] দর্শকের দৃষ্টি পথ থেকে অদৃশ্য হয়ে যাবে। নেটের উপস্থিতি কোনো পর্য্যায়েই দর্শকের দৃষ্টিগোচর হবে না।

নেটের উপরে জলরঙ দিয়ে দৃশ্যও আঁকা যায়। পিছনের পশ্চাৎপটে আঁকা একটি দৃশ্য থেকে সামনে নেটে আঁকা ভিন্ন দৃশ্যে পরিবর্তিত হওয়ার কারসাজিও আর একটি চমকপ্রদ পরিবেশনের নমুনা। এক্ষেত্রে চিত্রে খ-অবস্থান দু'টিতে দেখানো আলোকসম্পাতের আয়োজন করা হয়।

গজ বা নেট উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্য রাখতে হবে, পর্দায় যেন কোনো কোঁচকানো ভাব না থাকে এবং পুরো পর্দাটি এক বুনোটের হয়। শেলাইয়ের জোড় মাথা থাকলে, তা কালো কালো দাগের মতো ফুটে উঠবে এবং ধরা ফেলে দেবে গজ বা নেটের উপস্থিতি।

যদি জোড়া লাগানো অপরিহার্য্য হয়, তবে শেলাইয়ের লাইনগুলি লম্ব-ভাবে না রেখে ভূমি-সমান্তরাল রাখা উচিত। ভূমি-সমান্তরাল রেখাগুলি পর্দা ঝোলানোর সময় আঁকা বাঁকা হয়ে যায়, এবং পশ্চাৎপটে আঁকা বা প্রক্ষেপিত দৃশ্যাবলীর সঙ্গে মিশে যেতে পারে। লম্বভাবে ফুটে ওঠা কালো দাগ কিছুতেই মেলানো যায় না।

আলো! আলো!

আলো যেন দীপচিত্রণ-শিল্পীর হাতে একটি যাদুদণ্ড-বিশেষ। বিভিন্ন বর্ণমাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করার ক্ষমতা, প্রাখর্য্য এবং পরিবেশনে পরিবর্তন সাপেক্ষতা এবং সবার উপরে এর প্রক্ষেপণ-ধর্মীতা আলোকে করে তুলেছে একটি অতি শক্তিশালী হাতিয়ার।

আলোকসূত্র অথবা নিয়ন্ত্রণের ব্যবহার আয়ত্ব করতে খুব বেশী দিন লাগে না। কিন্তু যন্ত্রের ব্যবহারটুকু সম্বল করে বড় জোর **নিয়ন্ত্রক** অর্থাৎ 'বোর্ড অপারেটার' হওয়া যায়, আলোকসম্পাত-পরিকল্পক হওয়া যায় না।

পরিকল্পক হতে হলেও চাই আলোর সম্পর্কে ধারণা, যে ধারণা আসবে প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা থেকে। দীপচিত্রণশিল্পীর প্রয়োগ-অভ্যাস তাই যতটা না তার যন্ত্রপাতিতে, তার চেয়ে বেশী তার নিজের চোখের উপরে নির্ভরশীল। চোখ খোলা রেখে প্রতিটি মুহূর্তের বাস্তব চিত্রে আলোর খেলা প্রত্যক্ষ করে যেতে হবে। আর এই প্রত্যক্ষ করার ভিতর দিয়েই শুরু হবে দীপচিত্রণের প্রাথমিক পাঠগ্রহণ পর্ব।

অনুশীলনী

দীপচিত্রণ বিষয়ক বিবিধ প্রশ্নাবলী

১। তড়িৎশক্তি ব্যবহারের পূর্বে প্রচলিত মঞ্চে আলোকসম্পাতের ধারা সম্বন্ধে কি জান? মঞ্চে বৈদ্যুতিক আলোকের সার্বজনীন ব্যবহার দ্রুত প্রসার লাভের কারণ কি?

২। "মঞ্চে আলোকসম্পাত করা হয়, কয়েকটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের দিকে লক্ষ্য রেখে।" উদ্দেশ্যগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর।

৩। ওয়াট, এ্যাম্পিয়ার ও ভোল্ট-এর সংজ্ঞা লিখ এবং ও'মের নিয়ম ব্যাখ্যা করে উক্ত পরিমাণগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধ বুঝিয়ে দাও।

৪। একটি তড়িৎচক্রে বিদ্যুৎশক্তি ব্যয়ের গড় পরিমাণ ২৬.২৫০ ওয়াট। উক্ত চক্রে তড়িৎ প্রবাহের গতি ২৫ এ্যাম্পিয়ার। রেজিষ্ট্যান্স নিরূপণ কর।

৫। মঞ্চে ব্যবহৃত আলোকসম্পাতের সরঞ্জামগুলিকে কি ভাবে এবং কয়টি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়? উদাহরণসহ প্রত্যেক শ্রেণীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। বিভিন্ন শ্রেণীর আলোকসূত্রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট উল্লেখ করে, তুলনামূলক আলোচনা কর। সাধারণভাবে আলোক যন্ত্রগুলির কি কি বিশেষ গুণ থাকা উচিত?

৬। ডিমারের কার্য্যপ্রণালী ব্যাখ্যা কর। চরিত্রগত পার্থক্য উল্লেখ করে, বিভিন্ন শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ নিবন্ধ রচনা কর।

৭। আলোকের প্রখরতা কিসের দ্বারা প্রভাবিত হয়? "রঙ্গপীঠে আলোকরশ্মির পরিবেশনের উপরেই দৃশ্যের নাটকীয় রূপটি প্রধানতঃ নির্ভর করে।" বুঝিয়ে দাও।

৮। মঞ্চের উপরে বর্ণের উৎপাদন কিভাবে হয়? বর্ণের বিযুক্তি মিশ্রণ, সংযুক্তি মিশ্রণ ও ভগ্ন মিশ্রণের পার্থক্য কি?

৯। "যে রঙ বা রঙগুলি মঞ্চে বিশেষভাবে দেখানো দরকার, তাদের বিচ্ছিন্ন অংশে এবং উচ্চালোকিত স্থানগুলিতে সীমাবদ্ধ রাখা উচিত।" বিরোধাত্মক বর্ণ সমাবেশ নীতির উপরে নির্ভর করে এই উক্তি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা কর।

১০। বর্ণের ভাবগত মূল্য এবং আবেগমান বলতে কি বোঝায়? নীচের বর্ণগুলির উপমাত্মক মূল্যের পরিচয় দাও :—

কমলা, পারপল্, নীল, সাদা এবং ধূসর।

১১। "মূলসূত্র" এবং "উপসূত্রে"র চরিত্রগত পার্থক্য বুঝিয়ে দাও। "সীমালোক" আলোকসম্পাতের ব্যবহার কি ভাবে করা হয়? "পূর্তি" কাকে বলে ও তার প্রয়োজন কি?

১২। আলোকের সাহায্যে কয় রকমের ছায়ার সৃষ্টি হয়? অবাঞ্ছিত ছায়ার হাত এড়ানোর উপায় কি? ছায়ার আকৃতি ও ঘনত্ব কিভাবে প্রভাবিত হয়? বিকৃত ছায়ার সৃষ্টি কিভাবে হয়, এবং কি কাজে লাগানো যেতে পারে বর্ণনা কর।

১৩। বলয়পটের ব্যবহার সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর। আড়ালের প্রয়োজনীয়তা কি? এগুলিকে আলোকিত করার ধারা সম্পর্কে কি জান?

১৪। একটি ৩৫ ফুট দীর্ঘ ও ১৬ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট বলয়পটের জন্য উপরের ঝারিতে বিভিন্ন রঙের তড়িৎচক্রে ৫০ ওয়াটের কয়টি হিসাবে বাতী দরকার?

১৫। আভ্যন্তরীণ দৃশ্যে দিন ও আলোকিত রাত্রির পার্থক্য কি ভাবে বোঝা যাবে? বহির্দৃশ্যে চাঁদের আলো বোঝানোর উপায় কি?

১৬। নৃত্যানুষ্ঠানে আলোকসম্পাত অথবা ছায়াভিনয় পরিবেশন করার ধারা সম্পর্কে কি জান লিখ।

১৭। মঞ্চনুখযুক্ত মঞ্চে আলোকসম্পাতের সঙ্গে (ক) অধিরঙ্গ ব্যবস্থার এবং (খ) কেন্দ্রায়ত অভিনয় ব্যবস্থায় আলোকসম্পাতের মূল পার্থক্যগুলি বুঝিয়ে দাও।

১৮। 'সাময়লক্ষ কারসাজি' বলতে কি বোঝায়? পরের পৃষ্ঠায় প্রদত্ত বিষয়গুলি আলোকের কারসাজিতে উপস্থাপিত করার ধারা বর্ণনা কর :—

(ক) লণ্ঠনের আলো, (খ) তরঙ্গ, (গ) কুয়াশা (ঘ) অগ্নিকাণ্ড, (ঙ) ধোঁয়া, (চ) মোমবাতীর আলো, (ছ) জল থেকে আলোর প্রতিফলন।

১৯। নীচের বিষয়গুলির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(ক) বাতীর জীবনসীমা
(খ) প্রক্ষেপ বাতী
(গ) ফিলামেণ্ট-ট্রীবেশান
(ঘ) রশ্মিকোণ ও প্রতিফলিত কোণ
(ঙ) উপলরশ্মি ও নির্গত রশ্মি
(চ) আলোকসম্পাতে বিবর্তিজ্ঞাপন
(ছ) আলোকসম্পাতের সংকেত লিপি
(জ) বঙ্গপ্রদীপ, সূত্রপ্রদীপ ও পটপ্রদীপ
(ঝ) বক্ষাতি
(ঞ) বাতীর টুপী
(ট) পরিবাহী ও অন্তরণ
(ঠ) সিরীজ ও প্যারালেল কানেকসান
(ড) সরল ব্যাটারী
(ঢ) লিনেবাচ লণ্ঠন
(ণ) পূর্ববিন্যাস নিয়ন্ত্রণ
(ত) অতিবেগুণী আলোর কারসাজি।

২০। নিম্নে বর্ণিত দৃশ্যাংশগুলির জন্য আলোকসম্পাত পরিকল্পনা কর এবং সেই পরিকল্পনা অনুসরণে হাতেকলমে আলোকসম্পাত করে দেখাও। [মোটা হরফে লেখা বিশেষ সংকেতগুলির দিকে অনুশীলকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে]

(ক) [নায়ক চিন্তামগ্ন মুখে খোলা জানালার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। **আকাশে অস্তরাগ** তখনও মিলিয়ে যায়নি।

চায়ের পেয়ালা হাতে ভৃত্য প্রবেশ করে, এবং **ঘরের আলো জ্বালতেই** নায়ক ঘুরে দাঁড়ায়।]

নায়ক ।। ওঃ, চা নিয়ে এসেছিস ? ঐ টেবিলে রাখ। আর হ্যাঁ, আলো ভালো লাগছেনা। ওটা নিবিয়ে দিয়ে যা। [ভৃত্যের **তথাকরণ** ও প্রস্থান]

[নায়ক টেবিলের পাশে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে কয়েকটা কাগজ তুলে নেয় হাতে। একটা কাগজ তার বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করলো, কিন্তু পড়া যাচ্ছেনা। হাত বাড়িয়ে **টেবিল ল্যাম্পটা জ্বেলে নেয়** নায়ক এবং কাগজটার উপরে চোখ বুলোতে থাকে।

বেশ চিন্তিত মনে হয় নায়ককে। গালে হাত বুলোতে বুলোতে **আলোটা নিবিয়ে দিলো**।

জানালার বাইরে তখন আকাশের আলো মিলিয়ে গেছে। এক চিলতে **রাস্তার আলো** এসে পড়েছে পাশের দেয়ালে।

(খ) [কামারশালে কামার তার **হাঁপরের সামনে** বসে লোহা পেটাচ্ছে। দূরে একটা কোলাহল শোনা গেল। তার কিছু পরেই ছুটে ঢুকলো একটি চোর। চারদিক দেখে শুনে, পাশে রাখা খাটিয়াটাকে সোজা করে আরাম করে বসলো সে। পকেট থেকে দেশলাই বিড়ি বার করে **বিড়ি ধরায়**।]

চোর ॥ আজ ধরে ফেলেছিল আর এট্টু হলেই। বাব্বাঃ, খুব বাঁচা বেঁচে গেছি। কি ঠিক করলে চটপট বলে ফেলো দেখি বাবা ? কেটে পড়ি।

[কামার জবাব না দিয়ে লোহার টুকরোটা **আগুনে** ফেলে গরম করতে শুরু করলো। চোর কাছে উঠে আসে।]

চোর ॥ খাটিবো খুনিবো আমি। ধরা পড়লে মারও খাবো— জেলেও ঢুকতে হতে পারে। আমার দশআনা, তোমার ছ'আনা। কি কর্তা ? রাজী ?

[কামার লোহাটাকে টেনে নিয়ে আবার পেটাতে লাগলো। হঠাৎ একটা গাড়ী এগিয়ে আসার শব্দ ; তার পরে পরেই **হেড লাইটের আলো** ঘুরে এসে পড়লো ওদের গায়। পুলিশের বাঁশী শোনা গেল পরমুহূর্তে।]

চোর ॥ খেয়েছে! পুলিশ! আমি কাটলাম দাদা। পরে দেখা হবে।

[চোর পালানোর সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের প্রবেশ। **টর্চ জ্বেলে** ওরা চারদিকে খোঁজাখুঁজি শুরু করলো।]

(গ) পূর্বে বাণীবদ্ধ করা নীচের সংলাপের সংগে সংগতি রেখে মঞ্চে অভিনয় চলবে :

"বেজায় গুমোট। ঘুম আসছেনা। বাইরে নিঃশব্দে **বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে**। একটা দুঃস্বপ্নের ঘোরে যেন **ছটফট** করছি বিছানায়। মনে হচ্ছিল যেন আমারই ভিতর থেকে **একটা পৃথক সত্বা** বেরিয়ে গেল আস্তে আস্তে, তারপর ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগলো এলোমেলোভাবে। একসময় সে আমার খুব কাছে—হ্যা, প্রায় আমার মাথার সামনে এসে দাঁড়াতেই, আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম—কে !"

"মিলিয়ে গেল সেই অস্বাভাবিক অনুভূতিটা। **চমকে উঠলো বিদ্যুৎ**। আমি দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ঘরের **আলো-গুলো জ্বেলে দিলাম একটা একটা করে**। দেখলাম, ঘামে আমার গায়ের জামা ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। কুঁজো থেকে এক গেলাস জল গড়িয়ে খাচ্ছি, হঠাৎ মনে হলো, কেউ বুঝি আমার অজান্তেই ঢুকে পড়েছে ঘরের মধ্যে। আমি চমকে ঘুরে তাকানোর মুহূর্তে সে যেন **নিভিয়ে দিলো** সবকয়টা **আলো**।"

"**সূচীভেদ্য অন্ধকারে** ঢেকে গেল চারদিক। আমি চিৎকার করে ডাকতে শুরু করলাম, 'সরমা সুজিত, ভজুয়া....'"

"আবার **জ্বলে উঠলো ঘরের আলো**। আমি চমকে চোখ মেলে দেখি, আমি তখনও বিছানাতেই শুয়ে আছি। দরজার পাশে অনেকগুলি কৌতুহলি চোখে আতঙ্ক ও বিস্ময়। সরমার হাত তখনও সুইচবোর্ড থেকে নামেনি।"

(ঘ) জানালা টপকিয়ে চরিত্রটি ঢুকে পড়লো ঘরের মধ্যে। সামান্য এগোবার চেষ্টা করতেই হোঁচট খেলো কোনো কিছুতে ধাক্কা খেয়ে। মোমবাতী দেশলাই বের করে **বাতী ধরাল** সে। সেই **বাতীর কাঁপা কাঁপা আলোয়** ভাঙা বাড়ীর বিভৎসতা আরও প্রকট হয়ে উঠলো।

এবার সে বাতীটি একটি নিরাপদ আড়ালে বসিয়ে রেখে, চারদিকে কিছু খুঁজতে শুরু করে। দু'একটা জিনিষ বাতিল করার পর, একটা ফাটা হাঁড়ি তার পছন্দ হলো। পকেট

থেকে একটা **বাণ্ডিল** বের করে সেটার **মধ্যে** **লুকিয়ে** রাখলো সে।

একটা বিড়ি ধরাতে পারলে ভালো হয়। সে **বিড়িটা** **মুখে** নিয়ে মোমবাতীর উপরে ঝুঁকে পড়লো। ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে শোনা গেল প্রচণ্ড কোলাহল।

চট্ করে **বাতীটা ফুঁ দিয়ে নিবিয়ে ছুটে** যায় সে **বন্ধ** জানালাটার কাছে। নিজেকে আড়ালে রেখে **পাল্লাটা** খুলে ফেললো সে। এক ফালি **চাঁদের আলো** এসে **পড়লো** মেঝেয়। কোলাহল-কারীরা অন্য কোনও দিকে চলে গেল।

নিশ্চিন্ত মনে ঘুরে দাঁড়ালো সে **এবার**। দুটো উপুড় করে রাখা কাঠের **বাক্স** জোড়া দিয়ে একটা চলনসই শোবার **জায়গা** বানিয়ে নিলো চাঁদের আলোয়। তারপর সটান শুয়ে **পড়লো** জ্বলন্ত বিড়িটা মুখে নিয়ে। **ধেঁায়ার কুণ্ডলী** উঠতে লাগলো উপরের দিকে।

(ঙ) একটি মরুদ্যান। বেদুইনদের তাঁবুতে **আলো জ্বলছে**।

এক যায়গায় **আগুন জ্বেলে** তাকে ঘিরে **বসেছে** গান-বাজনার আসর। পাম্থপাদপের ফাঁক দিয়ে **বাঁকা চাঁদ** দেখা যাচ্ছে আকাশের গায়। অদূরে **কয়েকটি উট** দাঁড়িয়ে বা বসে আছে। তাদের নিশ্চল ছায়া কালো-কালো দেখাচ্ছে **রাতের আকাশের** পটভূমিতে।

ধ্বনি
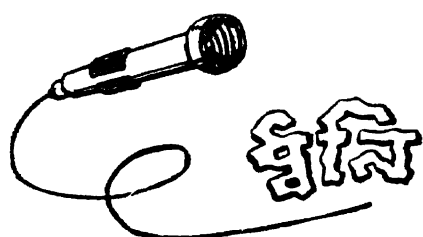
ধ্বনি-সংযোজন

বর্ণনায় পাওয়া যায়, লণ্ডনের গ্লোব থিয়েটার ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর শুরুতে কোনও এক সময় আগুন লেগে পুড়ে যায়। এই আগুনের উৎস ছিল একটি কামানের গোলা, যা এর ছাদে অবস্থিত মেশিন-রুম থেকে ছোড়া হয়েছিল নেপথ্য ধ্বনি-সৃষ্টির উদ্দেশে।

কামানের গোলা ফাটিয়ে তোপধ্বনি সৃষ্টি করার নজিরকে অবশ্য একটি চরম উদাহরণ বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু ঐ মেশিন রুমের অস্তিত্ব এবং তদানীন্তন মঞ্চ-নিয়ামকদের পুরাতন নথিপত্র ঘাঁটলে দেখা যাবে, ধ্বনিসৃষ্টির জন্য অনেক কৃত্রিম উপায়ও ব্যবহৃত হয়েছে মধ্যযুগীয় রঙ্গালয়গুলিতে। দামামা জাতীয় বাজনার সাহায্যে, অথবা অসম চাকাযুক্ত কাঠের গাড়ী গড়িয়ে মেঘগর্জন শোনানোর বহু ফিরিস্তি পাওয়া যাবে পুরানো দলিলে।

এই সব ঐতিহাসিক তথ্য একটি বিষয় খুবই সুস্পষ্টভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে যে, নাটক উপস্থাপনাকে দিনে দিনে বাস্তবধর্মীতার দিকে এগিয়ে এনেছি আমরা। এই বাস্তবধর্মীতার প্রয়োজনেই, প্রথমে এসেছে দৃশ্যপট, তার পরে পরেই এসেছে কৃত্রিম ধ্বনিক্ষেপণ, এবং সবার শেষে এসেছে আলোকসম্পাত।

আলোকসম্পাতের পরবর্তী অনুগামী হিসাবে এলো বিদ্যুতের ব্যবহার। এই বিদ্যুৎ-চালিত কলকব্জা যন্ত্রপাতির আবিষ্কার ও উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি-সৃষ্টি ও প্রক্ষেপণের পদ্ধতিও পাল্টে গেছে আমূলভাবে। আজ আর যুগপৎ ধ্বনি বা "লাইফ সাউণ্ড"-এর অপেক্ষায় কেউ থাকতে চায় না; পূর্বাহ্নে খুব সহজেই প্রয়োজনীয় যাবতীয় ধ্বনি বাণীবদ্ধ করে রাখা যায়। বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ধ্বনির ভাণ্ডারও মজুত রাখা হচ্ছে, দরকারের সময় যেখান থেকে ধ্বনি ধার নিয়ে এসে কাজ চালিয়ে নেওয়া যেতে পারে।

তবে মৌলিকত্বের দিক থেকে এখনও কৃত্রিম ধ্বনি সৃষ্টির চাহিদা আছে যথেষ্ট। রেডীমেড জামা এবং অর্ডার দিয়ে তৈরী করা জামার মধ্যে যে তফাতটুকু থেকে যায়, মজুদভাণ্ডার থেকে আনা ধ্বনি আর নিজের প্রয়োজনমতো তৈরী করা ধ্বনির মধ্যেও সেই পার্থক্য থাকতে বাধ্য। সে ক্ষেত্রে উৎকর্ষগত দিক দিয়ে নিজেদের কাজকে উন্নতমানের করে তুলতে হলে, ধ্বনি-বিজ্ঞানের দিকটিও আয়ত্বে রাখতে হবে মঞ্চ-কর্মীদের।

সেই সঙ্গে জানতে হবে, রঙ্গলয়ে ধ্বনি-বিস্তরণের সুবিধা ও অসুবিধার বিভিন্ন দিকগুলির কথা—আর বুঝতে হবে নাটককে।

পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে ধ্বনির তত্বগত দিক, ধ্বনি সম্পর্কিত যন্ত্রাদির কাজ, এবং নাটকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নেপথ্য ধ্বনির ব্যবহার সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হলো। এর সঙ্গে নাটকের মেজাজ বুঝতে পারার জন্য দরকার সূক্ষ্ম নাটক-বোধ। এই নাটক-বোধের ভিতর দিয়েই মঞ্চের একজন ধ্বনি-নিয়ন্ত্রক আর দশজন সাধারণ যন্ত্রীদের থেকে পৃথক হয়ে, একজন শিল্পী হয়ে ওঠেন। এই শিল্পী-সত্বা নিজের ভিতরে না জাগানো পর্য্যন্ত, মঞ্চের সার্থক নেপথ্য কর্মী হয়ে ওঠা সম্ভব হবে না কারও পক্ষে।
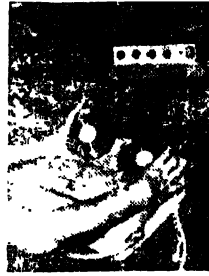
এক ধ্বনির বিশেষ ধর্ম

ধ্বনি ধ্বনির সংজ্ঞা এবং বিশেষ ধর্মের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে, ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণ ও প্রক্ষেপণের বিধি ব্যবস্থাদির কার্য্যকারণ বোঝা সহজ হবে না। শব্দ এবং মানুষের কানে তার অনুভূতি—এ দু'য়ের মাঝে পার্থক্য আছে। জনমানবশূন্য পার্বত্যপ্রদেশে—যেখানে শোনার মতো কানের অস্তিত্ব নেই—পাহাড়ের ধ্বস নামলে সেখানে শব্দ ওঠে কিনা, এখনও এটি একটি তর্কের বিষয়। সাধারণ কানে ধরা পড়ে, এমনই কোনও প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম বিক্ষোভ কিম্বা চাপের পরিবর্তন অথবা স্পন্দনকে আপাততঃ আমরা **শব্দ** অথবা **ধ্বনি** নামে অভিহিত করবো। [এই সংজ্ঞা অনুসারে, পাহাড়ের ধ্বস নামার ফলে শব্দ সৃষ্টি হয়েছিল।] সাধারণতঃ এই বিক্ষোভাদির প্রতিক্রিয়া বায়ুস্তর মারফত আমাদের কানে পৌঁছায়। ধ্বনির বিস্তরণের জন্য সর্বদাই এমন কোনও মাধ্যম আবশ্যক, যার মধ্যে **জাড্য** এবং **স্থিতিস্থাপকতা** উভয়বিধ গুণ বর্তমান। শূন্যের মাধ্যমে ধ্বনির বিস্তরণ সম্ভব নয়। সংজ্ঞা হিসাবে বলা চলে, কোনও কম্পনশীল বস্তু থেকে স্থিতিস্থাপক জড় মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যে বিশেষ অনুভূতি আমাদের কানে প্রবেশ করে, তাকেই আমরা শব্দ বা ধ্বনি বলি।

শ্রবণেন্দ্রিয় আমাদের পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্যতম আমাদের **কর্ণ** বা কানের কাজ মস্তিষ্কে শব্দের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা। মস্তিষ্কের সংজ্ঞা নাড়ীদের অন্তিম শাখাগুলির প্রান্তে গ্রহণকারক এক বিচিত্র ও অতিসূক্ষ্ম কোষাণু জড়িত আছে, যার দ্বারা ইন্দ্রিয়-প্রেরিত উত্তেজনা গৃহীত হয়।

মানুষের কান [চিত্র ৪৬] তিনটি ভাগে বিভক্ত। (ক) বহিঃকর্ণ, (খ) মধ্যকর্ণ এবং (গ) কর্ণাভ্যন্তর। বহিঃকর্ণ অংশের প্রথম ভাগটি **কানের**

[চিত্র ৪৫] ধ্বনি বাণীবদ্ধকরণের প্রায়োগিক পাঠগ্রহণ

পাতা আকারে মাথার দুপাশে দেখতে পাওয়া যায়। এর কাজ ধ্বনি তরঙ্গগুলিকে সংগ্রহ করা। সংগ্রহিত তরঙ্গমালা **কর্ণকুহর** পথে এগিয়ে যায় **ড্রাম** অথবা **টিম্পানিক পর্দা**র দিকে। পর্দাটির চেহারা অনেকটা বাঁকাভাবে বসানো খুরির মতো। এই পর্দা থেকেই মধ্য কর্ণের সীমানা শুরু হয়েছে। এখানে তিনটি ছোট ছোট হাড় এমন সুকৌশলে সংলগ্ন আছে যে, পর্দার সামান্যতম কম্পনও এরা ভিতরের অংশে পুনর্প্রচার করতে পারে কতকটা লিভারের কায়দায়।
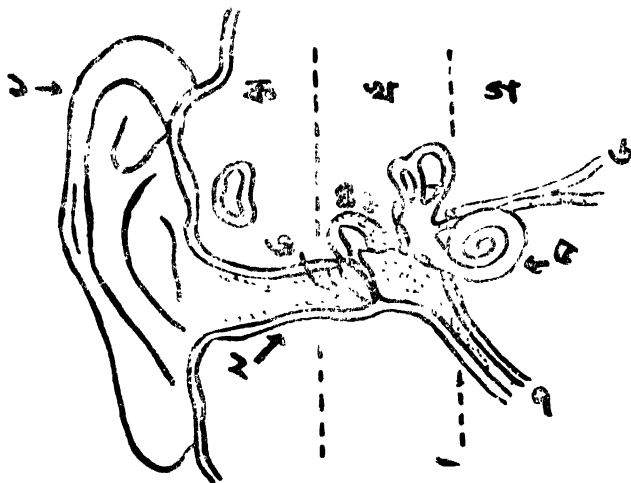
[চিত্র ৪৬] মানুষের কান : ১. কানের পাতা, ২. কানের কুহর বা কেনাল, ৩. পটহ বা পর্দা, ৪. লিভার ত্রয়, ৫. ককলিয়া, ৬. মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত স্নায়ু, ৭. কণ্ঠনালীর সঙ্গে যোগসূত্র।

কর্ণাভ্যন্তর বা ভিতরের কানের অংশগুলি রীতিমতো জটিল ব্যূহের মতো সাজানো। এর মধ্যে আড়াই প্যাঁচের একটি শামুকের আকার বিশিষ্ট **ককলিয়া**র মধ্যে অংসখ্য সূক্ষ্ম ধমনী, শিরা, লাসিকাবাহী নালী আছে, যা থেকে রস ঝরে সমস্ত জায়গাটিকে পূর্ণ করে রেখেছে। ড্রামের পিছন থেকে কুচো হাড় তিনটি লিভারের মতো কেঁপে কেঁপে তরঙ্গকে ঠেলে দেয় ককলিয়াতে, যেখানকার রসের মধ্যে ঢেউ ওঠে। এই ঢেউ ক্রমে বিভিন্ন স্নায়ুজালের ভিতর দিয়ে মস্তিষ্কের শ্রুতিকেন্দ্রে চলে যায়। তবে শ্রুতিকেন্দ্রে কিভাবে সুরগ্রাম ও মূর্চ্ছনা জাগে, ধ্বনির লঘু-

গুরুত্ব, বিস্তার, তারতম্য অথবা দিক্‌জ্ঞান কি ভাবে জন্মায়, এখনও সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ নয়।

ধ্বনির উৎপত্তি, বিস্তরণ ও বিবিধ সংজ্ঞা

ধ্বনির উৎপত্তিস্থল কোনও না কোনও **স্পন্দিত বস্তু**। সেতারে বা তানপুরার তারে ঝংকার দিলে, অথবা একটি **সুর শলাকা**য় আঘাত করলে, ধ্বনির উৎস-মুখের স্পন্দন চোখেই দেখা যায়। তেমনি আবার, ধ্বনি প্রক্ষেপকের মুখে বা বেতার যন্ত্রের জালতিতে স্পন্দন এত মৃদু যে চোখে ধরা পড়ে না; কিন্তু স্পর্শের দ্বারা অনুভব করা যায়।

ধরা যাক, কোনও বস্তু বাতাস পরিবেষ্টিত অবস্থায় কাঁপছে। যে মুহূর্তে এই কম্পনের ফলে বস্তুর শরীর বাইরের দিকে এগিয়ে যায়, সংলগ্ন বায়ুস্তর সেইদিকে ধাক্কা খাওয়ার ফলে সংকুচিত হয়, যার পরিণতিতে ঐ স্তরের ঘনত্ব ও উত্তাপ যায় বেড়ে। এই অবস্থাকে **ঘনীভবন** বলা হয়। এই আলোচ্য স্তরের চারপাশে অপেক্ষাকৃত নিম্নচাপ থাকার ফলে, উর্দ্ধচাপযুক্ত ক্ষেত্রের অণুগুলি প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ অঞ্চলের দিকে এগিয়ে যায়, এবং চাপবৃদ্ধি ঘটায়। অনুরূপভাবে নূতন তৈরী ঘনীস্থানগুলি থেকে পরবর্তী নিম্নচাপ অঞ্চল সমূহে অণুপ্রবাহ ঘটতে থাকে। কম্পনের ফলে বস্তুর শরীর যখন ভিতরের দিকে পিছিয়ে আসে, সংলগ্ন বায়ুস্তর থেকে হঠাৎ চাপ অপসারিত হওয়ার ফলে **তনীভবন** ঘটে। এই **তনীস্থান**-গুলি পূর্বসৃষ্ট **ঘনীস্থান**-গুলিকে ক্রমান্বয়ে এবং পর্য্যায়ক্রমে অনুসরণ করে চলে একই দিকে, সমান গতিতে। ঘনীস্থান এবং তনীস্থানের এই জাতীয় ক্রমাগত প্রবাহের নাম দেওয়া হয়েছে **ধ্বনি তরঙ্গ**। যে মাধ্যম দিয়ে ধ্বনি তরঙ্গ প্রবাহিত হয়, তার ঘনত্ব ও সঙ্কোচনশীলতার উপরে প্রবাহের গতি নির্ভর করে। সাধারণভাবে বলা যায়, ঘনত্ব ও সঙ্কোচনশীলতা যত কম হবে, তরঙ্গ-প্রবাহের গতি হবে তত দ্রুত।

তরঙ্গের মাঝে কোনও দুটি পাশাপাশি ক্ষেত্রে যেখানে বস্তু কণিকাদের অবস্থান সমভাবাপন্ন, সেই দুই বিন্দুর ব্যবধানকে **তরঙ্গ দৈর্ঘ্য** বলে। সাধারণতঃ এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বা 'ওয়েভ লেংথ'-কে প্রকাশ করার জন্য রোম্যান হরফ **লামডা** (λ) চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। জলের বুকে একটি ঢিল ফেললে যে ধরণের ঐককেন্দ্রিক বৃত্তে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়, বাতাসের বুকে সৃষ্ট তরঙ্গের চেহারাও হুবহু সেই রকমের।

ঘনীভবনের ফলে স্থানচ্যুত বস্তুকণা তনীভবনের ফলে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করলে একটি **সাইকল** পূর্ণ হয়। এরজন্য যে সময় লাগে, তাকে বলা হয় **পর্য্যায়কাল**। এক সেকেণ্ডের মধ্যে স্পন্দিত বস্তু যতবার তার এগিয়ে গিয়ে পিছিয়ে আসা পূর্ণ করে, অর্থাৎ যতবার সংলগ্ন ক্ষেত্রের অণুগুলিকে তাড়না করে, তাকে বলা হয় ধ্বনির **কম্পাঙ্ক** বা 'ফ্রিকোয়েন্সি'। কম্পাঙ্ক উল্লেখের সময় আবশ্যকীয় সংখ্যার পরে **সী-পি-এস** (সাইকেল্‌স্ পার সেকেণ্ড) অথবা ~ চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়।

কম্পাঙ্ক 'এন্' দ্বারা এবং পর্য্যায়কাল **টি** দ্বারা সূচিত করলে, কম্পাঙ্ক ও পর্য্যায়কালের সম্পর্ক হবে :

$$\text{এন্} = \frac{১}{\text{টি}} \quad \text{অথবা} \quad \text{এন্ টি} = ১$$

কারণ, এন্ সংখ্যক দোলন হওয়ার জন্য সময় লাগে ১ সেকেণ্ড,

$\therefore$ ১ সংখ্যক দোলন হওয়ার জন্য সময় লাগবে $\frac{১}{\text{এন্}}$ সেকেণ্ড,

কিন্তু, ১টি দোলন হতে য সময় লাগে, তাকেই পর্য্যায়কাল বলে ;

$$\therefore \text{টি} = \frac{১}{\text{এন্}} \quad \text{অথবা} \quad \text{এন্ টি} = ১$$
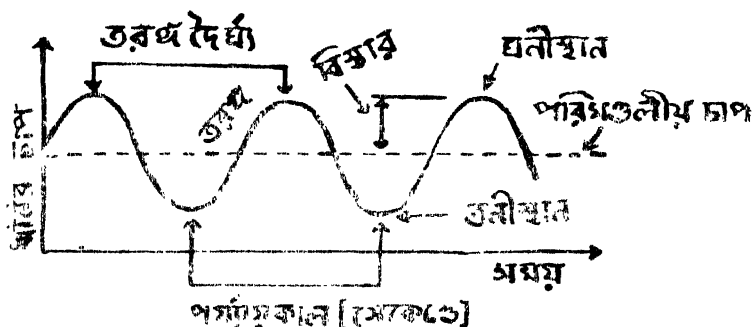
[চিত্র ৪৭.১] সুরশলাকা সৃষ্ট শুদ্ধ ধ্বনির তরঙ্গপ্রবাহ

কম্পমান বস্তুটি তার সাম্য অবস্থান বা মধ্যক থেকে দক্ষিণে বা বামে যে চরম দূরত্বে স্থানান্তরিত হয় তাকে ধ্বনির **বিস্তার** বা 'এ্যাম্পটিচ্যুড' বলা হয়। চিত্র ৪৭.১ ধ্বনিসংক্রান্ত পরিভাষাগুলি বুঝতে সাহায্য করবে।

আধুনিক প্রযুক্তি বিজ্ঞানে কম্পাঙ্ক মাপার আর একটি পরিমাপের নামকরণ করা হয়েছে **হার্জ—সংক্ষেপে এইচ-জেড্**। এখানে উল্লেখ থাক, 'সি-পি-এস' এবং 'এইচ-জেড্' সংখ্যাগত এবং অর্থগত উভয়দিকেই সমান সমান।

একজন সুস্থ যুবক ২৭ থেকে ২0,000 হার্জের মধ্যে ধ্বনি শুনতে সক্ষম। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে উচ্চতর কম্পাঙ্কের ধ্বনি শোনার ক্ষমতা কমে আসে। একজন বৃদ্ধের শ্রবণ-সক্ষমতা সর্বাধিক ৪000 হার্জের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তীক্ষ্ণ ধ্বনি তরঙ্গ ক্রমাগত কানে আঘাত করলেও শ্রবণশক্তি নষ্ট হতে পারে।

আমাদের স্বাভাবিক কথোপকথনের সময় আমরা সাধারণতঃ সর্বাধিক ৯ ফুট থেকে কমের দিকে ১$\frac{৩}{৪}$" দৈর্ঘ্যের ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি করে থাকি। হার্জের মাপে আমাদের কথোপকথনের কম্পাঙ্ক ১২৫ থেকে ৮000 এর মধ্যে থাকে। নীচের তালিকায় ধ্বনি তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সঙ্গে কম্পাঙ্ক পরিমাপের সম্পর্কটি বোঝা যাবে :

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য		কম্পাঙ্ক	তরঙ্গ দৈর্ঘ্য		কম্পাঙ্ক
৭২ ফুট	=	১৬ হার্জ	১' ১$\frac{১}{২}$ ইঞ্চি	=	১,000 হার্জ
৩৬ ফুট	=	৩১.৫ হার্জ	৬$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি	=	২,000 হার্জ
১৮ ফুট	=	৬৩ হার্জ	৩$\frac{৩}{৮}$ ইঞ্চি	=	৪,000 হার্জ
৯ ফুট	=	১২৫ হার্জ	১$\frac{৩}{৪}$ ইঞ্চি	=	৮,000 হার্জ
৪'-৬ ইঞ্চি	=	২৫0 হার্জ	$\frac{৭}{৮}$ ইঞ্চি	=	১৬,000 হার্জ
২'-৩ ইঞ্চি	=	৫00 হার্জ	$\frac{৭}{১৬}$ ইঞ্চি	=	৩২,000 হার্জ

[শ্রুতিসীমার বাইরে অর্থাৎ ২0 হাজারের বেশী কম্পাঙ্ক যুক্ত তরঙ্গকে **শব্দোত্তর তরঙ্গ** বা 'সুপারসনিক ওয়েভ' বলা হয়। জাগতিক বহু প্রাণীর কণ্ঠস্বরই আমরা শুনতে পাই না। সাধারণভাবে জলচর এবং কয়েকটি ভূচর প্রাণীকে আপাতঃ দৃষ্টিতে বোবা বলে মনে হয়। এদের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রাণীই শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে। এবং শারীরিক বিশেষ ক্ষমতায় অন্যের সৃষ্ট ঐ শ্রেণীর তরঙ্গ গ্রহণে সক্ষম হয়। বৈজ্ঞানিক বিবিধ গবেষণার কাজে এই তরঙ্গের মূল্য অপরিসীম। সাধারণ জাহাজ বা ডুবোজাহাজ থেকে এই ধরণের শব্দোত্তর তরঙ্গ সমুদ্র নিম্নে অবস্থিত ভূপৃষ্ঠে প্রতিফলিত করেই, সাগরের গভীরতা নির্দ্ধারণ

করা হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞানেও শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহার আজ সুপরিচিত। বলা বাহুল্য, নাটকে ব্যবহৃত ধ্বনির কম্পাঙ্ক সীমা মানুষের সহনযোগ্য শ্রুতিসীমার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়।]

ডেসিবেল মানুষের শোনার ক্ষমতাকে মাপার জন্য পৃথক একটি একক হিসাবে **বেল** পরিমাপের প্রচলন হয়েছে। ধ্বনি-সংক্রান্ত বিবিধ গবেষণার সঙ্গে যুক্ত প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক **আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল**-এর নাম থেকেই এই 'বেল' পরিমাপের উৎপত্তি। ধ্বনি-মাত্রা নির্ধারক যন্ত্র বা **সাউণ্ড-লেভেল মীটারে** [চিত্র ৪৭.২] এই 'বেল' এর দশাংশ **ডেসিবেল**-এর সাহায্যে যাবতীয় পরিমাপ ধার্য্য করা হয়। একটি ছোট হাতের 'ডি' এবং বড় হাতের 'বি'—অর্থাৎ dB প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত হয় ডেসিবেল বোঝানোর কাজে।
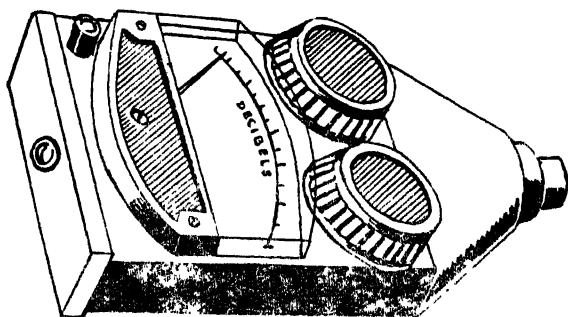
[চিত্র ৪৭.২] সাউণ্ড লেভেল মীটার

পরবর্তী তালিকায় [চিত্র ৪৭.৩] খুব পরিচিত কয়েকটি ধ্বনির ডেসিবেল-মূল্যমান দেওয়া হলো।* এই তালিকাতেই দেখা যাবে যে, আমাদের শ্রবণগ্রাহ্য ধ্বনির সর্বনিম্নতম পরিমাণকেই ধরা হয়েছে 'শূন্য' ডেসিবেল। বেশীর দিকে ৮৫ ডেসিবেল পর্যন্ত ধ্বনি আমরা সুস্থভাবে শুনতে পারি।

* সাউণ্ড লেভেল মীটারে "এ" "বি" এবং "সি" তিনশ্রেণীর স্কেল ব্যবহৃত হয়। প্রদত্ত তালিকা এ-স্কেল মীটারের সাহায্যে নেওয়া হয়েছে।

ডেসিবেল		ধ্বনির নমুনা
১৪০	কর্ণ-বিদারী	জেটপ্লেনের চলন্ত ইঞ্জিন
১৩০		ক্লেশকর অনুভূতির সূত্রপাত
১২০		কর্ণপটাহে প্রচণ্ড আঘাত
১১০		কয়েক ফুট দূরে মোটর সাইকেলের রেশ বাড়ানোর শব্দ
১০০	অত্যন্ত উচ্চ	দশ ফুট দূরে থাকা গাড়ীর তীক্ষ্ণ হর্ণ
৯০		বড় বড় গাড়ী চলার শহুরে রাস্তা
*		প্রচণ্ড শব্দ যুক্ত কারখানা
৮০	উচ্চ	স্কুল কলেজের মুখরিত ক্যাণ্টিন
৭০		টাইপরাইটারের ধ্বনিযুক্ত দপ্তর
৬০	সহন যোগ্য	সাধারণ গাড়ী চলার রাস্তা
৫০		সাধারণ দপ্তর
৪০	ক্ষীণ	মৃদু রেডিও সংগীতযুক্ত কক্ষ
৩০		সাধারণ বাসভবন [যেখানে বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্রাদি নেই]
২০	অত্যন্ত ক্ষীণ	ফিস ফিস করে বলা কথা
১০		মর্মর ধ্বনি
		মানুষের শ্বাস প্রশ্বাস
০		শ্রাব্যতার সূত্রপাত

কণ্ঠস্বরের সীমা (৫০–৭০ ডেসিবেল)

[চিত্র ৪৭.৩] কয়েকটি পরিচিত ধ্বনির ডেসিবেল মূল্যমান

* ৫ ডেসিবেলের উপরে কোনও নি গত নলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রবণেন্দ্রি

Q

প্রদত্ত তালিকায় দেখা যাচ্ছে, আমাদের শ্রবনেন্দ্রিয়ে ক্লেশের সূত্রপাত হচ্ছে ১৩০ ডেসিবেলে। শ্রবণেন্দ্রিয়ের এই যে ০ থেকে **১৩০ ডেসিবেল** পর্যন্ত ধ্বনি সহ্য করার ক্ষমতা কিন্তু নগণ্য নয়। শূন্য ডেসিবেলের ধ্বনির চেয়ে ১৩০ ডেসিবেল ধ্বনি দশলক্ষ কোটি (১০,০০০,০০০,০০০,০০০) অথবা দশ ট্রিলিয়ান গুণ বেশী।

শব্দের গতি শব্দ যদি আলোকের মতো দ্রুত [সেকেণ্ডে ১,৮৬,০০০ মাইল] গতিতে প্রবাহিত হতো, তবে প্রেক্ষাগৃহের ধ্বনি নিয়ন্ত্রণের অনেক সমস্যাই দেখা দিত না। শব্দের গতি তুলনামূলকভাবে অনেক কম—কক্ষের স্বাভাবিক উত্তাপে এই গতি সেকেণ্ডে মাত্র ১১৩০ ফুট। ফলে বহু কক্ষেই **প্রতিধ্বনি** আর **অনুরণনের** নিদারুণ ত্রুটি দেখা দেয়।

পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে, প্রতিফলিত শব্দ যদি মূল শব্দের পরে মাত্র ০.০৫৮ সেকেণ্ডের বেশী সময় নেয় শ্রোতার কানে পৌঁছাতে, তবেই তাকে **প্রতিধ্বনি** আকারে চেনা যায়। উক্ত সময়ের মধ্যে শব্দ ন্যূনাধিক ৬৫ ফুট পথ অতিক্রম করে। সুতরাং প্রতিফলনের স্থান ৩৩ ফুটের বেশী হলেই প্রতিধ্বনি শোনা যাবে। শব্দের এই স্বল্প গতিশীলতাই ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণ-সমস্যার প্রধানতম কারণ।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, বায়ু স্তরের তুলনায় তরল বা কঠিন পদার্থের ভিতর দিয়ে শব্দ অনেক দ্রুত প্রবাহিত হয়। জলের মাধ্যমে শব্দের গতি সেকেণ্ডে প্রায় ৫০০০ ফুট। শক্ত কাঠের আঁসের মাধ্যমে সেকেণ্ডে এই গতি প্রায় ১৩,০০০ ফুট—অবশ্য আঁসের আড়াআড়ি দিকে এই গতি কমে গিয়ে দাঁড়ায় সেকেণ্ডে প্রায় ৪০০০ ফুটে। পাথরের মাধ্যমে শব্দের গতি প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে ১২,০০০ ফুট পর্যন্ত। ধ্বনির এই বিশেষ ধর্মটি কক্ষের মধ্যে নিস্তব্ধতা সৃষ্টির ব্যবস্থা করার সময় বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

আলোর চেয়ে শব্দের এই পিছিয়ে পড়ার ঘটনাটি আকাশে বিদ্যুতের চমক ও মেঘ গর্জনের সময়ের মধ্যে ব্যবধান লক্ষ্য করলেই ধরা পড়ে। বলা বাহুল্য আকাশের বুকে মেঘের গর্জন এবং বিদ্যুৎ স্ফুরণ একই সঙ্গে ঘটে। দূরে দাঁড়িয়ে ফুটবল খেলা দেখার সময়, বলে কিক্ মারার দৃশ্য ও শব্দের মাঝে বেশ কিছুটা সময়ান্তর ঘটছে লক্ষ্য করা যাবে। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সময় স্টার্টারের বন্দুক ফোটানোর বিষয়টি যদি মাঠের বিপরীত দিক থেকে

লক্ষ্য করা হয়, তবে দেখা যাবে ধোঁয়া বেরোনোর কিছু পরে শব্দ কানে আসছে। দৃশ্য ও তার সংশ্লিষ্ট শব্দের মধ্যেকার সময় ব্যবটানকে **টি,** শব্দের বেগকে **ভি** এবং ঘটনার স্থান ও প্রত্যক্ষের স্থান এই দুয়ের ব্যবধানকে যদি **এস** ধরা হয়, তবে এদের সম্পর্ক নীচের সূত্রগুলিতে ব্যক্ত হবে :—

$$\text{ভি} = \frac{\text{এস}}{\text{টি}}, \text{ অথবা } \text{টি} = \frac{\text{এস}}{\text{ভি}}, \text{ কিম্বা } \text{এস} = \text{ভি} \times \text{টি}$$

ধ্বনি-ক্ষেপণ ক্ষমতা

বেশীর ভাগ ধ্বনিসূত্র থেকেই শব্দ নির্গমনের বেগ খুবই কম থাকে, ফলে ধ্বনির বিস্তরণ ক্ষেত্রে চাপও খুব নিম্ন শ্রেণীর হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, প্রেক্ষাগৃহে বক্তৃতারত সাধারণ মানুষের ধ্বনি-প্রক্ষেপণ ক্ষমতা ২৫ থেকে ৫০ **মাইক্রোওয়াটের*** মধ্যে। এই হিসাবে এক অশ্বশক্তি পরিমাণ ধ্বনি-শক্তি সৃষ্টি করতে হলে, অনুরূপ ১৫,০০০,০০০ টি ধ্বনিসূত্রের প্রয়োজন। বিশেষ প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার সাহায্য ছাড়া, একটি প্রেক্ষাগৃহে ঐ বক্তৃতা, ধ্বনির যথাযথ প্রবাহ সৃষ্টির উপযুক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারবে না। একটি ৮০ ফুট দীর্ঘ, ৫০ ফুট বিস্তৃত ও ২৫ ফুট উচ্চ প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে সর্বত্র ভালোভাবে শ্রুতিগোচর করানোর জন্য কমপক্ষে ১০,০০০ মাইক্রোওয়াট ধ্বনি-শক্তি দরকার। এর তুলনায় সাধারণ কণ্ঠস্বরের ২০—৫০ মাঃ ওঃ ধ্বনিশক্তি যে কত দুর্বল, তা সহজেই অনুমেয়।

তুলনামূলকভাগে বেশীর ভাগ বাদ্যযন্ত্রই মানুষের কণ্ঠস্বরের চেয়ে শক্তিশালী ধ্বনি উৎপাদন করে। নীচের তালিকায় বিভিন্ন ধ্বনিসূত্রের শব্দ-ক্ষেপণ ক্ষমতার একটি তুলনামূলক চিত্র পাওয়া যাবে।

ধ্বনিসূত্র	সর্বোচ্চ ক্ষেপণ ক্ষমতা
কথোপকথনের স্বর	
মহিলাদের ক্ষেত্রে	০·০০২ ওয়াট
পুরুষদের ক্ষেত্রে	০.০০৪ ,,
বাদ্যযন্ত্রাদির ধ্বনি :—	
ক্ল্যারিওনেট	০.০৫ ,,

* ১ মাইক্রোওয়াট ১ ওয়াটের ১০ লক্ষভাগের একভাগ।

ধ্বনিসূত্র	সর্বোচ্চ ক্ষেপণ ক্ষমতা
বেহালা (বাস)	0.১৬ ওয়াট
পিয়ানো	0.২৭ ,,
ট্রাম্পেট	0.৩১ ,,
ট্রম্বোন	৬.00 ,,
ড্রাম (৩৬"×১৫")	২৫.00 ,,
অর্কেষ্ট্রা (৭৫টি যন্ত্রসহ)	১0 থেকে ৭0 ওয়াট

ধ্বনির তীক্ষ্ণতা শব্দের বিস্তরণ পথে বিশেষ কোনও দিকের প্রতি লম্বভাবে অবস্থিত একটি একক ক্ষেত্রের উপর দিয়ে কোনও একবিন্দু পর্য্যন্ত ধ্বনিপ্রবাহের গতিকে, সেই দিকে সেই বিন্দুতে **ধ্বনির তীক্ষ্ণতা** বা 'ইণ্টেনসিটি' নামে অভিহিত করা হয়। এই তীক্ষ্ণতার পরিমাপ করা হয় **বর্গ-সেণ্টিমিটার প্রতি '—' ওয়াট** হিসাবে।

যদি সমজাতীয় এবং শান্ত মাধ্যমের মাঝে কোনও একবিন্দুতে কোনও শব্দের উৎপত্তি ঘটে, এবং বিস্তরণ ক্ষেত্রের পথে কোনও প্রতিফলন বা প্রতিসরণকারী বাধা না থাকে, তবে কিরণের মতো সেই শব্দ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে এবং তরঙ্গের সম্মুখভাগ হয় বৃত্তাকার। পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, অতিক্রান্ত পথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, ধ্বনির চাপ ও তীক্ষ্ণতা বিশেষ এক নিয়ম অনুসরণ করে কমে চলে। অবশ্য বিস্তরণ পথে কোনও শব্দশোষক তলের অস্তিত্ব থাকলে, এই হ্রাসপ্রাপ্তির বেগ বেড়ে যায়।

কোনও প্রতিফলন বা প্রতিসরণ-যুক্ত ক্ষেত্রে, ধ্বনি তরঙ্গের বিস্তার-লাভের কায়দাটি সেই শব্দ উৎপাদন সূত্রের বৈশিষ্ট বলে ধরা হয়। প্রেক্ষাগৃহে শ্রুতির কাজটিকে সুষ্ঠু করে তোলার জন্য, ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থায়, লাউড স্পীকার স্থাপনার সময় এই বৈশিষ্টের কথা স্মরণে রাখতে হয়। বিভিন্ন শব্দ উৎপাদক সূত্রের গঠন বৈচিত্রের উপরে যদিও এই বৈশিষ্ট অনেকখানি নির্ভর করে, তবু দুটি বিষয়ে এদের ধর্ম অনেকটা ধরাবাঁধা। প্রথমতঃ, শব্দ সূত্রের ব্যাসের চেয়ে যদি নির্গত তরঙ্গের দৈর্ঘ্য অনেক বেশী হয়, তবে বৃত্তাকার পথে চতুর্দ্দিকেই সমানভাবে ধ্বনি-বিস্তরণ ঘটে। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে, নির্গত তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যদি সূত্রের তুলনায় কম হয়, তবে বেশীর ভাগ শব্দই অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ রশ্মির আকারে নির্গত হয়। ধ্বনির কম্পাঙ্ক যত বেশী হবে, রশ্মি-কোণ হবে তত সংকীর্ণ। একটি

লাউড স্পীকারের উদাহরণ [চিত্র ৪৮.১] দেখা যাক। চিত্রে ধ্বনি বিস্তরণ ক্ষেত্রে সূত্র থেকে কোনো স্থানের দূরত্ব, আপেক্ষিক চাপের পরিমাণ
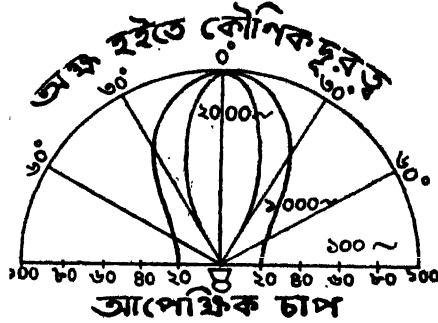
[চিত্র ৪৮.১] লাউড স্পীকার নির্গত ধ্বনি বিস্তরণে চাপের তারতম্য

থেকে বোঝা যাবে। স্পীকারকে কেন্দ্র হিসাবে ধরে নিয়ে বৃত্ত আঁকলেই সমচাপ রেখাগুলির সৃষ্টি হবে। দেখা যাচ্ছে, কম্পাঙ্ক যখন ১00 ~, তখন ধ্বনির বিস্তরণ ক্ষেত্র প্রায় সর্বত্র সমানভাবে ছড়িয়ে আছে। ১000 ~
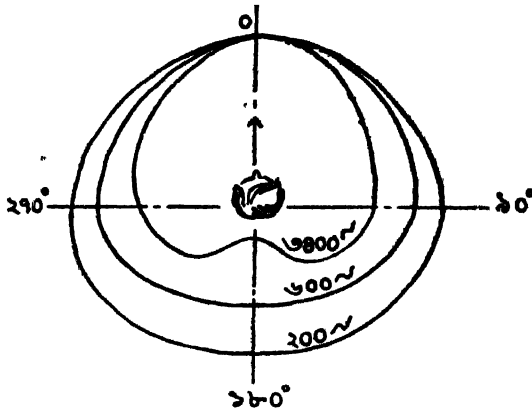
[চিত্র ৪৮.২] কণ্ঠনিসৃত স্বরের ধ্বনি বিস্তরণে চাপের তারতম্য

কম্পাঙ্কে ধ্বনি বিস্তরণের ক্ষেত্র অনেকটা একমুখী হয়ে পড়েছে। কম্পাঙ্ক যখন ২000 ~, ধ্বনি বিস্তরণের ক্ষেত্র তখন সংকীর্ণ হয়ে অক্ষ রেখার কাছাকাছি এসে গেছে।

মানুষের মাথার চারপাশের ধ্বনি বিস্তরণের ক্ষেত্রেও [চিত্র ৪৮.২] একই নমুনা পাওয়া যাবে। আলোচ্য চিত্রে তিন রকমের কম্পাঙ্কে ধ্বনি বিস্তরণের ফল দেখানো হয়েছে। নিম্নগ্রামের শব্দ তরঙ্গ প্রায় চারিদিকেই সমানভাবে বিস্তরণ লাভ করে। কিন্তু উচ্চগ্রামের ক্ষেত্রে মানুষের মুখের সম্মুখভাগে সংকীর্ণতর রূপ নেয়। শিস্ দেওয়ার শব্দ এই কারণেই একদিকমুখী হয়ে ওঠে।

ধ্বনির উপরে আবেষ্টনীর প্রতিক্রিয়া

রঙ্গমঞ্চের ধ্বনি প্রেক্ষাগৃহের দেয়াল, ছাদ, দোতলার সম্মুখভাগ প্রভৃতিতে আবদ্ধ একটি ক্ষেত্রের প্রতি সীমান্তে আঘাত খাওয়ার ফলে প্রতিফলিত হয়; যতক্ষণ না দূরত্ব ক্রমাগত বেড়ে যাওয়ার পরিণতিতে, ধ্বনির তীক্ষ্ণতা বা চাপ ক্ষয় পেতে পেতে শোনার অযোগ্য হয়ে যায়, ততক্ষণ এই প্রতিফলনের পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে। আবদ্ধ স্থানে প্রতিধ্বনির পুনরাবৃত্তির ফলে শব্দের এই জাতীয় স্থিতিকে **অনুরণন** বলে। নাটকের কথোপকথন ও সংগীতের উপরে এই অনুরণনের প্রতিক্রিয়া অনেকখানি। সাধারণতঃ মুক্তঅঙ্গনে একটি ধ্বনিসূত্র থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে শব্দের চাপ যতখানি থাকে, প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে একই দূরত্বায় ঐ ধ্বনিসূত্র-নির্গত শব্দের চাপ অনেক বেশী হয়। এই চাপের আধিক্য কণ্ঠস্বর-জাতীয় দুর্বল ধ্বনি-সূত্রের পক্ষে অনেকখানি সাহায্যকারী। এছাড়া, সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে কিছুটা অনুবণন শ্রুতিসুখকর হয়ে ওঠে। অনুরণন-ক্রিয়াটি সুনিয়ন্ত্রিত হলে প্রেক্ষাগৃহের একটি বিশেষ গুণ হয়ে দাঁড়ায়।

কথা বলার সময় প্রতি সেকেণ্ডে গড়ে দশটি পৃথক শব্দ সৃষ্টি করা যায়। ফলে, প্রতিটি শব্দের জন্য সেকেণ্ডের এক-দশমাংশ সময় পাওয়া যায়, যে সময়টুকুর মধ্যে ঐ শব্দটি শ্রোতার শ্রবণেন্দ্রিয়ে আত্ম-পরিচয় প্রকাশ করতে পারবে। সাধারণক্ষেত্রে একটি কক্ষের মধ্যে অনুরণন লেগে থাকার সময় এক সেকেণ্ডের কিছু বেশী। সুতরাং কোনও একটি নির্দিষ্ট শব্দের উপরে কর্ণপাত করার মুহূর্তে, পূর্ববর্তী একাধিক শব্দের অনুরণন একটি পর্দার আস্তরণের মতো আড়াল সৃষ্টি করে দাঁড়াবেই। অবশ্য এই আড়ালের ঢেকে দেওয়ার ক্ষমতা নির্ভর করবে, পূর্ববর্তী শব্দগুলির তীক্ষ্ণতা ও কম্পাঙ্কের উপরে। দেখা গেছে, ১ থেকে ১$\frac{১}{২}$ সেকেণ্ড পর্যন্ত অনুরণন-যুক্ত কক্ষে আমাদের কান প্রয়োজনীয় শব্দটিকে চিনে নিতে পারে। এই চিনে নেওয়ার

ব্যাপারে শ্রবণেন্দ্রিয়ের একাগ্র হওয়ার ক্ষমতাটি প্রশংসনীয়।* এই প্রশংসনীয় ক্ষমতাসত্ত্বেও, ৩ সেকেণ্ডের কাছাকাছি বা ততোধিক দীর্ঘ অনুরণন যুক্ত কক্ষে, আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় অভ্রান্তভাবে প্রয়োজনীয় শব্দ চিনে নিতে পারে না।

সংগীতের ক্ষেত্রে কিন্তু বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক। ধ্বনির উৎস থেকে শ্রোতার কর্ণে প্রবেশের পথে, সুরের উপাদানগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব যদি অপরিবর্তিত না থাকে, তবে সঙ্গীতের মূল মাধুর্য্য নষ্ট হয়ে যাবে। সাধারণ প্রেক্ষাগৃহে বা কোনও আবদ্ধ স্থানে সেই কারণেই সঙ্গীতের মূল মাধুর্য্য বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে ওঠে। আবদ্ধস্থানের বাতাস বিশেষ বিশেষ কম্পাঙ্ককে শোষণ করে নেয়। তাছাড়া আবদ্ধ কক্ষের বিভিন্ন সীমায় ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ধ্বনি-শোষণ ক্ষমতা কম্পাঙ্ক-বিশেষে কমবেশী হয়। ফলে, সুরের বিশেষ বিশেষ অংশ তীক্ষ্ণভাবে শোনা যায়, আবার অংশবিশেষ একেবারেই শোনা যায় না।

সৌভাগ্যের বিষয়, আবদ্ধকক্ষে কথোপকথনের স্বর বা সঙ্গীত উভয়বিধ ধ্বনি বিকৃতিলাভের পরেও, তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্টগুলি হারায় না বলে, অনুধাবনের পুরোপুরি অযোগ্য হয় না। মুক্ত অঙ্গনের ক্ষেত্রে বায়ুস্তরে পরিশোষণ-জনিত ক্ষয় ছাড়া অন্য কোনওরূপ বিকৃতি ঘটে না। সঙ্গীত পরিবেশনের বেলায় কিন্তু অনুরণনের অভাবে অনেকটা ফাঁকা লাগে।

উপসংহারে বলা চলে, চতর্দিকের কোলাহল, কক্ষের অনুরণন, উৎপাদিত ধ্বনির তীক্ষ্ণতা এবং কক্ষগাত্রের প্রতিধ্বনি-সৃষ্টি করার ক্ষমতার উপরে প্রেক্ষাগৃহের শ্রুতির গুণাগুণ সর্ব অংশে নির্ভরশীল।

---

* টেপরেকর্ডার প্রভৃতি বাণীবদ্ধকরণের যাবতীয় যন্ত্রপাতির এই ধরণের একাগ্র হওয়ার ক্ষমতা বা 'ফোকাশিং পাওয়ার' নেই বলেই, বাণীবদ্ধকরণের স্থানটিকে বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে গড়ে তুলতে হয়।

দুই

ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণ ও সুপ্রক্ষেপণ

ধ্বনির প্রতিফলন

কোনও ধ্বনি তরঙ্গ যখন কোনও পরিশোষণ-ক্ষমতাহীন মজবুত দেয়াল, মেঝে, দরজা, জানালা বা ছাদের নীচে ধাক্কা খায়, তখন আপতিত ধ্বনির অনেকখানি অংশ প্রতিফলিত হয়ে দিক পরিবর্তন করে। অবশিষ্টাংশ আঘাত দেওয়ার বস্তুটির মধ্যে প্রবেশ করে—যার কিছুটা অংশ উত্তাপে রূপান্তরিত হয়; বাকীটুকু সেই বস্তুর ভিতর দিয়ে অন্য দিকে বেরিয়ে যায়। বাড়ী ঘর-দুয়ারের বেশীর ভাগ বাধাই কিন্তু ন্যূনাধিক স্পন্দন-ক্ষমতাবিশিষ্ট। এগুলি সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে ধ্বনি তরঙ্গের ধাক্কায় স্পন্দিত হয় এবং ধ্বনি বিকিরণে সাহায্য করে। সেইজন্যেই এক কক্ষের শব্দ যাতে অন্য কক্ষে বাধার সৃষ্টি না করে, সেজন্য মজবুত ও মোটা দেয়ালের ব্যবধান রাখা দরকার। এর চেয়েও ভালো ফল পাওয়া যাবে, যদি মজবুত ব্যবধানের সঙ্গে সঙ্গে পরিশোষণ-ক্ষমতাবিশিষ্ট বস্তুর আস্তরণ ব্যবহৃত হয়।
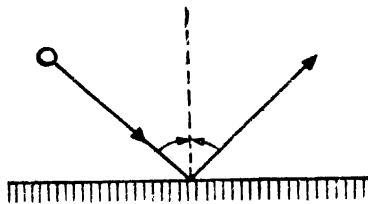
[চিত্র ৪৯.১] সমতল পৃষ্ঠে ধ্বনির প্রতিফলন

যখন প্রতিফলনের প্রতিক্রিয়া-মুক্ত কোনও মুক্ত ধ্বনি-তরঙ্গ, তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের তুলনায় বৃহত্তর কোনও সমতল বাধার গায় আঘাত পায়, তখন আলোক-প্রতিফলনের সুপরিচিত নিয়মানুসরণে ধ্বনি-তরঙ্গেরও প্রতিফলন ঘটে [চিত্র ৪৯.১], অর্থাৎ আঘাত পাওয়ার বিন্দুতে আপতিত ধ্বনি

রেখার দ্বারা বর্ণিত কোণ ও প্রতিফলিত ধ্বনিরেখার কোণ দুইটি সমান হবে। অনুরূপভাবেই অবতলপৃষ্ঠে আঘাত পেলে [চিত্র ৪৯.২] ধ্বনি তরঙ্গগুলি প্রতিফলনের ফলে সংহত হতে থাকে, এবং উত্তলপৃষ্ঠে প্রতিফলিত ধ্বনি তরঙ্গগুলি ছড়িয়ে পড়ে। প্রেক্ষাগৃহে শেষোক্ত উভয়শ্রেণীর
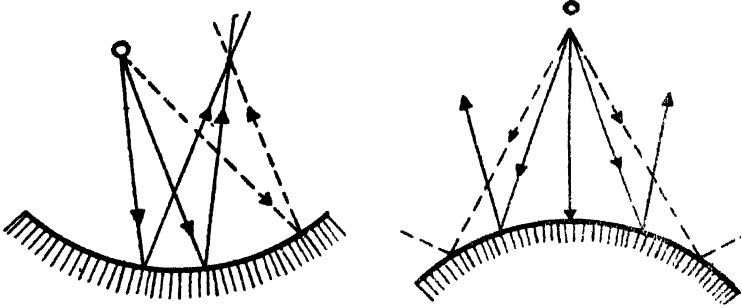
[চিত্র ৪৯.২] অবতল ও উত্তল পৃষ্ঠে ধ্বনির প্রতিফলন

প্রতিফলনকেই কাজে লাগানো যায় ; আবার লক্ষ্য না দিলে এই জাতীয় প্রতিফলন প্রেক্ষাগৃহের প্রভুত ক্ষতিসাধন করে। অবতলক্ষেত্রের এই জাতীয় সংহত প্রতিফলনকে নিয়ন্ত্রিত করে, স্থপতিরা প্রেক্ষাগৃহের প্রত্যেকটি প্রয়োজনীয় স্থানে সমান চাপের ধ্বনি পৌঁছিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। তেমনি আবার স্থপতিদের সুনিয়ন্ত্রণের ফলে, প্রেক্ষাগৃহের সীমান্ত বিন্দুগুলিতে, উত্তলক্ষেত্রের বিচ্ছুরিত প্রতিফলনের সাহায্য নিয়ে, ধ্বনির তীক্ষ্ণতা কমিয়ে দেওয়াও সম্ভব।

ধ্বনির প্রতিসরণ

বাস্তবে আলোকের প্রতিসরণ আর ধ্বনির প্রতিসরণ একই নিয়ম অনুসরণ করে সংঘটিত হলেও, আপাতঃদৃষ্টিতে এদের যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যাবে। আলোকের ন্যায় ধ্বনি তরঙ্গও সরলরেখায় গমন করে ; কিন্তু তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যদি কক্ষ, বহির্গমণের পথ বা প্রতিফলন ক্ষেত্রের আয়তনের তুলনায় যথেষ্ট ছোট না হয়, তবে এই নিয়ম প্রমাণ্য করা যায় না। স্মরণে রাখতে হবে, বেশীর ভাগ কক্ষ, রন্ধ্র বা প্রতিফলনের ক্ষেত্র আয়তনে সাধারণ নিম্নগ্রামে শব্দ তরঙ্গের চেয়ে অনেক ছোট। ফলে, জানালা, দরজা, থাম, কড়ি-বরগা, এমনকি দেয়ালের সাধারণ উঁচু নক্সাও শব্দ তরঙ্গের প্রতিফলন ও

প্রতিসরণ ঘটায়—যার পরিণতিতে প্রতিফলিত বা প্রতিসরিত শব্দের দিক এবং স্বরগ্রাম যায় বদলে।
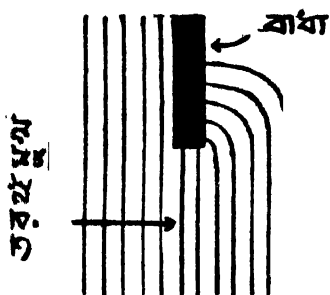
[চিত্র ৫০.১] সমতল বাধার প্রান্তদেশে ধ্বনিতরঙ্গের প্রতিসরণ
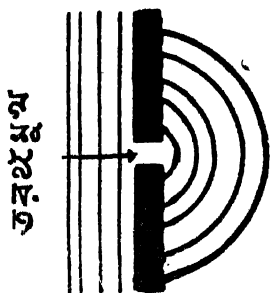
[চিত্র ৫০.২] রন্ধ্রপথে ধ্বনিতরঙ্গের প্রতিসরণ

কোনও বাধা অতিক্রমণের পরে ধ্বনিতরঙ্গের পূর্ব গতিপথের বক্রতাকে **ধ্বনির প্রতিসরণ** বলে। বাধার আকৃতি ও ধ্বনিতরঙ্গের দৈর্ঘ্যের অনুপাতের উপরে এই প্রতিসরণের ফলাফল নির্ভর করে। চিত্র ৫০.১-এ দেখানো হয়েছে, বাম দিক থেকে ডান দিকে বহমান শব্দতরঙ্গ একটি দেয়ালের প্রান্তদেশ অতিক্রমণের পর কিভাবে বেঁকে যায়। অথবা চিত্র ৫০.২-এ দেখা যাবে, সমান্তরাল তরঙ্গগুলি রন্ধ্রপথ পেরিয়ে যাওয়ার পর কিভাবে বৃত্তাকার রূপ নিয়েছে। আপাতঃদৃষ্টিতে পৃথক হলেও, তত্ত্বগত দিক থেকে আলোক ও শব্দের ধর্মে প্রভেদ নেই। উভয়ক্ষেত্রেই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য ও প্রতিসরণ মাধ্যমের আয়তনের অনুপাতের উপরে প্রতিসরণ-ক্রিয়া নির্ভরশীল। [পরিদৃশ্যমান কোনও আলোক-রশ্মির দৈর্ঘ্য 0.0000১৫ থেকে 0.0000৩0 ইঞ্চি মাত্র। অপরপক্ষে শ্রুতিগোচর হতে পারে এমন ধ্বনি তরঙ্গের দৈর্ঘ্য 0'0৬ থেকে ৬0 ফুট পর্যন্ত] আলোক-তরঙ্গ ও শব্দ তরঙ্গের আয়তনে যে বিরাট প্রভেদ রয়েছে, তারই ফলস্বরূপ প্রতিসরণের পরেও আলোক তরঙ্গ সরলরেখায় যাচ্ছে বলে মনে হয়, অথচ ধ্বনি তরঙ্গ মনে হয় ছড়িয়ে যাচ্ছে।

ধ্বনির সুসম-প্রসারণ

কোনও কক্ষের প্রতিটি অংশে যদি ধ্বনি তরঙ্গের চাপ সমান থাকে, তবে সেই কক্ষে ধ্বনির **সুসম-প্রসারণ** ঘটে বলা যেতে পারে। বাস্তবে পরিপূর্ণ সুসম-প্রসারণ

ঘটে না এবং এটি কাম্যও নয়। পরিপূর্ণ সুসম-প্রসারণে প্রতিটি দিকে তরঙ্গের ব্যাপ্তি এমনভাবে ঘটতে থাকে যে, শ্রোতার পক্ষে ধ্বনির উৎসের দিক নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু পরিমিত সুসম-প্রসারণ ধ্বনি কারক এবং শ্রোতা উভয়েই পছন্দ করেন। বিশেষ করে যে কক্ষে ধ্বনিবর্দ্ধক ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়, সে কক্ষের পরিমিত সুসম-প্রসারণের দিকে নজর দেওয়া বিশেষ দরকার।

ধ্বনির সুসম-প্রসারণ বর্দ্ধিত করা নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপরে। (ক) কক্ষের অন্তর্বর্তী বস্তুগুলি যদি ছড়িয়ে এলোমেলোভাবে সাজানো হয়, ধ্বনি তরঙ্গের প্রবাহ তাহলে একমুখী হওয়ার সুযোগ না পেয়ে সুসম-প্রসারণ ঘটায়। (খ) প্রাচীর গাত্র যদি প্রণালীবদ্ধ না হয়, ধ্বনি তরঙ্গ প্রতিফলন ও পরিশোষণের মাধ্যমে সুসম-প্রসারিত হতে পারে। বলা বাহুল্য, শূন্য কক্ষের তুলনায় সুসজ্জিত কক্ষে এই কারণেই ধ্বনির অধিক সুসম-প্রসারণ ঘটে। চেয়ার, টেবিল, পর্দা প্রভৃতি ধ্বনি তরঙ্গ ছড়ানোর ভালো উপকরণ। প্রাচীর গাত্রের অসমতা, থাম, খিলান বা পল তোলা কোনো নক্সা ধ্বনির ক্ষেত্রে এই সুসম প্রসারণ বাড়ানোর কাজে অনেকখানি সহায়তা করে। মনে রাখা উচিত, এই জাতীয় আসবাব বা অলঙ্করণ সুসম-প্রসারণের কাজে তখনই লাগতে পারে, যদি এদের আকার কমপক্ষে ধ্বনি তরঙ্গের সমান হয়। [দ্রষ্টব্য : ৫১২ ~ কম্পাঙ্কের একটি তরঙ্গ দৈর্ঘ্য প্রায় দুই ফুটের সমান] ধ্বনি তরঙ্গের তুলনায় আকৃতিতে ছোট হলে, ঐসব অলঙ্করণের পক্ষে ধ্বনিক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের কোনও ক্ষমতা থাকবে না। অবশ্য কম্পাঙ্ক বৃদ্ধির ফলে তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হ্রাস পেলে, আপনা হতেই কিছুটা সুসম-প্রসারণ ঘটতে পারে।

প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনির সুসম-প্রসারণ বাড়ানোর আর একটি উপায়, কক্ষের মধ্যে **ধ্বনিশোষক** বস্তুর বেশী ব্যবহার—বিশেষ করে যদি ঐ জাতীয় বস্তু এলোমেলোভাবে সাজানো যায়। পরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

মুক্ত বাতাসে ধ্বনির বিস্তরণ

কোনও প্রতিফলক বা প্রতিসরণ-ক্ষেত্রে বাধা না-পাওয়া মুক্ত ধ্বনি-তরঙ্গ যদি একই জাতীয় মাধ্যমের [এক্ষেত্রে বাতাসের] ভিতর দিয়ে অগ্রসর হতে থাকে, তবে ধ্বনির উৎসমুখে উৎপাদিত চাপ ভ্রমণ পথের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির সঙ্গে অনুপাত বজায় রেখে হ্রাস পাবে। কিন্তু বায়ুর গতি এবং উত্তাপ, ধ্বনির

স্বাভাবিক পথকে বক্র করে, ধ্বনিশক্তির উপরে অনেকখানি প্রভাব বিস্তার করে।
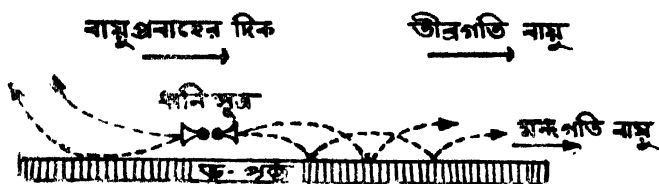
[চিত্র ৫১.১] ধ্বনিতরঙ্গ বিস্তরণের উপর বায়ুপ্রবাহের প্রভাব

বায়ুস্তরের স্বাভাবিক উত্তাপে শব্দের গতি সেকেণ্ডে প্রায় ১১৩০ ফুট। বায়ুপ্রবাহে গতির পরিবর্তন বা বায়ুস্তরে উত্তাপের তারতম্য ঘটলে, শব্দের গতির হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। বায়ুপ্রবাহের অনুকূলে শব্দের গতি, শব্দের নিজস্ব গতি ও বায়ুর গতির যোগফলের সমান। ধরা যাক, ধ্বনি সূত্রের উপর দিয়ে চিত্র ৫১.১ অনুযায়ী বায়ুর প্রবাহ চলেছে। বায়ুর ধর্ম অনুসারে ভূপৃষ্ঠের নিকটে বায়ুর গতি থাকে কম, উপরের দিকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে। ফলে ধ্বনির তরঙ্গ ভূপৃষ্ঠের দিকে ক্রমাগত নুয়ে যাবে।
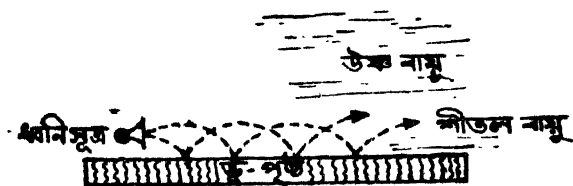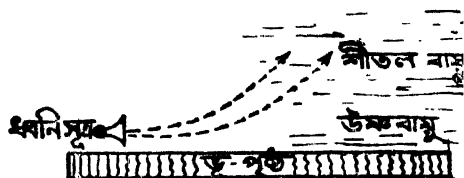
[চিত্র ৫১.২] বায়ুস্তরে উত্তাপের তারতম্যে ধ্বনিতরঙ্গ বিস্তরণের প্রতিক্রিয়া

অপরপক্ষে যে ধ্বনি তরঙ্গ বায়ুপ্রবাহের প্রতিকূলে অগ্রসর হতে চাইছে, তা উঠে যাবে উপরের দিকে। বায়ু প্রবাহের অনুকূলে, ধ্বনি তরঙ্গের উপরের

অংশও ভূপৃষ্ঠের দিকে অবনত হয়ে পূর্বোক্ত তরঙ্গের সঙ্গে মিশে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রবাহিত হবে। অপরপক্ষে, প্রতিকূল বায়ুপ্রবাহে উপরের ধ্বনি তরঙ্গগুলি অগ্রসর হওয়ার সুযোগই পায় না। ফলে ধ্বনির অগ্রগতি অল্প দূরেই থেমে যায়।

বায়ুস্তরের উত্তাপের পার্থক্যেও, ধ্বনিতরঙ্গের নিম্নস্রোত ও উচ্চস্রোতের গতিতে তারতম্য ঘটে। বহুস্থানেই উচ্চতার সঙ্গে সঙ্গে বায়ুস্তরে শীতলতা বৃদ্ধি পায়। সে সব স্থানে ধ্বনিতরঙ্গের উপরিভাগ নিম্নভাগের তুলনায় অনেক বেশী উর্দ্ধমুখী হবে। তরঙ্গের সম্মুখভাগই ক্রমাগত উপরের দিকে বেঁকে যাবে। আবার বহুস্থানে, বিশেষ করে সূর্য্যাস্তের পরে পরেই উপরিভাগের বায়ুস্তরের তুলনায় ভূপৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুস্তর ঠাণ্ডা হয়ে যায়। সে ক্ষেত্রে ধ্বনি তরঙ্গের উপরি অংশের গতি নিম্নাংশের তুলনায় দ্রুততর হওয়ার ফলে তরঙ্গের সম্মুখভাগ নিম্নমুখী হয়ে অগ্রসর হবে [চিত্র ৫১.২]।

নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন

ধ্বনির প্রতিফলন, প্রতিসরণ, সুসম-প্রসারণের অবশ্যকতা ও বিস্তরণের প্রাকৃতিক নিয়মগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আধুনিক রঙ্গমঞ্চ নির্মাণের সময় যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে। প্রেক্ষাস্থল মুক্ত অঙ্গনেই হোক, বা বৃহৎ কক্ষের মধ্যেই হোক, ধ্বনি প্রসারণের সুব্যবস্থা এবং প্রয়োজন বিশেষে, উৎপাদিত মূল ধ্বনির শক্তি বর্দ্ধনের বন্দোবস্ত না করলে, সমগ্র দর্শককে সমানভাবে নাটক উপভোগ করানো সম্ভব নয়।

প্রথম গ্রীসীয় নাট্যমঞ্চ বিশেষভাবে বাছাই করা পাহাড়ের ধারে তৈরী করা হয়েছিল। দর্শকেরা পাহাড়ের ঢালু জায়গায় দাঁড়িয়ে সামনের নৃত্য-গীত-মূলক অভিনয় দেখতেন। পরে এই অভিনয়ের জায়গাটিকে বৃত্তাকার করে, নামকরণ করা হয় অর্কেষ্ট্রা [চিত্র ৫২.১]—এবং এর
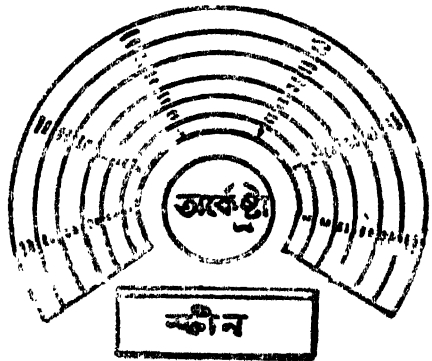
[চিত্র ৫২.১] প্রাচীন গ্রীসীয় মুক্তাঙ্গন মঞ্চের পরিকল্পনা

প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ পরিধি ঘিরে বৃত্তাকার ভাবেই স্তরে স্তরে বসার আসন সাজানো হলো। পরবর্ত্তী যুগে এই অর্কেষ্ট্রার পিছন দিকে **স্কীন** নামের একটি উঁচু বেদী যুক্ত হয়। গোড়ার দিকে এই বেদী অভিনেতাদের বিশ্রাম-স্থল হিসাবে এবং নানা প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতো। এই স্কীনই রোমের নাট্যোন্নতির যুগে **প্রোস্কিনিয়াম**-এ পরিণত হয়—যার সঙ্গে পরবর্ত্তী যুগের মঞ্চ নির্মাণ কৌশলের খানিকটা মিল দেখতে পাওয়া যাবে।

[চিত্র ৫২.২] প্রাচীন রোমক মুক্তাঙ্গন মঞ্চের পরিকল্পনা

রোম্যান নাটমঞ্চ শহরের বাইরে সমতল ক্ষেত্রে তৈরী হতো। অর্কেষ্ট্রাটিকে অর্দ্ধবৃত্তে পরিণত করে, সমগ্র মঞ্চ ও প্রেক্ষা-স্থলকে একটিমাত্র বিষয়ে সংক্ষিপ্ত করে আনা হলো। স্কীন পরিণত হলো বেশ উঁচু মঞ্চ বা বেদীতে, যার পিছনের তিনদিকে প্রতিফলক প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেওয়া হলো। এই প্রাচীর গাত্রে স্থায়ী অলঙ্করণের ব্যবস্থা ছিল, আর ছিল পাঁচটি প্রবেশ পথ [চিত্র ৫২.২]—দুটি দুইপাশে, তিনটি পিছন দিকে। মঞ্চে অভিনেতার কণ্ঠস্বর প্রক্ষেপণের জন্য প্রতি-ফলকের প্রয়োজন এখানেই অনুভূত হয়েছে। গ্রীস ও রোমের প্রযোজকেরা ভালোভাবেই বুঝেছিলেন যে, সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর, বৃহৎ প্রেক্ষাস্থলের সমস্ত দর্শকের কানে পৌঁছানোর পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়। বহুক্ষেত্রে অভি-নেতারা যেসব মুখোস ব্যবহার করতেন, তা যে শুধু মুখভঙ্গী বাড়িয়ে তোলার জন্য, তা নয়; সেইসঙ্গে মুখোসকে চোঙার মতো ব্যবহার করে ধ্বনি-বর্দ্ধনেরও ব্যবস্থা করা হতো।

আজকের ধ্বনি বিজ্ঞানের উন্নতির যুগে আমরা এই জাতীয় মঞ্চ পরিকল্পনার বিশেষ একটি পরিচিত ত্রুটি দেখতে পাই। এইসব মঞ্চে অভিনেতাকে দাঁড়াতে হতো সমান ব্যবধানে রাখা বৃত্তাকার আসন সারির কেন্দ্রস্থলে। ফলে, অভিনেতার কণ্ঠস্বরের সমস্ত প্রতিধ্বনি আবার

অভিনেতারই কাছে ফিরে এসে তাঁর অভিনয়ে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতো। শুধু যে প্রতিধ্বনিগুলি সংহত হয়ে ফিরে আসতো, তাই নয়—বৃত্তাকারে সজ্জিত আসনের সমব্যবধানে সাজানো খাড়াই পিঠগুলি ঐ প্রতিধ্বনি তরঙ্গকে আরও শক্তিশালী করে তুলতো। আসনগুলির ব্যবধানের উপরে এই প্রতিধ্বনির তীক্ষ্ণতা ও সুর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, এই জাতীয় বৃত্তাকার আসন ব্যবস্থার কেন্দ্রে যদি কোনো শব্দ সৃষ্টি করা হয়, তবে আসনগুলির ব্যবধানের দ্বিগুণ দৈর্ঘ্যের তরঙ্গে প্রতিধ্বনি ফিরে যাবে। যদি এই ব্যবধান ৩০ ইঞ্চি হয়, প্রতিধ্বনি-তরঙ্গের দৈর্ঘ্য হবে ৫ ফুট অর্থাৎ ২২৬ ~ কম্পাঙ্ক। [এটি মুদারা 'সা'-এর কম্পাঙ্ক।] অবশ্য আসনগুলির প্রত্যেকটি দর্শকের দ্বারা ভরে গেলে, প্রতিধ্বনির এই বিড়ম্বনা কমে যাবে, কিন্তু একেবারে নিরসন হবে না।

প্রেক্ষাগৃহের ক্ষেত্রেও পরিশোষণের ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত না হলে, প্রতিধ্বনির অনুরণন বহুক্ষণস্থায়ী হয়। এমন বহু কক্ষ আছে, যেখানে ১০, ১৫, এমন কি আসবাবশূন্য হলে ২৫ সেকেণ্ড পর্য্যন্ত অনুরণন স্থায়ী হতে পারে। যেখানে সাধারণ একটি 'সিলেবল্'-এর উচ্চারণে গড়ে ০.০৩ সেকেণ্ড মাত্র সময় লাগে, সেখানে এই শ্রেণীর অনুরণনযুক্ত কক্ষে কথোপকথন চালানো অসম্ভব। সামান্য কোনো জিনিষ পড়ে যাওয়ার শব্দ বজ্রপাতের মতো শোনাবে, অথচ বিভিন্ন শব্দমালা পৃথক ভাবে চেনা যাবে না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে কোনও প্রেক্ষাস্থলেই সমস্ত দর্শককে সমান ভাবে নাটকের বিষয়বস্তু শোনাতে হলে, ধ্বনির পরিবেশন সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার, এবং ক্ষেত্র বিশেষে [যে সব ক্ষেত্রে উৎপাদিত ধ্বনি সমগ্র প্রেক্ষাগৃহে ছড়িয়ে পড়ার পক্ষে পর্য্যাপ্ত নয়, অথবা ধ্বনিতরঙ্গের উপরে বাইরের কোনও কারণ প্রতিকূল প্রভাব বিস্তার করতে পারে] ধ্বনির নিজস্ব তীক্ষ্ণতা যন্ত্রের সাহায্যে বাড়িয়ে প্রক্ষেপণ ব্যবস্থাকে জোরালো করে তুলতে হবে।

তিন প্রেক্ষাস্থলের ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণ

ইতিকথা জনৈক প্রাচ্য-দেশীয় অধ্যাপকের অনুরণন-সম্পর্কে একটি উক্তি রীতিমতো গল্পকথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর অধ্যাপনা-কক্ষের প্রচণ্ড-অনুরণন ক্ষমতার প্রশংসা (?) করে বলেছিলেন যে, পরের দিন পড়াতে এসে তিনি আগের দিনের শেষ কথাগুলি শুনতে পান। ফলে, সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনা সুরু করার পক্ষে সুবিধাই হয়। হয়তো বিষয়টি পরিহাসের উক্তি। কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে দেখা যাবে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত অনুরণনাদি ধ্বনির বিঘ্নকারী কারণের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার কোনও প্রচেষ্টাই হয়নি—এবং বিংশ শতাব্দীতেই মাত্র তার বৈজ্ঞানিক প্রতিকার উদ্ভাবিত হয়েছে।

ষোড়শ শতাব্দীর ইটালীতে দেখা যায়, অলিম্পিয়ান একাডেমীতে প্রায় রোমক শিল্পের অনুকরণে তৈরী মঞ্চে ছাদ এবং দেয়াল সংযুক্ত হয়েছে। অল্পদিন পরেই দেখা গেল, দৃশ্য পটাদির ব্যবহারে শব্দের প্রতিফলন উন্নতি লাভ করছে। মঞ্চের পিছনের দেয়ালে দরজা না রেখে, ক্রমে মঞ্চটিকেই বড় একটি দরজার পিছনে সরিয়ে নেওয়া হলো—আজ যা রূপ নিয়েছে **মঞ্চমুখে**। আসনের বৃত্তাকার ব্যবস্থার কুফল বুঝতে পারা গেল—তার বদলে গভীর-গর্ভ অর্দ্ধবৃত্তাকার [ইংরাজী 'ইউ' অক্ষরের অনুরূপ] আসন সজ্জার ব্যবস্থা ও ঝুল বারান্দার হলো প্রচলন। একাধিক ঝুল বারান্দা দিয়ে দেওয়ালগুলি ভরে দেওয়ার ফলে, দর্শকেরা মঞ্চের অপেক্ষাকৃত নিকটে বসতে পেলেন; উপরন্তু দর্শকপূর্ণ আসনগুলি দেওয়ালের প্রতিফলনক্ষেত্র ঢেকে রাখার ফলে, বিরাট কক্ষের প্রচণ্ড অনুরণন অনেকখানি কমে গেল। সাময়িক ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রযোজক ও মঞ্চের মালিকেরা ধ্বনি বিজ্ঞানকে আমল দেননি। তাঁরা দেয়ালের গায় রাখা ঝুলবারান্দার সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছিলেন; জমানো

সিমেণ্টের দৃষ্টি সুখকর চকচকে কঠিণ দেয়ালগুলি প্রেক্ষাগৃহের ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণ বিপর্য্যস্ত করেছিল।

বিংশশতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার বৈজ্ঞানিকরা এগিয়ে এলেন তাঁদের ধ্বনি-বিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণা-লব্ধ-ফল নিয়ে, সাধারণ ভাবে বাসস্থান তথা বিদ্যালয়, মঞ্চ, উপাসনালয় প্রভৃতির ধ্বনি প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানে। ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণ আজ সামান্য কয়েক মিনিটের অঙ্ক কষার অপেক্ষা রাখে মাত্র। তবে দুঃখের বিষয়, আজও বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কক্ষ নির্মাণের পর বিশেষজ্ঞদের ডাকা হয়, তার ধ্বনি-সংপ্রসারণ ব্যবস্থার ত্রুটি মোচনের জন্য। সে অবস্থায় প্রয়োজনীয় স্থানে কিছু পরিশোষক লাগানো, বা ক্ষতিকর কয়েকটি গৃহকোণকে ভেঙে বা জুড়ে রূপান্তর করে দেওয়া ছাড়া অন্য কিছু করার উপায় থাকে না। বিষয়টি কিন্তু গৃহের পরিকল্পনার সময় থেকেই চিন্তায় আনলে, ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে কক্ষের সৌন্দর্য্যবিধানের অঙ্গ হিসাবেই গড়ে তোলা সম্ভব হয়।

প্রেক্ষাস্থলের পরিকল্পনা

প্রেক্ষাস্থলের [মুক্তাঙ্গন বা প্রেক্ষাগৃহ উভয় ক্ষেত্রেই] পরিকল্পনায় প্রথম এবং প্রধান কাজ **স্থান নির্বাচন**। তারপর নক্সা থেকে সুরু করে নির্মাণ সমাপ্তি পর্য্যন্ত প্রত্যেক স্তরে, স্থপতি ও ভারপ্রাপ্ত বৈজ্ঞানিকের যৌথ পরিশ্রমেই বিষয়টিতে সুফল পাওয়া যাবে। যে যে বিষয়ে বিশেষ ভাবে লক্ষ্য দিতে হবে, সেগুলি পর্য্যায়ক্রমে নীচে দেওয়া হলো :—

(ক) তুলনামূলক ভাবে শান্ত পরিবেশে রঙ্গমঞ্চের জন্য স্থান নির্বাচন করা দরকার। নির্বাচিত স্থানটি যানবাহন বহুল বড় রাস্তার ঠিক উপরে না হলে, কাজের অনেক সুবিধা হয়।

(খ) দিনের বিভিন্ন সময়ে, বিশেষ করে অনুষ্ঠানের সাধারণ সময়টিতে, কি ধরণের অবাঞ্ছিত শব্দ আশপাশের বিভিন্ন সূত্র থেকে সৃষ্টি হয়, তার একটি তালিকা প্রস্তুত করে, কতখানি পরিশোষণ ব্যবস্থা ও বাধা দানের ব্যবস্থা রাখতে হবে, তা নির্ণয় করা দরকার।

(গ) কক্ষের আয়তন নির্দ্ধারণ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতা থাকা উচিত। এই আয়তন আসন-সংখ্যার উপরে অনেকখানি নির্ভর করে।

(ঘ) ধ্বনি-অন্তরণের ব্যবস্থা মজবুত ও সুপরিকল্পিত হওয়া উচিত।

(ঙ) অট্টালিকার মধ্যবর্তী বহু শব্দ [লিফ্ট, এয়ারকণ্ডিশন মেসিন, জলের পাম্প, অন্যকক্ষের রেডিও প্রভৃতি] বায়ুস্তর, রন্ধ্রপথ বা কক্ষাদির

কঠিন স্তর মারফত প্রবাহিত হয়ে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত।

(চ) প্রতিফলক প্রাচীর ও পরিশোষক সংযুক্তির ব্যবস্থাটি এমন সুপরিকল্পিত হওয়া উচিত, যেন সেগুলি তাদের প্রয়োজনীয় কার্য্য সমাধা করার সঙ্গে কক্ষের সৌন্দর্য্যবিধানেও সহযোগিতা করে।

(ছ) প্রয়োজন হলে, উপযুক্ত ধ্বনিবিবর্দ্ধক ব্যবস্থার সংযোজন দরকার, এবং উক্ত ব্যবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোকের হাতে তার পরিচালনার ভার দিতে হবে।

(জ) নির্মাণ সমাপ্তির পর প্রতিটি আসন থেকে লক্ষ্য করতে হবে, ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সর্বাঙ্গীনভাবে পর্য্যাপ্ত হয়েছে কিনা। কোনও অংশে প্রতিফলনের **অধিশ্রয়ণ** অথবা **ধ্বনি-অবলুপ্তি*** ঘটলে, তার সংশোধন করা দরকার।

(ঝ) কি ভাবে ধ্বনি-নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থাগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ও সংস্কার করতে হবে, গৃহসজ্জার কোন কোন অংশ ধ্বনিবিস্তরণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়, কক্ষের নিয়ন্ত্রিত তাপের পরিমাণ কতখানি থাকলে হ্রস্ব-তরঙ্গের পরিশোষণ কম হবে, ধ্বনি-বিবর্দ্ধন ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালনা করা দরকার, ইত্যাদি বিষয়ে প্রেক্ষাগৃহের তত্ত্বাবধায়ককে যথাযথ নির্দেশ দিতে হবে।

মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চ

মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চের স্থান-নির্বাচন সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য বিষয়। আবেষ্টনীর নিস্তব্ধতা মুক্তাঙ্গনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য্য। নির্বাচিত স্থানটি যেন গাড়ী চলাচলের পথ থেকে দূরে হয়। সম্ভব হলে, পাহাড়ের সানুদেশে, মুক্তাঙ্গনের জন্য স্থান নির্বাচন করতে হবে; নচেৎ উঁচু মাটির পাড় দিয়ে ঘিরে বড় ঘন গাছ লাগানো উচিত প্রেক্ষাস্থলের তিনদিকে [চিত্র ৫৩.১]। স্থানটিতে বায়ুর বেগ যেন ঘণ্টায় অনধিক ১0 মাইল হয়। প্রেক্ষাস্থলের ঢাল কম-পক্ষে ১২° হওয়া উচিত [চিত্র ৫৩.২] যা দৃষ্টিরেখার উন্নতিবিধান করার সঙ্গে ধ্বনি বিস্তরণেও সাহায্য করে।

---

* জলের বুকে বিপরীত দিক থেকে এগিয়ে আসা দুটি তরঙ্গ যেভাবে পরস্পরের মধ্যে লীন হয়ে যায়, সেই ভাবে বিশেষ অবস্থায় দুই শব্দের মিলনেও ধ্বনি অবলুপ্তি ঘটতে পারে। এই ধরণের নীরবতা সৃষ্টির ঘটনাকে ধ্বনির 'ব্যতিচার' বলে।

পরীক্ষার দ্বারা দেখা গেছে, ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থা ব্যতিরেকেই, সর্বাধিক ৬00 জন শ্রোতাকে মুক্তাঙ্গন মঞ্চের কথোপকথন শোনানো যায়। ৬00 জন দর্শকের বসার জন্য ন্যূনাধিক ৬৫ ফুট গভীর ও ৮৫ ফুট চওড়া যায়গা
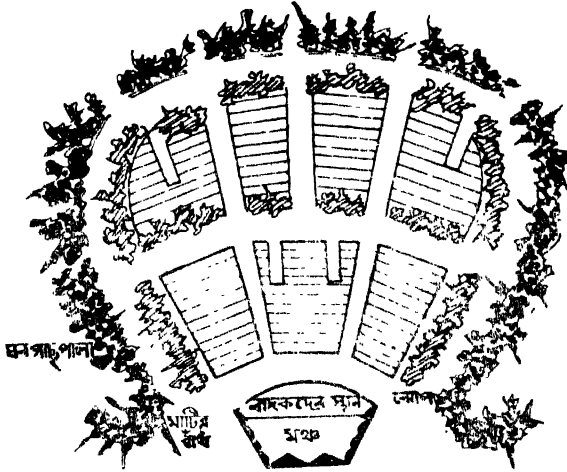
[চিত্র ৫৩.১] আদর্শ মুক্ত-অঙ্গন অভিনয় ব্যবস্থার ভূমিচিত্র

দরকার। এই পরিমাপের বাইরে গেলে, হয় অভিনেতাকে কণ্ঠস্বর স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী জোরে প্রক্ষেপণ করতে হবে, নয়তো উক্ত মাপের সীমানার বাইরে যে দর্শক থাকবেন, তাঁদের শোনার পক্ষে অসুবিধা হবে। অবশ্য, শুধুমাত্র সঙ্গীত নৃত্যমূলক অনুষ্ঠানের জন্য পৃথকভাবে তৈরী করা হলে, মুক্ত-অঙ্গনের মাপ কিছু বড়ও হতে পারে।
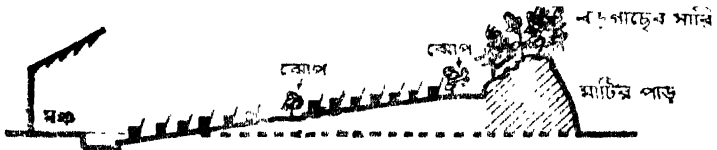
[চিত্র ৫৩ ২] আদর্শ মুক্ত-অঙ্গন মঞ্চের পার্শ্বচ্ছেদ চিত্র

এর পর মঞ্চের পিছনে ও উপরে একটি সুপরিকল্পিত প্রতিফলক নির্মাণের প্রশ্ন ওঠে। সরলতম প্রতিফলক হচ্ছে, মঞ্চের পিছনে একটি খাড়া এবং

সরল প্রাচীর। কোনও ক্রমেই যেন এই প্রাচীর বক্র বা বৃত্তাকার না হয়। এই প্রাচীরের উপরে একটি ঢালু ছাদ, শব্দ ক্ষেপণে অনেকখানি উন্নতি আনে। উক্ত ছাদের ঢাল হওয়া উচিত ৪৫°-এর চেয়ে প্রেক্ষাস্থলের ঢালের অর্দ্ধ-পরিমাণ অধিক। অর্থাৎ প্রেক্ষাস্থলে জমির ঢাল যদি ১২° থাকে, মঞ্চের প্রতিফলক ছাদের ঢাল হবে ৪৫°+১২/২°=৫১ ডিগ্রী। প্রতিফলকের গায় কমপক্ষে ৪ ফুট চওড়া বিভিন্ন আকারের ঢেউ তোলা আস্তরণ থাকলে ধ্বনির সুসমপ্রসারণে অনেকখানি সাহায্য হবে।

প্রেক্ষাগৃহ কক্ষের আকৃতি সেই কক্ষের ধ্বনি নিয়ন্ত্রনের উপরে সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। সুতরাং স্থপতির প্রধান কাজ, বিষয়টির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে প্রেক্ষাগৃহের নক্সা তৈরী করা।

প্রথমেই ধরা যাক ভূমিচিত্রের কথা। আসন ব্যবস্থা এমনভাবে রাখতে হবে, যেন সর্বাধিক দর্শক রঙ্গমঞ্চের যতখানি নিকটে থাকা সম্ভব, থাকতে পারেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে যদিও একটি বর্গক্ষেত্র আয়তক্ষেত্রের চেয়ে বেশী কার্য্যকরী, তবু বাস্তবে দেখা যায়, আয়তক্ষেত্রে শব্দ নিয়ন্ত্রণ ভালো হয়। কারণ ধ্বনির গতিপথ বিচার করলেই দেখা যাবে, তা অক্ষের পাশে পাশে সংহত হয়ে এগিয়ে যায়; সূত্রের উভয় পার্শ্বে ধ্বনি-তরঙ্গের প্রবাহ মন্দ হয়ে আসে।
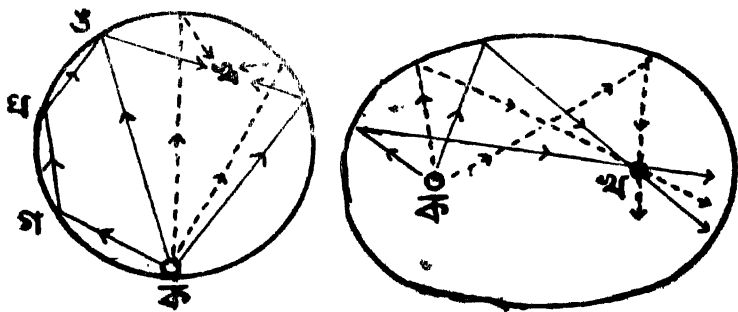
[চিত্র ৫৪.১] বৃত্তাকার ও ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট কক্ষে প্রতিফলনের ত্রুটি

বৃত্তাকার বা ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট কক্ষে প্রতিধ্বনির অধিশ্রয়ণ ঘটে [চিত্র ৫৪.১]—ফলে বিশেষ বিশেষ স্থানে শব্দাধিক্য ঘটে, এবং বেশীর-

ভাগ স্থানে কিছুই শোনা যায় না। চিত্রে দেখা যাবে, উভয়ক্ষেত্রে ক চিহ্নিত স্থানে উৎপন্ন শব্দের প্রতিধ্বনি বহুগুণ বর্ধিত হয়ে খ চিহ্নিত স্থানে পুনর্মিলিত হয়েছে। এই জাতীয় দ্বিতীয় কেন্দ্রে মিলিত হওয়াকেই **অধিশ্রবণ** বলে। বৃত্তাকার কক্ষে আবার বিশেষ একটি রশ্মি কগ, গঘ, ঘঙ রেখাক্রমে প্রাচীর গাত্রের গায়ে গায়ে এগিয়ে যায় এবং মৃদু-আলাপচারী-কেও বহুদূরবর্তী প্রাচীরের পাশে শ্রাব্য করে তোলে। [লক্ষ্ণৌয়ের 'ভুলভুলৈয়া', লণ্ডনের 'সেণ্ট পল্‌স্ ক্যাথিড্রেল', কোপেনহেগেনের 'রয়াল থিয়েটার' প্রভৃতি উদাহরণ হিসাবে উল্লেখযোগ্য] প্রেক্ষাগৃহের এই অংশে কিন্তু কোনো আসন থাকার কথা নয়। এই ধরণের কক্ষগুলির উন্নতিসাধন করতে হলে প্রাচীরের গায় বর্ত্তুলাকার প্রতিফলনব্যবস্থা [চিত্র ৫৪.২] যোগকরা যেতে পারে।
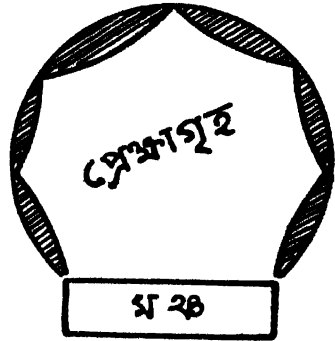
[চিত্র ৫৪.২] বর্ত্তুলাকার প্রতিফলন ব্যবস্থা

দর্শকদের বেশীরভাগ অংশকে মঞ্চের নিকটবর্তী রাখতে হলে, প্রেক্ষাগৃহের পাশের প্রাচীর দুটিকে কেন্দ্রাপসারী করে বেঁকিয়ে গড়া উচিত। এই ধরণের প্রাচীরগাত্র সুপরিকল্পিত হলে, প্রেক্ষাগৃহের পিছনের সারির আসনগুলির দিকে সুন্দরভাবে ধ্বনি প্রতিফলিত করে। মনে রাখতে হবে, ধ্বনির নিজস্ব সরলপথ আর প্রতিফলিত ধ্বনির বক্রপথের দৈর্ঘ্যের ব্যবধান যদি ৬৫ ফুটের বেশী হয়, তবে প্রতিধ্বনির সৃষ্টি হবে। ঐ ব্যবধান যদি ৫০ থেকে ৫৫ ফুটের মধ্যে হয়, তবে ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি জড়িয়ে গিয়ে স্পষ্টতার অভাব দেখা দিবে।

আসনের স্থান নিরূপণ করার সময় প্রেক্ষাগৃহের 'শোনার দিক থেকে ভালো' স্থানগুলিই ব্যবহার করা উচিত। 'শোনার দিক থেকে খারাপ' স্থানগুলিকে চলার পথ হিসাবে কাজে লাগানো যায়। সেদিক থেকে বিচার করলে, প্রেক্ষাগৃহের ঠিক মাঝখান বরাবর চলার পথ রাখা যুক্তিসম্মত নয়—কেননা এই অক্ষরেখা বরাবর ধ্বনির সর্বোৎকৃষ্ট বিস্তরণ ঘটে থাকে।

এবারে আসা যাক আসনের প্রসঙ্গে। সুপরিকল্পিত আসনসজ্জা ধ্বনি-বিস্তরণের একটি ভালো সহায়ক। দেখা এবং শোনা উভয় দিক থেকেই

ঢালুভাবে সাজানো আসন ব্যবস্থাই উপযুক্ত। প্রথমের কয়েকটি সারির আসন সমতলে রাখা চলে। মঞ্চের উচ্চতা যত বেশী হবে, এই সমতলের গভীরতা তত বাড়ানো যেতে পারে। একটি সহজ হিসাবে বলা যেতে পারে, জমি থেকে ধ্বনিসূত্রের উচ্চতার আড়াই গুণ থেকে এক ফুট বাদ দিয়ে, বিয়োগফলকে আসনশ্রেণীর অন্তবর্তী ব্যবধান দিয়ে গুণ করলে, এই সমতলের পরিমাণ পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক, ধ্বনিসূত্রের উচ্চতা ৬ ফুট এবং আসনশ্রেণীর অন্তর্বর্তী ব্যবধান ৩ ফুট। এরূপ ক্ষেত্রে সমতলের পরিমাণ হবে ৩ (৬ × ২½ — ১) বা ৪২ ফুট। এই ৪২ ফুটের আগেও অবশ্য ঢাল সুরু করা যেতে পারে, কিন্তু পরে নয়। ঢালের পরিমাণ হবে ন্যূনাধিক ৮ ডিগ্রী। মনে রাখতে হবে, ধ্বনি-সূত্রের সম্মুখে ১৪০° কোণের মধ্যে স্থাপিত আসনগুলিতে সবচেয়ে ভালো ধ্বনি-বিস্তরণ ঘটে।

প্রাচীর গাত্রের মতো ছাদের নিম্নভাগও শব্দ প্রতিফলনে সমধিক সাহায্য করে। সাধারণতঃ মঞ্চ থেকে দূরতম প্রান্তের আসনগুলি, বিশেষ করে ঝুল বারান্দার নীচের দর্শকবৃন্দ [চিত্র ৫৪.৩] একমাত্র সুপরিকল্পিত ছাদের সাহায্য ছাড়া ভালোভাবে শুনতে পারেন না। এই ছাদের (নিম্ন-ভাগের) উচ্চতা নির্দ্ধারণের কোনও বাঁধা ধরা নিয়ম নেই। তবে
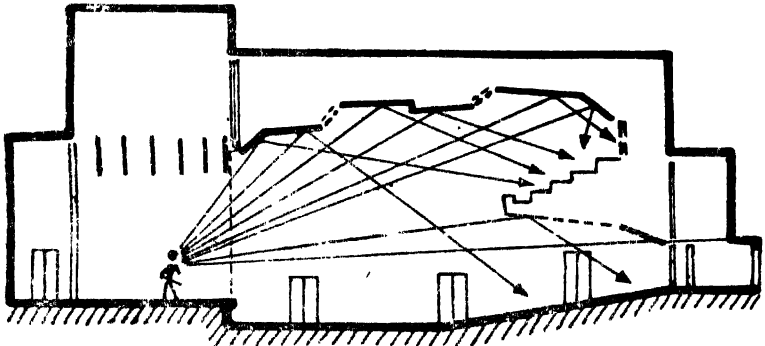
[চিত্র ৫৪.৩] প্রেক্ষাগৃহের সুপরিকল্পিত সিলিংয়ের সাহায্যে ধ্বনি প্রতিফলনের নিয়ন্ত্রণ

[চিত্রে...চিহ্নিত স্থানগুলিতে শব্দশোষক স্তর ব্যবহৃত হয়েছে]

সাধারণতঃ ধরে নেওয়া হয়, বড় প্রেক্ষাগৃহের ক্ষেত্রে এই উচ্চতা হবে কক্ষের প্রস্থের এক-তৃতীয়াংশ—ছোট প্রেক্ষাগৃহের ক্ষেত্রে হবে দুই-তৃতীয়াংশ। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একটি ১৫০ ফুট দীর্ঘ ১০০ ফুট প্রস্থের

প্রেক্ষাগৃহে ছাদ থাকবে ন্যুনাধিক ৩০—৩৫ ফুট উঁচুতে; অপরপক্ষে একটি ১৮ ফুট × ২৪ ফুট কক্ষের ছাদের উচ্চতা হবে ১০ থেকে ১২ ফুটের মধ্যে।

মেঝে থেকে ব্যালকনির সম্মুখভাগের উচ্চতা পশ্চাৎভাগের চেয়ে অবশ্যই বেশী হবে। কনসার্ট হলের ক্ষেত্রে সম্মুখের এই উচ্চতা গভীরতার সমান রাখা উচিত। নাট্যগৃহ এবং চিত্রগৃহের ক্ষেত্রে সর্বাধিক গভীরতা হবে যথাক্রমে ঐ উচ্চতার দুইগুণ এবং তিনগুণ।

পারতঃপক্ষে গম্বুজ, অবতল, বর্তুল বা খিলানযুক্ত ছাদ এড়িয়ে চলা উচিত। অলঙ্করণের জন্য যদি এই জাতীয় স্থাপত্যের একান্তই প্রয়োজন পড়ে, তবে বক্রতার ব্যাসার্দ্ধ যেন ছাদের উচ্চতার ২ গুণের বেশী, অথবা, অর্দ্ধেকের কম ধরা হয়। সবচেয়ে ক্ষতি ঘটে, যদি ছাদের বক্রতার ব্যাসার্দ্ধ তার উচ্চতার সমান নেওয়া হয়ে থাকে।

প্রেক্ষাগৃহের প্রাচীর গাত্রের পরিকল্পনা এমনভাবে হওয়া উচিত যেন ধ্বনি প্রতিফলিত হয়ে দর্শকের কাছে ফিরে আসতে অযথা বিলম্ব না ঘটে। আসনশ্রেণীর যেসব অঞ্চলে ধ্বনির বিস্তার অত্যন্ত কম হচ্ছে, দেয়ালে উপযুক্ত বক্রতা সৃষ্টি করে সেই অঞ্চলে ধ্বনির প্রতিফলিত রশ্মি পাঠানো যায়। প্রকাণ্ড প্রেক্ষাগৃহের বহু দূরবর্তী প্রাচীর গাত্র যদি প্রতিফলনে বিলম্ব ঘটানোর হেতু হয়ে দাঁড়ায়, তবে সেইসব দেয়ালের মসৃণতা দূর করে, ধ্বনির জন্য অসমতল করা উচিত।

আসন ব্যবস্থার সঙ্গে সমান্তরাল রেখে আসনের পিছনের প্রাচীরটিকে অবতলভাবে বেঁকিয়ে তৈরী করার দিকে একটি ঝোঁক দেখা যায়। দেখতে যতই সুন্দর লাগুক, ধ্বনি প্রতিফলনের পক্ষে এই ব্যবস্থা অত্যন্ত ক্ষতিকর।

গোলমাল, তথা অবাঞ্ছিত ধ্বনি

যে কোনও রকমের ধ্বনি, যা আমাদের একাগ্রতা নষ্ট করে, বিরক্তি উৎপাদন করে, অথবা দৈনন্দিন কাজ, বিশ্রাম, আমোদ-প্রমোদ বা পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটায়, তাকেই আমরা **গোলমাল** আখ্যা দিয়ে 'অবাঞ্ছিত ধ্বনি'র তালিকায় ফেলে থাকি। সাধারণ সংজ্ঞা হিসাবে বলা যায়, **শ্রোতার কাছে অবাঞ্ছিত ধ্বনি** মাত্রই গোলমাল। এই সংজ্ঞা অনুসারে মানুষের কথোপকথন এমন কি সংগীত ধ্বনিও 'গোলমাল' পর্য্যায়-ভুক্ত হবে, যদি তা অবাঞ্ছিত হয়।

বলা বাহুল্য, প্রেক্ষাস্থলটিকে যারপরনাই ভাবে 'গোলমাল' থেকে মুক্ত রাখতে হবে। বহিরাগত গোলমালের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রেক্ষার স্থান-নির্বাচনাদি ছাড়াও, স্থপতির আরও দুইটি দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। গোলমাল **বাতাস-বাহিত**ভাবে প্রেক্ষার অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে; আবার প্রেক্ষাগৃহের **কাঠামো মারফত**ও বাহিত হতে পারে। অবাঞ্ছিত ধ্বনি বিস্তরণের এই উভয় পথ যথাসম্ভব রোধ করা দরকার।

সাধারণতঃ দরজা, জানালা, বাতাস চলাচলের পথ, বন্ধ দরজা জানালার ফাঁক, জল বৈদ্যুতিক তার বা গ্যাসবাহী পাইপ ইত্যাদি মারফত 'বাতাস বাহিত গোলমাল' প্রবেশ করে। দেয়াল, কড়ী-বরগার ট্রাস, মেঝে, কাঠের পাটাতন ইত্যাদিকে কাঁপিয়ে 'কাঠামো-বাহিত গোলমাল' চলে আসে প্রেক্ষার অভ্যন্তরে। এই জাতীয় অবাঞ্ছিত ধ্বনির সূত্র অপসারিত করা, অথবা উৎপত্তিস্থলেই তাকে আবদ্ধ রাখা সম্ভব হলে, গোলমাল নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে সহজ হয়। যেখানে তা সম্ভব নয়, সেখানে বাতাসবাহিত ধ্বনি-প্রবেশের পথগুলিকে ভালোভাবে বন্ধ করতে হবে। শুধু পুরু আচ্ছাদনই এক্ষেত্রে পর্য্যাপ্ত নয়। **দ্বিস্তর দরজার** ব্যবস্থাই সঠিক প্রণালী। 'কাঠামো বাহিত' অবাঞ্ছিত ধ্বনি রোধের জন্য, কারপেট, রবার বা কর্কের টালি, পর্দা জাতীয় ধাক্কা রোধকারী পদার্থের সমধিক ব্যবহারই উৎকৃষ্ট প্রতিকার। ধ্বনি পরিশোষণ ব্যবস্থার ব্যবহার, একদিকে যেমন অবাঞ্ছিত ধ্বনি-প্রতিফলন রোধ করে, অন্যপক্ষে বহিরাগত গোলমালের কম্পনকেও পরিশোষণ করে, প্রেক্ষাস্থলকে অবাঞ্ছিত ধ্বনির হাত থেকে রক্ষা করে।

ধ্বনি পরিশোষণ ব্যবস্থা

ধ্বনিশক্তিকে অন্য কোনো শক্তিতে এবং শেষ পর্য্যন্ত উত্তাপে রূপান্তরিত করে ধ্বনির অবলুপ্তি ঘটানো যায়। এই নিয়ম অনুসরণ করেই নানা জাতের সছিদ্র বস্তু তৈরী হয়েছে, যা ধ্বনির বেশীরভাগ শক্তি শোষণ করে নেয়। প্রেক্ষাগৃহে অবাঞ্ছিত প্রতিফলনের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য এই জাতীয় বস্তুর আস্তরণ ব্যবহৃত হয়। প্রাচীর বা ছাদের গায় প্রয়োজনীয় স্থানে অসম-আকৃতির পরিশোষক লাগালে অনেক ভালো ফল পাওয়া যাবে।

ধ্বনি-পরিশোষক আস্তরণ ছাড়াও, আসনের পুরু গদি আর, চলাপথের উপরে পাতা গালিচা, অনেকখানি পরিশোষণের কাজ করে। এগুলিকেও ধ্বনি পরিশোষক ব্যবস্থার অঙ্গ হিসাবে ধরে নেওয়া যায়। সর্বাধিক

পরিশোষণ ব্যবস্থার প্রয়োজন পড়ে আসনশ্রেণীর পিছনের দেয়ালে ও ছাদ বা ঝুলবারান্দার শেষ প্রান্তে—যেখান থেকে কোনও প্রতিফলন হলে, প্রতিফলিত ধ্বনি-রশ্মি মঞ্চে অথবা প্রেক্ষাগৃহের অবাঞ্ছিত স্থানে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে ফিরে আসবে। ছাদের নীচেও অনুরূপভাবে একাধিক জায়গায় প্রতিফলন নিরোধের জন্য [চিত্র ৫৪.৩] পরিশোষণ ব্যবস্থা রাখার প্রয়োজন পড়ে।

ধ্বনি পরিশোষণের অন্তর্ভুক্ত না হলেও, দ্বিস্তর দরজার কথা, প্রেক্ষাগৃহের বহিরাগত ধ্বনি-নিরোধক হিসাবে এখানে আলোচনা করা যেতে পারে।

পরিশোষণ ব্যবস্থা যদিও প্রবেশ-পথের বাইরে দর্শকদের অপেক্ষা করার বা প্রবেশ পত্র সংগ্রহ করার জায়গাতেও লাগানো থাকে, তবু প্রবেশ নির্গমনের সময় দরজা খুললেই, সেই পথে বাইরের গোলামাল প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করবে। দ্বিস্তর দরজার ব্যবস্থায় [চিত্র ৫৪.৪] এই ত্রুটির অনেকটা সংশোধন সম্ভব। দর্শক যখন 'ক' চিহ্নিত দরজা খুলে প্রবেশ করেন, তখন বাইরের অবাঞ্ছিত ধ্বনি তরঙ্গ 'খ' চিহ্নিত বন্ধ দরজায় ধাক্কা খেয়ে প্রতিফলিত হয়। দর্শক যখন 'খ' দরজা খোলেন, তার পূর্বেই 'ক' বন্ধ হয়ে গেছে, এবং 'খ'-এর উপর তরঙ্গের চাপ প্রতিফলনের ফলে হয়ে গেছে অনেকখানি নিস্তেজ। ফলে, 'খ' খোলার সময় সেই উল্টোমুখী নিস্তেজ তরঙ্গ প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ করে না। বলা বাহুল্য, দরজাগুলি যাতে নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে যায়, তার মতো ব্যবস্থা রাখা দরকার।
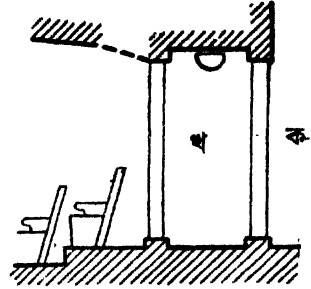
[চিত্র ৫৪.৪] দ্বিস্তর দরজা

ধ্বনি-আবরণ ধ্বনির ব্যতিচার সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুপ্রযুক্ত হলে, কৃত্রিম ধ্বনি দিয়ে অবাঞ্ছিত ধ্বনির তরঙ্গকে ঢেকে দেওয়া সম্ভব।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, গাড়ী চলার শব্দযুক্ত বড় রাস্তার ধারে পাশাপাশি দুটি ঘরের কথা-বার্তা বা অন্যান্য শব্দ দুই ঘরের গোপনীয়তা

রক্ষায় কোনও বাধা সৃষ্টি করে না। গাড়ী চলার একঘেঁয়ে শব্দে অভ্যস্ত হতেই যা কিছু সময় লাগে। শীততাপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্রের মৃদু ধ্বনি যদি ডাক্ট পথে ছড়িয়ে পড়ে, তবে দপ্তরের অনেক অবাঞ্ছিত শব্দই (টাইপ রাইটার, সাইক্লোষ্টাইল মেশিন বা অন্যান্য কুঠুরীর কথোপকথন) কানে লাগে না।

মৃদু এবং সহনযোগ্য কম্পাঙ্কে বাজানো যন্ত্রসংগীতের মূর্চ্ছনাও অনুরূপভাবে অনেক গোলমালের ধ্বনিতরঙ্গকে ঢেকে দিতে সক্ষম। প্রেক্ষাগৃহের পক্ষে বিষয়টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এই ধরণের ব্যবস্থাকে **ধ্বনি-আবরণ** নামে অভিহিত করা হয়।

প্রেক্ষাগৃহের ত্রুটি সংশোধন

ধ্বনি বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক পর্য্যায় শুরু হওয়ার বহু আগেই অধিকাংশ প্রেক্ষাগৃহ তৈরী হয়েছে। তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কিছু না কিছু ত্রুটি আছেই আছে। আবার বহু আধুনিক কক্ষ যে প্রয়োজনে তৈরী হয়েছিল, ব্যবহারের সময় ভিন্নতর প্রয়োজনে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে ধ্বনিগত দিক থেকে ত্রুটিযুক্ত মনে হচ্ছে।

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পরিকল্পনাহীনভাবে নির্মিত অথবা ভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহৃত প্রেক্ষাগৃহে নীচের এক বা একাধিক ত্রুটি পাওয়া যাবে :

(ক) অত্যধিক অনুরণন-জনিত ব্যাঘাত।

(খ) শ্রাব্য ধ্বনির গাম্ভীর্য্যমাত্রা প্রেক্ষার প্রত্যেকটি অংশে পর্য্যাপ্ত নয়।

(গ) প্রতিধ্বনি, ধ্বনি অধিশ্রয়ণ অথবা অবলুপ্তি-ঘটিত ত্রুটিসমূহ।

(ঘ) ধ্বনি-বিবর্ধন ব্যবস্থা পর্য্যাপ্ত এবং / অথবা সুপরিকল্পিত নয়।

(ঙ) বহিরাগত গোলমালের অনুপ্রবেশ।

এই ত্রুটিগুলির হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য সাধারণভাবে কয়েকটি নির্দেশ দেওয়া হলো :

(ক) কক্ষের পরিমাপহীন উচ্চতাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রে মাত্রাধিক অনুরণনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কক্ষের শিলিং ও প্রাচীরে ধ্বনিশোষক ব্যবস্থার সংযোগের সঙ্গে সঙ্গে ঘন-আয়তন কমিয়ে আনার দ্বারা এই ত্রুটি এড়ানো যায়। ধ্বনি-উৎপাদন কেন্দ্রের চারপাশে সমান্তরাল প্রতিফলক পরিহার করাই উচিত।

(খ) ধ্বনির গাম্ভীর্যমাত্রা বাড়াতে হলে, ধ্বনি-উৎপাদন সূত্রটিকে এমন একটি উপযুক্ত উচ্চতায় তুলতে হবে, যেখান থেকে সর্বাধিক পরিমাণ প্রত্যক্ষ তরঙ্গ শ্রোতার কানে পৌঁছাতে পারে। এর সঙ্গে বৃহদায়তন ধ্বনি প্রতিফলক ঝুলিয়ে দিতে হবে শিলিংয়ের নীচে। প্ল্যাষ্টারের চাদর, ন্যূনাধিক ⅜ ইঞ্চি মোটা প্লাই বোর্ড, ½ ইঞ্চি মোটা জিপসাম্ বোর্ড অথবা কংক্রীটের কাজও এই প্রতিফলনের কাজ করতে পারে। আসনশ্রেণীর সমতল অবস্থানও এই ধরণের ত্রুটির কারণ হয়। এগুলি ঢালুভাবে সাজালেই সর্বাধিক প্রত্যক্ষ ধ্বনি বিস্তরণে সাহায্য করে।

(গ) প্রতিধ্বনি-আদি ত্রুটি পরিশোধক ও প্রতিফলকের সুপরিকল্পিত ব্যবহারে অনেকখানি এড়ানো যায়।

(ঘ) পুরাতন ধ্বনি-বিবর্ধন ব্যবস্থা যদি ভালো কাজ না করে, তা বদলে ফেলাই যুক্তিযুক্ত। সেইসঙ্গে প্রক্ষেপকগুলির অবস্থানও পরিকল্পিত-ভাবে নির্বাচন করতে হবে।

(ঙ) বহিরাগত গোলমালের হাত থেকে একটি নির্মাণ-সম্পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহকে মুক্ত করতে হলে, দ্বিস্তর দরজা এবং প্রবেশ পথগুলির চারদিকে একটি ঘেরা বারান্দার সংযুক্তি ভালো ফল দিবে। এছাড়া রঙ্গালয়ের বাইরের ধ্বনিতরঙ্গে বাধাদানকারী মোটা প্রাচীর এবং বড় গাছপালা লাগানোর ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

চার ধ্বনি-বিবর্দ্ধন ব্যবস্থা

যান্ত্রিক ধ্বনি-বিবর্দ্ধনের প্রয়োজন

ধ্বনির প্রতিফলন, প্রতিসরণ, পরিশোষণ প্রভৃতি সুনিয়ন্ত্রিত করে প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনির সুসম প্রসারণ ব্যবস্থা আদর্শ করে তোলার সমস্ত যত্ন নেওয়া সত্ত্বেও, সর্বাধিক ৫০,০০০ ঘনফুট আয়তন পর্য্যন্ত স্থানে সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বর ব্যাপ্ত হতে পারে। অভ্যাসের সাহায্যে অভিনেতারা কণ্ঠস্বরের স্তর স্বাভাবিক স্তরের চেয়ে শক্তিশালী করতে পারলেও, বেশী সময় ঐ উচ্চতর স্তরে ক্রমাগত শব্দসৃষ্টি করতে পারেন না। বলা বাহুল্য, একটি ৬০,০০০ ঘনফুট আয়তনের প্রেক্ষাগৃহে গড়ে ৫০ মাঃ ওঃ ধ্বনি উৎপাদনক্ষম কণ্ঠস্বর দ্বিগুণ শক্তিসম্পন্ন হলেও, ধ্বনি বিস্তরণে কৃতকার্য্য হবে না। অথবা, অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর কক্ষেও, যেখানে অবাঞ্ছিত শব্দ সমাগম প্রয়োজনীয় ধ্বনিতরঙ্গকে নষ্ট করে ফেলে, সাধারণ কণ্ঠস্বর সম্যক ধ্বনিবিস্তরণে অসমর্থ হয়। এই জাতীয় প্রেক্ষাগৃহে অথবা অনুরূপ অসুবিধাযুক্ত মুক্তাঙ্গন মঞ্চে যান্ত্রিক উপায়ে ধ্বনি-বিবর্দ্ধনের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজনীয়।

ধ্বনি-বিবর্দ্ধনের সরঞ্জাম

ধ্বনি-বিবর্দ্ধন ব্যবস্থায় তিনটি প্রধান অংশ কাজ করে। [চিত্র ৫৫.১] প্রথম অংশ **মাইক্রোফোন** বা **ধ্বনি-গ্রাহক**। এগুলি রাখা হয় ধ্বনিসূত্রের নিকটবর্তী স্থানে। দ্বিতীয় অংশ **এমপ্লিফায়ার** বা **ধ্বনি-বিবর্দ্ধক**। এটি রাখা হয় নিয়ন্ত্রণকেন্দ্রে—সাধারণতঃ মঞ্চের পাশে অথবা বাদ্যপীঠে। তৃতীয় অংশ **লাউডস্পীকার** বা **ধ্বনি-প্রক্ষেপক**। এগুলির মুখ প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের দিকে এমনভাবে রাখা হয়, যেন এর দ্বারা প্রক্ষেপিত ধ্বনিতরঙ্গ পর্য্যাপ্তভাবে সমগ্র প্রেক্ষাস্থল ভরিয়ে দিতে পারে।

প্রয়োজন অনুসারে একটি বা একাধিক ধ্বনিগ্রাহক রাখা হয় বিভিন্ন সম্ভাব্য ধ্বনিসূত্রে। এরা প্রত্যেকেই একটি মাত্র ধ্বনি-বিবর্দ্ধকের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে। ধ্বনি-বিবর্দ্ধক মারফৎ বর্দ্ধিত চাপের তরঙ্গ এক বা একাধিক ধ্বনি প্রক্ষেপকের মাধ্যমে প্রেক্ষাগৃহে ছড়ানো হয়।
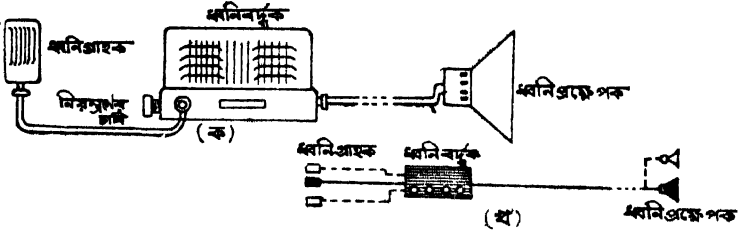
[চিত্র ৫৫.১] ধ্বনিবিবর্দ্ধনের সরঞ্জাম : (ক) ধ্বনিবিবর্দ্ধক ব্যবস্থার প্রধান তিনটি অংশ। (খ) রেখাচিত্রে দেখানো হয়েছে, এক বা একাধিক ধ্বনিগ্রাহক ও প্রক্ষেপক ব্যবহারের প্রণালী।

আদর্শ ধ্বনি-বিবর্দ্ধন ব্যবস্থার বিশেষ কয়েকটি গুণ থাকা দরকার : (ক) সমগ্র প্রেক্ষাস্থলে এই ব্যবস্থায় সমান গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে ধ্বনি শ্রুতি-গোচর হবে, (খ) ধ্বনির বিকৃতি যত কম হবে, ততই ভালো ; এবং (গ) যান্ত্রিক ব্যবস্থায় বর্দ্ধিত হলেও, শ্রোতা যেন এর কৃত্রিমতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার অবকাশ না পান।

ধ্বনি-গ্রাহক যন্ত্রের মজবুত গঠন, আকৃতি, ধ্বনিগ্রহণ করা এবং কম্পাঙ্কে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা ও ধ্বনিগ্রহণের দিকের উপরে তার উৎকর্ষ নির্ভর করে। এর মধ্যে, **ধ্বনিগ্রহণ**-এর দিক থেকে গ্রাহকযন্ত্রগুলিকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একশ্রেণীর গ্রাহকযন্ত্র তার চারদিকে ৩৬০° ডিগ্রীতেই শব্দ সংগ্রহ করতে পারে। দ্বিতীয় শ্রেণীর যন্ত্র একমুখী। এই **একমুখী শ্রেণীর গ্রাহকযন্ত্র** মঞ্চের পক্ষে উপযোগী। এর ফলে প্রেক্ষাগৃহের গুঞ্জন অথবা ধ্বনি প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা মারফত প্রসারিত শব্দ তরঙ্গাদি এই গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে না। প্রক্ষেপক মারফত প্রেরিত তরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে আবার ধরা পড়লে, এক বিশেষ জাতের অনুরণন এবং সময় বিশেষে এক ধরণের বিকৃত শব্দ সৃষ্টি হতে থাকে। এই ত্রুটিকে **ফীড্ ব্যাক** করা বলে।

ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের বিদ্যুত-তরঙ্গ গ্রহণের পরিমাণ, শব্দ-বর্দ্ধনের উচ্চতম সীমা, কম্পাঙ্কে সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা, বিকৃত শব্দ উৎপাদন না করার গুণ, ধ্বনি বিকৃতির পরিমাণ-স্বল্পতা এবং যান্ত্রিক গঠনের উপরে তার উৎকর্ষ নির্ভর করে। বিভিন্ন শব্দগ্রাহকের ধ্বনিগ্রহণ ক্ষমতার পার্থক্য থাকে। ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্র মারফত তাদের গৃহিত স্বরগুলি প্রক্ষেপকের মাধ্যমে সমান গাম্ভীর্য্যে (ভলিউমে) ছড়ানোর জন্য, ধ্বনি-বিবর্দ্ধক যন্ত্রে গাম্ভীর্য্য-মাত্রা বাড়ানো-কমানোর ব্যবস্থা থাকে। এই ব্যবস্থার সাহায্যে গ্রাহকগুলিকে পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভব।

ধ্বনি-বিবর্দ্ধন ব্যবস্থায় ভালোমন্দের সবচেয়ে বেশী দায়ীত্ব থাকে প্রক্ষেপকের উপরে। প্রক্ষেপকগুলির বৈদ্যুতিক তরঙ্গ-গ্রহণ ক্ষমতা, কম্পাঙ্ক-সচেতনতা এবং ধ্বনিতরঙ্গ পরিবেশনের সুগমতার উপরে তাদের উৎকর্ষ নির্ভর করে। দুই শ্রেণীর প্রক্ষেপক যন্ত্র সুপরিচিত। প্রথমটি উচ্চ কম্পাঙ্কের পক্ষে উপযোগী **শিঙ্গা** বা 'হর্ণ' জাতীয় ; অপরটি নিম্ন কম্পাঙ্কে বিশেষ কার্য্যকরী **বাক্সবন্দী** বা 'ডাইরেক্ট রেডিয়েটার'-জাতীয় [চিত্র ৫৫.২]। শিঙ্গাশ্রেণীর প্রক্ষেপক **টুইটার** এবং বাক্সবন্দী শ্রেণীগুলি নামেও পরিচিত।

[চিত্র ৫৫.২] শিঙ্গা ও বাক্সবন্দী-জাতীয় ধ্বনিপ্রক্ষেপক যন্ত্র

প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনি প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যেন প্রক্ষেপিত ধ্বনি চোখে দেখতে পাওয়া উৎসের দিক থেকেই আসছে বলে বোঝা যায়। সে দিক থেকে বিচার করলে, সমগ্র প্রেক্ষাগৃহের জন্য একটি মাত্র প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা রাখা উচিত ; এবং সেটিও ধ্বনিসূত্রের যত কাছে হতে পারে, ততই ভালো। কিন্তু কার্য্যতঃ তা সম্ভবপর নয়, যেহেতু মঞ্চের কেন্দ্রে ৫/৬ ফুট উচ্চতায় [সাধারণ মানুষের মুখের স্তরে] এই যন্ত্র স্থাপন করা যাবে না। অথচ একটি মাত্র সূত্র ডাইনে বা বামে রাখলে ধ্বনির কৃত্রিম

সূত্রের দিকে স্বতঃই শ্রোতার মন আকৃষ্ট হবে। এই ত্রুটি এড়ানোর জন্য মঞ্চের দুইপাশে প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা রাখার প্রচলন হয়েছে। প্রেক্ষাগৃহের আকৃতির উপরে নির্ভর করে, পার্শ্ববর্তী প্রাচীর গাত্রেও এই প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা রাখা হয়, দূরবর্তী শ্রোতাদের সুবিধার জন্য। তবে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়, একাধিক প্রক্ষেপকের ধ্বনিবিস্তরণের অক্ষগুলি যেন কোনও বিন্দুতে পরস্পরকে ছেদ না করে।

সর্বাধুনিক ধ্বনি প্রক্ষেপণ ব্যবস্থায়, উভয় পার্শ্বের প্রক্ষেপকগুলিকে পৃথকভাবে নিয়ন্ত্রিত করে, বৃহৎ মঞ্চের শব্দ উৎপাদনের অবস্থান অনুযায়ী ধ্বনিপ্রক্ষেপণ করা হয়।
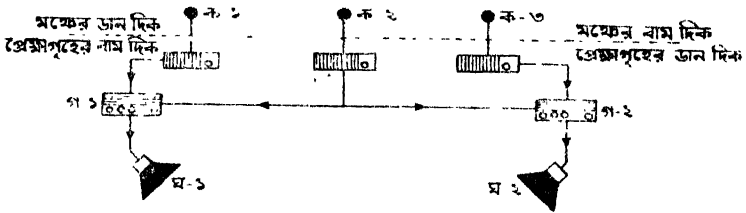
[চিত্র ৫৫.৩] স্তরমাত্রিক ধ্বনি প্রক্ষেপণ ব্যবস্থা। (ক) ধ্বনিগ্রাহক, (খ) প্রাক্-বর্দ্ধন ব্যবস্থা, (গ) বিবর্দ্ধন ব্যবস্থা, (ঘ) প্রক্ষেপক।

এর ফলে মঞ্চের কেন্দ্র থেকে ডান দিকে থাকা অভিনেতৃবর্গ বা গায়ক-গায়িকার কণ্ঠস্বর প্রেক্ষাগৃহের অনুরূপ দিক [এক্ষেত্রে প্রেক্ষাগৃহের বাম দিক] থেকে এবং কেন্দ্র থেকে বাম দিকে উত্থিত স্বর প্রেক্ষাগৃহের ডান দিক থেকে শোনা যায়। এই ব্যবস্থাকে বলা হয় **স্তর-মাত্রিক ধ্বনি-প্রক্ষেপণ** বা 'ষ্টিরিওফোনিক সাউণ্ড' ব্যবস্থা। ক্ষুদ্রায়তন মঞ্চ ও প্রেক্ষাগৃহে দুটি পৃথক ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থা ব্যবহার করলেই এই স্তরমাত্রিক প্রক্ষেপণের কাজ সমাধা হতে পারে। বৃহদায়তন মঞ্চে এর সঙ্গে একটি **প্রাকবর্দ্ধন ব্যবস্থা** [প্রিএম্প্লিফিকেশান] সংযুক্ত হয় [চিত্র ৫৫.৩]। মঞ্চের কেন্দ্রে যদি পৃথক প্রক্ষেপণ রাখা সম্ভবপর হয়, তবে মঞ্চ-কেন্দ্রে রাখা ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থাকে বাকি দুটি থেকে পৃথক করে নেওয়া যেতে পারে। তবে মঞ্চ কেন্দ্রে বাকি দুটি প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার সমান উচ্চতায় প্রক্ষেপক রাখার সম্ভাবনা খুবই কম; বিশেষতঃ মুক্তাঙ্গনে এটি অসম্ভব—তাই মাঝের গ্রাহকযন্ত্রে গৃহিত শব্দগুলি [চিত্র ৫৫.৩

অনুযায়ী] দুই পাশের প্রক্ষেপকের মাধ্যমে ছড়ানোর ব্যবস্থা করা সমীচীন।

যে শ্রেণীর প্রক্ষেপক যে ভাবেই ব্যবহার করা হোক না কেন, লক্ষ্য রাখা উচিত প্রক্ষেপক-নিসৃত ধ্বনি-তরঙ্গ যেন কোনও ক্রমেই কোনও প্রতিফলক বাধাকে স্পর্শ না করে। অনেকক্ষেত্রে একটি বড় ব্যাসের প্রক্ষেপক ব্যবহার না করে, উপর থেকে নীচে থাক করে সাজানো চার, ছয় বা আটটি প্রক্ষেপকের একটি **সাউণ্ড কলাম** ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যায়। এই জাতীয় কলামের ধ্বনি-বিস্তরণ-কোণ ভূমি-সমান্তরাল দিকে পর্য্যাপ্ত প্রশস্ত, অথচ লম্বের দিকে সংকীর্ণ—প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনি-বিস্তরণের কাজে এই গুণটি খুবই সহায়ক।

ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ যদি সম্ভব হয়, তবে ধ্বনি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটি দর্শকের মাঝে, সহজে পৌঁছানো যায় এমন জায়গায়, স্থাপনা করা উচিত। নিয়ন্ত্রণকারী তাহলে তাঁর নিয়ন্ত্রণের ফলাফল সঠিক অনুধাবন করতে পারবেন। কিন্তু সর্বোপযোগী এই ধরণের ব্যবস্থা করা প্রচুর ব্যয়-সাধ্য। তাই বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রণকারীকে মঞ্চের ভিতরের দিকে একপাশে স্থান নিতে হয়। বলা বাহুল্য, মঞ্চের ঐ অংশে প্রক্ষেপিত ধ্বনি কিছুমাত্র যেন না পৌঁছানোই উচিত। সেক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণকারীর পক্ষে অভিনয় আরম্ভের পূর্বে দর্শকের আসনে বসে, নিয়ন্ত্রিত ধ্বনির গাম্ভীর্য্য-মাত্রা যাচাই করে নেওয়া উচিত। মনে রাখতে হবে, পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহ আর শূণ্য প্রেক্ষাগৃহে ধ্বনিবিস্তরণের যথেষ্ট তারতম্য ঘটে। পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং অনুষ্ঠান চলাকালীন অনুধাবন থেকেই এর ত্রুটি মোচন সম্ভবপর। অবশ্য, **হেডফোন** অথবা হাতের কাছে নিম্ন কম্পাঙ্কের ছোট প্রক্ষেপক যন্ত্র রেখে নিয়ন্ত্রণের কিছুটা সুবিধা করে নেওয়া যায়।

অনেক সময় অভিনেতৃবর্গ প্রক্ষেপিত শব্দ শোনার প্রয়োজন বোধ করেন। নাচের বাজনা অথবা নেপথ্য শব্দ ইত্যাদি তার উদাহরণ। মঞ্চে নিম্ন কম্পাঙ্কের একমুখী প্রক্ষেপক রেখে এই সমস্যার সমাধান করা যায়। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, এইভাবে স্থাপিত প্রক্ষেপক থেকে সরাসরি বা প্রতিফলিত ধ্বনিরশ্মি যেন শব্দ গ্রাহক যন্ত্রে ধরা না পড়ে।
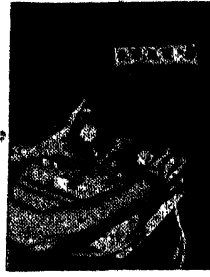
পাঁচ কৃত্রিম শব্দ

কৃত্রিম শব্দ-সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা

অভিনয়ের পরিবেশনকে বাস্তবানুগ করে তোলার জন্য কথোপকথন, সঙ্গীত বা আবহসঙ্গীত ছাড়াও বিভিন্ন পরিবেশে নানাবিধ আনুষঙ্গিক শব্দ যোজনার প্রয়োজন হয়। দর্শক দেখতে পাচ্ছেন, এমন কোনও ধ্বনিসূত্র থেকে যদি উৎপন্ন না হয়ে, অন্য কোনো কায়িক বা যান্ত্রিক কৌশলে সেই শব্দটি উৎপন্ন করে দর্শককে শোনানো হয়, তবেই তাকে বলা হবে **কৃত্রিম শব্দ**। এই জাতীয় শব্দ সৃষ্টির প্রয়োজন তখনই পড়ে,

(ক) যদি ধ্বনিসূত্র রঙ্গপীঠের উপরে না থাকে,

(খ) যদি স্বাভাবিক উপায়ে দৃষ্টিগোচর ধ্বনিসূত্র থেকে পর্য্যাপ্ত শব্দ সৃষ্টি সম্ভবপর না হয় ;

(গ) ধ্বনিসূত্র মঞ্চের উপরেই আছে, এবং পর্য্যাপ্ত ধ্বনি উৎপাদনে সক্ষম ; কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে যদি প্রার্থিত ফললাভে সন্দেহ থাকে ; অথবা

(ঘ) যদি পরিবেশ সৃষ্টির উদ্দেশে ধ্বনিবিশেষের প্রয়োজন হয়।

নেপথ্যে অশ্বখুর-ধ্বনি, কামানের গর্জন, কড়া নাড়ানোর শব্দ প্রভৃতি রঙ্গপীঠে ধ্বনিসূত্রের অনুপস্থিতির উদাহরণ। এই জাতীয় বহু উদাহরণ পেশ করা যায়, যার আসল শব্দ সৃষ্টি করে দর্শককে শোনানো সম্ভবপর নয়।

প্রাচীনযুগের তূরী ভেরীর নকল তৈরী করেই সাধারণতঃ তূরী বাদকের হাতে ধরানো হয়। মঞ্চে সে তূরী মুখে দিয়ে বাজানোর ভঙ্গী করা যায় মাত্র ; বাজানো যায় না। নিঃস্তব্ধ রাত্রে চোর ঘরে ঢুকে নকল চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলতেই, গৃহস্বামীর ঘুম ভেঙে গেল চাবি

ঘোরানোর শব্দে। আসলে চাবি ঘোরানোর শব্দ এত জোরে হয় না, যা প্রেক্ষাগৃহের সমগ্র দর্শককে শোনানো যায়। টেবিলে রাখা টেলিফোন ঝনঝন শব্দে বেজে উঠলো। মঞ্চে সাধারণতঃ নকল রিসিভার-সেট ব্যবহার করা হয়। তাকে বাজানো সম্ভব নয়—অন্ততঃ, খরচ-সাপেক্ষ। এই ধরণের বহু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেখানে ধ্বনিসূত্র দর্শকের চোখের সামনেই আছে, কিন্তু তার নিজস্ব শব্দ প্রক্ষেপণের ক্ষমতা নেই। এসব ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়েই আবশ্যক মতো শব্দযোজনা করতে হয়।

শাঁখে ফুঁ দিলে যে আওয়াজ হয়, তা প্রেক্ষাগৃহের সর্বত্র পৌছে দেওয়ার পক্ষে পর্যাপ্ত—কিন্তু প্রয়োজনীয় মুহূর্তে শাঁখ না বাজতে পারে, বা বিকৃত শব্দ সৃষ্টি করতে পারে। নকল পিস্তলের বারুদ লাগানো ক্যাপ অনুরূপভাবে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে ব্যর্থ হওয়ার আশংকা থাকে। এ জাতীয় ক্ষেত্রে কৃত্রিম উপায়ে ধ্বনি উৎপাদন করাই যুক্তিযুক্ত।

ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রপাত, রাত্রির নিস্তব্ধতা, সমুদ্রের অবিশ্রান্ত গর্জন প্রভৃতির সাহায্যে পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্যও যে শব্দমালার প্রয়োজন, তা একমাত্র কৃত্রিম উপায়েই তৈরী করা সম্ভব।

এখানে উল্লেখ রাখা যেতে পারে যে, বন্দক ফুটিয়ে বন্দুকের আওয়াজ করা, বা বিউগল বাজিয়েই বিউগ্‌ল-ধ্বনি শোনানোর মতো অকৃত্রিম শব্দও যদি নেপথ্য হতে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, তবে সেগুলিও কৃত্রিম-শব্দের সংকেতলিপিতে নথিবদ্ধ হবে। রঙ্গপীঠে অভিনয়-রত শিল্পী যদি নিজেই আসল বন্দুক চালায় বা বিউগ্‌ল বাজায়, তবে তা ধ্বনি-সম্পাতের তালিকাভুক্ত হবে না।

তাৎক্ষণিক ধ্বনি ও বাণী-বদ্ধ ধ্বনি

মঞ্চে কৃত্রিম শব্দ সৃষ্টির দুটি সাধারণ প্রণালী আছে। অভিনয় চলাকালীন যদি কৃত্রিম শব্দ কায়িক বা যান্ত্রিক কৌশলে সৃষ্টি করা হয়, তবে তাকে **যুগপৎ** অথবা **তাৎক্ষণিক ধ্বনি** বা 'লাইফ সাউণ্ড' বলে। যদি পূর্ব হতেই তা 'ডিস্ক' বা 'টেপে' ধরে রেখে, অভিনয়ের সময় সেই ডিস্ক বা টেপ বাজিয়ে ধ্বনি উৎপন্ন করা হয়, তবে সেই জাতীয় ধ্বনিকে **বাণীবদ্ধ ধ্বনি** বা 'রেকর্ড' বলা হয়। বাণীবদ্ধ ধ্বনি আবার দুই শ্রেণীর হতে পারে। ঝড়, বৃষ্টি, ট্রেনের শব্দ, ছেলের কান্না, রকমারী ঘণ্টা, কলকব্জার আওয়াজ, জনতার চিৎকার প্রভৃতি কয়েকটি বহুল ব্যবহৃত শব্দের তৈরী রেকর্ড পাওয়া

যায় বাজারে। এগুলি দক্ষহাতে নিয়ন্ত্রিত করে ধ্বনিবিবর্দ্ধকের সাহায্যে প্রক্ষেপণ করলে ফল খুব খারাপ হয় না। এগুলিকে **মজুদ** (ষ্টক) শ্রেণীতে ফেলা যায়। বিশেষ নাটকের প্রয়োজনেই যে ধ্বনি বাণীবদ্ধ করা হয়, তাকে বলা যেতে পারে **প্রায়োজনিক** বা 'মেড-টু-অর্ডার' শ্রেণীর বাণীবদ্ধ ধ্বনি।

তাৎক্ষণিক ও বাণীবদ্ধ উভয়বিধ ধ্বনির নিজস্ব সুবিধা এবং অসুবিধার দিক আছে। প্রয়োজনের সুবিধা, সুযোগ এবং সামর্থের উপরে নির্ভর করে, পন্থা দুটির কোনও একটিকে বেছে নেওয়া হয়। নীচের তালিকায় গুণাগুণের দিক থেকে বিচার করে উভয়বিধ ধ্বনির একটি তুলনামূলক চিত্র দেওয়া হলো :—

তাৎক্ষণিক ধ্বনি	বাণীবদ্ধ ধ্বনি
(ক) সর্বতোভাবে স্বাভাবিক মনে হয়।	(ক) যান্ত্রিক এবং কৃত্রিম বলে বোধ হয়।
(খ) প্রয়োজনের মুহূর্তে সর্বাঙ্গীন নির্ভুল ও সুন্দর ভাবে সৃষ্টি করা সম্ভব নাও হতে পারে।	(খ) প্রয়োজনের মুহূর্তেই বাজানো সম্ভব এবং মানের পরিবর্তন হয় না।
(গ) প্রতি অভিনয় আসরেই সমস্ত সহযোগী শিল্পীর সাহায্য দরকার।	(গ) একবার বাণীবদ্ধকরণের পর, একজন যন্ত্রবিদই ধ্বনি-প্রক্ষেপণের জন্য যথেষ্ট।
(ঘ) ব্যয়বহুল।	(ঘ) পরিমিত ব্যয়।

উপরোক্ত তুলনামূলক চিত্রে দেখা যাবে 'তাৎক্ষণিক ধ্বনি'র চেয়ে 'বাণীবদ্ধ ধ্বনি' ব্যবহারের ক্ষেত্রে সুবিধার সংখ্যা বেশী। কিন্তু গোড়াতেই বলা হয়েছে, পন্থা দুটির মধ্যে একটিকে বেছে নেওয়া একাধিক বিষয়ের উপরে নির্ভরশীল। প্রথম দেখতে হবে সুযোগের কথা। বাণীবদ্ধ করার যান্ত্রিক ব্যবস্থা সবার আয়ত্বের মধ্যে থাকে না। সেক্ষেত্রে সামর্থ থাকলেও, প্রযোজককে 'তাৎক্ষণিক ধ্বনির' উপরেই নির্ভর করতে হয়। অপরপক্ষে আর্থিক অসামর্থ্যের হেতু কৃত্রিম ধ্বনি সৃষ্টি করার উপযোগী আনুষঙ্গিক

তথা শিল্পী সংগ্রহ করার সামর্থ হয় না অনেকের। তাদের পক্ষে 'মজুদ' বাণীবদ্ধধ্বনি ব্যবহার করাই সুবিধাজনক।

তবে উৎসাহী মঞ্চশিল্পীর কাছে **মজুদ ধ্বনি ভাণ্ডার** প্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি কয়েকটি কারণে। প্রথম কারণ হিসাবে বলা যেতে পারে, শব্দ-গুলির স্বল্পকালস্থায়ীত্ব। সাধারণতঃ একটি রেকর্ডের এক পিঠের সওয়া তিন মিনিট সময়কে তিন-চারটি বিভিন্ন শব্দের জন্য ভাগ করে দেওয়া থাকে। ফলে, শব্দ-প্রক্ষেপণকারীকে বার বার বার শব্দ প্রক্ষেপণ থামিয়ে, গ্রামোফোনের সাউণ্ড বক্স ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয় শব্দ-রেখার শুরুতে। দ্বিতীয়তঃ, রেকর্ডগুলি সামান্য পুরাতন হলেই, শব্দের সঙ্গে একটি বিরক্তিকর অবাঞ্ছিত ঘর্ষণের আওয়াজ বেরুতে থাকে, যা প্রয়োজনীয় শব্দের সূক্ষ্ম কাজ নষ্ট করে ফেলে। তৃতীয় কারণ, মজুদ ধ্বনি-ভাণ্ডারের দৈন্য। রকমারী নাটকের প্রয়োজনে যে অগণিত রকমের কৃত্রিম শব্দের প্রয়োজন দেখা দেয়, তার খুব কম অংশই পাওয়া যাবে এই ভাণ্ডার থেকে।

সবচেয়ে বড় কারণ হলো অবশ্য মঞ্চশিল্পীর মানসিক পরিতৃপ্তি। ভাড়া করা পোষাক বা দৃশ্যপটের সাহায্য না নিয়ে, নিজেদের তৈরী (তা যেমনই হোক) পোষাক বা দৃশ্যপট ব্যবহার করায় যে আনন্দ, বাঁধা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করার তুলনায়, পাড়ায় নিজেদের হাতে বাঁশ পুঁতে মাঁচা বেঁধে অভিনয় করার মধ্যে আত্ম তৃপ্তির যে চরিতার্থতা—মজুত শব্দ ভাণ্ডারের সহজলভ্য পন্থা এড়িয়ে যাওয়ার মধ্যে উৎসাহী শিল্পী সেই জাতীয় পরিতৃপ্তি খুঁজে পান।

বিবিধ কৃত্রিম শব্দসৃষ্টির কৌশল

কৃত্রিম শব্দ উৎপাদন সর্বাঙ্গীনভাবে একটি প্রয়োগমূলক বিদ্যা। প্রয়োজনের বিভিন্নতার যেমন অন্ত নেই, কৌশলেরও তেমনি নেই কোনো বাঁধা ধরা নিয়ম। এখানে কয়েকটি সচরাচর প্রয়োজনীয় কৃত্রিম শব্দের বহু প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতির বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।

নাটকে সর্বাধিক ব্যবহৃত কৌশল বোধ হয় **ঝড়-এর ব্যবহার।** সাধারণতঃ দু'রকমের ঝড় ওঠে নাটকে—এক রকমের ঝড় প্রাকৃতিক, অন্যটি মানসিক। দৃশ্যগত পার্থক্য এদের মধ্যে থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু শব্দগত দিক থেকে এদের রূপ অভিন্ন।

মঞ্চে কৃত্রিম ঝড়ের শব্দ সৃষ্টি করার যন্ত্রটি হলো একটি ঘোরানোর ব্যবস্থাযুক্ত কাঠের ড্রাম। এই ড্রামের সমবর্তুল দিকটিতে থাকে সারি সারি কাঠের রেলিং। ড্রামের সমান প্রস্থ বিশিষ্ট একটি উপযুক্ত দৈর্ঘ্যের ত্রিপল আড়াআড়ি ভাবে ড্রামটির উপরে ফেলে রেখে ড্রাম ঘোরালে,
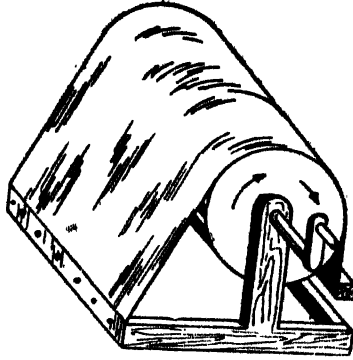
[চিত্র ৫৬.১] কৃত্রিম উপায়ে ঝড়ের শব্দ তৈরীর করার কল

কাঠের রেলিং ও ত্রিপলের ঘর্ষণের ফলে ঝড়ের অনুরূপ শব্দ হয়। ত্রিপলটির একদিক যন্ত্রের ভূমির সঙ্গে শক্ত ভাবে আটকে, অন্য দিকে একটি কাঠের বাটাম লাগিয়ে দিলে, [চিত্র ৫৬.১] কাজের সুবিধা হবে। কাঠের চাপের তারতম্য ঘটিয়ে, ঘোরানোর সময় শব্দের গভীরতায় পার্থক্য সৃষ্টি করা চলে।

ঝড়ের সঙ্গে অথবা পৃথক ভাবে **বৃষ্টির শব্দ** ব্যবহৃত হতে পারে। বৃষ্টির জল সাধারণতঃ টিনের চালা অথবা অনুরূপ কোনও শব্দ উৎপাদনকারী জমিতে আঘাত করলেই বৃষ্টি ধারা শ্রুতিগোচর হয়। কৃত্রিম বৃষ্টির শব্দ সৃষ্টির সময়ও ঐ কথাটি মনে রাখা হয়েছে।

এক্ষেত্রেও ঝড়ের শব্দ সৃষ্টির যন্ত্রের মতো একটি ঘোরানো ড্রামের সাহায্য নেওয়া হয়। তবে ড্রামের দেওয়াল থাকে ঢেউ খেলানো টিন বা এজবেষ্টাসের, অথবা পাখীলাগানো সার্সির মতো পাতলা কাঠের স্তর দিয়ে তৈরী করা। এই ড্রামের মধ্যে তেঁতুলের বীজ, কাঁকর বা ঐ জাতীয় কিছু রেখে ড্রামটি ঘোরালে, বৃষ্টি পড়ার মতো শব্দ ওঠে।
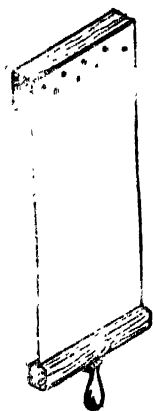
[চিত্র ৫৬.২]
কৃত্রিম বজ্রপাতের শব্দউৎপাদন ব্যবস্থা

শুধু বিদ্যুতের আনুষঙ্গিক শব্দ হিসাবেই নয়, অনেক ক্ষেত্রে চরম নাটকীয় মুহূর্ত্ত সৃষ্টির জন্যও **বজ্রপাতের শব্দ** কাজে লাগানো হয়। অন্যূন তিন ফুট লম্বা এবং আড়াই ফুট চওড়া একটি পাতলা লোহা, বা মোটা টিনের পাত [অভাবে, তিন-পিস প্লাই-উড] লম্বালম্বিভাবে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। পাতটির উপর নীচু দুই মাথায় কাঠের বাটাম লাগিয়ে, নীচের বাটামে একটি কাঠের হাতল লাগিয়ে দিলে [চিত্র ৫৬.২] কাজের সুবিধা হয়। প্রয়োজনীয় মুহূর্ত্তে ঐ হাতল ধরে ঝুলন্ত পাতটিকে কাঁপালেই বজ্রপাতের অনুরূপ প্রচণ্ড অনুরণন-যুক্ত শব্দ উঠবে। এখানে লক্ষ্য রাখার মতো কথা, এই ব্যবস্থাটি মঞ্চের যেখানে টাঙানো থাকবে, সেই স্থানটি যেন সাধারণ চলাচলের পথ না হয়। অন্ধকারে চলাচলের সময় এই জাতীয় ঝুলন্ত পাত প্রচণ্ড দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। খুব ভালো হয়, যদি মঞ্চের দেয়ালের কাছে উপরের ঝুলবারান্দার নীচের কড়িতে এই ব্যবস্থাটিকে আটকে রাখা হয়।

ঐতিহাসিক নাটকের ক্ষেত্রেই শুধু **বন্দুক** বা **কামানের শব্দ** সীমাবদ্ধ নয়—**পিস্তল** বা **বিস্ফোরণের শব্দ** আকারে সামাজিক নাটকেও এই জাতীয় আগ্নেয়াস্ত্রের শব্দ স্থান পেয়ে থাকে। যাঁদের সামর্থ ও সুবিধা আছে, তাঁরা সত্যকার বন্দুকে ফাঁকা আওয়াজের কার্ত্তুজ ব্যবহার করতে পারেন। মঞ্চে একটি পয়েণ্ট টু-টু (.২২) ক্যালিবারের বন্দুক থেকেও যথেষ্ট জোর শব্দ পাওয়া যায়। ফাঁকা ড্রামের মধ্যে এই জাতীয় ফাঁকা আওয়াজ বা বন্দুকের শব্দে, ধ্বনির গাম্ভীর্য্য আরও বেড়ে যাবে।

সত্যকার বন্দুক কিন্তু সহজলভ্য নয়। বিকল্প ব্যবস্থা তাই জেনে রাখা ভালো। দেশলাই কাঠির বারুদের অংশ ভেঙে ফাঁপা চাবির ফোকরে ঢুকিয়ে, তারপর সেটিকে পেরেকের আঘাতে জ্বালিয়ে চাবি-কামান ফোটানোর খেলা ছোট ছোট ছেলেরাও জানে। এরই একটি উন্নততর পর্য্যায়, গন্ধক ও মোমছাল ব্যবহার করা। একটি এক বা দেড় ফুট লম্বা লোহার কড়িতে (রেল লাইনের টুকরো হলে আরো ভালো) সারবন্দী কয়েকটি বিভিন্ন ব্যাসের ছিদ্র করে রাখতে হবে [চিত্র ৫৬.৩]। ছিদ্র-

গুলিতে উল্লিখিত বারুদ ভর্তি করে, লৌহশলাকা ঢুকিয়ে আঘাত করার ব্যবস্থা করা হয়। বিভিন্ন ব্যাসের ছিদ্রে বারুদের পরিমাণের পার্থক্যে, আওয়াজের তারতম্য ঘটে। আর, সারবন্দী ছিদ্রের ব্যবহারে, হঠাৎ প্রথমবারের চেষ্টায় ব্যর্থ হলে, পর-মুহূর্তেই দ্বিতীয় বা তৃতীয় ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া সহজ হয়।
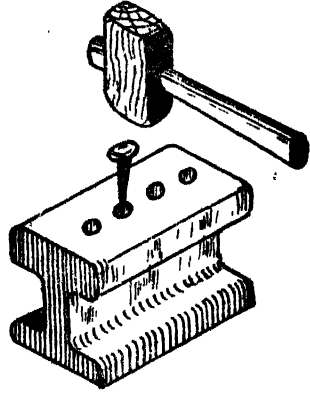
[চিত্র ৫৬.৩] আগ্নেয়াস্ত্রের অনুরূপ কৃত্রিম শব্দসৃষ্টির সরঞ্জাম

ফিউজে আগুণ ধরিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যেও বিস্ফোরণের আওয়াজ সৃষ্টি করা যায়। একটি অল্প এ্যাম্পিয়ারের ফিউজ তার গান্-পাউডারের মধ্যে এমনভাবে ডুবিয়ে রাখতে হবে, যেন তারের দুইপ্রান্ত পর্য্যাপ্ত পরিমাণে দুপাশে বেরিয়ে থাকে। বেরিয়ে থাকা অংশ দুটি বাদ দিয়ে, বাকী বারুদ সমেত তারটির চারদিকে শক্ত প্যাঁচে সুতলী দড়ি জড়াতে হবে বেশ কয়েকবার। উপযুক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা রেখে ফিউজ তারটিতে তড়িৎপ্রবাহ সঞ্চালিত করলেই বিস্ফোরণ ঘটবে। এই জাতীয় **ফিউজ-বোমা** যে তড়িৎচক্রের মারফত কার্য্যকরী করা হবে, সেই চক্রে যেন অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী ফিউজ লাগানো থাকে।

কামান বা বিস্ফোরণের শব্দে, প্রথম আওয়াজের পর দীর্ঘস্থায়ী অনুরণন যুক্ত হয়ে থাকে। বড় 'ড্রামে'র গায় আঘাত দিয়ে এই অনুরণন সৃষ্টি করা সম্ভব। একাধিক বারুদের আওয়াজ এবং দীর্ঘস্থায়ী অনুরণনের মিশ্রণে, সার্থক **তোপধ্বনি** বা **বিস্ফোরণের** শব্দ শোনানো যাবে।

কাচের সার্সি ভেঙে যাওয়া, বা বাসনপত্র পড়ে যাওয়ার **ঝনাৎকার** জাতীয় শব্দ সৃষ্টি করা হয় বাক্সবন্দী ভাঙা কাচের টুকরোর সাহায্যে। প্রয়োজন-বিশেষে, ভাঙা কাচ ভর্তি বাক্সটি কিছুটা উঁচু থেকে নীচে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। বাক্সটি যেন অনুরূপ ব্যবহারের উপযুক্ত মজবুত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। যে কোনো কাচের দোকানে সামান্য দামে

প্রচুর ভাঙা কাচ সংগ্রহ করা যাবে। ভাঙা বাসনপত্রও ভিন্ন ধরণের 'ঝনাৎকার' শোনানোর জন্য ব্যবহৃত হতে পারে।

ভেনিসিয়ান গ্রীলের অনুকরণে পাতলা কাঠের গ্রীল আচমকা বন্ধ করলেও এক ধরণের **ভাঙচুরের** আওয়াজ পাওয়া যায়। এছাড়া, ঈষৎ ফাঁক করে রাখা একটি চেরা তক্তার মাঝে পটকা রেখে আওয়াজ করার কায়দা সার্কাসের ক্লাউনদের একটি সুপরিচিত খেলা-বিশেষ। এই জাতীয় শব্দ করার উপকরণটি **স্ল্যাপ-স্টিক্** নামে পরিচিত।*

[চিত্র ৫৬.৪] কৃত্রিম অশ্বখুরধ্বনি সৃষ্টি করার জন্য ব্যবহৃত নারকেলের মালা

নারকেলের দুটি আধখানা মালা দিয়ে [চিত্র ৫৬.৪] হাতের কায়দায় **অশ্বখুরধ্বনির** অনুরূপ কৃত্রিম শব্দ সৃষ্টি করা খুবই সোজা। সামান্য অভ্যাসেই ঘোড়ার বিভিন্ন রকম চলনের শব্দ উৎপাদন করা যায়। কাঠের পাটাতন, সিমেণ্টের মেঝে বা মেশনাইট বোর্ডের ব্যবহারে শব্দের চরিত্রগত পার্থক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়।

পুলিশ বা সৈন্যবাহিনীর **কুচকাওয়াজের শব্দ** বা ধাবমান জনতার **পদধ্বনি সৃষ্টি** করার জন্য সুন্দর একটি ব্যবস্থা আছে। অনেকগুলি তিন-চার ইঞ্চি লম্বা কাঠের টুকরোর একপ্রান্তে ছিদ্র করে, সেগুলিকে কয়েকটি তারে গেঁথে নিতে হবে। তারপর একটি চৌকো কাঠের ফ্রেমের মাঝে সেই তারে গাঁথা কাঠের টুকরোর মালাগুলি [চিত্র ৫৬.৫] বেঁধে দিতে হবে সমান্তরভাবে। লক্ষ্য রাখা দরকার, বিভিন্ন সারিতে কাঠের টুকরার পরিমাণ যেন অসমান হয়। ফ্রেমটিকে দুদিক থেকে ধরে, কাঠের টুকরাগুলি সিমেণ্টের মেঝেয় বা কাঠের পাটাতনের উপরে তালে তালে ঠুকলেই কুচকাওয়াজের আওয়াজ উঠবে। বেতালে এই আওয়াজই হয়ে উঠবে ধাবমান জনতার পদধ্বনি।

* জোর করে হাসানো বা ভাঁড়ামী-যুক্ত কৌতুক অভিনয়কে 'স্ল্যাপ-স্টিক কমেডি' নামে অভিহিত করার পিছনে, এই শ্রেণীর পটকাযুক্ত তক্তা ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে।

দৃশ্যপটে উপস্থিত এমন কোনও দরজা বা জানালার পাল্লা বন্ধ করার শব্দ শোনাতে হলে, ঐ দরজা বা জানালাকে মজবুত এবং মঞ্চের অবশিষ্ট অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্থাপনা করা দরকার। নচেৎ মঞ্চের বাকী হাল্কা দৃশ্যপটগুলি নড়ে উঠবে। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই শব্দ সৃষ্টি
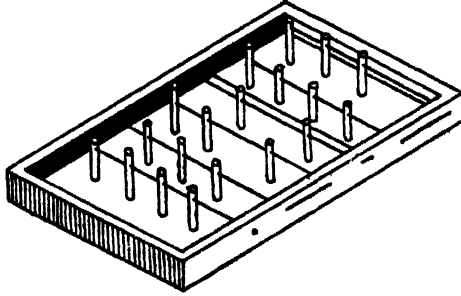
[চিত্র ৫৬.৫] পদধ্বনি শোনানোর কৃত্রিম ব্যবস্থা

করা হয় নেপথ্যের কোনও দরজা থেকে। একটি ভারী বাক্সের ডালা বন্ধ করেও এই শব্দ তৈরী করা যায়। সম্ভবপর হলে ঐ বাক্সের ডালায় চাবি (ল্যাচ্) লাগিয়ে রাখা যেতে পারে ; দরজা বন্ধ করার শব্দ আরও বাস্তবানুগ হয়ে উঠবে। অবশ্য, মঞ্চে হাতের কাছাকাছি কোনও দরজা থাকলে, সেটি ব্যবহার করাই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা।

দরজা বন্ধ করার মতো, দরজা খোলার সময় অবশ্য কোনও আচমকা শব্দ হওয়ার কথা নয়। তবে মরচে-পড়া কব্জা লাগানো পুরাতন দরজা আস্তে আস্তে খুললে, এক ধরণের **ক্যাঁচ কোঁচ** শব্দ হয়, যেটিকে আতঙ্ক সৃষ্টির কাজে লাগানো যেতে পারে।

ধ্বনিবিবর্দ্ধকের সাহায্য নিতে হবে এর জন্য। ধ্বনি গ্রাহকের সামনে বোতলের মুখে ভিজে কর্কের ছিপি এঁটে বন্ধ করতে গেলে, প্রয়োজনীয় শব্দ পাওয়া যায়। সেলোফেন কাগজ নিয়ে ধ্বনিগ্রাহকের সামনে আস্তে আস্তে মচকালেও অনুরূপ শব্দ সৃষ্টি করা যাবে। পাতলা তিন পিস্ বোর্ড ছোট ছোট কাঁটার সাহায্যে আর একটি অপেক্ষাকৃত শক্ত ফ্রেমে আটকে রেখে প্রয়োজনীয় মুহূর্তে সেটিকে টেনে ছাড়াতে গেলেও অনুরূপ শব্দ ওঠে। পূর্বাহ্নে পরীক্ষা করে ফলাফল যাচাই করে রাখা উচিত।

কাঁসর ঘণ্টা ছাড়াও, আধুনিক নাটকে বহুবিধ **ঘণ্টাধ্বনির** দরকার পড়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দরজার কলিং বেল, টেলিফোনের ঘণ্টা, দেয়াল ঘড়ীর বাজনা ইত্যাদি। ৬-ভোল্টের ব্যাটারী চালিত **বেল** ও **বাজার্** এ বিষয়ে খুব প্রয়োজনীয়। রকমারী বেল্ ও বাজারের একটি বোর্ড শব্দ প্রক্ষেপণকারীর হাতের কাছে প্রস্তুত রাখা খুবই দরকারী। ছোটদের খেলনা পিয়ানোর সাহায্যে ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি খুব বাস্তবানুগভাবেই সৃষ্টি করা যায়। বড় ঘড়ির **চাইম্** বাজনা শোনানোর উপযোগী দম-দেওয়া চাইম-বাজনা কিনতে পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, ধ্বনিবিবর্দ্ধকের সাহায্যে এই জাতীয় শব্দের তীব্রতা বাড়িয়ে নিতে হবে।

নানা জাতীয় **পশুপাখীর ডাক** শোনাতে হলে হরবোলার সাহায্য নেওয়া যেতে পারে। অনেকেই দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে বিভিন্ন রকমের আওয়াজ করতে পারেন মুখে। কুকুর, বিড়াল, গরু বা ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশু, বাঘ বা শেয়াল প্রভৃতি বন্যজন্তু, কাক, কোকিল, মোরগ প্রভৃতি পাখীর ডাক, ঘটনার পরিবেশ বোঝানোর জন্য প্রায়ই কাজে লাগে। বিভিন্ন ধরণের কিছু স্বর বাণীবদ্ধ করে মজুদ রাখলে নানারকম প্রয়োজনে ব্যবহৃত হতে পারে।

উৎসাহী নাট্যগোষ্ঠীর যন্ত্রীরা ব্যবহৃত ধ্বনিগুলিকে তালিকাভুক্ত ভাবে সঞ্চয় করার ভিতর দিয়ে, সুন্দর একটি নিজস্ব 'ধ্বনাগার' (সাউণ্ড-লাইব্রেরী) গড়ে তুলতে পারেন। প্রয়োজনের সময় এই ধরণের সংগ্রহ বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে।

ছয় সংকেত লিখন

শব্দ যোজনার তালিকা

নাটক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেমন আসবাব পত্র, দরকারী জিনিষপত্র, পোষাক পরিচ্ছদের তালিকা তৈরী করা হয়, তেমনি আলোকসম্পাত ও দৃশ্য পরিবর্তনের নির্দেশনামার সঙ্গে **নেপথ্য শব্দ যোজনা**রও তালিকা প্রস্তুত করা অত্যন্ত আবশ্যকীয়। নাটকের গোড়ায় যেখানে চরিত্রলিপি দেওয়া থাকে [কয়েক-জন আধুনিক নাট্যকার আসবাবপত্র ও দরকারী জিনিষেরও তালিকা দিচ্ছেন], সেখানে প্রয়োজনীয় বাকী তালিকাগুলিও মুদ্রিত হলে, প্রযোজকের পক্ষে অনেকখানি সুবিধা হতো।

আপাততঃ এখানে শব্দযোজনার তালিকা তৈরী করার কথা আলোচনা করা যাক। তিনটি সূত্র থেকে এই তালিকা তৈরী করা সম্ভব। সেই সূত্রগুলি হচ্ছে :—

(ক) নাট্যকারের দেওয়া নির্দেশ,
(খ) পরিবেশের বর্ণনা, এবং
(গ) পরিচালক বা মঞ্চশিল্পীর নিজস্ব পরিকল্পনাশক্তি।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যেতে পারে, নাটকেই হয়তো লেখা আছে 'নেপথ্যে কোলাহল', 'অদূরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল', 'মন্দিরে সন্ধ্যারতির কাঁসর ঘণ্টা বাজছে', 'টেলিফোন বা দরজায় কলিং বেল্ বেজে উঠলো'—এই জাতীয় বহু ধরণের নির্দেশ নাট্যকারই তাঁর নাটকে উল্লেখ করে থাকেন। এগুলি তালিকায় টুকে নেওয়া খুবই সহজ ব্যাপার।

অনেকক্ষেত্রে নাট্যকারের দেওয়া পরিবেশের বর্ণনা থাকে শুধু। 'গঙ্গার তীর', 'কয়লা খাদের হাজিরাবাবুর দপ্তর', 'শ্মশানে শবযাত্রীদের বিশ্রামের জায়গা', 'দপ্তরে বড়বাবুর টেবিল'—অগণিত উদাহরণ দেওয়া যেতে

পারে এই ধরণের, যার প্রতিটি ক্ষেত্রে আনুষঙ্গিক কিছু বিশেষ পরিচিত শব্দ থাকা বাঞ্ছনীয়। গঙ্গার তীরে 'ষ্টীমারের ভেঁপু', কয়লার খাদে 'লিফটের শব্দ', শহরের শ্মশান হলে মাঝে মাঝে 'হরিধ্বনি' আর গ্রাম্য শ্মশানে 'শেয়ালের ডাক', দপ্তরে আশপাশ থেকে 'টাইপ মেসিনের আওয়াজ' প্রভৃতি এই শ্রেণীর পরিবেশ বোঝানোর শব্দ বলে গণ্য হয়।

উপরের দুই শ্রেণীর দৃষ্টান্ত ছাড়া, অন্য আর এক শ্রেণীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, যা এগুলির থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রীতির। নাটক পাঠ করার সময়, সাধারণ পাঠকের মনে, ঐ ধরণের স্থানে শব্দযোজনার প্রয়োজন অনুভূত হবে না। 'আতঙ্ক', 'নিঃসঙ্গতা', 'নিস্তব্ধতা', 'ক্রোধে ফেটে পড়ার মতো অবস্থা' প্রভৃতি মানসিক বা নৈসর্গিক বহু ভাবকেই উপযুক্ত ধ্বনির সাহায্যে সুপরিস্ফুট করা সম্ভব। এরজন্য পরিচালক বা মঞ্চশিল্পীর প্রখর কল্পনা শক্তি থাকা দরকার।

প্রাথমিক সংকেতলিপি

শব্দযোজনার তালিকা প্রস্তুত হলে, সেগুলি কিভাবে তৈরী করা হবে বিচার করার জন্য, আমাদের একটি **প্রাথমিক সংকেতলিপি** প্রস্তুত করতে হবে। চারটি স্তম্ভ রাখা যেতে পারে এই প্রাথমিক লিপিতে। তার প্রথম দুটিতে যথাক্রমে **ক্রমসংখ্যা** ও **শব্দসূচী** থাকবে। তৃতীয় স্তম্ভে দিতে হবে **ঘটনার স্থায়ীত্ব**। এই স্তম্ভে প্রয়োজনীয় ধ্বনি কতক্ষণ সময় নিতে পারে, ষ্টপওয়াচ দেখে 'সেকেণ্ডে' তার পরিমাণ জানাতে হবে। নাটকের মহলা অনুসরণ করে, অথবা, কথোপকথনের গতি-বিরতি ইত্যাদির সঙ্গে সম্যক পরিচয় থাকলে, নাটক পাঠ করেও এই 'সময়' নির্দ্ধারণ করা কষ্টকর নয়।

চতুর্থ এবং শেষতম স্তম্ভে থাকবে **পরিচালকের মন্তব্য**। এই মন্তব্যের মধ্যে অনেকগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রথমতঃ, মঞ্চে কোন্ প্রণালীতে শব্দ উৎপাদন করা হবে, বিচার করা দরকার। উত্তর দাঁড়াবে, হয় **তাৎক্ষণিক** ; নয়তো **বাণীবদ্ধ**। উত্তর যদি 'তাৎক্ষণিক' হয়, তবে কার বা কাদের হাতে দায়িত্ব থাকবে এবং কি কি সরঞ্জাম লাগবে, তার তালিকা দিতে হবে। যদি 'বাণীবদ্ধ' শব্দ ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তবে তা **মজুদ** ভাণ্ডার থেকে সংগ্রহ করে ব্যবহার করা হবে, না **প্রায়োজনিক** ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হবে, তার উল্লেখ চাই। এরপর **গাম্ভীর্য্যের মাত্রা** সম্পর্কে মন্তব্য রাখতে হবে। কোনও কোনও ধ্বনি

মৃদু থেকে ক্রমশঃ গম্ভীর স্বরে পরিবেশিত হয়; কোনও ধ্বনি শুরুতেই চরম উচ্চগ্রামে পেশ করা দরকার। বাণীবদ্ধ করণের পূর্বেই এ বিষয়ে আভাষ দেওয়া থাকলে কাজের সুবিধা হয়। এরপর শেষের মন্তব্যে, যদি একাধিক টেপরেকর্ডার একসঙ্গে ব্যবহার করার দরকার থাকে, তবে জানিয়ে রাখতে হবে, কত সংখ্যক যন্ত্রে কোন্ শব্দ গৃহিত হবে। [একাধিক যন্ত্র একসঙ্গে ব্যবহারের কারণ পরে দেওয়া হয়েছে।]

ধ্বনিপ্রক্ষেপণ সংকেত

প্রাথমিক সংকেতলিপি প্রস্তুত করার পরেই করা হয় বাণীবদ্ধকরণের কাজ। পৃথক পরিচ্ছেদে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। বাণীবদ্ধকরণের সঙ্গে সঙ্গেই ধ্বনিপ্রক্ষেপণের **মূল সংকেতলিপি** প্রস্তুত হয়ে যাবে। নিয়মিতভাবে যাঁদের নাট্য পরিবেশন করতে হয়, তাঁরা যদি আদর্শ অনুযায়ী [চিত্র ৫৭] ছাপানো তালিকা তৈরী করে রাখেন, কাজের অনেক সুবিধা হতে পারে। অপেশাদার সংস্থা হাতে লিখে, অথবা টাইপ করে এই তালিকা তৈরী করে নিতে পারেন।

বাণীবদ্ধকরণের বিভিন্ন মাধ্যমের মধ্যে **টেপ রেকর্ডারই** সমধিক প্রচলিত। অপরপক্ষে, মজুদ ধ্বনিভাণ্ডার **ডিস্ক** রেকর্ডেই সহজলভ্য। আলোচ্য সংকেতলিপিটি তাই ঐ দুইটি মাধ্যম ব্যবহার করার উপযোগী করে তৈরী করা হয়েছে। যাঁদের বাণীবদ্ধকরণের কাজ হবে না, বা মজুদ ধ্বনি ব্যবহারেরও প্রয়োজন নেই, তাঁরা প্রয়োজনবোধে তালিকার 'যান্ত্রিক নির্দেশাবলী'র স্তম্ভটি অংশতঃ বা পূর্ণভাবেই বাদ দিতে পারেন। অনুরূপভাবে, কেউ যদি আলোচিত মাধ্যম দুটি ছাড়া, অন্য কোনও মাধ্যমে বাণীবদ্ধ শব্দ ব্যবহার করেন, তাঁরা ঐ স্তম্ভেই, প্রয়োজনীয় রদবদলের পর, নির্দেশাবলী বসিয়ে নিবেন।

এবার তালিকাটি ভরে তোলার পদ্ধতি আলোচনা করা যাক। **ক্রমসংখ্যা** শীর্ষক প্রথম স্তম্ভে থাকবে প্রতিটি শব্দ পরিবেশনের ক্রমিক সংখ্যা। যদি একটি শব্দের সঙ্গে অন্য শব্দের ঘটনাগত দিক থেকে যোগ থাকে, অথবা যদি উভয় শব্দের মাঝে সামান্য সময়ের বিরতি ছাড়া, কোনও ঘটনা বা কথোপকথনের সংকেত না থাকে, তবে ঐ জাতীয় শব্দ-গুলির ক্রমসংখ্যা একই সংখ্যার উপসংখ্যায় [যেমন ১ক, ১খ, ১গ ইত্যাদি] নির্দেশিত হবে। এর ফলে শব্দ প্রক্ষেপণকারী যন্ত্রচালনার সময় বিষয়টির প্রতি সচেতন থাকতে পারবেন।

দ্বিতীয় স্তম্ভে লেখা থাকবে **বাক্য সংকেত** অথবা **ঘটনা সংকেত**। নির্দিষ্ট কোন বাক্যের কোন শব্দের পর, অথবা মঞ্চের উপরে কোন অভিনেতার কি কাজের পরমুহূর্তে ধ্বনি প্রক্ষেপণ শুরু হবে, তা তুলে দিতে হবে মূল নাটক থেকে।

প্রয়োজনীয় ধ্বনির পরিচয়-শীর্ষক তৃতীয় স্তম্ভে দিতে হবে, কি শব্দ সৃষ্টি করা হচ্ছে, তার পরিচয়। 'বিমান আক্রমণের সংকেত', 'দমকলের ঘণ্টা' বা 'রেডিওর গান' এই জাতীয় সংক্ষিপ্ত পরিচয়লিপিই সংকেত-লিখনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত।

[চিত্র ৫৭] ধ্বনি প্রক্ষেপণের আদর্শ

চতুর্থ স্তম্ভে জানাতে হবে, কোন **শ্রেণীর** ধ্বনি উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যবহার করা হবে। অর্থাৎ, 'তাৎক্ষণিক' না 'বাণীবদ্ধ', 'টেপ' না 'ডিস্ক রেকর্ড', 'মজুদ' অথবা 'প্রায়োজনিক' ইত্যাদি।

পঞ্চম স্তম্ভে **যান্ত্রিক নির্দেশাবলী**র মধ্যে প্রথম দুটি উপস্তম্ভ টেপরেকর্ডার, আর শেষের দুটি ডিস্ক রেকর্ড ব্যবহারীদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যাঁরা টেপ রেকর্ডার ব্যবহার করবেন, তাঁরা প্রথম উপস্তম্ভে দিবেন টেপের গতিবেগ, [সেকেণ্ডে ১৫, ৭½, ৩¾ এবং ১⅞ ইঞ্চি, এই চার রকমের দ্রুতিতে সাধারণতঃ টেপে বাণীবদ্ধকরণের কাজ করা হয়], আর দ্বিতীয় স্তম্ভে টেপে নির্দিষ্ট ধ্বনির স্থান-নির্দেশ [যন্ত্রের সূচকে তিন সংখ্যার অংকে এই নির্দেশ পাওয়া যায়]। যাঁরা ডিস্ক রেকর্ড ব্যবহার করবেন, তাঁদের দুটি জানানোর বিষয়, ডিস্কের ঘূর্ণন বেগ [সাধারণতঃ মিনিটে ৭৮, ৪৫ ও ৩৩⅓ বার, এই তিনটি ঘূর্ণন বেগ পাওয়া যায়]

ও ঝরির ক্রম [তিন চারটি ঝরিতে ভিন্ন ভিন্ন শব্দ থাকে] পরপর দুটি স্তম্ভে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

পরের স্তম্ভে **ধ্বনির স্থায়ীত্ব**—প্রাথমিক তালিকা থেকে তুলে দেওয়া যেতে পারে। অবশ্য প্রাথমিক তালিকা প্রস্তুতের পর অনেক সময় মহলার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই 'সময়ের' হ্রাসবৃদ্ধি ঘটা সম্ভব। সাধারণতঃ বাণীবদ্ধ করার সময় প্রয়োজনীয় 'সময়ে'র চেয়ে কিছু দীর্ঘ স্থায়ী করেই ধ্বনি গৃহিত হয়। সুতরাং, সময়ের আলোচ্য হ্রাস বৃদ্ধিতে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

গাম্ভীর্য্যের মাত্রা-শীর্ষক পরবর্তী স্তম্ভে জানাতে হবে, কতখানি

সংকেতলিপির স্তম্ভশীর্ষকসমূহ

ভল্যুমে ধ্বনিটি ক্ষেপণ করা দরকার। ধ্বনিসহ মহলায় এই মাত্রা নির্দ্ধারণ করতে হবে। সাধারণতঃ কথোপকথনের সঙ্গে যে আবহধ্বনি থাকে, তা নিম্নগাম্ভীর্য্যে, আর একক নেপথ্য শব্দগুলি উচ্চতর গাম্ভীর্য্যে পরিবেশন করাই রীতি।

মন্তব্য শীর্ষক শেষের স্তম্ভে অনেকসময় বিশেষ কিছু নির্দেশ দেওয়ার থাকলে, জানিয়ে রাখতে হবে। হয়তো দ্বিতীয় যন্ত্রে পরবর্তী শব্দ পনরুৎপাদন শুরু হওয়ার পর, প্রথম যন্ত্রের শব্দ কমিয়ে নিতে হবে; হয়তো বা, কোনো বিশেষ ধ্বনি কথোপকথন চলার সময় মৃদু হয়ে, অন্য সময়ে উচ্চগাম্ভীর্য্যে প্রক্ষেপিত হবে; নয়তো, আলোচ্য ধ্বনি পুনরুৎপাদনের পরে পূর্বের কোনো ধ্বনি আবার প্রক্ষেপণ করা দরকার— সুতরাং টেপের পূর্ববর্তী স্থানে ফিরে যেতে হবে; এই জাতীয় বহু নির্দেশ মন্তব্যের স্তম্ভে লিখে রাখার প্রয়োজন পড়ে।

আলোচ্য স্তম্ভগুলি ছাড়া, নাটকের নাম, অঙ্ক, দৃশ্য পরিচিতি ও পৃষ্ঠাঙ্ক দিতে হয় সংকেত লিপির উপরে, এবং নীচে ভারপ্রাপ্ত যন্ত্রী ও নাট্য পরিচালকের স্বাক্ষর রাখা যেতে পারে।

কয়েকটি প্রণিধানযোগ্য বিষয়

সংকেতলিপি প্রণয়ন ও অনুসরণ সম্পর্কে বিশেষ কয়েকটি কথা জানা দরকার এবং স্মরণে রাখার মতো। সংকেতলিপিতে যেমন শব্দসূচী, ঘটনার ক্রম অনুসারে পর পর সাজানো হয়, বাণীবদ্ধকরণের সময়ও যেন সেই ক্রম বজায় থাকে। ক্রম ভেঙে, নিজেদের সুবিধামতো এলোমেলোভাবে বাণীবদ্ধ করলে, ধ্বনিপ্রক্ষেপণের সময় শব্দযন্ত্রীকে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সুযোগ-সুবিধার অভাবে, যখন যে ধ্বনি পাওয়া গেছে, সেই ক্রমে বাণীবদ্ধ-করণের ফলে এলোমেলো ভাবটি এড়ানো যদি একান্তই সম্ভবপর না হয়, তবে নতুন টেপে ক্রম অনুযায়ী **পূণর্মুদ্রণ** বা 'রি-রেকর্ডিং' করে নেওয়া উচিত।

একই ধরণের ধ্বনি বা আবহসঙ্গীত যদি নাটকের বিভিন্ন স্থানে বারবার দরকার হয়, তবে তালিকা অনুযায়ী সেই ধ্বনি বা আবহসঙ্গীত বারবারই বাণীবদ্ধ করে রাখা কাজের পক্ষে সুবিধাজনক। টেপের যন্ত্র উল্টোমুখে ঘুরিয়ে বারম্বার একটি জায়গায় ফিরে আসা যুক্তিসঙ্গত নয়। এর ফলে সময় অপচয় হয়, শব্দযন্ত্রীর পরিশ্রম বাড়ে; এ ছাড়া বার বার দ্রুতগতিতে এগোলে-পিছোলে সূচক-যন্ত্রের সংখ্যা সঠিক স্থান নির্দেশে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।

কয়েকটি বিশেষ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, একবার মাত্র বাণীবদ্ধ করা ধ্বনির স্থানে বারবার ফিরে আসা অপরিহার্য্য হয়ে ওঠে। (১) ব্যয় সংক্ষেপের জন্য যেখানে পর্য্যাপ্ত টেপ ব্যবহারের সুযোগ থাকে না, (২) বাণীবদ্ধকরণের কাজে যেখানে প্রচুর সময় দেওয়ার অবকাশ নেই, (৩) সংগ্রহিত টেপে যেখানে স্থান সংকুলান না হয়, অথবা (৪) বাণীবদ্ধ করণের কাজ শেষ হয়ে যাওয়ার পরে যদি পরিচালক কোনো ধ্বনি পুনর্বার ব্যবহার করার ইচ্ছা পোষণ করেন, এর প্রতিটি ক্ষেত্রেই **পুনরাবৃত্তি-র** প্রয়োজন হয়।

বাণীবদ্ধ-করণের সময় যদি অযুগ্ম ক্রমসংখ্যার শব্দগুলি প্রথম যন্ত্রে এবং যুগম-ক্রমসংখ্যারগুলি দ্বিতীয় যন্ত্রে গৃহিত হয়, তবে প্রক্ষেপণের সময় সর্বদাই

পরবর্তী ধ্বনি পূর্বাহ্নে প্রস্তুত করে রাখার কাজ সহজতর হয়ে ওঠে। একটি যন্ত্র নিয়ে (বিশেষ করে যেখানে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিভিন্ন ধ্বনি প্রক্ষেপণের নির্দেশ থাকে) কাজ করতে হলে, শব্দযন্ত্রীর যথেষ্ট ক্ষিপ্রতা থাকা দরকার। কিন্তু এমন বিশেষ ক্ষেত্র আছে, যেখানে একাধিক যন্ত্র একই সঙ্গে ব্যবহার করা অনিবার্য্য হয়ে পড়ে। নীচে অনুরূপ বিশেষ ক্ষেত্রের বিভিন্ন জাতীয় দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো :—

১। একটি শব্দ চলাকালীন, বিশেষ ঘটনা বা কথোপকথনের সঙ্কেতে যখন অন্য একটি শব্দ শুরু হয়; যেমন :—

(ক) ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দুই বন্ধু তৃতীয় কোনো একজনের প্রতীক্ষা করছে। কেউ হয়তো বললো, "সময় হয়ে গেল, এখনো আসছে না কেন?" এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

(খ) ট্রেন এগিয়ে আসছে তীব্রবেগে। একটি মেয়ে ছুটে যায় লাইনের উপর আত্মহত্যা করার জন্য। লাইনের উপরে ওঠা মাত্র ট্রেনের বাঁশী বেজে উঠলো তীক্ষ্ণ সুরে।

দৃষ্টান্ত দুটির প্রথমটিতে আছে কথোপকথন-সংকেত, দ্বিতীয়টিতে ঘটনা-সংকেত। উভয়ক্ষেত্রেই যদি একটিমাত্র টেপে উভয়বিধ শব্দই বাণীবদ্ধ করা হয়, তবে দ্বিতীয় শব্দটি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে নির্ভুল ভাবে বেজে ওঠার বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ থেকে যাবে। এক্ষেত্রে ঝড় এবং টেলিফোনের ঘণ্টা বা ট্রেনের শব্দ এবং বাঁশী পৃথক যন্ত্রে বাজানোই একমাত্র সমাধান।

২। দুটি শব্দ একসাথে চলার মধ্যে বিশেষ ঘটনা বা কথোপকথনের সংকেতে যখন তাদের একটি শব্দ থেমে যায়; যেমন :—

ঘরে রেডিওতে গান চলেছে, সেইসঙ্গে টেলিফোনে রিং হচ্ছে। কেউ ঢুকে রেডিও বন্ধ করে রিসিভার তুললো, অথবা শুধুই রিসিভার তুললো; উভয়ক্ষেত্রেই একটি শব্দ অন্যটির আগে, বিশেষ মুহূর্তে [এক্ষেত্রে রেডিওর চাবি বন্ধ করা, বা রিসিভার তুলে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে] বন্ধ হওয়ার কথা। এরকম স্থলেও একটিমাত্র যন্ত্রে সমস্ত দায়ীত্ব যদি থাকে, ঘটনাকে শব্দের অধীন হয়ে ঘটতে হবে—যা বেশীরভাগই ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

কয়েকটি বিশেষক্ষেত্রে, একাধিক ভিন্ন জাতীয় মাধ্যমে বাণীবদ্ধকরা ধ্বনি ব্যবহার করতে হয়। সাধারণতঃ, 'মজুদ সংগ্রহ' টেপে পুনর্মুদ্রিত না করে, সরাসরি বাজানোই এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পূর্ববর্তী দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে ঝড়ের শব্দ বা রেডিওর গান টেপে পুনর্মুদ্রিত না করে, গ্রামোফোনের সাহায্যে সরাসরি বাজানো চলে। অথবা যেখানে মজুদ শব্দের কিছুটা ডিস্কে, কিছু অংশ টেপে পাওয়া যায়, সেরকম স্থলেও [যদি পুনর্মুদ্রণের অসুবিধা থাকে] গ্রামোফোন ও টেপ রেকর্ডার উভয়বিধ যন্ত্রই শব্দপ্রক্ষেপণের কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে।

নেপথ্য ধ্বনিগুলি সুপরিকল্পিত প্রক্ষেপণের সাহায্যে স্বরমাত্রিক করে তুললে, বিষয়টি খুবই আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। এর জন্য ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা এমন ভাবে গড়ে তুলতে হবে, যেন প্রক্ষেপণের জন্য প্রেরিত ধ্বনি-তরঙ্গকে ইচ্ছামতো বিভিন্ন প্রক্ষেপকের দিকে চালিত করা সহজসাধ্য হয়।*

পূর্বে আলোচিত 'স্বরমাত্রিক ধ্বনিক্ষেপণ' ব্যবস্থার মতোই আলোচ্য ব্যবস্থায় প্রেক্ষার ডান দিকে ও বাম দিকে পৃথক তড়িৎচক্রে প্রক্ষেপক-শ্রেণীকে ভাগ করা হয়। সেই সঙ্গে প্রেক্ষার সিলিংয়ে, দর্শকদের পিছনে এবং রঙ্গপীঠের পিছনেও পৃথক প্রক্ষেপক পৃথক পৃথক চক্রে রাখা যেতে পারে। ধ্বনি উৎপাদনের কাল্পনিক সূত্রটির সঙ্গে দিকের সঙ্গতি রেখে নিয়ন্ত্রণকারী নির্দিষ্ট প্রক্ষেপক মারফৎ ধ্বনি প্রচার করবেন। বজ্রপাত, গাড়ী, ট্রেণ, এরোপ্লেন প্রভৃতির শব্দ এক প্রক্ষেপক থেকে ভিন্ন প্রক্ষেপকে সরিয়ে সরিয়ে নিলে, খুবই বাস্তবানুগ মনে হবে।

বলা বাহুল্য, সংকেত লিখনের সময় এই জাতীয় পরিবর্তন-সাপেক্ষ প্রক্ষেপণ তালিকাও পৃথক স্তম্ভে লিপিবদ্ধ করে রাখা উচিত।

* নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটি শুধু মাত্র সুইচের সাহায্যে গঠিত না হয়ে, উপযুক্ত 'ফেডার' বা ধ্বনিনিয়ন্ত্রণযোগ্য রেজিস্ট্যান্স দিয়ে গঠিত হলে, প্রক্ষেপণের বিষয়টি সাবলীল হয়ে উঠবে।
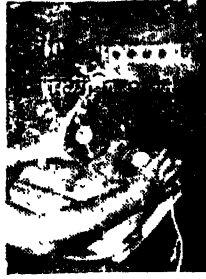
সাত বাণীবদ্ধকরণ

ধ্বনি সংরক্ষণ সংরক্ষণের দিকে মানুষের ঝোঁক আবহমান কাল থেকে বর্তমান। পরবর্তী যুগের জন্য নিজের শরীর সংরক্ষণের ইচ্ছা থেকেই আবিষ্কৃত হয়েছিল মমি তৈরী করার পদ্ধতি; নিজের চেহারা সংরক্ষণের ইচ্ছা থেকেই প্রতিকৃতি অংকনের ধারা জন্ম নিয়েছিল; এমনকি লেখার হরফের আবিষ্কারও হয়েছে নিজেদের যুগের কথা-গল্প-ইতিহাসকে পরবর্তী যুগের জন্য বাঁচিয়ে রাখার প্রেরণায়। কিন্তু কণ্ঠস্বরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য সেই প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের আকুতি থাকা সত্ত্বেও, এ সম্পর্কে কৃতকার্য্যতার নজির পাওয়া যায় না। একমাত্র চৈনিক লোকগাথায় খ্রী: পূ: ৪০০ অব্দের জনৈক চীনা সম্রাটের কথা পাওয়া যায়, যিনি নাকি এ ব্যাপারে সফল হয়েছিলেন। কিন্তু লোকগাথা কিম্বদন্তী-মাত্র।

আধুনিক ইতিহাসে এই ধ্বনি সংরক্ষণের ব্যাপারে প্রথম মোটামুটি সাফল্য লাভ করেন **স্কট** নামে একজন বৈজ্ঞানিক ১৮৫৭ সালে। এঁর যন্ত্রের নাম দিয়েছিলেন **ফোন অটোগ্রাফ**। পরে ১৮৬৪ সালে **কোনিগ** এই যন্ত্রের উন্নতিসাধন করেন। রেকর্ড করার ব্যাপারে এই যন্ত্র মোটামুটি কাজ করলেও, পুনরুৎপাদনের ক্ষেত্রে এটি প্রায় কাজই করতোনা বললে চলে।

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে **এডিসন** একটি উন্নত ধরণের যন্ত্র আবিষ্কার করলেন—যার নাম দিলেন **ফোনোগ্রাফ**। এ যন্ত্রে মোমের প্রলেপ লাগানো ঘুরন্ত এবং অক্ষ বরাবর এগিয়ে যেতে সক্ষম একটি ড্রামের উপরে ধ্বনিকম্পন ধরে রাখার ব্যবস্থা ছিল। এই ড্রামই পরবর্তী যুগে ঘুরন্ত গালার চাক্তি বা **ডিস্ক**-এ পরিণত হয়, এবং কম্পন বাণীবদ্ধ করার ধারাটিকে তাড়িতিক উপায়ে সাধন করা শুরু হয়। পরে পরে ধ্বনি

বাণীবদ্ধকরণের বিবিধ মাধ্যম আবিষ্কৃত হতে থাকে। তবে এডিসন আবিষ্কৃত ফোনোগ্রাফ আজও বিভিন্ন ধরণের **রেকর্ড প্লেয়ার**-এর চেহারায় ঘরে ঘরে সমাদর পাচ্ছে।

বিবিধ মাধ্যম

ধ্বনি বাণীবদ্ধকরণের চারটি মাধ্যমের কথা এখানে উল্লেখ করা হলো। এই চারটি মাধ্যমের মধ্যে (১) **ডিস্ক** আর (২) **টেপে** বাণীবদ্ধ করাই মঞ্চের কাজে সমধিক প্রচলিত। (৩) **ওয়্যার**-বাণীবদ্ধকরণের পদ্ধতি আজকাল ক্রমশঃ লোপ পাচ্ছে। (৪) চতুর্থ মাধ্যম **ফিল্ম**, চিত্র জগতের কাজেই বেশী ব্যবহৃত হয়। যাঁদের সরঞ্জাম আছে, তাঁরা এই মাধ্যমটিকে অনায়াসে মঞ্চের প্রয়োজনেও ব্যবহার করতে পারেন।

'ওয়্যার' বাণীবদ্ধকরণের সরঞ্জাম আজকাল আর পাওয়া যায় না। তাছাড়া, সহজলভ্য 'টেপ'-প্রণালীর জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে 'ওয়্যার' ক্রমশঃ অপরিচিত হয়ে পড়েছে। আলোচ্য পরিচ্ছেদে তাই 'ওয়্যার' নিয়ে আলোচনা অনাবশ্যক।
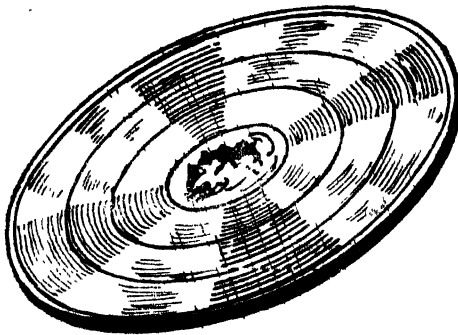
[চিত্র ৫৮.১] কৃত্রিম শব্দ মজুদ রাখা ডিস্ক

প্রথমে আসা যাক **ডিস্ক**-এ বাণীবদ্ধকরণের প্রসঙ্গে। গ্রামোফোনের সাহায্যে বাজানোর 'ডিস্ক' সবারই পরিচিত। তবে শব্দ প্রক্ষেপণের জন্য ব্যবহৃত মজুদ ধ্বনিভাণ্ডারের ডিস্কে [চিত্র ৫৮.১] কিছুটা পার্থক্য আছে। এই জাতীয় ডিস্কের উভয় পিঠেই তিন চার রকমের বিভিন্ন শব্দ বাণীবদ্ধ করা থাকে। একটি শব্দের শেষে কিছু অংশে কোনো শব্দ নেই; ডিস্কে

সে জায়গাটি সমতল। ঢেউ খেলানো গর্ত্ত যুক্ত ডিস্কে, এই সমতল অংশগুলি পৃথক ঝরির মতো দেখায়। এর সাহায্যে ডিস্কের মাঝের কোনো শব্দও ঠিক শুরু থেকে বেছে নেওয়া সহজ হয়। সাধারণ গ্রামোফোনের সাহায্যে যদি ডিস্কগুলি বাজানো যায়, তবে চোঙের কাছে ধ্বনিগ্রাহক যন্ত্র বসিয়ে নিতে হবে। পিক-আপ ব্যবস্থায় গ্রামোফোনের শব্দ সরাসরি ধ্বনিবিবর্দ্ধকের মাধ্যমে প্রক্ষেপকে পাঠানো সহজ হয়। ডিস্কের চাকতিতে শব্দের ক্রমিক তালিকা দেওয়া থাকে। ট্রেনের নানারকমের শব্দ, জনতার বিভিন্ন ধরণের কোলাহল, নানা জাতের তূর্য্যনাদ, যন্ত্রপাতি কলকব্জার শব্দ, ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত-জাতীয় প্রাকৃতিক ধ্বনি, সমুদ্রের গর্জন, নদীর কলতান ইত্যাদি সচরাচর প্রয়োজন পড়ে, এমন বহু ধ্বনি মজুদ করা আছে ডিস্কে। প্রয়োজন মতো সংগ্রহ করতে করতে, নিজেদেরই একটি মজুদ ধ্বনির ভাণ্ডার গড়ে তোলা যায়।
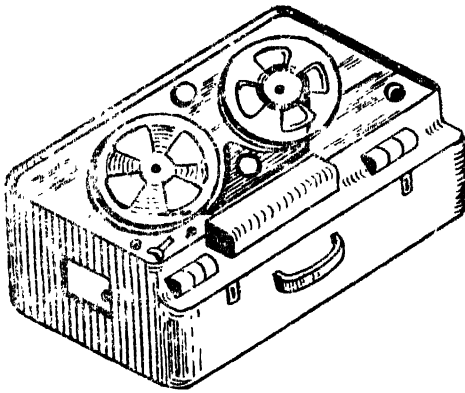
[চিত্র ৫৮.২] টেপ-রেকর্ডার

আজকের যুগে সর্বাধিক জনপ্রিয় বাণীবদ্ধকরণের ব্যবস্থা বৈজ্ঞানিক **পলসন** আবিস্কৃত **টেপ রেকর্ডার** [চিত্র ৫৮.২], যার মাধ্যমে প্ল্যাস্টিকের ফিতের গায় লাগানো ফেরিক অক্সাইডের পাতলা স্তরের উপরে চৌম্বিক পদ্ধতিতে ধ্বনি ধরে রাখা হয়। এখানে আলোচিত মাধ্যম তিনটির মধ্যে, একমাত্র টেপের সাহায্যেই বাণীবদ্ধ ধ্বনি বাণীবদ্ধকরণের সঙ্গে সঙ্গে শোনা যায় এবং প্রয়োজনে অবাঞ্ছিত অংশ মুছে ফেলা সম্ভব। একই ফিতের গায় বারবার ধ্বনি বাণীবদ্ধ করা যেতে পারে। এই যন্ত্রের নিজস্ব

ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থা থাকায়, অন্য ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থার সাহায্য না নিয়েও মঞ্চে এটিকে ব্যবহার করা চলে।

বিভিন্ন গঠনের টেপ রেকর্ডার পাওয়া যায়। সবারই পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা মোটামুটি এক রকমের। বিশেষ কয়েকটি ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে, নিজেদের প্রয়োজন বুঝে, রেকর্ডার বাছাই করা উচিত। নীচের অনুচ্ছেদে এই যন্ত্রের সাধারণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ও বিভিন্ন বৈশিষ্টের কথা আলোচনা করা হলো।

প্রত্যেক টেপ রেকর্ডার যন্ত্রে যে কয়টি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অবশ্যই থাকে, সেগুলি হলো : (১) বাজানোর একটি, রেকর্ড করার একটি, থামানোর একটি এবং সামনের দিকে ও পিছনের দিকে দ্রুত জড়ানোর দুটি চাবি, (২) রেকর্ড করার বিশেষ বোতাম বা 'সেফটি কী' (৩) ধ্বনিগ্রাহক যন্ত্র সংযোগ করার 'ইনলেট', (৪) ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থাসহ একটি ধ্বনিপ্রক্ষেপক, (৫) গাম্ভীর্য্যের মাত্রা বজায় রাখার চাবি, এবং (৬) দুটি ফিতের চাকা বা 'স্পুল' ধরার ঘূর্ণনক্ষম খুঁটি। এগুলি ছাড়া উন্নততর যন্ত্রে আরও কয়েকটি বিশেষ ব্যবস্থা থাকে, সেগুলি হচ্ছে : (৭) ফিতের দৈর্ঘ্য মাপার একটি সূচক, (৮) বিভিন্ন দ্রুতিতে বাণীবদ্ধকরণের চাবি, (৯) সাময়িকভাবে কাজ থামানোর চাবি, (১০) গাম্ভীর্য্যের মাত্রা সঠিক রাখার জন্য 'ম্যাজিক আই' বা 'লেভেল মিটার' ব্যবস্থা, (১১) পৃথকধ্বনি প্রক্ষেপক যোগ করার 'আউটলেট', (১২) দূর থেকে নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা এবং (১৩) গ্রামোফোন রেডিও ইত্যাদি থেকে সরাসরি বাণীবদ্ধ করার ভিন্নতর 'ইনলেট'। টেপ রেকর্ডার এ. সি. বৈদ্যুতিক ব্যবস্থায়, ব্যাটারীর সাহায্যে অথবা উভয়ের যে কোনোটিতে চলার উপযোগী মডেলে পাওয়া যায়।

সাধারণতঃ একটি ফিতের অর্দ্ধেক অংশে একবারে শব্দ গৃহিত হয়। ফিতেটি তারপর উল্টিয়ে নিলে, বাকি অর্দ্ধেকে আবার নূতন ধ্বনি গ্রহণ করা চলে। এমন যন্ত্র আছে, যার উভয় দিকেই গতি [টু-স্পীড]—সে যন্ত্রে ফিতে না উল্টিয়ে, দ্বিতীয় পর্য্যায়ের চাবি ব্যবহার করলেই, দ্বিতীয়ার্দ্ধে শব্দগ্রহণ শুরু হয়। অনুরূপভাবে 'ফোর-স্পীড' যন্ত্রে একটি ফিতে চারবার ব্যবহার করা চলে।* একটি শব্দের উপরেই আর একটি শব্দ

* বর্তমানে বহুল প্রচলিত ক্যাসেট-টেপরেকর্ডারে ধ্বনি গ্রহণের ফিতে প্ল্যাস্টিকের বাক্সে স্থায়ীভাবে আবদ্ধ থেকেই কার্য্যকরী হয়। এই ফিতের আকার সরু এবং দৈর্ঘ্য কম। যন্ত্রের গতিও একটিমাত্র দ্রুতিতে বাঁধা। ক্যাসেট-যন্ত্রে ক্যাসেট বের করা বা ঢোকানোর জন্য একটি অতিরিক্ত চাবি থাকে।

গ্রহণ করার জন্য উপরিপাতন-এর ব্যবস্থা অনেক যন্ত্রে থাকে। সাধারণ যন্ত্রে কিন্তু দ্বিতীয়বার বাণীবদ্ধকরণের সময় পূর্বের ধ্বনি আপনা হতেই মুছে যায়। বহু যন্ত্রে কৃত্রিম উপায়ে প্রতিধ্বনি মিশ্রণের ব্যবস্থাও থাকে। অধুনা ব্যবহৃত 'স্বরমাত্রিক বাণীবদ্ধকরণ ব্যবস্থা' টেপ রেকর্ডার যন্ত্রের আধুনিকতম উন্নতি বলা যেতে পারে।

ফিল্মে শব্দধারণ ব্যবস্থা, গোড়াতেই বলা হয়েছে, চলচ্চিত্র শিল্পেই সমধিক প্রচলিত। কিন্তু অনেকেরই নিজস্ব চলচ্চিত্র প্রক্ষেপক যন্ত্র থাকে। ফিল্মে সরাসরি শব্দযোজনা করার উপযোগী ১৬ মি: মি: ক্যামেরাও আজকাল পাওয়া যায়। উৎসাহী শিল্পীর পক্ষে, এটি একাধারে চলচ্চিত্র ও মঞ্চ উভয়বিধ প্রয়োজনে লাগানোর সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।
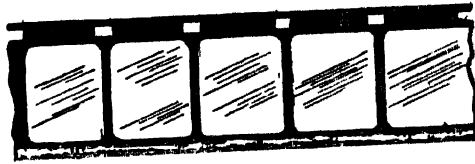
[চিত্র ৫৮.৩] ফিল্মের উপরে বাণীবদ্ধ ধ্বনি

অপেশাদারী ব্যবহারের জন্য একমাত্র ছোট আকারের ফিল্ম্ ১৬ মি: মি:, যার গায় শব্দগ্রহণ করা সম্ভব। এই জাতীয় ফিল্মের একধারেই চাকার দাঁত (স্প্রকেট) ঢোকানোর উপযোগী ছিদ্র থাকে। অন্য ধারে আলোছায়ার রেখা দিয়ে [চিত্র ৫৮.৩] অথবা আলো অন্ধকারে আঁকা ক্ষেত্রের সাহায্যে ধ্বনি বাণীবদ্ধ করা হয়। সবাক চলচ্চিত্র প্রক্ষেপণ যন্ত্রের সাহায্যে ঐ ধ্বনি পুনরুৎপাদন করা চলে। একই জাতীয় শব্দ বারম্বার শোনাতে হলে, ফুট তিনেক ফিল্মের দুইপ্রান্ত মালার মতো জুড়ে যন্ত্রে চাপিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ঝড়, মেঘের গর্জন, ঢেউয়ের শব্দ ইত্যাদি এই জাতীয় প্রান্তহীন সেলুলয়েডের ফিতের সাহায্যে খুব সুন্দরভাবে অথচ কম খরচে শোনানো যায়।

আলোচিত তিন শ্রেণীর বাণীবদ্ধকরণের ব্যবস্থার সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে একটি তুলনামূলক চিত্র পরের পাতায় দেওয়া হলো :—

ডিস্ক	টেপ	ফিল্ম
ব্যবস্থাটি ব্যয়বহুল	সবচেয়ে সস্তা ব্যবস্থা	অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ
স্টুডিও ছাড়া সরঞ্জাম পাওয়া যায় না	নিজস্ব সরঞ্জাম খুব সহজেই রাখা যায়	ফিল্ম পরিস্ফুটনের জন্য অন্ততঃ ল্যাবরেটরির সাহায্য চাই
ধ্বনি স্বল্পক্ষণ স্থায়ী	ধ্বনির দৈর্ঘ্য প্রয়োজনের পক্ষে পর্য্যাপ্ত দীর্ঘ করা সম্ভব	ধ্বনির দৈর্ঘ্য প্রয়োজন মতো দীর্ঘ করা সম্ভব
একই ধ্বনি বারবার বাজানো সহজ	একই ধ্বনি বারবার বাজানো কিছুটা সময়সাপেক্ষ	একই ধ্বনি আবার ঘুরিয়ে বাজানো কষ্টকর
যান্ত্রিক ঘর্ষণজাতীয় ধ্বনি মিশে যাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে	ধ্বনি প্রক্ষেপণ নিখুঁত	ধ্বনিপ্রক্ষেপণ নিখুঁত
নিজস্ব ধ্বনিবর্দ্ধন ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে থাকে না	নিজস্ব ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থা আছে	নিজস্ব ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থা আছে
নেগেটিভ থেকে অবিকল নকল পাওয়া সম্ভব	নকলে কিছুটা বিকৃতির সম্ভাবনা থাকে	নেগেটিভ থাকলে, ত্রুটিমুক্ত নকল পাওয়া সম্ভব
একই ডিস্ক্ বারবার ভিন্ন ধ্বনিগ্রহণে ব্যবহার করা সম্ভব নয়	একই টেপে বহুবার ভিন্ন ভিন্ন ধ্বনি গ্রহণ করা যায়	একই ফিল্ম একবার মাত্র ধ্বনিগ্রহণের কাজে লাগে
ধ্বনি মোছা যায় না	ধ্বনি মোছা যায়	ধ্বনি মোছা যায় না
ক্ষয়ের গতি দ্রুত। ভেঙে গেলে, জোড়া যায় না	ক্ষয়ের গতি ধর্তব্য নয়। ছিঁড়ে গেলে অথবা প্রয়োজনে কেটে জোড়া লাগানো যায়	বেশী ব্যবহারের ফলে দাগ পড়লে অবাঞ্ছিত শব্দ উৎপন্ন হয়। জোড়া লাগানো সম্ভব

ডিস্ক	টেপ	ফিল্ম
সম্পাদনা (এডিটিং) সম্ভব নয়	সম্পাদনা সম্ভব	সম্পাদনা সম্ভব
সহজ বহনযোগ্য	সহজ বহনযোগ্য	সহজ বহনযোগ্য নয়

উপরের তুলনামূলক চিত্রটি থেকে **টেপ রেকর্ডার**-এর জনপ্রিয়তার কারণ সহজেই অনুমান করা যাবে।* বিশেষ ভাবে, ব্যাটারীচালিত টেপ রেকর্ডার নিয়ে যে কোনও স্থানে বাণীবদ্ধকরণের কাজ তথা স্বর প্রক্ষেপণ আজ আর কোনও সমস্যাই নয়। ধ্বনিভাণ্ডারের ডিস্কগুলির স্থায়ীত্ব বাড়াতে হলে, সেগুলি থেকে প্রয়োজনীয় ধ্বনি টেপে তুলে নিয়ে ব্যবহার করাই যুক্তিসঙ্গত।

বাণীগ্রহণ কক্ষ আমরা শোনার জন্য দুটি কান একসঙ্গেই ব্যবহার করি। কিন্তু দুটি কানে যে শব্দ তরঙ্গ প্রবেশ করে, তাদের মধ্যে ধ্বনি-গাম্ভীর্য্য, শব্দগুণ এবং সময়ের দিক থেকে বেশ কিছুটা পার্থক্য থাকে। এই পার্থক্যবোধ থেকেই আমরা শব্দসূত্রের সঠিক দিক নিরূপণ করতে সক্ষম হই, এবং অনেক অবাঞ্ছিত শব্দ তরঙ্গের মাঝখান থেকে আবশ্যকীয় ধ্বনিটুকু চিনে নিতে পারি। এইভাবে দুই কান দিয়ে যখন আমরা একাধিক যন্ত্রী পরিচালিত যন্ত্রসংগীত শুনি, তখন ঐক্যতান বাদনের মধ্যেও কোন ধ্বনি কোন যন্ত্র থেকে আসছে, অনুমান করে নেওয়া কষ্টকর হয় না আমাদের পক্ষে। যদি আমরা একটি কান বন্ধ রেখে শোনার চেষ্টা করবো, দেখা যাবে, বিভিন্ন যন্ত্রের অবস্থানগত পার্থক্যবোধ কমে গেছে—সমস্ত ঐক্যতান বাদন যেন একটিমাত্র সূত্র থেকে উত্থিত হচ্ছে মনে হবে; কক্ষটির অনুরণন প্রবণতা মনে হবে বেড়ে গেছে; আর, অন্যান্য অবাঞ্ছিত শব্দ বা গোলমাল যদি বর্তমান থাকে, সেগুলিও এরসঙ্গে জড়িয়ে যাবে।

ধ্বনিগ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে গৃহিত শব্দ যখন আমরা শুনি, তখন এই জাতীয় 'এক কান দিয়ে শোনার' ফল ফলে। **বাণীগ্রহণ কক্ষের** বিশেষত্বের দিকে লক্ষ্য দেওয়ার প্রধান কারণ এই **এককর্ণ** এবং **উভকর্ণ শ্রবণ ব্যবস্থার** ফলাফলগত পার্থক্য। এককর্ণ শ্রবণ ব্যবস্থার মারাত্মক ত্রুটিগুলি যেন প্রভাব বিস্তার না করে, সেদিকে লক্ষ্য রেখেই **বাণীগ্রহণ কক্ষ** তৈরী করা হয়।

প্রথমেই বলা হয়েছে, উভকর্ণ শ্রবণ ব্যবস্থার সাহায্যে আমরা অবাঞ্ছিত বহুবিধ গোলমালের মধ্যেও প্রয়োজনীয় ধ্বনি চিনে নিতে পারি। এই চিনে নেওয়ার সময়, অবাঞ্ছিত ধ্বনি আমাদের লক্ষ্যের মধ্যে আসে না। কিন্তু ধ্বনিগ্রাহকের এককর্ণ শ্রবণ ব্যবস্থা ঐ জাতীয় গোলমাল বা অবাঞ্ছিত শব্দগুলিও সমান গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করবে। ফলে, বাণীগ্রহণ কক্ষটিকে বহিরাগত ধ্বনির হাত থেকে মুক্ত রাখতে হবে। শব্দসূত্রে উৎপন্ন শব্দও যেন প্রতিফলিত হয়ে ধ্বনিগ্রাহকে ফিরে না আসে, তারজন্য প্রাচীরগুলিতে পরিশোষণক্ষম উপযুক্ত প্রতিফলন ব্যবস্থা রাখা দরকার—যা ধ্বনি রশ্মিগুলিকে পরিশোষণ করার পরে উদ্বৃত্ত হলে, ভিন্নমুখে অন্য পরিশোষকের দিকে প্রতিফলিত করবে। বহু বাণীগ্রহণকক্ষে প্রাচীর গাত্র-গুলিকে খণ্ড খণ্ড ভাগে আবশ্যকমতো বেঁকিয়ে রাখা যায়। কোথাওবা পরিশোষণ ব্যবস্থা প্রয়োজনমতো বদলানোর ব্যবস্থা আছে। প্রাচীর গাত্রগুলি প্রয়োজনে সমতল, উত্তল ইত্যাদি করে নেওয়ার ব্যবস্থাও বহুল প্রচলিত।

প্রতিফলনের সুব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনির পর্য্যাপ্ত পরিমাণ সুসম-প্রসারের ব্যবস্থা রাখা হয় বাণীগ্রহণ কক্ষে। সুসম প্রসারণের সবচেয়ে সহজ উপায় (ক) পরিশোষকগুলিকে সামঞ্জস্যহীন ভাবে ব্যবহার করা, এবং (খ) প্রাচীর গাত্রগুলি ঢাল, খাঁজ ইত্যাদি দিয়ে অসমান করে তোলা।

বাণীগ্রহণকক্ষের আকার নির্ভর করে, যন্ত্রীসংখ্যা, অথবা শ্রোতাদের বসার আসন থাকলে, তার পরিমাণের উপর। চারজন পর্য্যন্ত যন্ত্রীর জন্য ৪000 ঘনফুটের কক্ষ ব্যবহার করা উচিত। যন্ত্রীসংখ্যা আরও বেশী হলে, জন প্রতি কমপক্ষে ১000 ঘনফুট স্থান বাড়ানো দরকার। হিসাবটি অবশ্য শ্রোতাদের বাদ দিয়ে ধরা হয়েছে। এর পরের প্রণিধানযোগ্য বিষয়টি হলো, ধ্বনির অনুরণন কমিয়ে এককর্ণ শ্রবণ ব্যবস্থার উপযোগী করে তোলার জন্য, কক্ষের দৈর্ঘ্য প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত পূর্ণসংখ্যায়

না রাখা। শুধু পূর্ণসংখ্যাই নয়; একটি অনুপাত যেন অন্যটির কাছাকাছিও না হয়। ক্ষুদ্রায়তন বাণীগ্রহণ কক্ষের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার আদর্শ অনুপাত ১'৬ : ১'২৫ : ১'০—বৃহদায়তন কক্ষে এই অনুপাত ব্যবহার করলে, উচ্চতা অনাবশ্যক বেড়ে যাবে। ২'৪ : ১'৫ : ১'০ এবং ৩'২ : ১'৩ : ১'০ অনুপাত দুটি বৃহদায়তন বাণীগ্রহণকক্ষের জন্য অনুমোদিত। বলা বাহুল্য, এই অনুপাতগুলিই চরম পরিমাপ নয়; স্থান, অর্থ এবং প্রয়োজনের দিকে চেয়ে অনেক ধরণের অনুপাতই হিসাব করে বের করা যাবে, যার ফলাফল সমান সন্তোষজনক হতে পারে।

একাধিক বাণীগ্রহণকক্ষও একই সঙ্গে কাজ করার উপযোগী করে গড়ে তোলা সম্ভব। সে ক্ষেত্রে তাদের প্রত্যেকটিকে অন্য কক্ষের উথিত ধ্বনির হাত থেকে রক্ষা করা দরকার। এরজন্য [চিত্র ৫৯] কক্ষগুলিতে জানালা রাখা উচিত নয়। দরজাগুলি যেন মুখোমুখী-ভাবে না থাকে। ধ্বনির সুসমপ্রসারণের জন্য কক্ষের দেয়ালগুলি যেন বিপরীত দেয়ালের সমান্তর না হয় এবং প্রতি ২০ ফুটে ১ ফুট ঢাল দিয়ে নকল সিলিং লাগালে, মেঝের সাথে ছাদের সমান্তরাল ভাবটিও কেটে যাবে। দেয়ালে পর্দা বা বইয়ের তাক, ধ্বনির সুষ্ঠু সুসম-প্রসারণের যথেষ্ট সহায়ক।
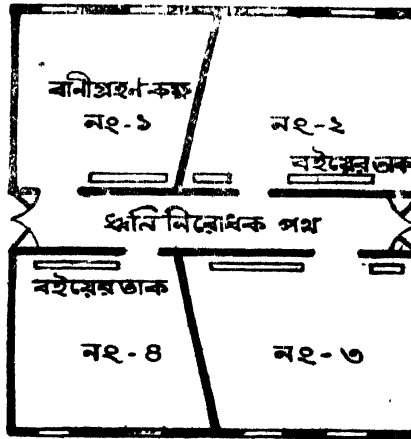
[চিত্র ৫৯] কয়েকটি বাণীগ্রহণকক্ষের একত্র অবস্থান

উভয়কক্ষের মাঝে সম্ভব হলে চলার পথ রাখা যেতে পারে। এই জাতীয় ব্যবধান **ধ্বনি-নিরোধক** হিসাবে কাজ করে। আলো আসার জন্য পুরু কাচের ছোট ছোট টালি ব্যবহার করে আবদ্ধ জানালা তৈরী করলে, বাইরের গোলমাল প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে না। কক্ষ বা কক্ষগুলির জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ব্যবহার করাই সমীচীন।

নিয়ন্ত্রণ কক্ষ প্রত্যেকটি বাণীগ্রহণ কক্ষের সঙ্গে সংলগ্ন এক বা একাধিক নিয়ন্ত্রণ কক্ষ তৈরী করা হয়। রেডিও, টেলিভিসান কিম্বা সাধারণ রেকর্ডিং স্টুডিওতে এই ধরণের নিয়ন্ত্রণ কক্ষের নমুনা দেখা যাবে। এগুলিকে বাণীগ্রহণের স্নায়ু কেন্দ্র বলা চলে। বাণীগ্রহণ কক্ষ এবং নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মধ্যবর্তী প্রাচীরে একটি বড় কাচের জানালা ধ্বনি-নিরোধক পদ্ধতিতে বসানো থাকে—যার ভিতর দিয়ে নিয়ন্ত্রণকারী বাণীগ্রহণ কক্ষের যাবতীয় খুঁটি-নাটি অবস্থার সঙ্গে চাক্ষুষ যোগাযোগ রাখতে পারেন। উভয় কক্ষের মধ্যে কথা বলার কাজটি চালানো হয় দ্বিমুখী মাইক্রোফোন ও স্পীকার ব্যবস্থার মাধ্যমে।

এই জাতীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষের আকার নির্ভর করে তার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির তালিকা এবং নিয়ন্ত্রণকারীদের সম্ভাব্য সংখ্যার উপরে। বাণীগ্রহণ কক্ষ ও নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মধ্যে সরাসরি আসা যাওয়ার যোগাযোগ পথ না থাকাই বাঞ্ছনীয়। নিয়ন্ত্রণ কক্ষ থেকে বাণীগ্রহণ কক্ষে নির্দেশ পাঠানোর জন্য আলোক-সংকেতের ব্যবস্থা রাখা উচিত।

যদিও অপরিহার্য নয়, তবু নিয়ন্ত্রণ কক্ষটিও বাণীগ্রহণ কক্ষের মতোই বাইরের গোলমালের হাত থেকে মুক্ত রাখা দরকার। আদর্শ ব্যবস্থায় তাই এই সব কক্ষেও জানালা থাকে না। সামগ্রিক ভাবে বাণী-গ্রহণ কক্ষ এবং নিয়ন্ত্রণ এলাকাকে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত করলে সব দিক দিয়ে ভালো ফল পাওয়া যায়। এখানে উল্লেখ রাখা যেতে পারে, বৈদ্যুতিক পাখার হাওয়া যে শুধু ধ্বনি-তরঙ্গকে এলোমেলো করে দেয়, তাই নয়—চলন্ত পাখার মোটরে যে বৈদ্যুতিক স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি হয়, সেগুলিও ভিন্নতর ধ্বনিতরঙ্গ আকারে মিশে যায় বাঞ্ছিত ধ্বনিতরঙ্গের সঙ্গে।

আট ধ্বনিক্ষেপণের প্রয়োগকলা

ধ্বনিক্ষেপণের সহায়ক সরঞ্জামগুলি

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধ্বনি-উৎপাদনকারী যন্ত্রগুলির নিজস্ব ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থা থাকে। সুপরিচিত মাধ্যমগুলির মধ্যে একমাত্র ডিস্ক বাজানোর কোনো কোনো শ্রেণীর **টার্ন-টেবল্** এবং **টেপ-ডেক্**-এ এই ব্যবস্থা থাকে না—এগুলি বেতার গ্রাহকযন্ত্র, ধ্বনিবিবর্দ্ধনব্যবস্থা সম্বলিত অন্য কোনও যন্ত্র অথবা পৃথক ধ্বনিবিবর্দ্ধকের সাহায্যে বাজানো হয়।

এই জাতীয় ধ্বনিক্ষেপণ ব্যবস্থা উৎকৃষ্ট পর্য্যায়ের হলে, বিশেষ ধ্বনি-বিবর্দ্ধন ও **ক্ষেপণ** ব্যবস্থার সাহায্য ছাড়াই, একটি ১৫০-৩০০ আসনযুক্ত প্রেক্ষাগৃহের পক্ষে পর্য্যাপ্ত বলে গণ্য হতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় ধ্বনিসূত্র একটিমাত্র হওয়ার ফলে, সেটি সংস্থাপনার স্থান-নির্বাচন একটি সমস্যার বিষয়।

সাধারণতঃ যে কোনও একদিকের পার্শ্বরঙ্গে শব্দ-যন্ত্রীর বসার স্থান নির্দিষ্ট হয়, এবং তাঁর আয়ত্বের মধ্যেই রাখা হয় ধ্বনি-উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলি। নিজস্ব ক্ষেপণ ব্যবস্থাসম্বলিত যন্ত্রের ধ্বনিপ্রক্ষেপকের মুখ হয় রঙ্গপীঠের দিকে [চিত্র ৬০.১ ক], নয়তো প্রেক্ষা-গৃহের দিকে [চিত্র ৬০.১ খ] ঘুরিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু এই উভয়বিধ অবস্থানেই, প্রক্ষেপিত ধ্বনি তরঙ্গের সামান্যতম অংশ মাত্র প্রতিসরিত হয়ে প্রেক্ষাগৃহে প্রবেশ
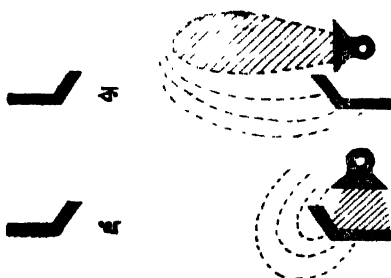
[চিত্র ৬০.১] পার্শ্বরঙ্গে রক্ষিত একমাত্র ক্ষেপণ-ব্যবস্থা সম্বলিত ধ্বনি উৎপাদনের দীনতা

করে। ধ্বনিতরঙ্গের প্রখরতম অংশসহ বেশীর ভাগই দৃশ্যপটাদির নমনীয় স্তরে পরিশোষিত হয়ে অবলুপ্ত হয়ে যায়। তাছাড়া, মঞ্চমুখের পরিসর বেশী হলে, ধ্বনি অভিনয়ের সঙ্গে একসূত্রবদ্ধ হতে পারে না। শ্রোতার মনঃসংযোগ ক্রমাগত যন্ত্র রাখার দিকটিতে আকর্ষিত হয়।

ধ্বনিপ্রক্ষেপণের ব্যবস্থাটি উর্দ্ধরঙ্গের মাঝামাঝি, নিম্নরঙ্গ তথা প্রেক্ষাগৃহাভিমুখী করে স্থাপিত হলে, উপরোক্ত ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব। এই কাজের সহায়তা করার জন্য ব্যবহার করা হয় একটি অতিরিক্ত ধ্বনিপ্রক্ষেপক, যাকে **এক্সটেনসান স্পীকার** বলে। এগুলি ধ্বনি-উৎপাদন যন্ত্রের নিজস্ব ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থার সাহায্যেই পরিচালিত হতে পারে। টেপ রেকর্ডার, রেডিও, প্রোযেক্টার প্রভৃতি যন্ত্রে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই ধরণের অতিরিক্ত ধ্বনিপ্রক্ষেপক লাগানোর ব্যবস্থা থাকে। পর্য্যাপ্ত তারযুক্ত এই পৃথক প্রক্ষেপকটিকে রঙ্গমঞ্চের দৃশ্যপটাদির আড়ালে অনায়াসে লুকিয়ে রাখা যায়।

পৃথক প্রক্ষেপক লাগানোর নিজস্ব ব্যবস্থা না থাকলে, যন্ত্রের প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার সঙ্গে প্যারালেল সংযোগের একটি আয়োজন নিজেরাই করে নেওয়া যায়। নিজস্ব ব্যবস্থাসম্বলিত যন্ত্রে, পৃথক প্রক্ষেপক কার্য্যকরী হলেই, যন্ত্রের নিজস্ব প্রক্ষেপকের সংযোগ আপনাহতেই বিচ্ছিন্ন হয়। নিজেরা ঐ ব্যবস্থা তৈরী করে নিলে, তড়িৎচক্রে একটি **টু-ওয়ে** স্যুইচ [চিত্র ৬০.২] লাগিয়ে নেওয়া উচিত।
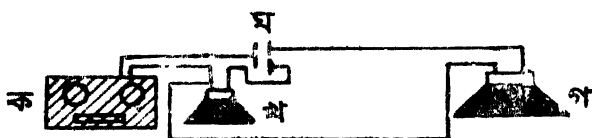
[চিত্র ৬০.২] নিজেদের তৈরী এক্সটেনসান স্পীকার ব্যবস্থায় টু-ওয়ে স্যুইচের ব্যবহার। ক : টেপ রেকর্ডার, খ : রেকর্ডারের ধ্বনিপ্রক্ষেপক, গ : এক্সটেনসান স্পীকার, ঘ : টু-ওয়ে স্যুইচ।

এক্সটেনসান স্পীকার কাজে লাগানোর বিষয়ে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন আছে। সামান্য অসতর্কতায়, এক্সটেনসান বন্ধ না থাকলে, পরবর্তী ধ্বনিপ্রক্ষেপণের প্রস্তুতিপর্ব অসময়ে শ্রুতিগোচর হয়ে, অভিনয়ে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। প্রত্যেকবার প্রয়োজনীয় ধ্বনিক্ষেপণের পরে পরেই

এক্সটেনসানের সংযোগ কেটে, মূলযন্ত্রের ভল্যুম কমিয়ে দেওয়ার অভ্যাস করা উচিত। এক্সটেনসানের সঙ্গে টু-ওয়ে সংযোগে একটি 'হেডফোন' রেখে, পরবর্তী ধ্বনিক্ষেপণের প্রস্তুতিপর্ব উক্ত হেডফোনের সাহায্যে চালালে, কাজটি অনেকাংশে সহজ ও নিরাপদ হয়। এ ক্ষেত্রে মূলযন্ত্রের প্রক্ষেপকটিকে বাতিল করে রাখাই যুক্তিসঙ্গত। হেডফোনের ব্যবস্থা না থাকলে, মূলযন্ত্রের ভল্যুম যতটা সম্ভব কমিয়ে পরবর্তী ধ্বনিপ্রক্ষেপণের ব্যবস্থা প্রস্তুত করতে হবে।

পৃথক ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থার কথা বাদ দিলে, একটি এক্সটেনসান স্পীকার, একটি হেডফোন এবং একটি টু-ওয়ে সুইচ, ধ্বনিপ্রক্ষেপণের কাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। সামান্য বুদ্ধি খাটিয়ে ধ্বনি-নিয়ন্ত্রণের সমগ্র ব্যবস্থাটিকে একটি সর্বাঙ্গীন সুষ্ঠু ও কাজ করার সুবিধাজনক রূপ দেওয়া যায়। প্রত্যেকটি যন্ত্র কমপক্ষে দুটি করে প্রস্তুত রাখলে, নাটক চলাকালীন অনেক অসহায় মুহূর্তের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সাধারণ পূর্বপ্রস্তুতি

প্রত্যেকটি যন্ত্রপাতি সর্বাঙ্গীন নিখুঁত ভাবে কাজ করছে কিনা পরীক্ষা করে দেখার সঙ্গে সঙ্গে, ধ্বনিপ্রক্ষেপণের কাজে বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে পূর্বপ্রস্তুতির দরকার হয়।

ডিস্ক রেকর্ড যদি ব্যবহৃত হয়, ডিস্কের প্রয়োজনীয় অংশটুকু উজ্জ্বল বর্ণে চিহ্নিত করে নেওয়া উচিত। ফটোর নেগেটিভে দাগ দেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হলুদ বা কমলা রঙের রঙিন পেনসিলে দাগ দেওয়া খুবই সুবিধাজনক। এগুলি অত্যন্ত নরম হওয়ার ফলে, রেকর্ডের খাঁজে কোনো ক্ষতি করে না—আর, উজ্জ্বল বর্ণের হওয়ার ফলে, স্বল্পালোকে ভালোভাবেই দেখা যায়। গ্রামোফোনে রেকর্ডটি বাজিয়ে দেখার সময় আবশ্যকীয় যায়গা এলেই, পেনসিলের মুখ খুব হাল্কভাবে পিনের গা ঘেঁসে রেকর্ডের উপরে ছোঁয়াতে হবে। ঘূর্ণায়মান চাকতিতে সঙ্গে সঙ্গে একটি রঙিন বৃত্ত আঁকা হয়ে যাবে। অনুরূপভাবে শেষাংশও চিহ্নিত করে নেওয়া দরকার। রেকর্ডের মাঝখানে বিশেষ যায়গা থেকে ধ্বনি-ক্ষেপণ শুরু করতে হলে, এই প্রথা অপরিহার্য্য। সাধারণ খড়ির মুখ সরু করেও দাগ দেওয়ার কাজ চালানো যেতে পারে; কিন্তু খড়ির গুঁড়ো অথবা খড়ির সঙ্গে মিশে থাকা বালির কণা রেকর্ডের ক্ষতি করবে।

দাগ দেওয়ার কাজ ছাড়া, রেকর্ডগুলি প্রয়োজন-অনুযায়ী পর পর সাজিয়ে রাখা, রেকর্ড অনুযায়ী গ্রামোফোনের দ্রুতি বা স্পীড ঠিক করে

নেওয়া, পিন পাল্টানো বা স্টাইলাসের সঠিক দিক ঠিক করে নেওয়া প্রভৃতি কাজগুলিও পূর্বাহ্নে প্রস্তুত করে রাখা সুবিধাজনক।

টেপ রেকর্ডার ব্যবহারের ক্ষেত্রে, যন্ত্রের সংখ্যাসূচকটিকে সব-শূন্যে নিয়ে আসতে হবে। টেপের গায় স্থায়ী কালীতে একটি দাগ দিয়ে, সেই দাগটী যন্ত্রের বিশেষ কোনো যায়গার সঙ্গে একসূত্রে রাখা অবস্থায় সংখ্যাসূচককে 'সব-শূন্যে' আনলে, কাজের সুবিধা হয়।* বলা বাহুল্য, বাণীবদ্ধকরণের সময় থেকেই পদ্ধতিটি অনুসৃত হওয়া উচিত ; তা হলেই সংকেতলিপিতে লিপিবদ্ধ সংখ্যাসূচী কার্য্যকরী হবে।

পৃথক ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থাও পূর্বপ্রস্তুতি পর্বে পরীক্ষা করে দেখা দরকার। বাতী জ্বালানোর জন্য বিদ্যুৎপ্রবাহ সরবরাহ করার সময়, তারের সামান্যতম সংযোগ পথেও তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে বাতী জ্বালানোর কাজ সাধন করে। কিন্তু ধ্বনি উৎপাদনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত তড়িৎ-প্রবাহী তারের সংযোগ সামান্য ঢিলে হলেই, ধ্বনি বহনের কাজে বিভ্রাট বাধবে। এজন্য সমস্ত সংযোগের স্ক্রুগুলি শক্তভাবে আঁটা দরকার। যন্ত্রের ভিতরকার জোড়গুলি একই কারণে ঝালিয়ে দেওয়া হয়।

প্রেক্ষাগৃহে দর্শক সমাগম শুরু হওয়ার পূর্বেই ধ্বনিপ্রক্ষেপণ ব্যবস্থার খুঁটি-নাটি পরীক্ষা করে, ভল্যুম তোলার পরিমাণ নির্দ্ধারণ করে নিতে হবে। দর্শকবৃন্দের উপস্থিতিতে এই জাতীয় পরীক্ষা চালানো, অত্যন্ত বিরক্তিকর ব্যপার হয়ে দাঁড়ায়।

ধ্বনি পুনরুৎপাদনের কার্য্যক্রম

যে কোনও শব্দযন্ত্রের সম্পর্কে বলা যেতে পারে যে, বিদ্যুৎসরবরাহ চালু করার সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রটি কার্য্যকরী হয়না। [বেতার যন্ত্রের উদাহরণ সুপরিচিত।] ধ্বনি উৎপাদনকারী অংশের কর্মক্ষম হয়ে উঠতে, যন্ত্র বিশেষে ন্যূনাধিক ১৫—৩০ সেকেণ্ড সময় নেয়। বিষয়টি ধ্বনিনিয়ন্ত্রণকারীর মনে রাখা উচিত। প্রয়োজনবোধে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ

* ক্যাসেট-টেপে দাগ দেওয়া সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে ক্ল্যাপস্টিক্ জাতীয় বিশেষ ধ্বনি, অথবা মুখে বলা কোনও 'সংকেত' বাণীবদ্ধ করে রাখতে হবে 'সব-শূন্যে' মিলিয়ে নেওয়ার সূত্র হিসাবে। স্পুলের টেপেও এই ধরণের 'বাণীবদ্ধ সংকেত' ব্যবহার করা যেতে পারে।

করা থাকলে, যন্ত্রটিকে আবার কাজে লাগানোর সময়, কার্য্যক্ষম হয়ে নেওয়ার মতো অবকাশ দেওয়া দরকার।*

অনেক শব্দযন্ত্রই অত্যধিক উত্তপ্ত হওয়ার পর ভাল কাজ করে না। দীর্ঘ বিরতির অবকাশে যন্ত্রের বিদ্যুৎ সরবরাহ কেটে রাখাই যুক্তিযুক্ত।

নাটক চলাকালীন ধ্বনি-সংযোজন প্রসঙ্গে, নিয়ন্ত্রণকারীর কাজগুলি আলোচনা করা যাক। [টেপরেকর্ডারই সর্বাধিক ব্যবহৃত ধ্বনি উৎপাদক যন্ত্র ; তাই এখানে ঐ যন্ত্রেরই কার্য্যক্রম বিস্তারিত আলোচিত হলো।]

সংকেতে উল্লিখিত নাট্যাংশ উপস্থিত হওয়ার যথেষ্ট আগেই, টেপের প্রয়োজনীয় জায়গাটি বের করে নিতে হবে। এই কাজের সময় এক্সটেনশান স্পীকারের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে রাখা চাই ; ভল্যুম নামানো থাকবে খুব মৃদু স্বরে। সংখ্যাসূচকের উপরেই একান্তভাবে নির্ভর না করে, সংখ্যা পাওয়ার পর কিছুটা বাজিয়ে দেখা উচিত। প্রয়োজনে, টেপের চাকা দুটি হাতে ধরে এগিয়ে পিছিয়ে নিখুঁত জায়গাটি প্রস্তুত করে নিতে হবে। এরপর এক্সটেনশান স্পীকারের সংযোগ দিয়ে, অপেক্ষা করতে হবে সংকেত স্থল আসার জন্য। প্রয়োজন অনুযায়ী কখনো ধ্বনিপ্রক্ষেপণ শুরু করার পর ভল্যুম বাড়ানো হয় আস্তে আস্তে, কখনও বা উচ্চ ভল্যুমেই প্রক্ষেপণ শুরু করা হয় ; আবার কখনও নাটকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনির গাম্ভীর্য্য বাড়ানো কমানোর প্রয়োজন পড়ে। এ বিষয়ে সংকেত-লিপির নির্দেশ অনুসরণ করে চলতে হবে যথাযথভাবে।

প্রায়ই দেখা যায়, কিছুক্ষণ ব্যবহারের পরেই টেপরেকর্ডারের সংখ্যাসূচক সংকেতে বর্ণিত সংখ্যাসূচীর সঙ্গে একমত হচ্ছে না। এক্ষেত্রে তালিকার হেরফের করা উচিত নয়। টেপরেকর্ডারের টেপবাহক চাকাগুলিতে দাঁত বা 'স্প্রকেট্' না থাকায়, এগোনো পিছোনোর সময় টেপ পিছলে যাওয়ার ফলে এই পার্থক্য ঘটে। দুই-এক সংখ্যার পার্থক্য ধর্তব্য নয়, বা মনে রাখার পক্ষে অসুবিধাজনকও নয়। কিন্তু বেশী সংখ্যার পার্থক্য ঘটতে শুরু করলে, সংখ্যাসূচকটিকে সংকেতের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলিয়ে নেওয়া দরকার। এ ব্যাপারে সংখ্যাসূচক পরিবর্তনের নিজস্ব যান্ত্রিক ব্যবস্থায় হাত দেওয়া উচিত নয়। যান্ত্রিক ব্যবস্থাটি সূচককে

* ট্রানজিস্টার চালিত যন্ত্র সচল করার সঙ্গে সঙ্গেই কার্য্যকরী হয়ে ওঠে। যে বিলম্বের কথা উল্লেখ করা হলো, তা শুধু ভাল্‌ভ-যুক্ত যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

শুধু সব শূণ্য অবস্থানে নিয়ে আসার কাজে সাহায্য করতে পারে। বাঁদিকের স্পুলটি তার অক্ষ থেকে সাবধানে ঈষৎ তুলে ধরে, সেই অক্ষটি প্রয়োজন মতো হাতে ঘুরিয়ে, সংখ্যাসূচকটিকে ঠিক করে নেওয়া যায়।

ধ্বনিপ্রক্ষেপণের একটি সংকেত অনুসরণের কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূলযন্ত্রের ভল্যুম শূণ্য-অবস্থানে এনে, এক্সটেনসানের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এবার পরবর্তী সংকেতের প্রস্তুতি পর্ব চলবে আবার একই ধারায়।

পৃথক ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থা ব্যবহারের সময়, সংকেত অনুসরণের কাজটি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, ধ্বনিবিবর্দ্ধকের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিতে হয়। [ধ্বনিযন্ত্রে যে কোনও যোগাযোগ স্থাপন বা বিচ্ছিন্ন করার সময়, বিবর্ধন ব্যবস্থা সংলগ্ন ভল্যুমের চাবি সর্বদা শূণ্য-অবস্থানে নামিয়ে আনা উচিত; নচেৎ প্রক্ষেপকে অবাঞ্ছিত শব্দের সৃষ্টি হবে।]

রেকর্ডারের চাবিগুলি যতটা সম্ভব নিঃশব্দে ব্যবহার করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। চাবির শব্দ নাটকের অনেক সুন্দর মুহূর্ত্ত নষ্ট করে দেয় এবং ধ্বনিপ্রক্ষেপণ ব্যবস্থার দিকে দর্শকের মন আকর্ষণ করে। চেষ্টা করেও যে যন্ত্রের চাবি নিঃশব্দে ব্যবহার করা যাবে না, সে যন্ত্রের **সাময়িক ষ্টপ** চাবিটি (অথবা, তা'ও না থাকলে, বাঁদিকের স্পুল) একহাতে চেপে রেখে, সংকেত স্থল আসার কিছু আগেই যন্ত্রটিকে চালু করতে হবে। সংকেত স্থল আসা মাত্র 'সাময়িক ষ্টপ' (অথবা স্পুল) ছেড়ে দিলেই ধ্বনিপ্রক্ষেপণ শুরু হবে। এ ব্যবস্থায় চাবির শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনি অনুসরণ করে না বলে, চাবির শব্দ শ্রোতাদের লক্ষ্যে পড়বে না। 'স্টপ' চিহ্নিত চাবিটি টিপলেই অপর যে চাবিটি ছিটকে নিজস্ব অবস্থানে ফিরে আসার কথা, তাদের উভয়কে যদি একই সঙ্গে চেপে আস্তে আস্তে ছাড়া যায়, তবে অবাঞ্ছিত শব্দ হওয়ার ভয় থাকে না।

টেপ কাটা এবং জোড়ার কায়দা

সম্পাদনার প্রয়োজনে, অথবা ছেঁড়া টেপ জোড়ার জন্যও টেপ কেটে জোড়া লাগানোর দরকার পড়ে। এর জন্য বিশেষ এক ধরণের আঠা লাগানো পাতলা প্ল্যাষ্টিকের ফিতে (অথবা সাধারণ **সেলোটেপ**) ব্যবহার করা হয়। জোড়া লাগানোর অংশ দুটি মুখোমুখী রেখে ½" থেকে ¾" আঠা লাগানো টেপ তার উপরে চেপে বসাতে হবে। তারপর

আঠা লাগানো টেপের উদ্বৃত অংশ কাঁচি দিয়ে কেটে বাদ দিতে হয়। এই জোড়া লাগানোর ব্যপারে যে কয়টি দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে, সেগুলি হচ্ছে :—

(১) জোড়া লাগানোর মুখ দুটি যেন তীর্য্যক ভাবে এবং পরস্পরের সঙ্গে খাপ খাইয়ে কেটে নেওয়া হয় ;

(২) জোড়া লাগানোর সময় দুই অংশের টেপ যেন একই সরল রেখায় ধরা থাকে ; এবং

(৩) জোড়া লাগানোর দুটি অংশের চকচকে দিকটি উপরের দিকে রেখে, সেই দিকেই যেন আঠা লাগানো ফিতে লাগানো হয়।

একমাত্র স্পুলের টেপই কেটে জোড়া যায়। তবে দীর্ঘ ব্যবহারের পব, অথবা অত্যধিক শুষ্ক আবহাওয়ায় এই জোড় মাথা খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ক্যাসেটের টেপ কেটে সম্পাদনা করা যায় না। ছিঁড়ে গেলে, অপেক্ষাকৃত কম অংশটিকে বাতিল করে দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

শেষ কথা

এক একটি রঙ্গালয় ধ্বনির বিশেষ বিশেষ গাম্ভীর্য্য মাত্রায় সঠিক ফল দেয়। অন্যদিকে শূন্য প্রেক্ষাগৃহ আর পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহেও ফলাফলের প্রভূত তারতম্য ঘটে। তাই ধ্বনি-প্রক্ষেপণের সময় প্রেক্ষার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ফলাফলের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে মাত্রা নির্ধারণ করা দরকার। নিয়ন্ত্রকের হাতের কাছে রাখা শুধুমাত্র মণিটার-এর উপরে নির্ভর করে বসে থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

এর সঙ্গে দরকার নাটকীয় ঘটনার আবেগ এবং প্রবাহের উত্থান পতনের দিকে সচেতন থাকা। সংলাপের গাম্ভীর্য্য-মাত্রা কিভাবে ওঠা-নামা করছে, সেদিকেও সজাগ থাকতে হবে। সব কয়টি নেপথ্য কর্মের মতো, ধ্বনি সংযোজনেরও শেষকথা যন্ত্র নয়, নাটক। তার জন্য শব্দযন্ত্রীকে আগে হয়ে উঠতে হবে নাট্যশিল্পী। নাটকবোধ বাদ দিয়ে নিছক যন্ত্রীর কাজ প্রয়োগের ক্ষেত্রে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে উঠতে পারে।

অনুশীলনী

ধ্বনিযোজনা
বিবিধ
প্রশ্নাবলী

১। উৎপত্তি স্থল থেকে কিভাবে ধ্বনির বিস্তরণ ঘটে ? ধ্বনির কম্পাঙ্ক কাকে বলে এবং কিভাবে বোঝানো হয় ? প্রতিধ্বনি সৃষ্টি হওয়ার কারণ কি ?

২। ধ্বনির বিস্তরণের উপরে আবেষ্টনীর প্রভাব কি ভাবে পড়ে ? প্রতিধ্বনি ও অনুরণনের পার্থক্য কি ?

৩। আলোক ও শব্দ তরঙ্গের প্রতিসরণ ক্রিয়ার তুলনা কর। ধ্বনির সুসম-প্রসারণের জন্য কি কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ?

৪। ধ্বনি প্রক্ষেপণের দিক থেকে প্রাচীন গ্রীসীয় ও রোমক নাট্য-মঞ্চগুলির কি ত্রুটি ছিল ? আধুনিক মুক্ত-অঙ্গন অভিনয় ব্যবস্থায় ঐ ত্রুটিগুলি কিভাবে সংশোধন করা হয়েছে ?

৫। প্রেক্ষাগৃহের ধ্বনি নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি আলোচনা কর। বৃত্তাকার ও ডিম্বাকৃতি প্রেক্ষাগৃহ আদর্শ নয় কেন ? কিভাবে ঐ জাতীয় প্রেক্ষাগৃহের ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব ?

৬। যান্ত্রিক ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা কি ? ধ্বনিবিবর্দ্ধন ব্যবস্থায় ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলির কার্য্যকারিতা বুঝিয়ে দাও। ত্রয়মাত্রিক ধ্বনিপ্রক্ষেপণ ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং ব্যবহার প্রণালী বর্ণনা কর।

৭। মঞ্চে কৃত্রিম শব্দ উৎপাদনের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর। তাৎক্ষণিক ধ্বনি ও বাণীবদ্ধ ধ্বনি বলতে কি বোঝায় ? নাটকে কোনটি ব্যবহার করা সুবিধাজনক ?

৮। নীচের শব্দগুলি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি করার কৌশল বর্ণনা কর :—

(ক) বজ্রপাত (ঘ) মরচে পড়া কব্জার শব্দ
(খ) বিস্ফোরণ (ঙ) ঝড় ও বৃষ্টি
(গ) কুচকাওয়াজ (চ) অশ্বখুর ধ্বনি।

৯। নাটকে কোন্ কোন্ সূত্র থেকে শব্দযোজনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় ? নীচের পরিবেশগুলি বোঝাতে কি ধরণের নেপথ্য শব্দব্যঞ্জনা যোগ করা দরকার ?

(ক) সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে।
(খ) দুপুর বেলা রাস্তার ধারে নির্জন বাড়ীর অন্দর।
(গ) ষ্টেশনের ওয়েটিং রুম।
(ঘ) রেস্তোঁরার কেবিন।
(ঙ) নৃত্যগীত বিদ্যালয়ের দপ্তর।

১০। নীচের ঘটনাগুলি কি পরিবেশে ঘটে, উদাহরণ সহ বুঝিয়ে দাও :—

(ক) টেপে একবার বাণীবদ্ধ করা ধ্বনি পুনর্মুদ্রণের প্রয়োজন।
(খ) একাধিক ধ্বনি সৃষ্টিকারী যন্ত্রের এককালীন ব্যবহার।
(গ) বিভিন্ন জাতীয় ধ্বনি উৎপাদন মাধ্যম একই সঙ্গে ব্যবহারের প্রয়োজন।

১১। ধ্বনি বাণীবদ্ধ করার প্রচলিত মাধ্যমগুলির গুণাগুণের দিক থেকে তুলনা কর।

১২। বাণীগ্রহণ কক্ষ নির্মাণের সময় কি কি বিষয়ে লক্ষ্য দেওয়া উচিত ? বাণীগ্রহণ কক্ষের আয়তন নির্দ্ধারণ করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

১৩। এক্স্‌টেনসান স্পীকার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কি ? এক্সটেনসান স্পীকারের জন্য কি ধরণের তড়িৎচক্র তৈরী করা হয় ?

১৪। ধ্বনিপ্রক্ষেপণের পূর্বপ্রস্তুতি হিসাবে কোন্ বিষয়গুলির উপরে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া দরকার ?

১৫। নাটক চলাকালীন, এক্সটেনসান স্পীকারের সাহায্যে টেপে / ডিস্কে বাণীবদ্ধ ধ্বনি প্রক্ষেপণের কার্য্যক্রম বর্ণনা কর।

১৬। নীচের বিষয়গুলির উপরে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ :—

(ক) ধ্বনির তীক্ষ্ণতা, (ঙ) গোলমাল,
(খ) ধ্বনির প্রতিফলন, (চ) মজুদ বাণীবদ্ধ ধ্বনি,
(গ) ধ্বনির প্রতিসরণ, (ছ) প্রাথমিক ধ্বনি সংকেত লিপি,
(ঘ) ধ্বনি পরিশোষক, (জ) টেপরেকর্ডারের সংখ্যাসূচক।

১৭। নিম্নে বর্ণিত দৃশ্যাংশগুলির জন্য প্রয়োজনীয় নেপথ্য ধ্বনি বাণীবদ্ধ কর এবং সংকেতলিপি অনুসরণে অভিনয় চলার সময় সেগুলি যথাযথভাবে ব্যবহার করে দেখাও :—

[মোটা হরফে ধ্বনির ইংগিত দেওয়া হলো]

(ক) [অফিসের বড়বাবু তাঁর চেয়ারে বসে কাগজ পত্র দেখছেন। **টেলিফোন বেজে উঠতেই** রিসিভার তুলে নেন কানে।]

বাবু ॥ ইয়েস, গাংগুলি কথা বলছি ? আরে, কি খবর হালদার! এতদিন পরে মনে পড়লো ? তারপর বলো— হ্যাঁ হ্যাঁ.....হ্যাঁ.....আরে ছিঃ ছিঃ, তা কেন হবে ? না-না... .হ্যাঁ.....হ্যাঁ.....এক মিনিট, **ভীষণ হল্লা হচ্ছে**, শুনতে পাচ্ছি না। প্লীজ হোল্ড অন।

[বড়বাবু ঘণ্টা বাজাতে বেয়ারা ঢুকে সেলাম দেয়]

বাবু ॥ কি, হচ্ছে কি বাইরে ? এটা অফিস, না মাছের হাট ? **বাইরে এত গোলমাল** কিসের ?

বেয়ারা ॥ একটা পাগলাটে বাবু জোর করে ঢুকে পড়েছে স্যার। বলছে আপনার সঙ্গে দেখা করবে।

বাবু ॥ ননসেন্স! বের করে দাও ওকে। যাও।

[বেয়ারার প্রস্থান। বড়বাবু আবার কথা শুরু করেন ফোনে] আরে বলো না। একটা পাগলাটে লোক নাকি.....এঁ্যা.....আচ্ছা.....আচ্ছা.....তাই নাকি ? কবে ছাড়া পেলো বলতো ?....হুঁ....

পাগল [নেপথ্যে] ॥ **কি মুস্কিল, বলছি আমি পাগল নই। পাগল তোমাদের ঐ বড় বাবুটা। ওকে বার করে দাও**

শিপশির। আমি আজ থেকে বসবো ঐ ঘরের চেয়ারে—হ্যাঁ! [হাস্যরোল]

[বড়বাবু বিরক্ত হয়ে টেলিফোন নামিয়ে, ঘন ঘন ঘণ্টা বাজাতে শুরু করেন]।

) [শর্মিলার হাতে একটি খোলা কাগজ। তন্ময় হয়ে সে পড়ছে সেখানা। কথাগুলি তার মনের পর্দায় সুর তুলেছে—]

একটি স্ফুলিঙ্গ—কি অসীম ক্ষমতা তাহার
নিঃশেষে দহিতে পারে একটি নগর।
একটি চাহনি—হোক না তা ক্ষণেকের তরে,
নিমেষে জিনিতে পারে একটি অন্তর।
একটি বচন—যদি তা বর্ষণ করে মধু,
অক্লেশে বাঁধিতে পারে প্রেমের বাঁধন।
একটি খেলাপ—হোক তা সে যত তুচ্ছতম,
জীবনে আনিতে পারে বিরাট ভাঙন।

[শর্মিলা উঠে দাঁড়ায়। এবার সে লেখাটি নিজেই পড়ে চলে কণ্ঠস্থ করার ভঙ্গীতে। তারপর যেন স্বগতঃ বলে ওঠে—]

শর্মিলা ॥ অপূর্ব! ছোট্ট কটি শব্দ। অথচ কত কথাই না বলে গেল এর ভিতর দিয়ে। আঃ, এখনি যদি স্বরূপকে সামনে পেতাম....

[দরজায় কড়া নাড়ানোর শব্দ]

শর্মিলা ॥ মাই গড্! অনেকদিন বাঁচবে। নিশ্চয় স্বরূপ।

[পোষাক ঠিক করে নিয়ে দরজা খুলে দিতেই স্বরূপ এসে দাঁড়ায় সামনে। একটা মিষ্টি বাজনা বেজে উঠলো। শর্মিলার চোখে মুহূর্তের জন্য লজ্জার আভাষ।]

স্বরূপ ॥ হাতে ওটা কি? আমারই লেখা মনে হচ্ছে?

শর্মিলা ॥ কেন? আর কেউ বুঝি কবিতা লিখতে পারে না?

স্বরূপ ॥ হয়তো পারে। তবে স্বরূপ সেনের মতো সুন্দর করে পারে না।

[দুজনে প্রাণ খুলে হেসে ওঠে। বাইরে বিদ্যুতের চমক। দমকা বাতাসে জানালার পর্দাটা উড়ে গেল।]

শর্মিলা ।। ঝড় উঠলো মনে হচ্ছে? দাঁড়াও জানালাটা বন্ধ করে আসি।

স্বরূপ ।। ঝড় তো আমিই—ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। জানালা বন্ধ করে কি আমায় বাইরে রাখা যাবে?

[শর্মিলা হাসিমুখে জানালাটা বন্ধ করার চেষ্টা করে। ঝোড়ো হাওয়ার শব্দের সঙ্গে স্বরূপের কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে ওর মনের মধ্যে :—

ঝড়তো আমিই—ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি।
ঝড়তো আমিই—ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছি....

(গ) বিছানায় শুয়ে একজন ছটফট করতে করতে টুকরো টুকরো স্বপ্ন দেখছে। [স্বপ্নে দেখা দৃশ্যাংশগুলিতে চরিত্রেরা মূকাভিনয় করে যাবে—সংশ্লিষ্ট ধ্বনির সবটাই আসবে ধ্বনি-প্রক্ষেপণ ব্যবস্থার মাধ্যমে।]

বহু লোক **চিৎকার করতে করতে** ছুটে আসে, আবার দূরে চলে যায়। **হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে আসে** একটি চোর—চারদিক দেখে নেওয়ার জন্য থামে, ও জোরে জোরে **হাঁপায়**। দূরের **কোলাহল** কাছে এগিয়ে আসছে শুনতে পেয়ে আবার **ছুটতে** শুরু করে সে।.... কেউ গুমরে গুমরে **কাঁদছে,** আর নিষ্ঠুরের মতো **চাবুক মারছে** তাকে ষণ্ডা গোছের একজন লোক। চাবুকের সপাৎ সপাৎ শব্দের সঙ্গে আর্তনাদ বেড়ে বেড়ে উঠছে। ....একটি গুপ্ত ঘাঁটিতে প্রচণ্ড **কোলাহল হাসি মস্করার** সঙ্গে তাসের আড্ডা জমে উঠেছে। নেপথ্যে একটি **গাড়ী এসে থামার** শব্দ। সবাই মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা করে। বিশেষ ইঙ্গিতবহ **একটা শিস্** ভেসে আসে। দলনেত্রী সবাইকে নিঃশব্দে থাকার ইঙ্গিত জানিয়ে এগিয়ে যান দরজার কাছে। ও পাশ থেকে **সংকেত ধ্বনি** ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে **দরজার খিল খোলা হলো**। দ্রুত একটি লোক ঢুকে পিঠের চাপে

দরজা আবার **বন্ধ করে** চেপে ধরে এবং প্রায় ফিসফিস শব্দে উচ্চারণ করে **"পুলিস"**।.... বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর দল **পড়া মুখস্থ** করছে। শিক্ষক মশাই ঢুকতেই সবাই উঠে দাঁড়ানোর সঙ্গে **চেয়ার টেবিল নড়াচড়ার শব্দ** হলো। শিক্ষক মশাই বললেন, **"বোসো, বোসো তোমরা"**। আর একবার **চেয়ার সরানোর শব্দ** শোনা যাবে। এবার **নাম ডাকতে** শুরু করলেন শিক্ষক এবং ছাত্র-ছাত্রীরা **সাড়া দিয়ে** চললো।

শেষ **একটি নাম ডাকের** সঙ্গে ঘুমন্ত লোকটি স্বপ্নের ঘোরে "ইয়েস স্যার" বলে উঠে বসতেই তার স্বপ্নের ঘোর কেটে যায়।

(ঘ) প্রারম্ভিক **যন্ত্র সংগীত** মূর্চ্ছনা ক্রমে **ঝড় বৃষ্টি** ও **বজ্রপাতের** শব্দে পরিবর্তিত হলো। শৈলেশ্বর মন্দির মধ্যে উৎকণ্ঠিতা বিমলা ও তিলোত্তমাকে সচকিত করে দূরাগত **অশ্বখুর ধ্বনি** এগিয়ে এসে থামলো মন্দিরের সন্নিকটে। মনে হলো দ্রুত কেউ মন্দিরের পাষাণ সোপান অতিক্রম করে **উঠে এলো** উপরে। পরক্ষণেই বন্ধ দরজায় **করাঘাতের শব্দ**। যুবাপুরুষ কণ্ঠে ডাক শোনা গেল **"মন্দির মধ্যে কে আছ? দ্বার খোল!"**

তিলোত্তমা ।। কেউ আশ্রয় চাইছে। দ্বার খুলে দাও।

বিমলা ।। যদি শত্রু হয়?

তিলোত্তমা ।। শত্রু!

নেপথ্যে পুনরায় ব্যস্ত কণ্ঠস্বর ফুটে উঠলো, **"বাইরে প্রবল বৃষ্টি পড়ছে। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না। দ্বার খোল, নচেৎ দ্বার ভেঙে প্রবেশ করবো।"**

বিমলা ও তিলোত্তমা পরস্পরকে ভয়ে জড়িয়ে ধরার সময় **অলংকার ঝংকার** শোনা গেল।

কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি। তারপরই সশব্দে মন্দির দ্বারের **আগল ভেঙে** প্রবেশ করলেন জগৎসিংহ। নারীকণ্ঠের আর্তনাদের সঙ্গে প্রচণ্ড শব্দে কাছে কোথাও **বজ্রপাত** হলো।

ঝড় বৃষ্টির শব্দ বেড়ে উঠেছিল দ্বার খোলার সঙ্গে সঙ্গে। জগৎসিংহ দ্বার বন্ধ করার পর কমে গেল সেই শব্দ।

(ঙ) [শুভংকর জানালায় দাঁড়িয়ে আছে বাইরের দিকে চেয়ে। রাস্তা দিয়ে মিলিটারী একটি প্লেটুন মার্চ করে চলেছে। মাঝে মাঝে কম্যাণ্ডারের নির্দেশ ভেসে আসছে অস্পষ্টভাবে। উর্মি চায়ের পেয়ালা হাতে ঢুকে, হেসে ফেললো।]

উর্মি ॥ এখনো তোর ছেলেবেলার অভ্যাস গেল না শুভ। রাস্তায় কিছু গেলেই ছুটে যাস জানালার ধারে।

[শুভংকর জানালা বন্ধ করে এগিয়ে এসে চায়ের কাপ ধরে নেয়]

শুভ ॥ বেরোবি বলেছিলি? যাবি না উর্মি?

উর্মি ॥ লাল শাড়ীটা তোর আলমারীতে আছে। বের করতে এলাম।

[উর্মি চাবি নিয়ে আলমারী খোলে। পাল্লায় ভীষণ ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ ওঠে]

উর্মি ॥ আলমারীর পাল্লাটা ভীষণ জ্যাম হয়ে গেছেরে শুভ। একটু তেল দিয়ে রাখিসতো?

[রাস্তায় একটা এ্যাকসিডেণ্ট ঘটলো। দুজনেই ছুটে যায় জানালার ধারে এবং জানালা খুলতেই বহু কণ্ঠের উৎকণ্ঠিত কোলাহল শোনা যাবে।]

শুভ ॥ ইস্! ছেলেটা একেবারে—

উর্মি ॥ কি বিভৎস। বন্ধ কর জানালাটা। আমি সহ্য করতে পারি না।

শুভ ॥ টুটুলকে বারান্দায় একা রেখে এসেছিস?

উর্মি ॥ হ্যাঁ, খেলছে ওর ট্রাই সাইকেল নিয়ে। আমি এই ফাঁকে....

[বাচ্ছা ছেলের কান্না শোনা গেল]

উর্মি ॥ এইরে! নিশ্চয় আছাড় খেয়েছে।

[ছুটে বেরিয়ে যায় উর্মি বাইরের দিকে। শুভ আবার জানালা খুলে দেখতে শুরু করলো। কোলাহল অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসছে।]

উপসংহার

নাট্যজগতে আজ আঙ্গিক-প্রাধান্যের যুগ চলেছে এবং সেই সঙ্গে সমালোচক মহলে চলেছে বিতর্ক এবং মতানৈক্যের ঝড়। সংখ্যা-গরিষ্ঠেরা বলেন, আঙ্গিকের প্রাবল্যে নাটকের মূলকথা 'ভাব'-এর অভাব দেখা দিচ্ছে—ঘটছে নাটকের অপমৃত্যু। অনেক দুর্বল নাটক আঙ্গিকের জমকালো পোষাকে গা মুড়ে বাজারে চালিয়ে নিচ্ছে নিজেদের। তাঁরা আরও বলেন, প্রয়োজন কি এসবের? আঙ্গিক বাদ দিয়েও তো বহু কালোত্তীর্ণ নাটক মঞ্চস্থ হয়েছিল।

আঙ্গিক শব্দটি আজকাল নাট্য জগতে যে অর্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, এর আভিধানিক অর্থ কিন্তু তা নয়। আঙ্গিকের অর্থ 'আলো বা মঞ্চের কারসাজি'—এই ধরণের একটি সংকীর্ণ সংজ্ঞা গড়ে উঠেছে সবাইকার মনে। কিন্তু এটি ভুল। অভিনেতা এবং নাটক, এই দুটিকে বাদ দিয়ে, দৃষ্টি-গ্রাহ্য আর যা কিছু থাকে একটি অভিনয়ে, সবটাই আঙ্গিক। আঙ্গিকের দরকার পড়ে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য। সেদিক থেকে বিচার করলে শুধু মঞ্চ বা আলো নয়, চুল দাড়ি রঙ প্রভৃতি রূপসজ্জার উপকরণ এবং কালোচিত, চরিত্রোচিত পোষাক পরিচ্ছদও আঙ্গিকের অঙ্গ। যে আবহসঙ্গীত পরিবেশের পরিমণ্ডল রচনার কাজে ব্যবহৃত হয়, তাও আঙ্গিক পদবাচ্য। নাটকের যেদিন সূত্রপাত হলো, অভিনেতাকে চরিত্রানুরূপ করে তোলার বাহ্যিক প্রচেষ্টাস্বরূপ রূপসজ্জাও প্রায় সেইদিন থেকেই শুরু হয়েছে। সেদিন হাল্কা ধরণের পট নির্মাণের কৌশল আবিষ্কৃত হয়নি। আবিষ্কৃত হয়নি বিদ্যুতের ব্যবহার কৌশল, বা ধ্বনিক্ষেপণের অতি আধুনিক সরঞ্জামাদি। কিন্তু আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই সেগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে একাত্ম হয়ে গেছে নাট্য পরিবেশনের কাজে।

বিরোধী সমালোচকেরা বলেন, পূর্ণ আলোকিত মঞ্চে যদি কোনও অভিনেতাকে অন্ধকার শ্মশানের চিত্র শুধুমাত্র তাঁর অভিনয় কৌশল আর বাচনভঙ্গিমায় প্রকাশ করতে হয়, তখন যে শক্তি বিকাশের সুযোগ থাকে, বাস্তবধর্মী মঞ্চপরিবেশনায় সে শক্তি বিকাশের প্রয়োজন হয় না। ফলে, অনুশীলনের অভাবে অভিনেতার ক্ষমতা-মান ক্রমেই নীচের দিকে নেমে চলেছে।

এর প্রতিবাদে দুটি কথা বলার আছে। প্রথম কথা, অভিনয় চাতুর্য্যেই ঘটনার অবস্থা দর্শকের মনে দৃঢ়বদ্ধ করার সুনিশ্চিত ক্ষমতা রাখেন যে অভিনেতা, তিনিও কি বাবরী চুলের উইগ না চাপিয়ে, আজকের প্রথাসিদ্ধ ট্রাউজার হাওয়াই শার্ট গায়ে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় নেমে যাওয়ার সাহস রাখেন ? অভিনয়টাই যদি একমাত্র কথা হয়, তবে ভেক নেওয়ার প্রয়োজন কোথায় ? প্রয়োজন আছে, তাঁকে কৃষ্ণ চরিত্রে বিশ্বাসগ্রাহ্য করে তোলার জন্য। কিন্তু এই বিশ্বাসগ্রাহ্য করে তোলার জন্য তাঁকে বাহ্যিক সাহায্য দেওয়া হলো বলে, যদি তিনি তাঁর নিজস্ব দক্ষতার পূর্ণ প্রয়োগে কার্পণ্য প্রকাশ করেন, তবে সে দোষ তাঁর নিজের—আঙ্গিক-শিল্পীর নয়।

দ্বিতীয় কথা, সে যুগে যানবাহনের এতাদৃশ উন্নতি ঘটেনি—পায়ে হেঁটে যারা দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতো, তাদের ক্ষমতা ছিল অসীম ; আজ বিশেষ করে শহরের লোকেরা এক পা বেরোতে ট্রামে বা বাসে ঝোলে। নিঃসন্দেহে আগের মতো হাঁটার ক্ষমতা আর মানুষের থাকছে না। তাই বলে, সেই হারানো ক্ষমতাকে ফিরিয়ে আনার জন্য কি কেউ যানবাহনের সেই আদিম অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জেহাদ তুলবেন ? খালি গলায় গান গেয়ে শ্রোতাকে মুগ্ধ করে রাখা নিঃসন্দেহে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচায়ক। যিনি পারেন, তিনি যথেষ্ট গুণী। কিন্তু ক'জন এই ধরণের গুণীর সমাবেশ ঘটানো সম্ভব একটি আসরে ? যন্ত্র সংগীত যদি এই গুণীর কণ্ঠের সঙ্গে সহযোগিতা করে, তবে ঐ গানই হয়ে উঠবে আরও শ্রুতিমধুর। গাইয়ের যদি ক্ষমতায় কোথাও ঘাটতি থাকে, তবে যন্ত্র-সংগীত তা ঢেকে রাখার বিষয়ে সাহায্য করে। গাইয়ে যখন দম নেয়, যন্ত্র-সংগীত সে ফাঁকটুকু অনায়াসে ভরিয়ে রাখে—পরিবেশকে ছিন্ন ভিন্ন হতে দেয় না।

অস্বীকার করার উপায় নেই, এমন দিক্‌পাল অভিনেতারাও জন্মগ্রহণ করে গেছেন, যাঁরা যেভাবেই আসরে দাঁড়ান না কেন, অভিনয় উপভোগ করার ব্যাপারে কোনও অভাববোধ করতেন না দর্শকবৃন্দ। কিন্তু

অভিনয় হচ্ছে একটি দলের যৌথ প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি। সেক্ষেত্রে দলের অ থেকে ঔ পর্যন্ত সবাই দিকপাল হবেন, এ আশা করা বৃথা। একটা যুগ অবশ্য ছিল, যখন দর্শক একক অভিনয়ের সৌকর্যেই নাটক বিচার করেছেন। আজ এসেছে দলগত অভিনয় কুশলতার ভিত্তিতে বিচার করার দিন। আজ তাই আবহসৃষ্টি না করে দলকে নামিয়ে দিলে, বহু পার্শ্ব-চরিত্রই অগাধ জলে হাবুডুবু খাবে—দু'একজন দিকপালের পক্ষে তাদের বাঁচিয়ে তীরে তোলা প্রায় অসম্ভব বললে চলে।

তবে একটা কথা আছে। যেমন অলংকার যাকে পরানো হবে, সে যদি সুশ্রী না হয়, তবে শুধু অলংকারের সৌন্দর্যে তাকে সুশ্রী করে তোলা সম্ভবপর নয়; তেমনি মূল নাটক এবং তার অভিনয় যদি উৎকৃষ্ট না হয়, তবে তাকে আঙ্গিক দিয়ে উৎরে দেওয়ার চেষ্টা বাতুলতা মাত্র। মনে রাখতে হবে, মানুষটাই মুখ্য, অলংকার মুখ্য নয়। তেমনি মুখ্য হচ্ছে নাটক—আঙ্গিক তার শোভাবর্ধনের সহায়ক মাত্র।

আঙ্গিক-শিল্পীকে তাই আঙ্গিকের প্রয়োগ সম্পর্কে হয়ে উঠতে হবে যথেষ্ট সচেতন, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সংযমী। ভাবীযুগের নাট্যশালার জন্য আঙ্গিক একটি শক্তিশালী মাধ্যম। এর অপচয় এবং অপপ্রয়োগ ঘটিয়ে একে যেন বিরূদ্ধ-সমালোচনামূলক ঝড়ের মুখোমুখী ফেলা না হয়। নাটকে আঙ্গিকের প্রয়োগ যুক্ত করার আগে প্রয়োগশিল্পীরা যেন নিজেরাই তার যুক্তিগুলি ঠিক করে নেন: "কেন এই আঙ্গিকের প্রয়োজন? এর কি স্বতঃস্ফূর্ত প্রয়োজন আছে, না জোর করে একে চাপানো হচ্ছে? সারা নাটকে আঙ্গিকের প্রয়োগ সুসমভাবে বণ্টিত হয়েছে তো? আঙ্গিকের চরম মুহূর্ত আর নাটকের চরমক্ষণ পরস্পরকে খণ্ডন করছে না তো?"

মঞ্চের গভীরতা, বলয়পটের পিছনে পশ্চাৎ-প্রক্ষেপণের জন্য পর্যাপ্ত পরিসর, মঞ্চমুখের ব্যাপ্তি ও উচ্চতা, দৃষ্টিরেখার উৎকর্ষ, দৃশ্যপরিবর্তনের ব্যবস্থা, প্রেক্ষাগৃহকে নিরন্ধ্র অন্ধকার করার বিষয়ে কতখানি সাফল্যলাভ সম্ভব ইত্যাদি বিষয়ের উপরে আঙ্গিক প্রয়োগের সফলতা-ব্যর্থতা অনেকখানি নির্ভর করে। তেমনি আবার প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি জোগাড় করার সামর্থ এবং সুযোগ, সহযোগী কর্মীদের নৈপুণ্য এবং অভিজ্ঞতা, আঙ্গিকের প্রয়োগ-সহযোগে পর্যাপ্ত মহলার ব্যবস্থা ইত্যাদিও বহুলাংশে প্রয়োগ-সাফল্যকে প্রভাবিত করে। লক্ষ্য করে দেখা গেছে, একটি বিশেষ মঞ্চে যে পদ্ধতির প্রয়োগে একটি বিশেষ আঙ্গিক চমক সৃষ্টি করেছিল, ভিন্ন মঞ্চের ভিন্ন পরিবেশে তা আংশিকভাবে বা পূর্ণতঃ ব্যর্থ হলো।

পরিকল্পিত আঙ্গিক একটি বিশেষ মঞ্চের বিশেষ পরিবেষ্টনীতে সর্বাঙ্গীন সফলতার সঙ্গে পরিবেশিত হতে পারছে কি না, মহলায় ফেলে তা পুংখানুপুংখরূপে যাচাই করে দেখা উচিত। দৃঢ়তার সঙ্গে আপোষ এড়িয়ে চলাই যুক্তিসম্মত। আঙ্গিকের কারসাজি বাদ যাক, তা'ও ভালো; কোনওক্রমেই যেন জোড়াতালি দিয়ে ধরা পড়ে যাওয়ার দৈন্য নিয়ে কোনও আঙ্গিক ব্যবহৃত না হয়—এদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখা দরকার।

যাদের হাতে এই আঙ্গিকের দায়িত্ব ন্যস্ত, মঞ্চের সেইসব নেপথ্য কর্মীদের উদ্দেশে শেষ কথা, নাট্য নির্দেশকের সার্বভৌমত্ব যেন তাদের দ্বারা অস্বীকৃত না হয়। আলোচনা করার পর্য্যাপ্ত অবকাশ থাকবে—কিন্তু সেটি সীমাবদ্ধ থাকবে প্রস্তুতি পর্বের একেবারে গোড়ার দিকে। একটি সুনির্দিষ্ট রূপরেখায় পৌঁছে যখন সমস্ত নেপথ্যকর্মের ঐকতান শুরু হবে, তখন তার কর্ণধার থাকবেন একজন—এবং তিনি নাট্যনির্দেশক। সংযত অনুগামিতার বাঁধনে বশীভূত থেকেও স্বীয় বৈশিষ্টে যে সমুজ্জল হয়ে উঠতে পারে, তাকেই সার্থক নেপথ্য কর্মী বলা হয়।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-ক পরিভাষা

ইংরাজী শব্দগুলি অধিক প্রচলিত, তাই সুপরিচিত। সেই কারণেই কোন্ ইংরাজী শব্দের কি প্রতিশব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বোঝার সুবিধার জন্য, ইংরাজী শব্দগুলি প্রথমে দেওয়া হলো।

Absorption—পরিশোষণ
Acting Area—রঙ্গপীঠ
Acting-Area Lights—রঙ্গপ্রদীপ
Additive Mixing—সংযুক্তি-মিশ্রণ
Adjustable—পরিবর্ত্তনসাপেক্ষ
Alternating—পরিবর্তী (তড়িৎপ্রবাহ)
Amplifier—ধ্বনিবিবর্দ্ধক
Amptitude—বিস্তার
Apex—শীর্ষবিন্দু
Approximate—উপান্তিক
Apron—অগ্রিরঙ্গ
Arena—কেন্দ্রায়ত রঙ্গপীঠ
Assembling—সন্নিবেশ
Auditorium—প্রেক্ষাগৃহ
Automatic—স্বয়ংক্রিয়

Back-drop / -ground—পশ্চাৎপট
Backings—আড়াল
Balance—ভারসাম্য
Ballet—নৃত্যনাট্য
Barn-door—কপাট
Base—ভূমি
Bayonet Cap—সঙ্গীন টুপী
Beam Angle—রশ্মিকোণ
Beam of Light—আলোকরশ্মি
Binaural—উভকর্ণ
Blending
& Toning—আলোকপ্রলেপ
Blue-green—নীলাভ-সবুজ
Border—ঝালর
Borderlights—ঝরির আলো
Brace—ধারক
Broken Colour—বর্ণের ভগ্নমিশ্রণ
Built unit—ভারবহনকারী দৃশ্যপট
Bunch (filament)—গুচ্ছ

Cable—তার
Circuit—তড়িৎচক্র / বর্তনী
Circumference—পরিধি
Clamp—চাবি
Colour—বর্ণ বা রঙ
Colour Booth—বর্ণপরীক্ষণ কক্ষ
Colour fatigue—বর্ণক্লান্তি
Colour Medium—বর্ণমাধ্যম
Colour Wheel—বর্ণচক্র
Complementary—প্রতিপূরক (বর্ণ)

Compression—ঘনীভবন
Concave—অবতল
Concentrated—সংহত
Conductor—পরিবাহী
Conical—মোচাকৃতি
Connector—তার সংযোজক
Constant—ধ্রুবক
Contrast—বিরোধাত্মক ভাব
Control System—নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা
Convex—উত্তল
Counter weight—প্রতিচাপ
Cross Section—প্রস্থচ্ছেদ চিত্র
Crystal—কেলাস
Cube—ঘনতল
Cue Sheet—সম্পাত সংকেত
Curtains—যবনিকা, পর্দা
Cut-offs—রোধক
Cut-off Angle—প্রতিহত কোণ
Cyc Foot—বলয়প্রদীপমালা
Cyclorama—বলয়পট
Cylindrical—সমবর্তুল

Dead pocket—অন্ধঘতি
Decibel—ডেসিবেল
Deep—ঘন (বর্ণের ক্ষেত্রে)
Dependability—নির্ভরযোগ্যতা
Diagonally—কোণাকুণিভাবে
Diameter—ব্যাস
Diffusion—সুসমপ্রসারণ (ধ্বনি)
Direct—একমুখী (তড়িৎপ্রবাহ)
Dispertion—বিভাজন
Distortion—বিকৃতি
Distribution—পরিবেশন
Divergent—কেন্দ্রাপসারী
Dome—গম্বুজ
Dominating Light—মূলসত্র
Down Stage—নিম্নরঙ্গ
Draperies—বনাত
Drop—যবনিকা

Earth—ভূমিযুক্ত (তড়িৎ সংক্রান্ত)
Echo—প্রতিধ্বনি
Effect—প্রতিক্রিয়া / কারসাজি
Effect Machine—কারসাজিকল
Elasticity—স্থিতিস্থাপকতা
Electricity—তড়িৎ, বিদ্যুৎ
Electric Current—তড়িৎ বা বিদ্যুৎ প্রবাহ
Emotive—ভাবগত
Endless—প্রান্তহীন
Expressive—প্রকাশধর্মী
Exterior Scene—বহির্দৃশ্য

Fabric—তন্তুজা
False Proscenium—অধিমুখ
Fill-in Light—পূর্তি
Filter—বর্ণমাধ্যম
Fire proof—অগ্নি নিরোধক
Fixture—আসবাববাতী
Flexible—পরিবর্তনযোগ্য
Floodlight—ফ্লাডবাতী
Floor plan—ভূমিচিত্র
Fluorescent—প্রতিপ্রভ
Fly-gallary—ঝুলবারান্দা

Focus—অধিঃশ্রয়ণ
Focal length—অধিঃশ্রয়ণ মান
Footlights—পাদপ্রদীপ
Formal—বিন্যাসধর্মী
Formula—সূত্র
Frequency—কম্পাঙ্ক
Funnel—চুঙ্গি
Furnishing—সজ্জানুষঙ্গিক

Ghost light—উপরশ্মি
Green room—সাজ ঘর
Grid—কড়ি কাঠাম, গরাদ
[ফিলামেণ্টের ক্ষেত্রে]
Grounded—ভূমিযুক্ত
Ground Row—ভূমিপট
Ground Plan—ভূমিচিত্র

Hand Prop—সঙ্গানুষঙ্গিক
Hanging—আলম্ব
Heavy—গাঢ়
Hertz (Hz)—হার্জ
Horizon strip—বলয়প্রদীপমালা
Horizontal—অনুভূমিক

Illumination—আলোকিত করা
Incident Ray—আপতিত রশ্মি
Index—সূচক
Inertia—জাড্য
Infra-Red—অবলোহিত,
লাল-উজানী
Insulation—অন্তরণ
Intensity—প্রাবর্ষ্য, তীক্ষ্ণতা
Interference (of sound)—
ব্যতিচার
Interior Scene—আভ্যন্তরীন দৃশ্য

Lamp—বাত্তী
Lamp Cap—বাত্তীর টুপী
Lens—আতসকাচ
Light—আলোক, হাল্কা
Lighting —আলোকসম্পাত,
দীপচিত্রণ
Lighting Cue-sheet—দীপচিত্রণ
সংকেতলিপি
Lightning—বিদ্যুৎচমক
Light Source—আলোকসূত্র
Live Sound—
যুগপৎ (তাৎক্ষণিক) শব্দ
Longitudinal Section—
দৈর্ঘ্যচ্ছেদ চিত্র
Loud Speaker—ধ্বনিপ্রক্ষেপক

Magazine Equipment—
প্রদীপ-ভাণ্ডার
Make up—রূপসজ্জা
Mask—আড়াল
Mat—জালতি
Mean position—মধ্যাঙ্ক
Microphone—ধ্বনিগ্রাহক
Mirror spot—আয়না বাত্তী
Model—প্রতিরূপ
Monaural—এককর্ণ
Mood lights—পটপ্রদীপ
Motivating lights—সূত্রপ্রদীপ

Neutral—প্রভাবহীন (বর্ণের ক্ষেত্রে)
Negetive—ঋণভাগ
Normal—লম্ব (জ্যামিতিক)
Numerical order—সংখ্যানুক্রমিক

Objective phase—মৃন্ময়ী পর্য্যায়
Ohm—ও'ম / ওহ্ম
Opaque—অস্বচ্ছ
Open-air Theatre—মুক্তাঙ্গন মঞ্চ
Operator—নিয়ন্ত্রক
Orchestra—বাদ্যপীঠ
Organic—ছন্দোবদ্ধ, দৈব

Pale—ফ্যাকাশে
Parallel Beam—সমান্তরাল রশ্মি
Peacock Blue—ময়ূরকণ্ঠী নীল
Perspective—পরিপ্রেক্ষিত
Phantom Load—ঘাটতি চাপ
Pin-rail—কীলক
Plan—ভূমিচিত্র
Plane—তল
Plasticity—সহজ পরিবর্তন
Plot—খসড়া
Portable—বহনযোগ্য
Poseiive—ধনভাগ
Pre-set Control—পূর্ববিন্যাস নিয়ন্ত্রণ
Primary Colour—মৌলিক বর্ণ
Prime Coat—প্রাথমিক বর্ণপ্রলেপ
Prism—তিনপলা কাচ
Projector Lamp—প্রক্ষেপ বাতী
Propagation—বিস্তরণ
Properties—আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি
Proscenium—মঞ্চমুখ
Psychological—মনস্তাত্বিক
Pully—কপিকল
Punctuation—বিরতি

Quarter Sphere—অর্দ্ধ-গোলার্দ্ধাকার

Radius—ব্যাসার্দ্ধ
Rarefaction—তনীভবন
Ratio—অনুপাত
Realism—বাস্তববোধ
Realistic—বাস্তবানুগ
Recorded Sound—বানীবদ্ধ ধ্বনি
Rehearsal—মহলা
Reflection—প্রতিফলন
Reflector—প্রতিফলক
Refraction—প্রতিসরণ
Remote-Control—দূর-নিয়ন্ত্রণ
Repeatation—পুনঃকৃতি
Reproduction—পুনরুৎপাদন
Re-recording—পুনর্মুদ্রণ
Resonance—অনুনাদ
Reverberation—অনুরণন
Revolving Stage—ঘূর্ণায়মান মঞ্চ

Saturated—পরিপৃক্ত
Scene Prop—মঞ্চানুষঙ্গিক
Scenery—দৃশ্য পট
Screw Cap—বাতীর প্যাঁচ টুপী
Script—পাণ্ডুলিপি

Secondary Colour—যৌগিক বর্ণ
Secondary Lighting—উপসূত্র
Section—ছেদচিত্র
Sedative—ক্লান্তিকর
Selective Reflection—
নির্বাচিত প্রতিফলন
Selective Transmission—
নির্বাচিত অতিক্রমণ
Settings—দৃশ্যপট
Set Unit—ভূমিলগ্ন দৃশ্যপট
Set-up Sheet—বিন্যাস সংকেত
Shade—আলোছায়া
Shadow—নিক্ষিপ্ত ছায়া
Sharp Edge spotlight—
তীক্ষ্ণসীমা-বিশিষ্ট স্পটবাতী
Shifting—অপসারণ
Shutter—সার্সি
Sight line—দৃষ্টিরেখা
Silhoutte—কৃষ্ণচিত্র
Sketch—নক্সা
Skiopticon—কারসাজি কলবিশেষ
Sky—নভোপট
Slide—স্বচ্ছচিত্র
Soft edge—ক্রমবিলীয়মান সীমা
Sound wave—ধ্বনিতরঙ্গ
Speed—দ্রুতি
Sphere—গোলাকার
Spotlight—স্পটবাতী
Stage—রঙ্গমঞ্চ
Stage Lighting—মঞ্চে আলোক-
সম্পাত, দীপচিত্রণ
Stage Manager—মঞ্চ-নিয়ামক
Stand—ধারক
Standing unit—লম্ব দৃশ্যপট
Step lens—ধাপযুক্ত আতসকাচ
Stimulating—উৎসাহব্যঞ্জক
Stock—মজুত
Stray light—নির্গত
Striplights—প্রদীপভাণ্ডার
Stylistic—ভাবধর্মী
Subjective phase—তন্ময়ী পর্য্যায়
Subtractive mixing—
বিযুক্তি মিশ্রণ
Suggestive—ইঙ্গীতধর্মী
Supersonic wave—শব্দোত্তর তরঙ্গ
Symbolic—উপমাত্মক

Teaser—মুখপট
Terminal—উৎসপ্রান্ত
Tormentor—পার্শ্বপট
Thrust stage—অধিরঙ্গমঞ্চ
Tower—তোরণ
Translucent—অর্দ্ধস্বচ্ছ
Transmission—অতিক্রমণ
Transperent—স্বচ্ছ
Trap—সুঁড়ি
Trial set-up—পরীক্ষামূলক সন্নিবেশ
Tubular—নলাকৃতি, সমবর্তুল
Tuning Fork—সুরশলাকা
Tweeter—টুইটার
(শিঙ্গা প্রক্ষেপক)

Ultra violet—অতিবেগুনী
Unit—একক

Unity—সমার্থবোধকতা
Up Stage—উর্দ্ধ রঙ্গ

Vacuum—শূন্যগর্ভ
Variable—পরিবর্তনযোগ্য
Variety—বৈচিত্র
Ventillation—বায়ুচলাচলের পথ
Violet—বেগুনী
Visual Prop—দৃশ্যানুষঙ্গিক

Wagon stage—শকট-মঞ্চ
Weight bearing Construction-
ভারবহনক্ষম ব্যবস্থা
Wings—পার্শ্ব রঙ্গ
Woofer—উফার (বাক্সবন্দী প্রক্ষেপক)
Working Drawing—
গঠন-নির্দেশিকা
Working Light—কাজী

প্রতিশব্দ নির্বাচনের সময় আভিধানিক অর্থের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে ব্যবহারিক অর্থটিকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

পরিশিষ্ট-থ ॥ অনুশীলনী

এই পরিচ্ছেদে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েকটি নাটকের এক একটি দৃশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলির জন্য আঙ্গিক নির্দেশকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত কর। উত্তর পত্রে যে যে বিষয়গুলি অবশ্য চাই, তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলো।

(ক) দৃশ্যের নক্সা এবং দৃশ্যারম্ভের মুহূর্তে উপস্থিত চরিত্রগুলির অবস্থানের ইঙ্গিত,

(খ) ভূমিচিত্র এবং উল্লেখযোগ্য আনুষঙ্গিকগুলির সঠিক নির্দেশ,

(গ) দৃশ্যপটের গঠন-নির্দেশিকা,

(ঘ) বিশেষ বিশেষ মঞ্চানুষঙ্গিকের গঠণ-নির্দেশিকা,

(ঙ) আবশ্যকীয় কাঠ ও কাপড়ের পরিমাণ,

(চ) ভূমিচিত্রে আলোকযন্ত্রগুলির সূচক-যুক্ত অবস্থান,

(ছ) আলোকসম্পাত পরিকল্পনা এবং দীপচিত্রণ সংকেত,

(জ) ধ্বনি যোজনার সংকেত,

(ঝ) ধ্বনি বাণীবদ্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির তালিকা,

(ঞ) বিশেষ নির্দেশাবলী, তথা মন্তব্য।

[স্থানাভাবে দৃশ্যগুলির অংশমাত্র দেওয়া হলো। উত্তর-পত্র প্রস্তুত করার সময় অবশ্যই পূর্ণ নাটক অনুসরণ করতে হবে। প্রদত্ত দৃশ্যাংশ-গুলিতে মোটাহরফে উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলির দিকে অনুশীলনকারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। উত্তর-পত্র প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অনুশীলনকারী-কর্তৃক পটলিখন, দীপচিত্রণ বা ধ্বনিযোজনায় সৌকর্য্য সাধনের প্রয়োজনে, নাটকে উল্লেখ নেই এমন বিষয়েরও অবতারণা চলতে পারে। কিন্তু সেগুলি যেন কোনও ক্রমেই নাটকে উল্লিখিত নির্দেশাবলীর পরিপন্থী না হয়। বলা বাহুল্য, নাট্যাংশে উল্লিখিত নির্দেশাবলীর কোনও অংশ বাদ দেওয়া বা পরিবর্তন করা চলবে না।]

পৌরাণিক নাটক

মাইকেল মধুসূদন দত্তের

শর্মিষ্ঠা নাটক

প্রথমাঙ্ক : দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

দৈত্য-দেশ—গুরু শুক্রাচার্য্যের আশ্রম

(শর্মিষ্ঠার সখী দেবিকার প্রবেশ)

দেবি ।। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বগত) **সূর্য্যদেব** ত প্রায় **অস্তগত** হলেন। এই যে আশ্রমে পক্ষিসকল **কুজন ধ্বনি** করে চারি দিক্ হতে আপন আপন বাসায় ফিরে আসচে ; কমলিনী আপনার প্রিয়তম দিনকরকে গমনোন্মুখ দেখে বিষাদে মুদিতপ্রায়......মহর্ষিগণ স্বীয় স্বীয় **হোমাগ্নিতে** সায়ংকালীন **আহুতি প্রদানের** উদ্যোগে ব্যস্ত ; ...... এই ত সন্ধ্যাকাল উপস্থিত, কিন্তু রাজকুমারী যে এখনও আসচেন না, কারণ কি ?

* * *

দেবযানী ।। (আকাশ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) প্রিয় সখি ! বসুমতী যেন অদ্য **রাত্রে** স্বয়ম্বরা হয়েছেন ; ঐ দেখ **আকাশমণ্ডলে ইন্দু** এবং **গ্রহনক্ষত্রগণ** প্রভৃতির কি এক অপূর্ব এবং রমণীয় শোভা হয়েছে। ...... স্থানে স্থানে **নানাবিধ কুসুমজাল** বিকশিত হয়ে যেন স্বয়ম্বরা বসুন্ধরার অলঙ্কার স্বরূপ হয়ে রয়েছে।

শুক্র ।। (স্বগত) আমার চিরকাল এই বাসনা, যে আমি অনুরূপ পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করি ; কিন্তু ইদানীং বিধি আনুকূল্য প্রকাশপূর্বক মদীয় মনস্কামনা পরিপূর্ণ করলেন। **এক্ষণে** কন্যাদায়ে নিশ্চিন্ত হলেম। সুপাত্রে প্রদত্তা কন্যা পিতা-মাতার অনুশোচনীয়া হয় না।

[প্রস্থান]

ঐতিহাসিক নাটক

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের

চন্দ্রগুপ্ত

দ্বিতীয় অংক : পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—**সেতুপার্শ্বে অরণ্য**। কাল—**সন্ধ্যা**

[চাণক্য একাকী]

চাণক্য ॥ **ক্ষুধিত** লেলিহান কুক্কুরদের যুদ্ধক্ষেত্রে ছেড়ে দিয়েছি। এখন তারা স্বচ্ছন্দে এই প্রবাহিত ভৈরবরক্তধারা পান করুক। এই **নিবিড় অরণ্যে** ব্যাঘ্র ভল্লুকের অভাব আজ তারাই পূর্ণ কর্চ্ছে।

* * *

চাণক্য ॥ এই ত আমার শিষ্য। এই ক্ষণিক অবসাদ তোমার প্রাণ থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। একবার সবলে—

দূর নেপথ্যে ॥ এই দিকে—এই দিকে—

চাণক্য ॥ ঐ তারা আসছে—এখানেই আসছে।...... **ঐ তূর্য্যধ্বনি**। তোমার সৈন্যেরাও আসছে। ভয় নেই।

নিকটতর নেপথ্যে ॥ এই জঙ্গলের ভিতরে।

* * *

[ইত্যবসরে অবশিষ্ট সৈনিকদ্বয় তাঁহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, সেই মুহূর্তে প্রথমে চন্দ্রকেতু ও ছায়া, তৎপশ্চাতে অন্যান্য সৈনিক আসিয়া উহাদের প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। ঠিক সেই সময়ে **চাণক্যকে সেতুর উপর** দেখা গেল। তিনি কহিলেন]

চাণক্য ॥ বধ কোরো না। বন্দী কর।

সামাজিক নাটক

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের

রমা

প্রথম অংক : প্রথম দৃশ্য

[৺যদুনাথ মুখুয্যে মহাশয়ের **বাটীর পিছনের দিক**। **খিড়কীর দ্বার খোলা**, সম্মুখে **অপ্রশস্ত পথ**। চারিদিকে

আম-কাঁঠালের বাগান, এবং অদূরে পুষ্করিণীর **বাঁধানো ঘাটের কিয়দংশ** দেখা যাইতেছে। **সকাল বেলায়** রমা ও তাহার মাসি স্নানের জন্য বাহির হইয়া আসিল, এবং ঠিক সময়েই বেণী ঘোষাল আর এক দিক দিয়া প্রবেশ করিলেন। রমার বয়স বাইশ তেইশের বেশী নয়। অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল বলিয়া হাতে কয়েক গাছি চুড়ি ছিল, এবং থানের পরিবর্তে সরু পাড়ের কাপড় পরিত। বেণীর বয়সও পঁয়ত্রিশ ছত্রিশের অধিক হইবে না।]

* * *

বেণী ।। রমা, আসল কথা হচ্ছে ...... দিন রাত মনে রাখতে হবে, এ তারিণী ঘোষালের ছেলে আর কেউ নয়। চেপে বস্‌লে আর— [**অন্তরাল হইতে** গম্ভীর কণ্ঠের ডাক আসিল— **"রাণী কইরে?"** রমা চকিত হইয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই দ্বারের ভিতর দিয়া রমেশ প্রবেশ করিল। তাহার রুক্ষ মাথা, খালি পা, উত্তরীয়টা মাথায় জড়ান।]

* * *

বেণী ।। তবে যে শুনি—

গোবিন্দ ।। অমন ঢের শুনবে বাবাজী, অনেক ব্যাটা এসে অনেক রকম ক'রে লাগাবে; কিন্তু গোবিন্দ খুড়োকে চেনো ত? ব্যস্‌! ব্যস্‌!

[উভয়ের প্রস্থান]

কাব্য নাটক

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

বিসর্জন

তৃতীয় অংক : পঞ্চম দৃশ্য

মন্দির

[নক্ষত্র রায়, রঘুপতি ও নিদ্রিত ধ্রুব]

রঘুপতি ।। কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে। জয়সিংহ
এসেছিল মোর কোলে অমনি শৈশবে
পিতৃমাতৃহীন।......

নক্ষত্র ॥ ঠাকুর, কোরো না দেরি আর—
ভয় হয়, কখন সংবাদ পাবে রাজা।

রঘুপতি ॥ সংবাদ কেমন করে পাবে? চারিদিক
নিশীথের নিদ্রা দিয়ে ঘেরা।

* * *

নক্ষত্র ॥ অনেক বিলম্ব
হয়ে গেছে। আমি বলি, আজ থাক। কাল
পূজা হবে।

রঘুপতি ॥ বিলম্ব হয়েছে বটে! রাত্রি
শেষ হয়ে আসে।

নক্ষত্র ॥ ওই শোনো পদধ্বনি।

রঘুপতি ॥ কই। নাহি শুনি।

নক্ষত্র ॥ ওই শোনো, ওই দেখো
আলো।

* * *

রঘুপতি ॥ সংবাদ পেয়েছে রাজা! আর তবে
এক পল দেরি নয়! জয় মহাকালী!

[খড়্গ উত্তোলন। গোবিন্দ মাণিক্য ও প্রহরীগণের দ্রুত প্রবেশ। রাজার নির্দেশক্রমে প্রহরীর দ্বারা রঘুপতি ও নক্ষত্ররায় ধৃত হইল]

গোবিন্দ ॥ নিয়ে যাও কারাগারে, বিচার হইবে।

বিদেশী নাটক

জর্জ বার্ণার্ড শ'য়ের

আর্মস্ এ্যাণ্ড দি ম্যান

প্রথম অংক

[রাত্রিকাল। ১৮৮৫ সাল, নভেম্বরের শেষ। বুলগেরীয়ায় ড্রাগম্যান গিরিবর্ত্মের কাছে ছোট একটি শহরে জনৈকা ভদ্রমহিলার শয়ন কক্ষ। খোলা জানালা দিয়ে বুল-

বারান্দা পেরিয়ে বলক্যান পর্বতমালার **তুষার মণ্ডিত গিরিশীর্ষের অপূর্ব শোভা** দেখা যাচ্ছে ; **তারকালোকিত** শুভ্র তুষার রাজি মনে হচ্ছে বুঝি মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। .... কক্ষের বাম দিকে দেয়ালের একটি খাঁজের মধ্যে শয্যাশীর্ষে রঙ করা কাঠের বেদী—নীল আর সোনালী রঙের মাঝে **হাতী দাঁতের যীশু মূর্তি :** তার সামনে তিনটি চেনে ঝোলানো **একটি প্রদীপ গোলক।** মূল বসার যায়গাটি কক্ষের বিপরীত দিকে, জানালার মুখোমুখী বসানো—**একটি তুর্কী অটোম্যান।** ...... শয্যা এবং জানালার মাঝামাঝি যায়গায় **ড্রেসিং টেবিল** ...... **দরজাটি** শয্যার খুব কাছে, এবং উভয়ের মাঝে একটি **ড্রয়ার চেষ্ট।** ...... একটি **ছোট ইজেলে** একজন সুদর্শন অফিসারের **তৈলচিত্র**—যার ব্যক্তিত্ব এবং চোখের আকর্ষণীয় দৃষ্টি দেখামাত্র নজরে পড়ে। ...... ড্রয়ার চেষ্টের উপরে রাখা **মোমবাতীর আলোয়** কক্ষটি আলোকিত। ড্রেসিং টেবিলের উপরে আর একটি বাতিদানে **বাতী জ্বলছে**—তার পাশে একটি দেশ্লাই বাক্স রাখা। ..... ঝুল বারান্দায় মুগ্ধ দৃষ্টিতে স্বপ্নভরা চোখে দাঁড়িয়ে আছে রাঈনা। পরণে শোবার পোষাক, তার উপরে লোমের কলার দেওয়া ক্লোক।]

[রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে গেলো **দূরাগত গুলির শব্দে।** বিছানা থেকে চট্ করে উঠে **বাতিগুলি নিভিয়ে দেয়** রাঈনা। .... যীশুর সামনেকার গোলকের আলো আর দূরের আকাশে তারার আলো ছাড়া সব অন্ধকার। খুব নিকটেই **গুলি ছোঁড়ার শব্দ** হলো—বাইরে **ছোটাছুটির হট্টগোল।** .... হঠাৎ খড়খড়িটা কেউ খুলে ফেললো বাইরে থেকে। দূর পাহাড়ের পটভূমিকায় ফুটে উঠলো ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা এক **আগন্তুকের ছায়ামূর্তি।**

লোকটি ।। বিরক্ত করলাম বলে ক্ষমা চাইছি। কিন্তু মনে হয় আমার পোষাক দেখেই চিনতে পারছেন ? সার্বিয়ার দলে। ধরা

পড়লেই আমায় মেরে ফেলা হবে। ব্যাপারটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন ?

* * *

[নেপথ্যে প্রচণ্ড কোলাহল। দরজার কড়া নড়ে ওঠে]

নেপথ্যে
অফিসার ।। দরজা খুলুন। কে আছেন, উঠে পড়ুন শিগগির।

নেপথ্যে
নিকোলা ।। এটা মেজর, পেটকফের বাড়ী মশাই। বললেই, ছট্ করে ঢোকা চলবেনি।

[চিৎকার, গোলমাল, দরজায় ধাক্কা বেড়ে উঠলো। দরজা খোলার শব্দ। এক গাদা লোকের এগিয়ে আসার আওয়াজ হঠাৎ থেমে গেল ক্যাথেরিণের কথায়]

* * *

রাঈনা
[মায়ের হাত ধরে] ।। থাক মা-মণি, বেচারা একেবারে ক্লান্তিতে ভেঙে পড়েছে। ওকে ঘুমুতে দাও]

ক্যাথেরিণ
[অবাক দৃষ্টিতে] ।। ‘বেচারা’। রাঈনা।

[ক্যাথেরিণের চোখে কঠোর চাউনি ফুটে উঠলো। লোকটি ওদিকে নির্বিবাদে নাক ডাকাতে শুরু করে]*

* মূল ইংরাজী নাটক, অথবা সহজলভ্য যে কোনও অনুবাদ অনুসরণ করে উত্তরপত্র প্রস্তুত করা চলবে। প্রদত্ত অংশ গ্রন্থকার অনুদিত পাণ্ডুলিপি থেকে সংগ্রহিত।